ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন

সারসংক্ষেপ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক

ইয়াসমিন আরা সাথী
শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-২০১২
রেজি. নম্বর : ০৩

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

নভেম্বর ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

এক.

সমরেশ বসু সমাজঘনিষ্ঠ কথাকোবিদ। প্রখর কালচেতনা, বিশেষ জীবনবোধ, অগ্রবর্তী অভিজ্ঞতা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য আর সুগভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ তাঁর সাহিত্যজীবন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা এবং শাণিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি অভিনন্দিত। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং উপমহাদেশের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাতের ফেনিল আবর্তে দিশেহারা মধ্যবিত্ত জীবনের নানা বিচ্যুতি, বিসংগতি আর রূপান্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্র পরিস্ফুটনে তিনি নিপুণ শিল্পী। তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে যথাযথভাবে অন্তর্লগ্ন হয়েছে মধ্যবিত্তের জীবনজিজ্ঞাসা।

বিশ শতক সমরেশ বসুর প্রতিভা বিকাশের কাল। তাঁর মানসপ্রত্যয় এই শতকের সমাজ অভিব্যক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমরেশ বসুর লেখনীর বিকাশে এবং বিকাশের সীমাবদ্ধতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা অনেক। সমরেশ বসুর লেখক-জীবনের সাড়ে চার দশকে সমগ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি এক ওলট-পালটের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে। একদিকে সাম্যবাদী চেতনা, অপরদিকে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা মধ্যবিত্তকে বিপরীতমুখী ধাক্কায় আলোড়িত করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ’৪৭-এর দেশভাগ, ’৬৭-এর যুক্তফ্রন্ট, র‌্যাডিকাল অভ্যুত্থান, শ্বেতসন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, বামফ্রন্ট ও আকাশচুম্বী আশা, সাম্যবাদী স্বপ্নের ভাঙন প্রভৃতি বিষয়। চল্লিশের দশকে বৃহত্তর চেতনাসমৃদ্ধ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি আশির দশকে ভবিষ্যতহারা, ক্রমশ রাজনীতিবর্জিত মানসিকতায় সঙ্কীর্ণ এক বিবরবাসী হয়ে উঠেছে। সমরেশ বসুর লেখক-জীবনের শুরুতে যে রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখেছেন, যে রাজনৈতিক চেতনায় মধ্যবিত্ত-পিছুটানকে কাটাতে চেয়েছিলেন, দ্বান্দ্বিক সময়ের প্রভাবে পরবর্তীকালে সেখান থেকে অনেকখানি সরে আসেন। ক্রমশ রাজনীতি-বিমুখতার ছাপ পড়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যে। চরিত্ররা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নায়কেরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে পরিবেশ-নিয়তি এবং সামাজিক-নিয়তির বিরুদ্ধে। আর এ কারণেই তাঁর চরিত্ররা স্বতন্ত্র। সমরেশের উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মুক্তির কথা। মানুষই তাঁর কাছে বড়। কারণ তিনি জানতেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। আর এই মানুষের কথা বলতে গিয়েই বিবরবাসী মধ্যবিত্তের মানসসঙ্কট, বিচ্ছিন্নতার আর্তি, মুক্তির প্রচেষ্টাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। সমরেশ বসুর লেখায় ঘুরেফিরে এসেছে মধ্যবিত্তের নৈরাশ্য, নৈঃসঙ্গ্য, উৎকণ্ঠা, আশা আর আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে সমাজবিচ্ছিন্ন ও আত্মবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা। প্রত্যয় প্রমূল্যহীন সমাজে মধ্যবিত্ত যে একদিন তার আত্মকৃত বিবর ভেঙে বেরিয়ে আসবে এই আশাবাদ সমরেশ বসুর সবসময় ছিল।

দুই.

মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান সমাজের মধ্য স্তরে। এরা বিত্তবান নয় আবার বিত্তহীনও নয়। সমাজে যে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস লক্ষ করা যায়, সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের মধ্যভাগে অবস্থান করে। এই শ্রেণি স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে সমাজে অবস্থান করতে পছন্দ করে। সাধারণভাবে এই শ্রেণি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ভদ্রোচিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মধ্যবিত্তকে তার জীবিকা শুরু হয় বিচিত্র পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন এবং বাস্তবের ব্যবধান ঘোচাতে তাকে প্রতিনিয়ত হোচট খেতে হয়। সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান দূর করতে প্রতিনিয়ত মানসিক টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। শাসকশ্রেণি রাষ্ট্রযন্ত্রকে হাতের মুঠোয় রাখতে এই শ্রেণিটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে । সমরেশ বসু নিজে যেহেতু এই বিত্তের মানুষ ছিলেন তাই তিনি মধ্যবিত্তের চিত্তবৈকল্য এবং দ্বিধান্বিত জীবন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। আত্মমগ্ন ভীরু পলায়নপর মধ্যবিত্তকে তিনি দাঁড় করালেন বাস্তবতায়।

সমরেশ বসু মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। সমরেশ বসুর পূর্বে বাংলা উপন্যাসে নানাভাবে মধ্যবিত্তের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার নিজস্ব সত্তা সবচেয়ে বেশি বিকশিত করেছে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে পরিবর্তনশীল সমাজ পরিস্থিতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল। এই শ্রেণির একটি অংশ উচ্চ শ্রেণিতে ওঠার বাসনায় নৈতিকভাবে স্খলিত হয়েছে। অন্য একটি অংশ আয়ের উচ্চ স্তরে পৌঁছেও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়নি। পুরনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। এই শ্রেণির অভ্যন্তরে সামাজিক জঙ্গমতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এরা সাধারণত বিত্তবানদের সংস্কৃতি অনুসারী, কায়িক শ্রমবিমুখ বিদ্যা এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী। মানসিকতায় এরা সর্বাধিক সংবেদনশীল। সমরেশ বসু এই বৈশিষ্ট্যসমূহই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোলোক সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ শতকের তিরিশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপনের বাস্তবতাকে প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক দুটো বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এক. মধ্যবিত্তের মানসভূমি, দুই. মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ক্ষেত্রভূমি। মধবিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র বিনির্মাণে সমরেশ বসু উপন্যাসে কখনো একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, কখনো কখনো অর্থপূর্ণ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অর্থপূর্ণ সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনো-বা লেখক নিজেই তার সর্বজ্ঞদৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন।

তিন.

'সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন' শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমরেশ বসুর জীবনবোধ এবং মানসগঠনের মূল প্রবণতাগুলো আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর জীবন-ইতিহাস এবং মানসগঠনের সাথে মধ্যবিত্তজীবনের অভিযোজন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষত মধ্যবিত্তের সংজ্ঞার্থ, বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব, বিকাশ এবং চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা : মধ্যবিত্তের অবস্থান'- এ বাংলা উপন্যাসের অগ্রযাত্রা এবং বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সমরেশ বসুর মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসসমূহকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. সমরেশ বসুর উপন্যাস : প্রথম পর্ব; দুই. সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্য পর্ব; তিন. সমরেশ বসুর উপন্যাস : অন্ত্য পর্ব। প্রথম পর্বে (১৯৫২-৬৪) মোট সাতটি, মধ্য পর্বে (১৯৬৫-৭০) মোট বারোটি এবং অন্ত্য পর্বে (১৯৭১-৮৮) মোট সাতাশটি উপন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে সর্বমোট ছেচল্লিশটি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। সমরেশ বসু তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বমোট একশ ষোলোটি উপন্যাস রচনা করেছেন। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা তাঁর মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস সমূহ আলোচনা করেছি।

চার.

আত্মদ্বন্দ্বে দগ্ধীভুত মধ্যবিত্তের মানসভূগোল নির্মাণে সমরেশ বসু অভিজ্ঞতাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে সমকালীন মধ্যবিত্তের যাপিত জীবন সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম পর্বে আলোচিত মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস *শ্রীমতি কাফে* তে তিনি ভজুলাটের দোদুল্যমানতা প্রকাশে বেছে নিলেন ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ সাল। এই সময়ে মধ্যবিত্তের মনোযন্ত্রণার কথা বললেন ভজুলাটের মতো এক বেকার যুবকের মধ্য দিয়ে। অনুচ্চারিত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় সে কখনোই পরিবারের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। সমরেশ বসু সেই ভজুলাটকে বৃহত্তরের সাথে মেশাতে চাইলেন। ভজুলাটকে সে সময়ের বৃহত্তর বাস্তব-জীবনের টানাপোড়েনের আশাভঙ্গ ও আশার প্রায় প্রতীক হিসেবে দাঁড় করালেন। ভজুলাটের ব্যক্তিগত পরিবারগত অস্তিত্ব ক্রমশ প্রসারিত হয় বৃহত্তর বাস্তবের দিকে। এই প্রসারতা সেই সময়ের ইতিহাসে মধ্যবিত্তের মধ্যে পাওয়া যায়। ভজুলাটের যে

সংকট তা এক অর্থে সমসময়েরই সংকট। সময়ের বহুবঙ্কিম জটিল ও যন্ত্রণার শিল্পভাষ্য *বাঘিনী* উপন্যাস। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভাঙনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি *বাঘিনী* উপন্যাস। চিরঞ্জীবকে শেষ পর্যন্ত মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন বৃহত্তরের মধ্যে। দুর্গাকে হারিয়েও সে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। ত্রিধরের মতো নেতা তাকে পথ দেখিয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতজনিত জীবন সত্যের আলোতে চিরঞ্জীব স্নাত হয়ে নবজন্ম লাভ করেছে। *দুরন্ত চড়াই*-এ কন্যাকে পাত্রস্ত করা নিয়ে মধ্যবিত্তের ফাঁকি দেখালেন। অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের চরিত্র স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই উপন্যাসে। *ফেরাই*-এ মধ্যবিত্ত নারীর মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। এই পর্বের প্রথম দিককার উপন্যাসে ব্যক্তি এক বৃহত্তরের সাথে মেলাতে চেয়েছেন। ক্রমশ এই মধ্যবিত্তের অস্তিত্ত্ব সংকট এতই প্রবল হয় যে ব্যক্তি সমষ্টি থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

সময়ের অনিবার্য কাল-কৃত্যে মধ্য-পর্বে নায়কেরা নিপতিত হয়েছে ব্যক্তির অনন্বয়বোধে। ষাটের দশকের উন্মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, দ্বন্দ্বময় সময়ের ছবি পাওয়া যায় সমরেশ বসুর এ-পর্বের উপন্যাসে। সমাজ-রাষ্ট্রের নানাবিধ চাপে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মনোলোক বিচ্যুতি-বিসঙ্গতি-বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। তারা সুস্থ সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবনের প্রত্যাশায় জীবনের মিথ্যাচার-লাম্পট্য-মেকি ভদ্রতা-ভণ্ডামি এ সমস্ত অন্তঃসারশূন্যতা থেকে বের হতে চেয়েছে। কিন্তু সমকালীন উৎকেন্দ্রিক পরিবেশ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দেয়নি। বিচ্ছিন্নতা আর শূন্যতার গর্ভে তারা হারিয়ে যেতে থাকে। এ সময় সংকটাদীর্ণ নৈরাজ্যময় পরিবেশে মধ্যবিত্ত সত্তাবিচ্ছিন্ন হয়ে চরম সংকটে নিপতিত হয়। বিশেষত মূল্যবোধ হারিয়ে স্ব-সংস্কৃতি, সততা এবং অস্তিত্ব হারিয়ে অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়। সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে মূল্যহীনতার জগৎ থেকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। যে কারণে প্রচলিত কথ্যভঙ্গি-নস্যাৎ করে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজকে বারবার আঘাত করেছেন। জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। আত্মিক সঙ্কটাদীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই পর্বে। আত্মকথন এবং স্ল্যাঙভাষ্যে নায়কের মনোবিকারের শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। যেমন *বিবর, পাতক, স্বীকারোক্তি*-র অনামা নায়ক এবং *প্রজাপতি*-র সুখেন সবাই আত্মসমালোচক এবং সমাজসমালোচক। তারা কেউই জীবনের কোথাও ছন্দ বা সঙ্গতি খুঁজে পায়নি। প্রত্যেকেই সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তশ্রেণির সঙ্গে এদের ভয়াবহ রকমের বিরোধ। তাইতো এরা প্রত্যেক্যেই কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে। সমাজকে শোধন করার অভিপ্রায়ে শ্রেণি স্বার্থের বেষ্টনীকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। সমালোচনা করেছে সমকালীন রাজনীতির। লেখক ষাটের দশকের প্রত্যয়-

প্রমূল্যহীন অপচয়িত সমাজের অন্তর্বাস্তবতা বোঝাতে সত্তাবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বহুভূজ যন্ত্রণার প্রসঙ্গ এনেছেন। এই পর্বে ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে এতই সচেতন যে ক্রমশ নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছে। *বিবর*-এর অনামা নায়কের আত্মকথনে তার বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ এসেছে। তবে সে অপচয়িত সমাজের অংশ হয়েও মধ্যবিত্তের অসঙ্গতিপূর্ণ ক্লেদাক্ত জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই অনামা নায়ক প্রত্যাখান করেছে তার সামগ্রিক মূল্যবোধহীনতাকে। এই পর্বে শুধু ব্যক্তির সংকটই নয় মধ্যবিত্তের নানামাত্রিক সংকটের চিত্র তুলে ধরলেন। মধ্যবিত্ত একটা সময় নিজেদের স্বার্থে নিজের শ্রেণিকে অবমূল্যায়নের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এই পর্বের নায়কেরা নিজেদের সেখান থেকে বের করে আনতে চেয়েছে। *তিন ভূবনের পারে* মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সংকট এবং উত্তরণ দেখালেন। *প্রজাপতি*তে সুখেনের বোধের উত্তরণ যেন তার সমাজের উত্তরণ। *পাতকে*র অনামা নায়ক প্রতিবাদ করেছে তার স্ব-সমাজের প্রেম-রাজনীতি-যৌনতা সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। অবাধ যৌনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ালে সে ভণ্ড মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছে। *বিবর প্রজাপতি পাতক* এবং *স্বীকারোক্তি*র নায়করা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্তের যৌনতা বিষয়ক ইলিউশনকে কুঠারাঘাত করেছে। ষাটের দশকের অবক্ষয়িত সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ *বিবর*-এর অনামা নায়ক করেছিল সেই প্রতিবাদই প্রচণ্ডভাবে দেখা যায় সমরেশ বসু অন্ত্য পর্বের উপন্যাসে। ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের শ্রেণি চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করলেন।

অন্ত্য পর্বেও বর্ণিত হয়েছে মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা। এই পর্বে এসে তাঁর নায়কেরা নিজ শ্রেণি বলয় থেকে বেরিয়ে শ্রমিক শ্রেণি তথা সর্বহারা শ্রেণির সাথে একাত্ম হতে চেয়েছে। লেখক এই প্রবণতাকে সদর্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বিনাসী যুগ আর বৈরী পরিবেশে তারা একাত্ম হতে পারেনি। স্বশ্রেণিজাত শূন্যতা তাদের একাত্ম হতে দেয়নি। শ্রমিকরা তাদের সাথে নিজের মতো করে মিশতে পারেনি। তারাও শ্রমিকদের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। একধরনের ফাঁকি সহজেই প্রতীয়মান হয়। লেখক এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনার টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করেছেন। *যুগ যুগ জিয়ে*র অনিল নিজস্ব দর্শন আর বিরূপ পরিবেশে একাত্ম হতে না পারার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে। *পুনর্যাত্রার* তাপস সমাজ থেকে দূরে পালিয়ে গঙ্গাযাত্রীর ভগ্নগৃহে বসে পুরনো পাণ্ডুলিপির মধ্যে নিজেকে খুঁজেছে। ত্রিদিবেশের মতো বাস্তববাদী শিল্পীকে তার সমাজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। এই পর্বে চরিত্ররা রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্তে পড়ে অনেকটাই দিশেহারা হয়েছে। ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশেষত খাদ্য আন্দোলন-নকশাল আন্দোলন-রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নে পরিবেশ পরিস্থিতি আরো বেশি উত্তপ্ত হয়েছে। ষাটের দশক বাঙালি মধ্যবিত্ত কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পায়নি।

সত্তর দশককে নকশালবাদীরা মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের খতম অভিযান, গেরিলা বাহিনি গঠনের তৎপরতা, চারু মজুমদারের গ্রেফতার হওয়া এবং মৃত্যুবরণ নকশাল আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্যকে অনেকাংশে ম্লান করে। এই পর্বের নায়কেরা তাদের চারপাশে কেবল বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার শব্দ শোনে। সত্তর দশকে যে আন্দোলন ছিল মুক্তির দশকে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি, তা পরবর্তী সময়ের মূল্যায়নে দেখা যায় এই আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক উল্লম্ফনের সূচনা মাত্র, সমকালে অনেক নকশালবাদী অনুধাবন করেছেন। তারা যে বাম-হঠকারী লাইনে চলেছেন তার পূর্বাভাস ১৯৬৯ সালের আটটি দলিলে আছে। সমরেশ বসু এই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন নকশাল আন্দোলনে অনেক খামতি, ভুল ছিল তবে নকশালবাদীরা ছিল সাহসী, বিপ্লবী, তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। *মানুষ শক্তির উৎস, গন্তব্য, মহাকালের রথের* ঘোড়া উপন্যাসে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। অন্ত্যপর্বের উপন্যাসে সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিতশীলতা এবং আশির দশকের রাজনৈতিক আবহ সরাসরি উপন্যাসে এসেছে। এই পর্বে লেখক বাক-বিন্যাসে অনেক বেশি সচেতন। ষাটের দশকের ন্যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতার আর্তি এই পর্বেও লক্ষণীয়। সময়-রাজনীতির দ্বন্দ্বে সৃষ্ট ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন এই পর্বে। ভজুলাটের সংকটকে আরো বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরলেন *যুগযুগ জিয়ে* উপন্যাসের ত্রিদিবেশ চরিত্রে। তারই দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরলেন যুদ্ধ-মন্বন্তর দাঙ্গা-দেশভাগ-স্বাধীনতা ত্রিদিবেশ মূলত লেখকের প্রতিচ্ছায়া। ত্রিদিবেশের মধ্যে ব্যক্তি সমরেশ বসুর মানসভূবন খুঁজে পাওয়া যায়।

সমরেশের নায়কেরা পার্টির ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। *বিবর, প্রজাপতি, পাতকের* নায়ক রাজনীতিতে আস্থাবান নয়। *বিবরের* নায়ক পার্টি চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে চায়নি। *প্রজাপতি*র সুখেনের মনে জন্ম নেয় সর্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক অবিশ্বাস। সে তার শিক্ষায়তনের অধ্যাপক, নেতৃবৃন্দ, বন্ধু কারো প্রতি আস্থাশীল হতে পারেনি। সর্বত্রই লক্ষ করেছে অন্তঃসারশূন্যতা। *বিশ্বাসের* নীরেন তার পরিবার পরিজনের মতো সমকালীন স্বার্থন্বেষী রাজনীতিতে আস্থাবান নয়। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা এর সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর কোনোটার প্রতি তার বিশ্বাস নেই। *যুগযুগ জিয়ের* ত্রিদিবেশ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং সদস্য হয়েও পার্টিম্যান হয়ে উঠতে পারেনি। *মানুষ শক্তির উৎস*-এর সজল, এবং *গন্তব্য*-এর কমলকে প্রাণ দিতে হয়েছে পার্টির সমালোচনার অভিযোগে। তাঁর নায়কেরা কেউই পার্টিম্যান হতে চায়নি। সমাজকে বদলে দেবার অভিপ্রায়ে তারা পার্টির বলয়াবদ্ধ হয়েছে আবার বেরিয়েও এসেছে।

এছাড়া বেশকিছু স্বল্পায়তনের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বিশেষ বিশেষ মানসপ্রবণতাকে ধরার প্রচেষ্টা এই পর্বে উল্লেখযোগ্য দিক। যেমন দাম্পত্য সংকট, প্রেম বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। এই পর্বে ভাষা ব্যবহারে লেখক আরো পরিশীলিত। যৌনতা বা বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে এই পর্বে স্থান পেল সমাজবাস্তবতা। স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এই পর্বে দ্রোহের রূপ নেয়। হতাশা, বিবমিষা থেকে বেরিয়ে সত্তর দশকে মধ্যবিত্ত প্রতিবাদী হয়েছে। *বিশ্বাসের* নীরেন, *অশ্লীলের* মদন, *অপদার্থের* জয় এরা সবাই ক্রমশ সাহসী হয়েছে। এই পর্বের উপন্যাস অনেকটা তত্ত্ব নির্ভর। চরিত্রের অর্ন্তগত বিশ্লেষণের চেয়ে বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা সব সময়ই ছিল কিন্তু তা পূরণের সাধ্য তার কখনো পুরোপুরিভাবে হয়নি। লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষার সমগ্রতাকে সুচারুভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। জীবনের প্রতি ঔৎসুক মন আর বৈচিত্র্যের মধ্যে সমগ্রতার আস্বাদ নেওয়ার এক সর্বগ্রসী অভিপ্রায় তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সমরেশ বসু সমগ্র জীবনব্যাপী চেয়েছেন মানুষের সর্বৈব কল্যাণ ও মুক্তি। এই সূত্রে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী কখনো সংগ্রামশীল নিম্নজীবী-শ্রমজীবীর কথা বলেছেন আবার অস্তিত্বাদী মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতা প্রকাশ করেছে। আবার কখনোবা তিনি কালকূট হয়ে মানুষের মাঝে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। সঙ্কটাদীর্ণ মধ্যবিত্তের কথা বলতে গিয়ে একই সাথে তিনি নন্দিত এবং নিন্দিত হয়েছেন। *বিবর*, *প্রজাপতি*, *পাতক* এই সব উপন্যাস নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তারপরও থেমে থাকেনি তাঁর কলম। বৈচিত্রপিয়সী সমরেশ বসু নতুন নতুন সৃষ্টি করে গেছেন।

সমরেশ বসু গান্ধীবাদ কিংবা মার্কসবাদ কোনো তত্ত্বের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। বৈশ্বিক নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে গান্ধীর অহিংস মতবাদে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তিতে তার ঝোঁক ছিল সাম্যবাদে কিন্তু তিনি দেখেছেন দেশীয় রাজনীতির আবহে সাম্যবাদী দলগুলির বিচ্যুতি। আসলে কোনো 'বাদে'ই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি তিনি ছিলেন মানবতাবাদী।

উপন্যাসে অনেক স্থানে যৌনতার প্রসঙ্গ চলে এসেছে। অনেকেই এর কঠোর সমালোচনা করেছে। ষাটের দশকের বুর্জোয়া সমাজের অর্ন্তবাস্তবতার শিল্পরূপ নির্মাণে লেখককে যৌনতা প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। তবে সমকালীন যুগসঙ্কটে সৃষ্ট যুবসমাজের এই যৌনবিকৃতি কখনোই আরোপিত নয়। এই যৌনতা সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিতে একটা আলাদা জগত, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে।

পাঁচ.

পরিশেষে বলা যায় সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের রূপাঙ্কনে নাগরিক চৈতন্যের যন্ত্রণা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশে অধিক আগ্রহী। মধ্যবিত্তের বিস্তৃত প্লাটফর্মকে তিনি উপন্যাসের ফ্রেমে বন্দি করেছেন। বৌদ্ধিক ও যৌক্তিকভাবে শঙ্কিত, দ্বিধান্বিত, বিবরগ্রস্ত মধ্যবিত্তের অবস্থার মূল্যায়ন করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি জাতির সঙ্কটে হাল ধরেছে। নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাসকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন। মোটকথা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন-অবলোকন ও রূপায়নে তিনি যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং স্বাতন্ত্র্য চিহ্নায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন

ইয়াসমিন আরা সাথী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

নভেম্বর ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইয়াসমিন আরা সাথী (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৩, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-১২) কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি তাঁর একক গবেষণার ফল। গবেষণাকর্মটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

প্রসঙ্গকথা

উপন্যাসের প্রতি আমার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। যখন উপন্যাস কী বুঝতাম না, তখন লুকিয়ে পাঠ্য-বইয়ের মলাটে ঢেকে উপন্যাস পড়তাম। এজন্য মায়ের বকুনিও খেয়েছি। একান্নবর্তী পরিবারে সবার অলক্ষ্যে উপন্যাস পাঠ শুরু। তখন ভাবিনি উপন্যাস নিয়ে একদিন গবেষণায় ব্রতী হব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এই আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। তখন থেকেই ভাবনাচিন্তার শুরু। এরই ধারাবাহিকতায় 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন' শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণা-কর্মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধনকৃত হই। এ ব্যাপারে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং আমি তাঁর অধীনে গবেষণার কাজ শুরু করি। আমার সৌভাগ্য যে ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় সময় দান করেছেন। গবেষণার কাজ সময়মতো এবং সুষ্ঠুভাবে শেষ করার প্রতি ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তাঁর কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে সঠিক পথ-নির্দেশ, পরামর্শ এবং উপদেশ পেয়েছি।

গবেষণা-পরিকল্পনা ও এর রূপরেখা প্রণয়নে আমাকে আরো সহযোগিতা করেন আমার শিক্ষাগুরু ড. শেখ রজিকুল ইসলাম। তিনি আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচন, অধ্যায়-বিভাজন, তথ্য উপস্থাপন এবং বিন্যাস তথা গবেষণাপদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এককথায় তাঁর অনুপ্রেরণাতেই কাজ শুরু করি। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগও আমি পেয়েছি। এছাড়া আমাকে তাগিদ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. আবুল আহসান চৌধুরী, ড. মো. হাবিবুর রহমান (হাবিব আর রহমান), ড. মো. সরওয়ার মুর্শেদ, ড. মো. হাবিবুর রহমান (ড. রহমান হাবিব), ড. গৌতম কুমার দাস, ড. মোহা. সাইদুর রহমান, জনাব মো. ইয়াসিন আলী, জনাব মো. গাজী মাহবুব মুর্শেদ, ড. শেখ মহা. রেজাউল করিম, ড. মো. রবিউল হোসেন, ড. মো. মনজুর রহমান, জনাব সাইফুজ্ জামান, ড. মো. রশিদুজ্জামান, ড. মো. বাকী বিল্লাহ, জনাব তপন কুমার রায় এবং ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন অর রাশিদ আসকারী। বিশেষ করে ড. গৌতম কুমার দাস এবং জনাব সাইফুজ্ জামান-এর ঋণ মৌখিক স্বীকৃতির উর্ধ্বে। ড. গৌতম কুমার দাস অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দান করেন। জনাব সাইফুজ্ জামান কলকাতা থেকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করে আমার কাজের গতি এনে দিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার গবেষণাকর্মে গতি সঞ্চার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সিদ্দিকা মাহমুদা, অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শিপ্রা সরকার। তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

পরামর্শদানে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. লোকমান হাকিম, অধ্যাপক ড. মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি; বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সরিফা সালোয়া ডিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের লেখক গবেষক জনাব ইরবান বসু রায়। বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে সহযোগিতা নিয়েছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শামিম আরা রনির কাছ থেকে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব রেজওয়ানা আবেদীন এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক জনাব সারিয়া সুলতানা। সকলের প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি এবং আমার শৈশব কৈশোরের স্মৃতিতীর্থ মেহেরপুরের পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ সব গ্রন্থাগারের সজ্জন ও শুভানুধ্যায়ী কর্তৃপক্ষ-কর্মচারিবৃন্দের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

অভিসন্দর্ভ কম্পোজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উপ-রেজিস্ট্রার জনাব আশরাফুল আলম।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ, যাদের সান্নিধ্যে আমি প্রতি মুহূর্তে ঋদ্ধ হই, এই গবেষণাকর্মে তারাও নানাভাবে অবদান রেখেছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালোবাসার, ঋণ স্বীকার কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয়।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা মোঃ রফিকুল ইসলাম, মা মনোয়রা ইসলামকে— যাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে সহায়ক করেছে। বিশেষত, আব্বার নিরন্তর তাগিদ আমার কাজের

Dhaka University Institutional Repository

গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। গবেষণাকালে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য 'সমরেশ বসু রচনাবলী' পুরো সেটটি তিনি কলকাতা থেকে এনে দিয়েছিলেন। এছাড়া আরো একজনের কথা না বললেই নয় তিনি আমার শাশুড়ি আঞ্জুমান আরা মীনা, যিনি সংসারের যে কোনো কাজের দায় থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে আমার পড়ার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

জীবনসঙ্গী আ. স. ম আসাদুর রহমান— প্রতিনিয়ত তাগাদা দিয়ে এবং সহযোগিতা করে কাজটি সম্পাদনে আমাকে একরকম বাধ্যই করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেহেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয়, তাই ঋণটুকু স্বীকার করছি মাত্র। অনুজ সুখী ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি, প্রিয়াংকা ইসলাম এবং সিনথিয়া ইসলাম প্লাবন— এরা কখনও কখনও আমার গবেষণাকর্ম সমাপ্তি প্রসঙ্গে সংশয় এবং সন্দেহ প্রকাশ করে প্রতিনিয়ত তাগাদা দিয়েছে।

একমাত্র আত্মজা আহসানা সুকৃতি রহমান, গবেষণাকর্মে নিমগ্ন থাকার দোহাই দিয়ে যাকে প্রতিমুহূর্তে বঞ্চিত করেছি। মা হিসেবে এই অপরাধবোধ থেকে হয়তো কখনোই মুক্তি পাবো না। তার সপ্রতিভ উপস্থিতি আমার অনুপ্রেরণাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় **১-১৬**
সমরেশ বসুর জীবনকথা ও মানসগঠন

দ্বিতীয় অধ্যায় **১৭-৪১**
মধ্যবিত্ত শ্রেণি : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায় **৪২-৭৪**
বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা : মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান

চতুর্থ অধ্যায় **৭৫-২৯২**
সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্যবিত্ত জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৫
সমরেশ বসুর উপন্যাস : প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১৯
সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্য পর্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৯২
সমরেশ বসুর উপন্যাস : অন্ত্য পর্ব

উপসংহার **২৯৩-২৯৮**

গ্রন্থপঞ্জি ২৯৯-৩০৯

অবতরণিকা

সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যের শক্তিমান লেখক। তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে যথাযথভাবে অন্তর্লগ্ন হয়েছে মধ্যবিত্তের জীবন জিজ্ঞাসা। সমরেশ বসু যখন উপন্যাস লেখা শুরু করেন তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিতটি ছিল বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ-মূল্যবৃদ্ধি আবার যুদ্ধোত্তর সংকট, আসন্ন দেশবিভাগ-খণ্ডিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক সংকট সমগ্র শ্রেণিটিকেই অতলান্ত খাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারপরও এই শ্রেণিটি অস্তিত্ব হারায়নি। শ্রেণিস্বার্থের বেষ্টনীকে ছিন্ন করে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে এই মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনি ততদিনে বহুভাবে রচিত হয়েছে। ঠিক এই সময় সমরেশ বসু মধ্যবিত্তের কথা উপন্যাসে বললেন। জীবনবোধে স্বাতন্ত্র্যবাদী এই শ্রেণিটি ততদিনে শিক্ষা এবং বুদ্ধিকে পুঁজি করে উপরে ওঠার স্বপ্নে বিভোর।

তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন আসে। বাঙালি এক সময় বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছে কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাঙ্গা-দেশভাগ-মন্দা এমনই বিপন্নতা তৈরি করেছিল যে বাঙালি এর থেকে মুক্তির জন্য সাম্যবাদে ঝুঁকেছিল। কিন্তু অচিরেই তারা হতাশ হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে অর্ন্তগূঢ় অস্থির অবস্থা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির একাধিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল না দেওয়া, পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারাদের গমন ও সমস্যা, তীব্র খাদ্য আন্দোলন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, চীনের সাথে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ, নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব ও তীব্রতা, কংগ্রেসকে সরিয়ে দেশীয় মসনদ দখল, সত্তর দশকের জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও তুলে নেওয়া, চর্তুদিক থেকে অস্তিত্ব সংকট, রাজনৈতিক আন্দোলনে হতাশ তরুণদের আত্মত্যাগ— শাসকশ্রেণির কাছে এমন সব ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ঘটনা পঞ্চাশ থেকে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত অস্থির ও পাণ্ডুর করে পরিবেশকে। এই পাণ্ডুর পরিবেশেকে সমরেশ বসু অনুভব করেছিলেন, ফলে তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের যন্ত্রণার পাশাপাশি অনায়সে সমকালীন সংকটাপন্ন রাজনীতির প্রসঙ্গ চলে এসেছে। সমরেশ বসু সময় এবং সমাজসচেতন লেখক। সময় এবং সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে তিনি আমৃত্যু মানুষের কথা বলেছেন। কেননা মানুষই তাঁর কাছে বড়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান সমাজের মধ্য স্তরে। এরা বিত্তবান নয় আবার বিত্তহীনও নয়। সমাজে যে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস লক্ষ করা যায়, সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের মধ্যভাগে অবস্থান করে। এই

শ্রেণি স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে সমাজে অবস্থান করতে পছন্দ করে। সাধারণভাবে এই শ্রেণি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ভদ্রোচিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। সমরেশ বসুর পূর্বে বাংলা উপন্যাসে নানাভাবে মধ্যবিত্তের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার নিজস্ব সত্তা সবচেয়ে বেশি বিকশিত করেছে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে পরিবর্তনশীল সমাজ পরিস্থিতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল। এই শ্রেণির একটি অংশ উচ্চ শ্রেণিতে ওঠার বাসনায় নৈতিকভাবে স্খলিত হয়েছে। অন্য একটি অংশ আয়ের উচ্চ স্তরে পৌঁছেও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়নি। পুরনো মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। এই শ্রেণির অভ্যন্তরে সামাজিক জঙ্গমতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। এরা সাধারণত বিত্তবানদের সংস্কৃতি অনুসারী, কায়িক শ্রমবিমুখ বিদ্যা এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী। মানসিকতায় এরা সর্বাধিক সংবেদনশীল। সমরেশ বসু এই বৈশিষ্ট্যসমূহই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোলোক সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ শতকের তিরিশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপনের বাস্তবতাকে প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক দুটো বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এক. মধ্যবিত্তের মানসভূমি, দুই. মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ক্ষেত্রভূমি। মধবিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র বিনির্মাণে সমরেশ বসু উপন্যাসে কখনো একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, কখনো কখনো অর্থপূর্ণ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অর্থপূর্ণ সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনো-বা লেখক নিজেই তার সর্বজ্ঞদৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন।

‘সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন’ শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমরেশ বসুর জীবনবোধ এবং মানসগঠনের মূল প্রবণতাগুলো আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর জীবন-ইতিহাস এবং মানসগঠনের সাথে মধ্যবিত্তজীবনের অভিযোজন প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষত মধ্যবিত্তের সংজ্ঞার্থ, বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব, বিকাশ এবং চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় ‘বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা : মধ্যবিত্তের অবস্থান’- এ বাংলা উপন্যাসের অগ্রযাত্রা এবং বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সমরেশ বসুর মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসসমূহকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। এক. সমরেশ বসুর উপন্যাস : প্রথম পর্ব; দুই. সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্য পর্ব; তিন. সমরেশ বসুর উপন্যাস : অন্ত্য পর্ব। প্রথম পর্বে (১৯৫২-৬৪) মোট সাতটি, মধ্য পর্বে (১৯৬৫-৭০) মোট বারোটি এবং অন্ত্য পর্বে (১৯৭১-৮৮) মোট সাতাশটি উপন্যাস বিশ্লেষিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে সর্বমোট ছেচল্লিশটি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে। সমরেশ বসু তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বমোট একশ ষোলোটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এসকল উপন্যাসে সমাজের নানা শ্রেণির জীবনবাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে। এর মধ্যে যে সব উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে কেবল সেসব উপন্যাসই এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। লেখক সমরেশ বসু নিজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ ছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত জীবনে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনি যেমন দেখেছেন, উপন্যাসে তারই চিত্র এঁকেছেন। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্র বিশেষত মধ্যবিত্তের জীবন-অন্বেষা, পরিপার্শ্বের সাথে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত, প্রেম-রাজনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যচেতনা, জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশভাবনা— এ সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসসমূহে মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গতা, বিবমিষা, দ্রোহ এবং দাহের ভাষা ব্যবহারে সমরেশ বসুর নিজস্বতা লক্ষণীয়। আলোচনার সময়ে এ-বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উপসংহার অংশে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারৎসার তথা সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের মৌলসূত্রসমূহ বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সমরেশ বসুর জীবনকথা ও মানসগঠন

প্রথম অধ্যায়
সমরেশ বসুর জীবনকথা ও মানসগঠন

সাহিত্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়। দেশকালের বৈচিত্র্য ও প্রবণতার ওপরই সাহিত্য নির্ভরশীল। নিস্তরঙ্গ ও গতানুগতিক জীবনস্রোতের প্রবহমান ধারায় সাহিত্য আপনখাতেই গতিমান। তবে চলমানতার বিক্ষুব্ধতায় সঙ্গী হয়ে সাহিত্য মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। যেখানে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা ছাড়াও প্রত্যয় ও বিশ্বাসের ভূমি থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক তাৎপর্যমণ্ডিত প্রেক্ষাপটে সামাজিক, ব্যক্তিক ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রবণতা কালটিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবনতি, রাজনৈতিক বিশ্বাসহীনতা, ছিন্নমূল মানুষের অসন্তোষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত, জনজীবনে আতঙ্ক ও দুর্যোগের কালোছায়া নানা আন্দোলন ও বিদ্রোহের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিফলন সাহিত্যের আঙ্গিনায় স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) দ্বিধাদীর্ণ এই সংক্ষুব্ধ সময়েরই প্রতিনিধি। বিষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে তাঁর রচনা শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ। লেখক সমরেশ বসুকে পাই ১৯৪৬ থেকে ১৯৯২–এর মধ্যবর্তী সময়ে। অর্থাৎ বিশ শতক সমরেশের প্রতিভা বিকাশের কাল। তাঁর মানসপ্রত্যয় এই শতকের সমাজ অভিব্যক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিংশ শতাব্দীর জটিল আবর্তময় সঙ্কটাদীর্ণ সময়ের অন্তঃসারকে অন্তরে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে সমরেশের জীবনবোধ। বিংশশতাব্দীর প্রত্যয়হীনতার পেছনে কার্যকারণ সূত্রে জড়িত ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক শাসন-শৃঙ্খলিত ভারতীয় সমাজজীবন। সমরেশ বসুর সাহিত্য সেই প্রত্যয়হীনতার স্বাক্ষর।

সমরেশ বসুর লেখক সত্তা বিকাশে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। তাঁর লেখক–জীবনের সাড়ে চার দশকে সমগ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি তীব্র ওলট-পালটের মধ্যে দিনাতিপাত করেছে। একদিকে সাম্যবাদী চেতনা, অপরদিকে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ–দাঙ্গা মধ্যবিত্তকে বহুমুখী ধাক্কায় আলোড়িত করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে '৪৭- এর দেশভাগ '৬৭- এর যুক্তফ্রন্ট, র‍্যাডিকাল অভ্যুত্থান, শ্বেত সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা, বামফ্রন্ট ও আকাশচুম্বী আশা, সাম্যবাদী স্বপ্নের পঙ্গু হওয়া পশ্চিমবঙ্গের এসব অনুষঙ্গ। চল্লিশের দশকের বৃহত্তর চেতনাসমৃদ্ধ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি আশির দশকে ভবিষ্যতহারা, ক্রমশ রাজনীতিবর্জিত মানসিকতায় সঙ্কীর্ণ বিবরবাসী হয়ে ওঠে। সমরেশ বসু তাঁর লেখক–জীবনের শুরুতে যে রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখেছেন, যে রাজনৈতিক চেতনায় মধ্যবিত্ত

জীবনকে শিল্পিত করতে চেয়েছেন পরবর্তীকালে সেখান থেকে অনেকখানি সরে আসেন। ক্রমশ রাজনীতি–বিমুখতার ছাপ পড়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যে। চরিত্ররা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নায়কেরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে পরিবেশ নিয়তি এবং সামাজিক নিয়তির বিরুদ্ধে। আর এ কারণেই তাঁর চরিত্ররা স্বতন্ত্র। সমরেশের উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মুক্তির কথা। মানুষই তাঁর কাছে বড়। আর এই মানুষের কথা বলতে গিয়েই বিবরবাসী মধ্যবিত্তের মানসসঙ্কট, বিচ্ছিন্নতার আর্তি, মুক্তির প্রচেষ্টাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। সমরেশ বসুর লেখায় ঘুরেফিরে এসেছে মধ্যবিত্তের নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, উৎকণ্ঠা, আশা আর আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে সমাজবিচ্ছিন্ন এবং আত্মবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত মানুষ।

সমরেশ বসু দক্ষ এবং শক্তিমান লেখক। তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত মধ্যবিত্তের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই তাঁর জীবনবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও চেতনালোকের মৌল প্রবণতাসমূহ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা তাঁর সৃজনভুবন গড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিসত্তা এবং কালপরিসরের সীমানায়।

পারিবারিক প্রতিবেশ, জন্ম ও শৈশবজীবন

সর্বভারতীয় রাজনীতির এক অস্থির সময়ে সমরেশ বসু অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজানগর গ্রামে, ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মোহিনীমোহন বসু, মায়ের নাম শৈবলিনী দেবী।[২] তাঁর বাবার আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার শুভঢ্যা গ্রামে। সমরেশের পিতামহ মহেশচন্দ্র বসু শুভঢ্যা গ্রাম থেকে বিক্রমপুরের রাজানগর গ্রামে নিজ শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন।[৩] এখানেই মোহিনীমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। মোহিনীমোহন বসু ছিলেন মহেশচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি রূপলাল দাসের জমিদারি এস্টেটে রেকর্ড কিপারের কাজ করতেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মোহিনীমোহন সংসারের ব্যায়ভার নির্বাহ করতেন। ফলে সমরেশ বসু শৈশব থেকেই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে শিখেছেন। সমরেশ বসুর পিতৃপ্রদত্ত নাম সুরথনাথ বসু, আঁতুড় ঘরে ঘটনাচক্রে তাঁর নাম হয় 'তড়বড়ি'।[৪] নামটি একান্তভাবে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পারিবারিক নাম সুরথনাথ বদলে সমরেশ রাখেন তাঁর বন্ধুপ্রতীম শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।[৫] পরবর্তীকালে শুধু লেখায় নয়, ব্যক্তিজীবনেও তিনি নিজেকে সমরেশ নামে পরিচয় দিতেন। এই নামে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে সাফল্য পান। এছাড়া ১৯৭৬ সালে *প্রসাদ* পত্রিকায় পৌরাণিক পটভূমিকায় তিনি 'অন্তিম প্রণয়' নামক কাহিনিটি লেখার সময় 'ভ্রমর' ছদ্মনামটি ব্যবহার করেন। রাজনৈতিক ফিচার লেখার প্রয়োজনে প্রথম জীবনে তিনি 'কালকূট'[৬] ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। 'ভোটদর্পণ' নামে তাঁর একটি লেখা 'প্রবাহ'

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায় ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তর চব্বিশ পরগনার চটকল এলাকার নির্বাচনকালীন উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ে তিনি 'কালকূট' নামে লিখেছিলেন। কালকূট নাম সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন :

> কিন্তু এমন নামটি কেন? তাহলে প্রাণটি খুলে দেখাতে হয়। দেখলেই বোঝা যাবে, বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে তো হা অমৃত হা অমৃত। বিষে অঙ্গ জর্জর কোথা হা অমৃত !... কালকূট ছাড়া আমার নাম আর কি হতে পারে?[৭]

সমরেশ বসু তাঁর বাবা-মায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। অবশ্য মোহিনীমোহন-শৈবালিনীর অকাল-মৃত পুত্রকন্যাদের সংখ্যা অনুযায়ী সমরেশ শৈবলিনীর অষ্টম গর্ভের সন্তান।[৮] তাঁর বড় ভাই মন্মথনাথ বসু, মেজো ভাই প্রমথনাথ বসু, এবং বোন অমিয়াকণা দাস। সংস্কৃতমনা পরিবারে তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন শৈল্পিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর বাবা নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং গাইতেন। পারিবারিক আসরে, প্রতিবেশীদের ডাকে তাদের বাড়িতে গিয়ে গান গাইতেন। বিয়ের আসরে, দোল উৎসবে মোহিনী বসুর আলাদা কদর ছিল। তিনি মালসী গান, শাক্ত গান, ভক্তিমূলক গান, লোকসঙ্গীতসহ নানা ধরনের গান গাইতেন। এছাড়া চমৎকার অভিনয় করতেন। তিনি *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকে ভিক্ষুকের এবং *হরিশ্চন্দ্র* নাটকে শৈব্যার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতেন। মোহিনীমোহনের এই অভিনয় প্রয়াস প্রজন্মান্তরে তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এছাড়া সমরেশের বাবা এবং কাকা চমৎকার ছবি আঁকতেন।[৯] কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সহজাতভাবেই মোহিনীমোহন বসু এ গুণাবলি অর্জন করেন। শৈশবে সমরেশ শৈল্পিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন, যা তাঁর মানসগঠনে সহায়ক হয়েছে। সমরেশের ধমনীতে শুধু যে পিতার শৈল্পিকতার ছোঁয়া ছিল তাই নয়, তাঁর মধ্যে মায়ের কিছু গুণ প্রবিষ্ট হয়েছিল। সমরেশের মা চমৎকার গল্প বলতেন। আটপৌরে স্নিগ্ধ ভাষায় বিশ্বাসযোগ্য অভিব্যক্তি নিয়ে বলা সেসব গল্প এবং ব্রতকথার শিল্পকুশলতা দুইই তাঁর শিল্পীমানসে প্রভাব ফেলেছে।

শৈশবে সমরেশ চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন। অনুসন্ধিৎসা আর কৌতূহলী মন সমরেশকে টেনে নিয়ে যেত নির্জন শ্মশানে। শ্যামপুরের শ্মশানের নির্জনতা সমরেশকে আকর্ষণ করত। 'এখানে ওখানে ছেঁড়া কানি হোগলা পাটি, চাটাই ছড়ানো গণ্ডা গণ্ডা কুকুর। দুই চরে সাধু এইসব সমরেশ গালে হাত দিয়ে দেখতেন।'[১০] একবার শ্মশানে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। খাঁখাঁ দুপুরে সিঁদকাটা রাস্তা দিয়ে একটি লাশকাটা ঘরে ঢুকে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ঘরের মধ্যে নগ্ন বৃদ্ধ এবং নারীর পেটকাটা লাশ দেখে সমরেশ হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরে অনেক কষ্টে সেখান থেকে উদ্ধার পান।[১১] নির্ভীক সমরেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন পুরাতন ঢাকার অলিগলি, শ্মশান, মন্দির সমস্ত জায়গায়। এ সময় তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে

সমমনোভাবাপন্ন বন্ধু জয়নাল মনসুর, মোটর ক্লিনার ইসমাইল আর জিয়সের গলির নয় বছরের ফ্রক পরা বাচ্চা বান্ধবী রাজলক্ষ্মী।[১২] এছাড়া 'মোক্তার দাদুর কেতুবধ'-এর মোক্তার দাদু তাঁর এই অসমবয়সী বাচ্চা বন্ধুটিকে জীবনের নানা পথের নানা ঠিকানার সন্ধান দিয়েছেন। মজার গল্প বলতেন, দুঃখের কাহিনিও শোনাতেন। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার সাথে সমরেশের ছেলেবেলার কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

শৈশব আর কৈশোরে অপার কৌতূহল আর অপরিসীম বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সমরেশ বসু দেখেছিলেন মানুষ আর প্রকৃতিকে। এই মানুষই পরে তাঁর সাহিত্যক জীবনে পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সমরেশ কিছুটা ব্যতিক্রমী স্বভাবের ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি দলছুট থাকতে ভালবাসতেন। সমরেশের বাড়ির উল্টো দিকে ব্রাহ্মণী হরিমতি ঠাকুরণ বাস করতেন। এই হরিমতি ঠাকুরণের বাড়িতে কেষ্ট ঠাকুর ভাড়া থাকতেন। কেষ্ট ঠাকুর ছিলেন শিল্পী। সাইনবোর্ড লিখতেন, নানা রকম ছবি আঁকতেন। সমরেশ সুযোগ পেলেই কেষ্ট ঠাকুরণের কাছে যেতেন। উদ্দেশ্য একটাই– ছবি আঁকা দেখা :

> ও অবাক অপলক চোখে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কেষ্ট ঠাকুরের আঁকা দেখত, বিরাট পটের বুকে আস্তে আস্তে কেমন করে গাছের গুড়ি থেকে ডালপালা ছড়িয়ে পাতায় মস্ত বড় চাঁদ ওঠে, নিচের জলাশয়ে তার প্রতিবিম্ব, একটি হরিণ সেখানে মুখ নামিয়ে জল পান করে।[১৩]

সমরেশের শৈশবের বন্ধুর তালিকায় মনিদি, জোবেদামাসী, আলী, কালিপদ এদের নাম পাওয়া যায়। এরা সকলেই সমরেশ বসুর থেকে বয়সে বড়। বিধবা মনিদির বৈধব্যের যন্ত্রণা এবং আত্মহত্যা শৈশবে সমরেশকে ব্যথিত করেছিল।

সমরেশের পরিবারে তন্ত্রের প্রভাব ছিল। পূর্জাঅর্চনা, মন্ত্রদীক্ষা, অলৌকিকতার আবহে ধর্মভীরুতা তাঁর যৌথ পরিবারের মানসিকতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মোহিনীমোহন ও শৈবলিনীর কুলগুরুর নাম 'করুণাময় ভট্টাচার্য'। শৈশবে সমরেশ গুরুর ক্রিয়াকলাপ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। অলৌকিকতার ওপর বিশ্বাস সমরেশের মনে শৈশবে ছাপ ফেলেছিল। মার্কসবাদে বিশ্বাসী সমরেশের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার একটা খাদ এমনভাবে মিশে ছিল যা পরবর্তী সাহিত্যজীবনে তাঁকে 'কালকূট' হতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের দশক থেকেই সমরেশের জীবনে মার্কসবাদের গ্রন্থি অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। কালকূট-এর আধ্যাত্মপ্লুত রচনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় আউল বাউল সাধনভজনের মধ্যে একটা গোপন টান তাঁর ছিল। মানব জন্মকে ফিরে ফিরে দেখার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে এক অচেনা সুরে মেলাবার চেষ্টা তিনি করেছেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন ও অধ্যয়ন ব্যাপ্তি, প্রতিভার অন্তগূঢ় প্রেক্ষাপট

ব্যক্তির প্রতিভা সততই তার আত্মগঠন ও আত্মবিকাশ চর্চার উপর নির্ভরশীল। আর এই আত্মগঠনে শৈশবের পাঠাভ্যাস, অধ্যয়ন, পারিবারিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়মুখী প্রণালীবদ্ধ পঠন-পাঠন বালক সমরেশকে কখনোই আকর্ষণ করত না। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের গিরিশ মাস্টারের পাঠশালা ছিল সমরেশের প্রথম স্কুল।[১৫] ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি গিরিশ মাস্টারের পাঠশালায় পড়ালেখা করেছেন। এ সময় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র অশ্বিনী। পরে তিনি গেণ্ডারিয়া গ্র্যাজুয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন নৈহাটির মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। কিন্তু অষ্টম শ্রেণির রেজাল্ট 'নট প্রমোটেড' হওয়ায় মাত্র পনেরো বছর বয়সে সমরেশের স্কুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমরেশের মহেন্দ্রনাথ স্কুলের বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমরেশের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া ছিল স্বতন্ত্র। স্কুলের পাঠ্য বইয়ের চেয়ে অন্য যে কোনো বই তাঁকে আর্কষণ করত। ফলে বড়দের চোখে ধুলো দিয়ে অবলীলায় পড়েছেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বা অন্য কোনো লেখকের গল্প উপন্যাস।[১৬] তাছাড়া পরীক্ষামুখী পঠন-পাঠনের চেয়ে স্কুল পালানোতেই তাঁর আনন্দ :

> 'স্কুল পালাতে হবে এটাই আসল কথা। মুক্তি কে না চায়, বন্দীদশা থেকে মুক্তি সবাই চায়। কিন্তু ইস্কুল পালিয়ে কোথাও যেতে হল, এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে চেনা মুখের না দেখা মেলে।'[১৭]

সমরেশের দাদা মন্মথনাথের মতে, সমরেশ ছিলেন 'অনিচ্ছুক মেধাবী পড়ুয়া'। সাধারণত সাহিত্যিকদের স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয় বালক বয়সেই। সমরেশের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ সময় থেকেই তিনি 'বীণা' নামের হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকায় নিজে লিখতেন এবং ছবিও আঁকতেন। পড়াশোনার ইতি টানার পর বোহেমিয়ান সমরেশকে নিয়ন্ত্রণে আনা মন্মথনাথের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে সমরেশকে ঢাকায় বাবা মোহিনীমোহন বসুর কাছে পাঠিয়ে দেন। অধ্যয়ন সম্পর্কিত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরেশ বাল্যকাল থেকেই স্বাধীনচেতা মুক্ত মনের অধিকারী। প্রথা ভাঙাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও এই বোহেমিয়ানতার ছাপ পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সবার সঙ্গে থেকেও বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত। পাঠক হিসেবে সমরেশের প্রথম প্রেম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। পরবর্তীকালে বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় নৈহাটির জনবিরল রেস্তোরাঁয় বসে তিনি বন্ধুদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতেন।[১৮] তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 'আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ নিত্য আশ্রয়। আমার গভীর সুখে, নিবিড় দুঃখে, আমার প্রতীক্ষা এবং বিরহে, তাঁর গানই তো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।'[১৯] পরবর্তীকালে তাঁর অসংখ্য রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্পর্শ, এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তি। কিন্তু ব্যক্তি সমরেশ বসুর নিকট রবীন্দ্রসাহিত্য দুরূহতম বিষয়।

কর্ম ও সাহিত্যজীবন

সমরেশ বসুর কর্ম ও সাহিত্যজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁর কর্মের সঙ্গে সাহিত্যসাধনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির রেজাল্ট 'নট প্রমোটেড' হওয়ায় সমরেশকে ঢাকায় এনে মোহিনীমোহন বসু 'ঢাকেশ্বরী কটন মিলে' ট্রেইনার হিসেবে ঢুকিয়ে দেন। এখানেই তাঁর শ্রমিকজীবনের হাতেখড়ি। পরবর্তী সময়ে সমরেশ যে শ্রমিক জীবনের কথা লিখবেন তার অভিজ্ঞতা তিনি এখান থেকেই সঞ্চয় করেন। বোহেমিয়ান সমরেশকে কটন মিলের কাজের চেয়ে বুড়িগঙ্গা, রমনার ধানক্ষেত বেশি আকর্ষণ করত। ব্যক্তি সমরেশ বন্দি জীবন থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। সেকারণেই তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মুক্তির কথা। কারখানার কাজের চেয়ে অভিনয় আর আড্ডায় মেতে উঠলেন। ঢাকায় এসে সমরেশ জানতে পারলেন তাঁর বাল্যবন্ধু সেন্টুর কুষ্ঠ হয়েছে। তিনি কারখানার কাজ ফেলে লুকিয়ে লুকিয়ে সেন্টুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সেন্টু মারা যাওয়ার পর সমরেশ আরো বেশি বাউন্ডেলে হয়ে যান। ষোলো বছর বয়সে তিনি আবার নৈহাটি ফিরে যান। জীবনের এই নতুন পরিক্রমায় নিজের সম্পাদনায় পত্রিকায় লেখা এবং লেখা সংগ্রহ করা, ছবি আঁকা, বাঁশি বাজানো নিয়ে মেতে ওঠেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী ছিল মেথর বস্তির বাউন্ডেলে নেশাখোর বন্ধুরা আর আড্ডার কেন্দ্রস্থল ছিল মেথর বস্তি। অস্বাভাবিক পরিবেশে পঙ্কজের প্রস্ফুটন সম্ভাবনা দেখা দিল। সমরেশ বসু ছিলেন তাঁর বাবার মতই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রামনিধি গুপ্তর গান, টপ্পা গান গাইতেন, ভাল তবলা বাজাতে পারতেন, থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক ছিল, ফুটবল খেলতেন, ব্যায়াম সমিতির শারীরিক কসরতে নাম লিখেছিলেন অর্থাৎ 'মফস্বলীয় মধ্যবিত্ত পরিবারে গতানুগতিকতার সীমা অতিক্রম করাতেই ছিল তাঁর মুক্তি'।[২০] মধ্যবিত্ত পরিবারে যা কিছু নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ তার সবকিছুতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ফলে অতি সহজেই বৃত্তচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীরা যখন নবম শ্রেণিতে পড়ছে তখন তিনি এক অখ্যাত দোকানের পেছনের বেঞ্চিতে বসে ধূমপান করছেন। অর্থাৎ সীমাকে অতিক্রম করাতেই তাঁর আনন্দ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সমাজ অননুমোদিত প্রেমের ফাঁদে পড়ে হয়েছেন নিন্দিত। দুঃসাহসী সমরেশ বসু স্বামী পরিত্যাক্ত চার বছরের বেশি বয়সী গৌরী দেবীর প্রেমে পড়েছেন। নৈহাটি তোলপাড় করে গৌরীকে নিয়ে সংসার পেতেছেন আতপুরে আবদুল মিস্ত্রির বস্তিতে।

সমরেশের মানসগঠনে ঢাকা পর্ব এবং নৈহাটি পর্ব দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ— তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বীজ উপ্ত হয়েছিল এই দুই পর্বে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যসমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

> যে মধ্যবিত্ত জীবনের খোলনলচে কাঠামো এবং ভিত্তিকে তিনি পরবর্তী জীবনে বারে বারে আক্রমণ করবে, যে বুর্জোয়া বিবাহ-ধারণাকে সে তাঁর সাহিত্যে বারে বারে নানা সমালোচনার মুখে ফেলেছে তার গোড়াপত্তন

> ঘটেছে এই পর্বে। সে যা কিছু করেছে সারা জীবনে তার মূল কথা হল কেটে বেরিয়ে পড়া–ঔপনিবেশিকতার দায়ভাগী মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্ততার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়া।[২১]

সমরেশ বসুর স্ত্রী গৌরী দেবী তাঁর বন্ধু দেবশঙ্করেরর বড় দিদি। গৌরীর ডাকনাম বুড়ি। তিনি স্বামী বিচ্ছিন্না হয়ে পিত্রালয়ে থাকতেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পুঞ্জীভূত গ্লানি এবং একাকিত্ব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সমরেশ তাকে 'গৌরী দিদি' বলে ডাকতেন। নৈহাটিতে সমরেশ একবার জন্ডিস এবং ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হন। মন্মথনাথের আর্থিক দৈন্য এবং চিকিৎসার উদাসীনতায় সমরেশ যখন মৃত্যুমুখে পতিত, তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরী। গৌরী তার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গয়না বিক্রি করে ছোট ভাই দেবশঙ্করের সাথে সমরেশ বসুকে আরোগ্যের জন্য গাজীপুরে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে সমরেশ ফিরে আসেন। এই ঘটনার পর থেকে গৌরীর সঙ্গে তাঁর হৃদয়গত সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পান।

সমরেশ সুস্থ হয়ে ফিরে গৌরীকে নিয়ে নৈহাটি থেকে পালিয়ে এসে আতপুরের এক বস্তিতে সংসার জীবনের সূত্রপাত করলেন। আতপুরে আবদুল মিস্ত্রির বস্তি তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল জীবনের চরম বাস্তবতায়। নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় যে মধ্যবিত্ত খোলস থেকে বের হতে চেয়েছিলেন এখানে তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পেলেন। একদিকে গৌরীকে বিয়ের অপরাধে হলেন পরিবারবিচ্যুত, স্বজন পরিত্যক্ত এবং নৈহাটির সমাজচ্যুত; অন্যদিকে পড়লেন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে। বিশ্বযুদ্ধকালীন সেই সময়টা ছিল অর্থনৈতিক মন্দার। কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতির কারণে বেকারত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দুঃসময়ে কাজ পাওয়া দুষ্কর ছিল। কিন্তু আতপুরের নিম্নজীবী মানুষেরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শুরু হলো কঠোর সংগ্রাম করে জীবনকে উদ্ভাসিত করার পালা। একই সাথে তিনি সংগ্রাম করেছেন অভাবী প্রতিকূল জীবনধারণ ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সমাজের রক্তচক্ষু থেকে স্ত্রী গৌরীকে রক্ষা করেছেন। আবার সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টা করেছেন। এ সময় জোয়ার্দার পোলট্রি ফার্ম থেকে ডিম নিয়ে কখনো সাহেবদের বাড়িতে কখনো মিলিটারি ক্যাম্পে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কিন্তু পাওয়ার হাউজের সার্জেন্টের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধের সূত্র ধরে এই কাজটিও তিনি হারান ।

ডিম বিক্রির কাজটি হারানোর পর তিনি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। তখন পরিচয় হয় 'সত্য মাস্টার'-[২২]এর সঙ্গে। তিনি সমরেশ বসুকে *জনযুদ্ধ* নামে একটি পত্রিকা পড়তে দেন। তারই সহায়তায় তিনি আতপুরের দফাদার পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে তিনি ইছাপুর রাইফেল

ফ্যাক্টরিতে চাকরি পান। ১৯৪৩-৪৯ এই ছয় বছর তিনি এখানেই কাজ করেছেন। এ সময় ব্যক্তিগত এবং সংসারজীবনে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বস্তি আসায় তিনি সাহিত্য সাধনায় এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন। সারাদিন কারখানায় কাজ করে রাতে উদয়ন পাঠাগারের হারিকেনের স্বল্প আলোয় তিনি পড়াশোনা এবং লেখালেখি করতেন। এই সময় *পরিচয়* পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প *আদাব* প্রকাশিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে রচিত এই গল্পটি প্রকাশের পর চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপর তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কৃষকদের নিজস্ব সংগ্রাম ও জাগরণ নিয়ে লিখেছেন 'প্রতিরোধ' গল্পটি। এই গল্পটি পরবর্তীকালে রুশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়। সত্য মাস্টারের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হন। তারই সহায়তায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[২৩] বারাকপুর জুট বেল্টের ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী একই সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। রসজ্ঞ সমালোচকের মতে 'এ সময় তাঁর ছোট সংসারটা মিশে গিয়েছিল পার্টির প্রত্যহের সঙ্গে।'[২৪] এ সম্পর্কে সমরেশ জানাচ্ছেন এইকথা :

> কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে। আমার নিজের দারিদ্র্য, দুঃখী মানুষদের সম্পর্কে, এক আত্মিক চেতনা গড়ে তোলে। আমার ভেতরে জাগিয়ে তোলে এক সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা।[২৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দগ্ধীভূত জীবন সমাজ সংস্কৃতির ফসল সমরেশ বসু। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর কমিউনিস্ট পার্টির পট পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টির সশস্ত্র কর্মকাণ্ডকে তিনি সমর্থন করেননি; যার কারণে পার্টির সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে সমরেশ বসু গ্রেফতার হন ১৯৪৯ সালে।[২৬] জেলে যাওয়ার পর সমরেশ কমিউনিস্টদের আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান :

> ওর স্পষ্ট উপলব্ধি হল জেলে যারা আসে তারা যে সবাই সাচ্চা কমিউনিস্ট তা নয়। তারা সাচ্চা বিপ্লবী তাও নয়। এখানকার শ্রমিক জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার মধ্যবিত্তভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের চরিত্র দেখে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে সমরেশ বুঝতে পারলেন রাজনীতি করা ওঁর দ্বারা সম্ভব হবে না।[২৭]

কারান্তরালের পর ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের আনুকূল্যে মাত্র দেড়শো টাকায় গৌরী দেবী সংসার চালাতেন। পরবর্তীকালে লেখক নিজের সম্পর্কে লিখেছেন :

> ক. কিন্তু এ কথাও অকপটেই স্বীকার করা উচিত, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই, আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়।
>
> খ. আমি জীবনকে নানা দিক থেকে দেখেছি। সবই পার্টির কল্যাণে।[২৮]

জীবনধারণের সমস্ত রকম জটিলতাকে মেনে নিয়ে অবক্ষয়িত পরিবেশে তিনি জেলখানায় বসে লিখলেন *উত্তরঙ্গ। উত্তরঙ্গ* লেখার আগেই অস্ত্রকারখানায় নকশাঘরে বসে লিখেছেন *নয়নপুরের মাটি* উপন্যাসটি। প্রতিকূল অবস্থাকে মেনে নিয়ে কীভাবে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার তথ্য আছে তাঁর নিজের লেখাতেই :

> বাড়ি থেকে বেরোতাম অন্ধকার থাকতে, যখন ফিরে আসতাম, তখন আমার কুটিরে জ্বলতো কেরোসিনের আলো। কাজে যাবার সময়ে ঘুমিয়ে থাকতো আমার সন্তানেরা, ফিরে যখন আসতাম, তখন তারা রাত্রির ঘুমে শায়িত। একজনকেই থাকতে হতো জেগে, সেই ভোর রাত্রি থেকে, রান্নাবান্না সংসারের সকল কর্ম আর সন্তান-সন্ততিদের এবং আমার সেবার জন্যও বটে, বলা বাহুল্য তিনি আমার স্ত্রী। প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে ক্লান্ত শরীরে লিখতে বসাটা প্রায় অসম্ভব মনে হলেও ভিতরের উন্মাদনা কোনো ক্লান্তিকেই মেনে নিতো না। আবার লিখতে বসতাম হ্যারিকেনের আলো নিয়ে কিন্তু অভাব ছিল কেরোসিন তেলের। সময়টা যুদ্ধের, জীবনধারণের সব কিছুই ছিল প্রায় নাগালের বাইরে, নিতান্ত কোনোরমম বেঁচে থাকা ছাড়া।[২৯]

শিল্পীসত্তার প্রতি তাঁর অবিমিশ্র আগ্রহ ছিল। তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাসটি মহিম নামক এক মৃৎশিল্পীকে নিয়ে, শেষ উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে*-র প্রধান চরিত্র শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ।

জেলে বন্দি অবস্থায় গণনাট্য সংঘের সেক্রেটারি নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে সমরেশের পরিচয় হয়। নিরঞ্জন সেন তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিরঞ্জন সেনের ভাই শচী সেনই 'বুক ওয়ার্ল্ড' থেকে *উত্তরঙ্গ*(১৯৪৯) উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। ১৯৫১–এর মাঝামাঝিতে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সমরেশ কোনো রকম চুক্তিতে রাজি না হওয়ায় পূর্বের চাকুরি ফেরত পান না। চার সন্তান বুলবুল, দেবকুমার, নবকুমার ও মৌসুমীকে নিয়ে অভাব-অনটনে এই সময় দিশেহারা হয়ে পড়েন সমরেশ। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। ছেলেমেয়েদের অন্নসংস্থান করতে পারেননি, বস্তির ঘরভাড়া বাকি-সব মিলিয়ে বিপর্যস্ত সময় পার করেছেন। তখন নারায়ণ মিস্ত্রি নামের এক প্রতিবেশীর যৎসামান্য সাহায্যে তাঁর সংসার চলেছে। এই সময় গৌরীর গয়না বিক্রি করে ব্যারাকপুর আদালতে গিয়ে গৌরীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকার বৈধ অনুমতি পান। কেননা বাইরের উৎপাতে সমরেশ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন আর ততদিনে তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীর পূর্বের বিয়ের আইনগত বিচ্ছেদও হয়নি।

আতপুরে সুকুদির দশ টাকার ভাড়া বাড়িতে সমরেশ-গৌরী থাকতেন। খুব বেশি প্রয়োজন না পড়লে ঘর থেকে তিনি বের হতেন না। পনের মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি থাকায় বাড়িওয়ালি যদিও কিছু বলতেন না কিন্তু বাড়িওয়ালির কন্যা রম্ভার তীক্ষ্ণ বিষবাক্য সমরেশের পরিবারকে সহ্য করতে হয়েছে। জীবনধারণের সামূহিক কষ্ট সহ্য করেও সেই সময় তিনি লিখে চলেছেন, হাল ছাড়েননি। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে হিন্দি সাহিত্যিক নারায়ণ ঝাকে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছি। প্রত্যুত্তরে নারায়ণ ঝা বলেছিলেন 'বাস্তব অবস্থা যাই হোক, ডুবছি ভাবলে ডুববে বরং চিন্তা কর উঠতে হবে, উঠতেই হবে'।[৩০] নারায়ণ ঝার কথাগুলো সমরেশের মনে গেঁথে গিয়েছিল। এর পর থেকে সমরেশের লেখায় উঠে এলো সংগ্রামী মানুষের কথা। *পরিচয়, চতুষ্কোণ* প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। সমরেশের লেখার প্রথম পাঠক এবং সমালোচক ছিলেন স্ত্রী গৌরী। গৌরী সবসময় উৎসাহ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বলতেন, 'তোমাকে বড় লেখক হতে হবে, আমি আর কিছু জানি না'।[৩১] লেখার প্রতি অদম্য ভালবাসা সমরেশকে সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝেও লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। *উত্তরঙ্গ* উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর কবি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন :

> প্রথমত আপনার উপন্যাসটি পড়ে মনে হল, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, দ্বিতীয়ত আরো লিখুন, গঙ্গার ধারের যে কথা আপনি লিখেছিলেন, আপনাকে দেখতে চাই তার সাগর-সঙ্গমে।[৩২]

ইতোমধ্যে সম্পাদক অনিল সিংহের আমন্ত্রণে *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় *বি. টি. রোডের ধারে* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লেখার পাঠক চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। *উত্তরঙ্গ* উপন্যাসের প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত হয় *পরিচয়* পত্রিকায়। চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন। অধ্যাপক সনৎ বসু *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় চিন্মোহন সেহানবীশের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। *নতুন সাহিত্য* পত্রিকায় অচ্যুত গোস্বামী *উত্তরঙ্গ* উপন্যাসটির বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী সংখ্যায় গান্ধী ও বার্নাড'শ- এর জীবনীকার ঋষি দাস সমরেশের পক্ষে এগিয়ে আসেন। সাহিত্য রচনার প্রথম থেকেই সমরেশ সদর্থক এবং নঞর্থক সমালোচনার মুখে পড়েন যা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। গান্ধী ও বার্নাড'শ- এর জীবনীকার ঋষি দাস সমরেশ বসুকে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানির কর্ণধার প্রহ্লাদ প্রামাণিকের কাছে নিয়ে যান। এখান থেকে তাঁর *মরশুমের একদিন* গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর বিনিময়ে সমরেশ কিছু অর্থ পান। দেহোপজীবীনীদের নিয়ে লেখা এই গল্পটি নিয়েও নানা মহলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পরবর্তীকালে দেহোপজীবীনীদের নিয়ে লিখেছেন *আয়নায় আমার মুখ* উপন্যাস। সিগনেট প্রকাশনার মালিক দিলীপ গুপ্ত সমরেশকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সমরেশের লেখায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি ফাউন্টেনপেন এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথার* দুটি খণ্ড পুরস্কার দেন। সমরেশের জীবনে এটিই প্রথম পুরস্কার। ঋষি দাসের ব্যবস্থাপনায় *উত্তরঙ্গ উপন্যাসের* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সমরেশের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর হয়। এ সময় *চতুষ্কোণ* পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় *শ্রীমতী কাফে* লেখেন। একই সময় বিষ্ণু দে সম্পাদিত *সাহিত্যপত্র* পত্রিকায় এবং *পরিচয়* পত্রিকায় কিছু গল্প লেখেন। *আনন্দবাজার* পত্রিকার সম্পাদক সরোজ আচার্যের পরামর্শে *দেশ* পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, তখন থেকেই *দেশ* পত্রিকা বাঙালি মধ্যবিত্তের পাঠকরুচির চাহিদা পূরণ করে; এখন অবধি এর প্রকাশনা অব্যাহত আছে। *দেশ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প *গুনীন*। *গুনীন* প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির বন্ধুদের সাথে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়।

সমরেশ বসুর পারিবারিক অবস্থান-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা-রাজনৈতিক বৈরিতা সমস্ত কিছুর সাথে সংগ্রাম করে লেখকসত্তা এগিয়ে গেছে। সমরেশ জেলে থাকতে বুঝেছিলেন পার্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে জেলবাস তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে আদর্শগত সঙ্কট তাঁকে মানসিকভাবে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। একদিকে অর্থনৈতিক সঙ্কট, অন্যদিকে আদর্শিক দ্বন্দ্বে সমরেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এই দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি তিনি স্পষ্ট করেছেন *মানুষ শক্তির উৎস* উপন্যাসে সজল চরিত্রের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে তিনি *আনন্দবাজার* পত্রিকায় পৌর এলাকার পর্যালোচনামূলক কিছু ফিচার লিখেছিলেন। এই ফিচার লিখতে গিয়ে তিনি আরো বেশি মাটি ও মানুষের কাছাকাছি এসেছিলেন। ১৯৫৪ সালে সাগরময় ঘোষ এবং কানাইলাল ঘোষের সহায়তায় এলাহবাদে কুম্ভমেলায় যান। কুম্ভমেলায় গিয়ে তিনি প্রথমে অরুণ মিত্রের বাড়িতে ওঠেন। এখানে এসে সমরেশ জীবনের ভিন্ন ধরনের অর্থ খুঁজে পান। মেলায় সবই তিনি দেখেছেন শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে। কল্পনা তাঁকে টেনেছে প্রত্যক্ষের অন্তরালে অন্য ভুবনে।[৩৩] এখানে এসে তাঁর চেতনার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রতিদিন যা দেখতেন ইনল্যান্ডে তা লিখে পাঠাতেন। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* তা হুবহু প্রকাশিত হত।[৩৪] মেলা থেকে ফিরে কালকূট ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন।

> অমৃতকুম্ভের সন্ধানে প্রকাশকালে এবং প্রকাশিত হলে সমরেশ পাঠক সমাজে প্রভূত সমাদর পান এবং মূলত এই বইটি তার শিল্পীজীবনে মোড় ফেরার দিকচিহ্ন। মূলত এই বইটিই তাকে স্বস্থানে স্থাপিত করে।[৩৫]

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে পাঠক মহলে সাড়া জাগালেও তাঁর পার্টি বন্ধুরা আশঙ্কা করেছিলেন যে সত্তার শ্রমজীবী মানুষের পাশে নিরন্তর দাঁড়াবার কথা সেই সত্তা ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।[৩৬] ১৯৫৮ সালে তিনি *দেশ* সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এই *দেশ* পত্রিকায় *কোথায় পাবো তারে* এবং বিনোদন সংখ্যায় *অমৃত বিষের পাত্র* নামে উপন্যাস দুটি কালকূট নামেই প্রকাশিত হয়। *অমৃত বিষের পাত্র* উপন্যাসটি রচিত হয় শোভনা সিদ্দিকী নামে এক বিদূষী ও দরদী মহিলার ঘনিষ্ঠতায়।[৩৭]

সমরেশ তাঁর মেজদাদা বীরবলের সহায়তায় নৈহাটি স্টেশন বাজারের কাছে একটি বাড়ি কেনেন। এই বাড়িতে থিতু হয়েই সমরেশের স্বাধীন শিল্পীসত্তা নবতরের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছে। সমরেশ জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন, সেই দেখার ছাপ পড়েছে তাঁর লেখায়। *গঙ্গা* উপন্যাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আতপুরে থাকতে :

> আমি যখন আতপুরে থাকতাম, তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া আছে, আমি সে পাড়ায় প্রায়ই যেতাম। এই ভাবে ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমার হালিশহরে কয়েকটি মৎস্যজীবী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি ওদের সঙ্গে হাসনাবাদ এবং সেখান থেকে আরও সাউথ-এ সমুদ্রের দিকে চলে গেলাম ...তখন আমি রাইফেল ফ্যাক্টরীতে কাজ করতাম। দিন সাতেক আমার কোন পাত্তা থাকত না।[৩৮]

নারীর প্রতি সমরেশের মূল্যায়ন স্বতন্ত্র। সমরেশের জীবনে অনেক নারী এসেছে। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর তিন কন্যা হিলু, গৌরী ও ধরিত্রীর সঙ্গে সমরেশ প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হিলুর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রণয়, গৌরীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ এবং ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ পুনরায় গৌরীর ছোট বোন ধরিত্রীকে বিয়ে করেন তিনি। গৌরীকে কৈশোরে এবং ধরিত্রীকে যৌবনোত্তর কালে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়াও অনেক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। নারীসঙ্গ নিয়ে সমরেশের কোনো সংস্কার ছিল না। অকপটে তিনি সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন। বয়সে বড় হলেও সমরেশের সাথে মধুদির গড়ে উঠেছিল এক আশ্চর্য সম্পর্ক।[৩৯] *যুগ যুগ জিয়ে* উপন্যাসে মধুদির প্রসঙ্গ এসেছে। জরাই কোলের আরণ্যক কন্যা মাংরির সাথেও ঘনিষ্ঠ হয়েছেনে। মাংরির কথা লিখেছেন *দুই আরণ্যক* উপন্যাসে। *সানন্দা* পত্রিকায় প্রিয় নারী নিবন্ধে মাংরি এসেছে কয়ো নামে। দ্বিতীয় বিয়ের পর দিল্লিতে শোভনা সিদ্দিকী নাম্নী এক বিদূষী নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শোভনার সঙ্গে সমরেশের সম্পর্ক ধরিত্রী বসু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। ধরিত্রী বসুকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেও প্রথম স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে কখনো অবহেলা করেননি সমরেশ। সমরেশ-ধরিত্রীর বিয়ে অনেকেই সহজভাবে মেনে নেয়নি। ধরিত্রীকে বিয়ের পূর্বে সমরেশ অস্থিরতায় ভুগেছেন। এই অস্থিরতার ছাপ পড়েছে তাঁর লেখক সত্তায়। *দুই আরণ্যক* প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। নতুন কিছু সৃষ্টি না করার যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন।

বিরতি দিয়ে আবার লিখলেন *বিবর* (১৯৬৫)। *বিবর* লেখার পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী লীলা রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কেন লেখো? সমরেশ বলেছিলেন মানুষকে জানবার জন্য লিখি। লীলা রায় বলেছিলেন, তোমার মনে হয় না নিজেকে জানবার জন্য লেখা উচিত?[৪০] এই একটি মাত্র প্রশ্ন তাঁর শিল্পীসত্তাকে আলোড়িত করেছিল, শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে তিনি *বিবর* লিখলেন। *বিবর* সমরেশকে বিতর্কিত অভিধা প্রদান করল। এই সময় সমরেশ সি.আই.এ-এর চর, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের দোসর, সোভিয়েত সাম্রাজ্যের তল্পীবাহক, আধা ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী এরকম অনেক অভিধায় অভিযুক্ত হয়েছেন। অবশ্য *বিবরের* আগে *স্বীকারোক্তি* গল্প লিখেছিলেন, এখান থেকেই বির্তকের সূত্রপাত। ১৯৬৭ সালে দেশ শারদীয় সংখ্যায় লিখলেন *প্রজাপতি*। একই সময়ে কালকূট ছদ্মনামে *দেশ*-এ লিখেছেন *কোথায় পাবো তারে* এবং স্বনামে পিতাপুত্রীর যৌনসম্পর্ক নিয়ে লিখলেন *পাপপুণ্য* গল্প। ১৯৬৮ সালে অমল মিত্র নামক এক আইনজীবী *প্রজাপতি* উপন্যাসটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে মামলা করেন। এই মামলার সাক্ষী কবি নরেশ গুহ

বলেছিলেন '*প্রজাপতি* অশ্লীল নয় না সামগ্রিকভাবে না অংশত।'[৪১] *প্রজাপতি*র মতো *পাতক* উপন্যাস নিয়ে মামলা হয়েছে।

১৯৭৬ সালে সমরেশ হৃদযন্ত্রের জটিলতায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে ক্যালকাটা হসপিটালে ভর্তি করা হয়। এই অসুস্থতা মাঝে মাঝে তাঁকে বিরক্ত করত। কিন্তু তাঁর সৃজনশীলতা থেমে থাকেনি। তিনি ১৯৭৮ সালে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো যান এবং নৃত্য উৎসব সম্পর্কে 'বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন তোলেন আদিবাসী শিল্পীদের দূরের ধর্মশালায় অযত্নে কেন রাখা হয়েছে।[৪২] ১১ জুলাই ১৯৮০ সমরেশের প্রথম স্ত্রী গৌরী বসুর মৃত্যু হয়। গৌরী দেবী ছিলেন তাঁর বন্ধু ও অভিভাবকের মতো। তবে গৌরী-সমরেশ-ধরিত্রী সংসার জীবনের যে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল সে- সম্পর্কে কোনো লেখা পাওয়া যায় না। গৌরী বসুর মৃত্যুর পর তাঁকে *যুগ যুগ জিয়ে* উপন্যাস উৎসর্গ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে *দেখি নাই ফিরে* উপন্যাস লিখতে গিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সমগ্র ভারতবর্ষ। সংগ্রহ করেছেন দুষ্প্রাপ্য সব নথি। ১৯৮৩ সালে উপন্যাস *বিজন বিভূঁই*, *আকাঙ্ক্ষা*, কিশোরগ্রন্থ *গোগোল*, *চিক্কুস নাগাল্যান্ডে* এবং কালকূট ছদ্মনামে *কোথায় সে জন আছে* প্রকাশিত হয়। গোগোল নামটি তাঁর এলাহাবাদের বন্ধু অরুণ মিত্রের পুত্রের নাম। ১৯৮৪ সালে তাঁর হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা ধরা পড়ে। ১৯৮৫ সালের ৬ জুন তিনি মস্কো নিউজ ক্লাবের অনুরোধে মস্কো ভ্রমণ করেন। মস্কো থেকে ফেরার পাঁচ মাসের মাথায় ১৯ নভেম্বর আবার হৃদযন্ত্রের সমস্যায় বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ১৯৮৬ সালের ৩ এপ্রিল হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যান। সেখান থেকে পাঠানো প্রতিবেদন *আনন্দবাজার পত্রিকায় অমৃতংগময়* নামে প্রকাশিত হতো। এই বছরে তিনি সন্তোষকুমার ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পান। ফ্রাঙ্কফুট প্রবাসীদের আমন্ত্রণে ২৮ সেপ্টেম্বর ফ্রাঙ্কফুট বইমেলায় যান। সেখানে ভারত উৎসবে যোগদান করেন এবং এরপর যান বার্লিনে। বার্লিনে জার্মান প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন, তারপর যান প্যারিসে। ১৯৮৭ সালে উপন্যাস *খণ্ডিতা*, *আদি মধ্য অন্ত্য*, এবং *প্রকৃতি উদ্ধার* প্রকাশিত হয়। এ বছর জানুয়ারিতে তিনি তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে আসেন। ১৯৮৮ সালে *মোহমায়া* ও *বিপর্যস্ত* উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ভুবনেশ্বর বইমেলা উদ্বোধন করেন এবং একজন লেখক হিসেবে পাঠকের মুখোমুখী হন। পাঠকের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন :

> আমি মনে করি, বিশ্বাস করে ঠকা ভালো। কিন্তু বিশ্বাস ও মিথ্যা সন্দেহ করে কোনও সৎ মানুষকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। অবিশ্বাস ও সন্দেহর বীজ একবার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেলে, তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড় কঠিন। মৃত মানুষের শোকে আমরা পাগল হয়ে যাই। তখন কিন্তু মনে থাকে না, জীবিত মানুষটির জন্যেও একদিন শোক পালন করতে হবে।...আমি আমার মতো করেই লিখি। আমার লেখা পড়ে কেউ সুখী হতে পারেন। আমি কিন্তু ইচ্ছাকৃত কাউকে সুখী করার জন্য বা কাউকে দুঃখ দেবার জন্য লিখি না।..আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যের থেকে জীবন বড়।[৪৩]

জীবন-শিল্পী সমরেশ বসু ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রথমে নবকুমার নার্সিংহোমে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্থানান্তরিত হন বেলভিউ হাসপাতালে। এখানে বিকেল ৩.৪৫ মিনিটে সমরেশ বসুর জীবনাবসান হয়।

বোহেমিয়ান সমরেশের জীবন ছিল দুঃসাহসিক। চারপাশের জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। সমরেশ আর কালকূট একই শরীরের দুই আত্মা। তাঁরা আলাদা হয়েছেন শুধু আঙ্গিকে। সমরেশ যেখানে থামেন সেখানেই যেন কালকূট-এর আরম্ভ হয়।[৪৪] সমরেশ তাঁর সাহিত্যের রসদের প্রয়োজনে ছুটে গিয়েছেন কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরে, মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সমুদ্রোপকূলে, কখনো রাজধানীর অভিজাত মহলে, কখনো বা বোম্বের চলচ্চিত্র জগতে। কল্পনা তাঁর রচনায় আছে তবে তা সাহিত্যের প্রয়োজনে। লেখাকে তিনি জীবন-জীবিকা হিসেবে নিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ কাজটি তাঁর অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চণ্ডীনাপিতের ছেলে রামকিঙ্কর— সময়ের অন্যতম শিল্পী হয়েও বর্ণ বৈষম্য থেকে মুক্তি পাননি। রামকিঙ্করের প্রতি এই বিরুদ্ধতার একটা শিল্পসম্মত প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছিলেন সমরেশ বসু কিন্তু অমৃতলোকের যাত্রা তাঁর এই কর্মকে অসমাপ্ত করে দেয়। সমরেশ নিজে মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান ছিলেন। আর এই আঙিনার ঘেরাটোপ থেকে বের হতে পারেনি তাঁর কালকূট সত্তা। তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল ভবিষ্যতমুখী চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করলেও পরবর্তীকালে এই মধ্যবিত্তের প্রত্যয় এবং বিপর্যস্ততার যন্ত্রণাকে তিনি ঔপন্যাসিক রূপ দিয়েছেন নানাভাবে। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী জীবনশিল্পী তাই জীবনের সূক্ষ্মতর ভাবনাকে উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে শিল্পিতা দিতে তিনি ঈর্ষনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সমরেশ বসু, 'মানুষের কথাকার', সম্পাদক, স্বপন দাস অধিকারী, *এবং জলার্ক* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ২০০০), পৃ. ৫০৬
২. *তদেব*
৩. বিক্রমপুরের রাজানগর গ্রাম মহেশচন্দ্রের পিতৃকূলের ভিটে নয়, সেটা ওঁর শ্বশুরবাড়ি। এ বাড়িতেই সমরেশের বাবা মোহিনীবসুর জন্ম। তবে বিক্রমপুর পরগনার এই রাজানগর গ্রামের বাড়িতে সমরেশ তাঁর পিতামহকে জীবিত অবস্থায় দেখেননি। নিতাই বসু, *কালকূট সমরেশ* (কলকাতাঃ জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, ১৩৯৪), পৃ. ২৫
৪. অন্তঃসত্ত্বা শৈবালিনীর পরিবারকে দেখভাল করতেন মোহিনীমোহনের এক মামিমা। একদিন রাত্রে শৈবালিনী সন্তানদের খেতে দিচ্ছেন, এমন সময় ওই মহিলা এসে তাঁকে বললেন, বউমা, তোমার শরীর কেমন? শৈবালিনী বললেন শরীরটা খুব ভাল ঠেকছে না।... প্রায় ঘণ্টা কয়েক পরে ওই ভদ্রমহিলা শৈবালিনীর খবর নিতে এসে দেখলেন শৈবালিনী পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। ভদ্রমহিলা মহাখুশি, আনন্দ আর ধরে না। বললেন, এই দেখে গেলাম, তুই ছেলেমেয়েদের খাবার দিচ্ছিস, এর মধ্যে কখন তড়বড় তড়বড় করে হয়ে গেল, এ্যাঁ ? ওই যে তড়বড় কথাটা উনি বললেন, তার থেকে আঁতুড়েই সমরেশের নাম হয়ে গেল তড়বড়ি। নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, *সমরেশ বসু আমাদের বাস্তব* (কলকাতাঃ একুশ শতক, ২০১৩), পৃ. ১০
৬. কালকূট নামে সমরেশের রচনার সংখ্যা চল্লিশটি। *দেশ* পত্রিকায় 'কালকূট' নামে ধারাবাহিক উপন্যাস *অমৃতকুম্ভের সন্ধানে* প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। উদ্ধৃত : *কালকূট বিশেষ সংখ্যা*, সম্পাদকঃ সাধন বড়ুয়া, *শব্দ সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষ ৩য়, সংখ্যাঃ (কলকাতাঃ ২০১১), পৃ. ০১
৭. 'গাহে অচিন পাখি', *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২, *কালকূট রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ডে সংকলিত
৮. পুরাণের কাহিনি অনুসারে, বাঙালিদের মধ্যে সাধারণত একটি সংস্কার আছে, অষ্টম গর্ভের সন্তান হয় খুব ভালো হবে, নতুবা খারাপ হবে। নিতান্ত ছেলেবেলায় ফরিদপুরের সাধু জগবন্ধু মহারাজের একটি ছবি গলায় পরে সমরেশ যেভাবে চুপচাপ একা বসে থাকত, তার সেই ধ্যান-মৌন রূপ দেখে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা বলতেন ও অষ্টম গর্ভের সন্তান সংসারে থাকতে আসেনি। ও চলে যাবে। ও যে রকম সাধুভক্ত হয়েছে, ও জীবনে কোনো দিন সংসার করবে না। উদ্ধৃত : দীপালি নাগ, *এবং মানুষঃ সমরেশ বসুর গল্প* (কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২), পৃ. ২৫
৯. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
১০. সাধন বড়ুয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪
১১. *তদেব*
১২. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২
১৩. সাধন বড়ুয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৭
১৪. দীপালি নাগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪
১৫. সাধন বড়ুয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৩
১৬. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১
১৭. সাধন বড়ুয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪-৩০৫
১৮. দীপালি নাগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫
১৯. *তদেব*
২০. ঝুমা রায় চৌধুরী, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু সামগ্রিক মূল্যায়ন* (কলকাতা : পূর্বাশা, ২০০৭), পৃ. ১০৮
২১ ব্যক্তি ও লেখক–ভূমিকা অংশ, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১* সম্পাদক. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৭), পৃ.১
২২. জগদ্দলের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ওরফে সত্য মাস্টার। তাঁর প্রভাবে সমরেশ মার্কসবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন। নতুন করে প্রগতি সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। পার্টির অন্তর্দলীয় কোন্দলে সত্য মাস্টারকে প্রাণ দিতে হয়। তখন এঁর অমর আত্মা প্রতিবাদদৃপ্ত সমরেশের চোখ খুলে দেয়। উদ্ধৃত : দীপালি নাগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭
২৩. আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মধ্যে কোনো মার্ক্সীয় তত্ত্বজ্ঞান কাজ করেনি। বস্তুত পক্ষে, ১৯৪২ সালের আগেই, কার্ল মার্ক্স বা এঙ্গেলস–এর নাম শুনলেও তাঁদের কোনো রচনাই তখনও আমি পড়িনি। এবং আমার দিক থেকে অকপটে স্বীকার করতেও কোনো বাধা নেই উদ্ধৃতঃ সমরেশ বসু, '*ভার*তের কমিউনিস্ট (অখন্ড) পার্টি ও আমি', *দেশ* ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৬৫

২৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *হৃদয়ের একূল-ওকূল, দুই বঙ্গের গদ্যসাহিত্য* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১১৯

২৫. সমরেশ বসু, 'ভারতের কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

২৬. "লর্ড সিংহ রোডের এস বি সেলে তাঁকে সাতদিন আটকে রেখে জেরা করা হয়। দৈনিক 'ইনটারোগেশন ও অত্যন্ত হিউমিলিয়েটিং অবস্থায় স্নান' প্রাতঃকৃত্য–'শারীরিক ও মানসিক একটা দাগ দেয়।' এস, বি, সেল থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে ছিলেন এক বছর।" উদ্ধৃত: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

২৭. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১

২৮. সমরেশ বসু, 'ভারতের কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', *দেশ* ২২ নভেম্বর ১৯৮৬

২৯. সমরেশ বসু, 'নিজেকে জানার জন্যে', *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২

৩০. *তদেব*, পৃ. ৯২

৩১. *তদেব*, পৃ. ৭৫

৩২. দীপালি নাগ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১

৩৩. *দেশ*, ৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১ মে ১৯৮৮, পৃ. ৪১

৩৪. সমরেশ বসু, 'মানুষের কথাকার', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৪

৩৫. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৩

৩৬. সমরেশ বসু, 'মানুষের কথাকার', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৪

৩৭. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯

৩৮. সমরেশ বসু, 'মানুষের কথাকার', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৬

৩৯. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

৪০. নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬

৪১. সমরেশ বসু, 'মানুষের কথাকার' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫৫

৪২ *তদেব*, পৃ. ৫৬৪

৪৩. দেবকুমার বসু, 'অপরিশোধ্য ঋণ: একটি জবানবন্দি', *কালকূট বিশেষ সংখ্যা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩

৪৪. অমর মিত্র, 'কালকূট দ্বন্দ্বসমাস', *কালকূট বিশেষ সংখ্যা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়
মধ্যবিত্তের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষ যে দিন থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকে শ্রেণি[১] ধারণা তাকে গ্রাস করেছে। ইতিহাসে এমন কোনো সমাজব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে সামাজিক শ্রেণি বিভাজন পুরোপুরি অনুপস্থিত। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি করেছে। প্রথমে ব্যক্তি, তারপর ব্যক্তিকে ঘিরে পরিবার, পরিবারকে ঘিরে সমাজ। সমাজবদ্ধ মানুষ তার প্রয়োজনেই নানা পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সামাজিক শ্রেণি ও স্তর। দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণিবদ্ধতা থেকে প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণিমনোভাব গড়ে ওঠে।[২] শ্রেণি ধারণাটির উৎসস্থল প্রাচীন রোম।[৩] প্রাচীন ও আধুনিককালে সামাজিক শ্রেণিসমূহ প্রধানত দুটি ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে— ভূমি ও পুঁজি। প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ছিল ভূমিনির্ভর অর্থনীতি।

সামাজিক শ্রেণি বা স্তরের ধারণা যুগে যুগে মানুষকে ভাবিত করেছে। এরিস্টটল তাঁর *পলিটিকস* গ্রন্থে রাষ্ট্রের তিনটি স্তরবিন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন— সম্পদশালী, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও দরিদ্র শ্রেণি।[৪] প্রাচীন ইউরোপের গ্রিক ও রোম সমাজে যে দুটি শ্রেণি পাওয়া যায় তার একটি হলো দাস-মালিক শ্রেণি ও অপরটি দাস। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস পাওয়া যায় না।[৫] তবে *চর্যাপদে* যে ব্রাহ্মণদের দেখা পাওয়া যায় তারা অধিকাংশ মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা মধ্যশ্রেণির, যারা নিভৃতে অন্ত্যজ নারীদের নিপীড়ন করত।

সামাজিক শ্রেণি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে দুজন তাত্ত্বিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— কার্ল মার্কস ও ম্যাক্স ওয়েবার। মার্কস মনে করেন, মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রধানত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি বিশ্বের ইতিহাসে মানব সভ্যতার বিবর্তনে যেসব শ্রেণির উল্লেখ করেছেন তারা হলো— দাস-মালিক এবং দাস, সামন্ত-প্রভু এবং ভূমিদাস, পুঁজিপতি শ্রেণি এবং শ্রমিক। এসব শ্রেণি ছাড়াও প্রাচীন দাস-সমাজ, সামন্ত সমাজে কারিগর, যাজক শ্রেণি, পুঁজিবাদী সমাজে পাতি-বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি ইত্যাদি।[৬] আর ম্যাক্স ওয়েবার শ্রেণির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে :

> we may speak of `class' when (1) a number of people have in common specific casual component of their life chances, in so far as (2) this component is respresented exclusively by economic interests in the possession of goods and opportunities for income…[৭]

মধ্যবিত্তের স্বরূপ

'মধ্যবিত্ত' শব্দটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণি অবস্থানের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এর ওপরে একটি এবং নিচে আর একটি স্তরের মধ্যবর্তী রেখায় এর অবস্থান।[৮] মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজি প্রতিশব্দ Middle Class। *Oxford Dictionary of Sociology*- তে Middle class এর অর্থ - In many ways this is the least satisfactory term which attempts in one phrase to define sharing common work and market situations.[৯]

আর *Oxford Concise Dictionary of Politics* –এ বলা হয়েছে :

> The class or social stratum lying above the working class and below the upper class. It is a term that everybody even defines.[১০]

কার্ল মার্কস মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন– এই শ্রেণিটি সাধারণ ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির উপর নির্ভরশীল থেকে উচ্চবিত্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থকে।[১১] মার্কস মনে করেন সাম্যবাদী সমাজে এ শ্রেণির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

১৯৭৭ সালে Barbara Ehrenreich দম্পতি *New Marxist Class in United States*- এ মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন :

> Marxist class in United States as "salaried mental workers who do not own the means of production and whose major function in the social division of labor...(is)...the reproduction of capitalist culture and capitalist class relations"; the Ehrenreichs named this group the "professional-managerial class.[১২]

বাংলা ভাষায় Middle Class-এর অনুবাদ মধ্যশ্রেণির চেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।[১৩] শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী একজন নিম্নবিত্ত এমনকি নির্বিত্ত হয়েও মধ্যশ্রেণির অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।[১৪] সাধারণভাবে সামাজিক মর্যাদা এবং অবস্থানগত কারণে মধ্যবর্তী স্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বসবাস। তবে এই শ্রেণি সম্পর্কে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ভারতীয় মনোভাব এক নয়।[১৫] ফরাসি ভাষায় Middle Class--এর প্রতিশব্দ Bourgeoisie; বুর্জোয়া শব্দ এসেছে ফরাসি Bourgeousie শব্দ থেকে। বুর্জোয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নাগরিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও বোঝায়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সংগঠক ছিল সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[১৬] ইউরোপীয় Burgher শব্দ বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপের সামন্তবাদ সমাজে বার্গাররা প্রধানত অভিজাত শ্রেণি এবং শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করত।[১৭] শিল্পবিপ্লবের পর সামাজিক স্তরবিন্যাসে আরেকটি নতুন শ্রেণির সংকেত পাওয়া যায় :

> Between the middle class and the proletarat were the not so rich' and not so poor individuals small shop keepers, government officials, lawyers, doctors independent farmers and teachers.[১৮]

প্রকৃতপক্ষে মধবিত্তের যথার্থ সংজ্ঞার্থ নির্ণয় দুরূহ ব্যপার। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত একজন লোক বা একটি পরিবার সারা জীবন একই শ্রেণি-সীমায় স্থিতিশীল নয়।[১৯] এছাড়াও এ শ্রেণির মন ও মনন, আচার-আচরণ ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য প্রায়শ থাকে বিচিত্র পথগামী। এদের ওপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি আর নিচে কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষেরা। এই দুই শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[২০] আবার অর্থনীতির বিচারে মাঝারি মানে থাকলেই সে মধ্যবিত্ত নয়, যদি না তার সাথে কোনো না কোনোভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তির যোগ থাকে। অর্থাৎ একজন নির্বিত্ত মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষানির্ভর কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকলেই মধ্যবিত্ত পর্যায়ে পড়েন।

ধনতান্ত্রিক সমাজ জাত বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণির মধ্যবর্তী সীমানায় বিচরণশীল, প্রত্যক্ষ উৎপাদন সম্পৃক্তহীন, শিক্ষা সংস্কৃতি পরিশীলিত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিন্ন জনসম্প্রদায়কে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[২১] জীবিকা নির্বাহে যারা বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল[২২] তাদেরকে মধ্যবিত্ত বলা হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় যারা প্রতিনিধিত্ব করে, সহজ ও সাধারণ বস্তু বা দ্রব্যের উৎপাদক, কোনো খামারের মালিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী– তাদেরকেও মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে অভিহিত করা হয়।[২৩] *The New Oxford Dictionary of English*,Vol.1-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে— মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের এমন একটি স্তরের লোকদের নিয়ে গঠিত যারা উচ্চ শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যাবস্থানে থেকে জীবিকা সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়িক কর্মী এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা সামাজিক মর্যাদাগত কার্যে নিজেদের জড়িত রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ শ্রেণি সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে 'জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সুখ ভোগবাদীতে (meteral comfort) বিশ্বাসী শ্রেণি'[২৪] মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজ অন্য যে কোনো সমাজ থেকে সুসংগঠিত এবং পরিশীলিত। সমাজে মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করার ফলে এই শ্রেণি নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। আর সে-কারণেই সর্বদা নিজেদের অবস্থানকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপে এই শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। যাদের সামাজিক অবস্থান ছিলো অর্থনৈতিক দিক হতে পুঁজিপতি মজুর শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরে। ধনবাদী সমাজব্যবস্থার বিবর্তনে এরা বিকশিত হয়েছে।[২৫] তবে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক নয়। আর্থিক বিবেচনায় ও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে এদের বিচরণ সর্বদা মধ্যম পর্যায়ে, ফ্রান্সে এদের বলা হতো বুর্জোয়াজি এবং ইংল্যান্ডে তারা মধ্যশ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত।[২৬] ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রেটেন সাহেব বলেছেন সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যশ্রেণি বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান, এদের মধ্যে থেকে তিনি জমিদার কৃষকদের বাদ দিয়েছেন। কারণ ভূসম্পত্তি ও জমিই এদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, টাকা নয়।[২৭] অর্থাৎ ইংরেজ মধ্যবিত্ত অনেকটাই টাকার উপর নির্ভরশীল। তবে ইংরেজ মধ্যবিত্তের ধারণা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়। ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত ভারতীয় মধ্যবিত্ত থেকে অনেক বেশি সচ্ছল এবং বিত্তবান। ভারতীয় মধ্যবিত্তরা জীবনবোধে স্বাতন্ত্র্যবাদী, সন্তান ও পরিবারের প্রতি সচেতন এবং যত্নবান, নগর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, ঝুঁকিহীন ব্যবসায় এবং পেশাজীবী কর্মে তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত করা যায়।[২৮] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারী-কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, চিকিৎসক-সাংবাদিক, আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং লেখক, শিল্পী রাজনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত।[২৯] বাংলা ভাষায় মধ্যবিত্ত শব্দের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। ১৮২৭ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর অভিধানে প্রথম মধ্যবিত্ত শব্দটি পাওয়া যায় :

> যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে। এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল। তাহাদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে.. ক্লেশেও থাকিত।...এই নতুন শ্রেণী হইতে যেসকল উপকার তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত।[৩০]

'বঙ্গদূত' পত্রিকাটি বাংলায় নব্য উত্থিত এই শ্রেণিটিকে সচেতন করার প্রয়াসে মধ্যবিত্ত শব্দটি ব্যবহার করে।

সুতরাং বলা যায়, কায়িক শ্রমবিমুখ, সংস্কৃতমনা, যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক আচরণে পরিশীলিত, বিলাস-ব্যসনে বিত্তবানদের অনুসারী, নির্দিষ্ট রুচির ধারক এবং বাহক পেশাজীবী মানুষ নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত। এরা আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতির অনুসারী, স্বাতন্ত্র্যবাদী, শ্রেণিমর্যাদায় সচেতন। নাগরিক জীবনবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং স্বীয় স্বার্থ চেতনায় বিশ্বাসী।

আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

প্রকৃতপক্ষে ভারত উপমহাদেশে মধ্যবিত্তের উদ্ভব এবং বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্যবিত্তের শ্রেণি চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজে যেমন আধুনিকতার সূত্রপাত হয়, তেমনিভাবে ইংরেজ আগমনের ফলে এবং তাদের নিজ প্রয়োজনে এদেশে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ হয়।

অবশ্য প্রাক-পলাশী পর্বে ভারতীয় সমাজে শ্রেণিবিভক্তি ছিল। সে-সময় শ্রেণিবিভক্তি ছিল এরকম :[৩১]

১. রাজা ও তার সভাসদগণ নিয়ে প্রথম শ্রেণি।

২. বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতবর্গ নিয়ে পরবর্তী শ্রেণি।

৩. সওদাগর শ্রেণি।

৪. কৃষক সম্প্রদায়, ছুতার, মিস্ত্রি, কারিগর নিয়ে আরও একটি শ্রেণি।

এই বিভাজনের মধ্যে মধ্যবিত্ত বলে আলাদা কোনো শ্রেণি পাওয়া যায় না। তবে মধ্যবিত্ত যে ছিল না তা নয়, তবে সমাজে তাদের কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণিগত স্বাতন্ত্র্য ও সত্তা ছিল না বললেই চলে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে প্রথম দিকে ভারতীয় সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যে জাতিবর্ণ প্রথাটা কাজ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে বাঙালির মানসে জাতীয়তাবাদী ভাবনা আধুনিক যুগমানসের ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাক-নবাবী যুগে জাতীয়তাবাদী ভাবনার চেয়ে বৈশ্বিক ভাবনা প্রবল ছিল। সে কারণে দেশের অধিনায়ক নিজেকে তখনকার বাংলা বা ভারতের রাজা গণ্য না করে বরঞ্চ বিশ্ববাদশা গণ্য করতেন।[৩২] তাঁদের উপাধি ছিল জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর, শাহ আলম ইত্যাদি। মুঘল রাজ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই অবস্থান করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মুঘল সরকার একে সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি বলে গণ্য করতেন না। সে-কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদৌল্লার পতন দিল্লির সম্রাটকে খুব বেশি ভাবিত করেনি। আবার মুঘল সরকারের বিশ্বজনীন নীতি দেশের জনগণের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল।[৩৩] তাদের নিজস্ব ধর্ম বর্ণ জাতি গোষ্ঠী, কৃষ্টি কালচারে অর্থাৎ জীবনযাত্রার বড় কোনো রকম পরিবর্তন না এলে শাসককে মেনে নিতে কোনো আপত্তি ছিল না। ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর লর্ড ক্লাইভের ইঙ্গ-মুঘল যৌথ শাসনের কুফল জনগণ খুব সহজেই টের পায়। ক্লাইভ ও তার অনুচরবৃন্দ বাংলাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অরাজকতা শুরু করেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিংশতি বয়সের অভিজ্ঞতা হয়তো ক্লাইভের দেশের উন্নত মানের অস্ত্র এবং সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক পারিষদ দলের ছলাকলার তুলনায় অপরিণত ছিলো।[৩৪] যে কারণে

খুব সহজে ক্লাইভ ও তার অনুচরবৃন্দ জয়লাভ করে। নতুন রাজশক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়।[৩৫] ইংরেজের রাজস্ব আদায়ের নব নব পন্থা বাংলার অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। ইংরেজ শাসক বাংলা বিহারের শাসন ক্ষমতা পেয়ে প্রাচীন জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করতে সক্রিয় হয়, এই সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে তারা ভূমি রাজস্বের নতুন ব্যবস্থা প্রচলন করে। অল্পকালের মধ্যেই বাংলা এবং বিহারের প্রাচীন গ্রামসমাজের ভিত্তি বিনষ্ট হয়। যে ভিত্তি টিকে ছিল একটা স্থূল অর্থনৈতিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে তাকে ধ্বংস করে বাংলা ও বিহারকে শশ্মানে পরিণত করা হয়।[৩৬] মধ্যযুগীয় স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়াতে বংশকৌলীন্যের স্থান নিল সচল মুদ্রা।[৩৭] ইংরেজ শাসক দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং ব্রিটিশ সরকারকে অনবহিত রেখে নির্মম লুটপাটের বেসাতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তারা কৃষিব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে রাজস্বের হার বহু গুণে বৃদ্ধি করেছিল। ফলে কৃষক ক্রমশ সর্বস্বান্ত হয়েছিল। কোম্পানির সৃষ্ট নতুন ব্যবস্থায় রাজস্বের টাকা সংগ্রহের জন্য বাংলা ও বিহারের কৃষকরা বাধ্য হতো তাদের সম্বল খাদ্য ফসল বিক্রি করতে। নতুন শাসকেরা বাংলা এবং বিহারের জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার নতুন ভিত্তি সৃষ্টি করল। এরা মুঘল যুগের গোমস্তাদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করল এবং যথেচ্ছচারিতার অবাধ অধিকার খুলে দিল।[৩৮] ইংরেজের এই সাম্রাজ্য নীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট জটিল ভূমিবিন্যাসের কারণে মধ্যবিত্তের উত্থানের যুগ শুরু হলো। ১৮৩০ সালের মধ্যেই সামাজিক শক্তি হিসেবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়। ১৮৬২ সালে ৩ জুলাই একটি সরকারি ডেসপ্যাচে (নং ১৪) সেক্রেটারি অফ স্টেট পরিষ্কারভাবে বলেন :

> ‘. ..it is most discrible that facilities should be given for the gradual growth of a middle class connected with the land without dispossessing the peasant proprietors and occupiers…The proprietors, the tenure-holders, and other middle class people who stand between the zaminderrs and the cultvators have built up the social and economic structure of Bengle.[৩৯]

ইংরেজ সরকারের বিপুল পরিমাণ খাজনা আদায়ের জন্য এক শ্রেণির কর্মচারী অপিরিহার্য হয়ে পড়ে। এক শ্রেণির ভূঁইফোঁড় লোক যাদের হাতে অর্থ ছিলো তারা জমি ক্রয় করে জমিদার হলো। এই নব্য জমিদারের ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল উচ্চ চাকরি অথবা ব্যবসা কিংবা মহাজনী দ্বারা। তারা লগ্নী করার মতো কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিল এবং লগ্নীর জন্য ভূ-সম্পত্তির দিকেই তাদের দৃষ্টি ছিল। এরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির পূর্বপুরুষ। এরা ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে ছিল অনভিজ্ঞ এবং নগরে বসবাস করত। যে কারণে এরা মধ্যস্বত্বভোগী ও খাজনা আদায়কারী একদল এজেন্ট নিয়োগ করে।[৪০]

ফলে দেখা যায় প্রত্যেক জমিদারিতে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা হয়েছিল দেড়লক্ষেরও বেশি।[৪১] এরা কৃষকের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশি মনোযোগী ছিল। নিজেদের গুণগত মান উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলো। ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে মধ্যবিত্ত শব্দটি 'ভদ্রলোক' শব্দটির সমার্থক হিসেবে দাঁড়াল।[৪২] বিত্ত ও শিক্ষা ছিলো এই ভদ্রলোক বিবেচিত হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি।[৪৩] উনিশ শতকে বাংলার প্রশাসনিক রিপোর্টগুলোতে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদনে 'ভদ্রলোক' নামে যে সামাজিক শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তারা হচ্ছেন শিক্ষিত সরকারি কর্মচারি, পেশাদার বৃত্তিধারী (ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক), খাজনাভোগী এবং জমির অকৃষক রায়ত। 'ভদ্রলোক' কায়িক শ্রম করেন না, কায়িক শ্রমসাধ্য কর্ম নিকৃষ্ট মানের বলে মনে করেন।[৪৪] 'ভদ্রলোক' শব্দটি ব্রিটিশ গবেষকদের আবিষ্কার নয়। এটি আবিষ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি তদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে।[৪৫]

সাধারণত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এ তিন উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 'ভদ্রলোক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা এক নতুন সামাজিক গোষ্ঠী। এদের জীবন যাত্রা, নৈতিক মান, আচার-আচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি অভদ্রদের থেকে অনেকাংশে পৃথক।[৪৬] বাঙালি 'ভদ্রলোক' জমির আয় ছাড়া নানামুখী পেশাদার বৃত্তিতে আগ্রহী হলেন। ফলে এরা কেরানি, হিসাবরক্ষক, সহকারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক নানাবিধ পেশায় জড়িয়ে পড়লেন। নিজ প্রয়োজনে ইংরেজি শিখলেন। অল্প কালের মধ্যে ভাষা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে দখল হলো। মোটকথা বাঙালি ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় পরিচয়–এরা হলেন শিক্ষিত। তবে এই ভদ্রলোক গোষ্ঠী বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হলেও এই গোষ্ঠীকে শুধু মধ্যবিত্ত বলা যায় না। ব্রিটিশ শাসনে এদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ফলে ব্যবসায়–বাণিজ্যে নিযুক্ত এদেশের তেলি, সাহা, বসাক, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক শ্রেণি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত হলেন।[৪৭] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাংলার সমাজে ভদ্রলোক কথাটির চেয়ে 'বাবু' শব্দটি বেশি প্রচলিত হতে থকে। ইংরেজি সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক বা ইংরেজি মিশনারিরা প্রায় একই অর্থে শব্দ দুইটি ব্যবহার করত।[৪৮] কোম্পানি শাসনের শুরুতে কলকাতা শহরে মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, দেওয়ান, ভূম্যধিকারী ফড়িয়া, দালাল, গোমস্তা, ইজারাদারদের নিয়ে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়েছিল তারই একটি অংশ ছিলো এই 'বাবু' শ্রেণি। ইংরেজরা স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের 'বাবু' নামে সম্বোধন করত।[৪৯]

তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি মুসলমান লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকরি লাভ করলেন, জমিদারি বা জমিদারির একাংশ কিংবা খাজনাভোগী মধ্যবিত্ত এবং জমি কিনে অকৃষক রায়তের মর্যাদা

পেলেন। এই সামাজিক শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে। দাস, ভূমিদাস, কারিগর ও কৃষকদের জীবনে মুক্তি আনে।[৫০] মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে আমরা দেখব উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালি মধ্যবিত্তরা সমাজ গঠনে তেমন স্বাধীন ভূমিকা রাখেনি কিন্তু পরবর্তীকালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কণ্ঠস্বর সমাজের যে কোনো আন্দোলনে উচ্চকিত থেকেছে। তারা তাদের নবলব্ধ শিক্ষা দিয়ে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করারও প্রয়াস পায়।[৫১] ভারতীয় মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিটাকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায় যেমন :

ক. বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
খ. ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি।
গ. পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

ক. বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত

এদেশে বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় ইউরোপীয়দের আগমনের পর থেকে। ইউরোপীয়রা লাভের আশায় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এই বাণিজ্য উপনিবেশগুলোকে কেন্দ্র করে নানান শ্রেণির মানুষ যেমন– বণিক, মহাজন, পাইকার, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, সরকার ও বেনিয়ারা ভিড় করতে থাকে।[৫২] এদেরকে ব্রিটিশরা নির্বিচারে গোমস্তা বা বানিয়া নামে আখ্যায়িত করে।[৫৩] কোম্পানির ব্যবসা ও রাজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে।[৫৪] কোম্পানি তার নিজের স্বার্থে বাণিজ্য যত প্রসারিত করল ততই এই বাণিজ্য সহযোগী গোষ্ঠী লাভবান হল। প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিকরা এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, বাজার, রীতিনীতি কিছুই বুঝতো না। অনেক সময় নিঃসম্বল অবস্থায় অনেক ইউরোপীয় এদেশে বাণিজ্য করতে আসত।[৫৫] তাদেরকে এ দেশীয়রা টাকা ধার দিত, পণ্য সংগ্রহ করে দিত আবার আমদানিকৃত পণ্য বিক্রিতে সহযোগিতা করত। এই নতুন কর্মযজ্ঞে শুধু বাঙালি হিন্দুরাই জড়িত হলেন। ১৭৩৬-৪৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল ৫২ জন হিন্দু বণিক।[৫৬] পলাশী যুদ্ধের পর এদেশে কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে বিধান অনুযায়ী কলকাতা হয় ভারতের রাজধানী। কলকাতাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো এজেন্সি হাউস[৫৭] প্রতিষ্ঠিত হয়। তৈরি হয় ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপযোগী বিশাল ও উন্নত বাজার। এই বাজারকে কেন্দ্র করে নানান শ্রেণির মানুষ বিবিধ পেশায় জড়িয়ে পড়ে। নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের

সামনে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। কলকাতা ও অন্যত্র যে বাণিজ্যিক ফার্ম তৈরি হয় সেখানে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকে এরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সহযোগিতায় নতুন নতুন যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে শুরু করে[৫৮] কিন্তু এই যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাংক পতনের মধ্য দিয়ে ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। যৌথ উদ্যোগ বন্ধ হওয়ায় বহু বাঙালি বণিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাংলায় বৈদেশিক বাণিজ্যিক উন্নতি দেখা দেয়। এর মূল কারণ আমদানি কম, রপ্তানি বেশি। 'ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এই বাণিজ্যিক উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল'।[৫৯] তবে ১৯৩০-এ বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারত থেকে মূলধন সরাতে থাকে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ক্রমশ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প স্থাপন সম্পর্কে হতাশ হতে থাকে। এই হতাশা দূর করতে বাংলা সরকার এদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষদের বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।[৬০] স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার বুদ্ধিজীবী ও দেশবরেণ্য নেতারা দেশীয় শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রতি নজর দেন। তবে বাঙালি শিল্প প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা এবং মূলধনের অভাবে খুব বেশি সফলতার মুখ দেখেনি। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শিল্প-বাণিজ্যর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করলেও মুসলমান সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। শুধু ইংরেজ শাসনামলে নয়, মুসলিম শাসনকালেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। তারা তখন হয় জমিতে কৃষিকর্মে রত হয়েছে, নইলে সামরিক-বেসামরিক চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়াই পছন্দ করত।[৬১]

প্রাক-ব্রিটিশ আমলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি মুসলমানের খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায়নি। মূলধনের অভাব, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা, ব্রিটিশদের অর্থনীতি ও যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাল না মিলিয়ে সঞ্চিত অর্থ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অনাগ্রহ প্রভৃতি কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে বাণিজ্যাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের উদ্ভব বিলম্বিত হয়। তারপরও উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় মুসলিম সমাজে ব্যবসায়-বাণিজ্যনির্ভর একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশ করে।

> Muslim had not taken to commerce or trade after the loss of power and failed to produce the much needed middle class.[৬২]

খ. ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণি

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়টি ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অব্যবস্থা দূর করার জন্য পাঁচশালা বন্দোবস্ত করেন। এখানে অভিজ্ঞ জমিদারের চেয়ে যে

সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েছিল তাদেরকে ভূমি ইজারা দেওয়া হয়। এতেও সরকার লাভবান না হওয়ায় পরবর্তীকালে একশালা বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। পরে ১৭৯৩ সালে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে জমিদারগণ জমির প্রকৃত মালিকানা স্বত্ব পায়। কিন্তু সূর্যাস্ত আইন (sunset law)[৬৩]-এর কারণে অনেক প্রাচীন জমিদার তাদের খাজনা সময় মতো পরিশোধ করতে না পারায় তাদের জমিদারী বাকী রাজস্বের দায়ে বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক বড় বড় জমিদার তাদের জমিদারি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে বাৎসরিক নির্দিষ্ট ভূমিকরের বিনিময়ে মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের পত্তনি দেন। এই পত্তনি ব্যবস্থা বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ তৈরি করে দেয়।[৬৪] ফলে, নিলামী জমিদারী কিনে কিংবা পত্তনি নিয়ে এক শ্রেণির নব্য জমিদার তৈরি হলো। যাদের অধিকাংশই শহরে বসবাস করতো। এদের অনুপস্থিতে নায়েব, গোমস্তা বা কর্মচারী ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে ওঠে। এরাও এক ধরণেরে ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত। এ ছাড়াও হিন্দু মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের কারণে বড় বড় জমিদারি ভাগ হয়ে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণি তৈরি হয়েছে যারা ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত। নিস্কর সম্পত্তি ভোগীরাও ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তের পর্যায়ে পড়ে। নবাবী যুগে বাংলার জমিদাররা বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য চাকর, পাইক ঘাটোয়াল (পাহাড়ি পথের পাহারাদার) ও বৃত্তি ধারী মানুষদের (কামার কুমোর নাপিত তেলি ইত্যাদি) নিষ্কর জমি ভোগ করার অধিকার দিতেন।[৬৫] ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণির মধ্যবিত্ত ছিল। বাংলার আরো এক শ্রেণির ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত পাওয়া যায় এরা হচ্ছে মহাজন।[৬৬] এই সকল মহাজনেরা বেশির ভাগ হিন্দু, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নানান ধরনের পেশাদার ব্যক্তি যেমন ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী তিলি সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, বেনিয়ান, গোমস্তা, জমিদার তালুকদার, সরকারি কর্মচারি পেনসনভোগী ও বিধবা।[৬৭]

এছাড়াও এদেশে যে মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরী হল তারা কোনো কলকারখানা স্থাপনের অধিকার পায়নি। ভূমিতে আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা থাকলেও কৃষক এবং কৃষির কোন উন্নতি হয়নি। এরা কৃষির উন্নয়নে চেষ্টাও করেনি। ব্রিটিশদের উপনিবেশ হওয়াতে দেশটিতে কোনো সুষ্ঠ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। ফলে যে শ্রেণিটা তৈরী হল সেটি আধা সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন কৃষক শোষক জমিদার শ্রেণি যাদেরকে উচ্চবিত্ত বলা যায়। আরেকটি মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণি যাদেরকে ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বলা যায়।[৬৮] এরা ছিল অধিকাংশ হিন্দু আর বাংলার অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান।

ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিত ভাবে এদেশে বড় জমিদারের পাশাপাশি নিজেদের স্বপক্ষে একটি শক্তিশালী দেশীয় শ্রেণির স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা অবশ্য ইংল্যান্ডের ব্যারনদের মত স্বাধীন ও স্বনির্ভর ছিলো না, তারপরও এই ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার হয়েছে। এমনকি দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময়ে সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছে। ব্রিটিশ শাসকের এই সুহৃদ শ্রেণির একাংশ উনিশ শতকে এসে শুধু ভূমির ওপর নির্ভরশীল না থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি লাভের উদ্দেশ্য শহরে ভিড় করতে থাকে। এসবের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রভাবশালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব।

গ. পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি

ইংরেজ শাসক ভারতের শাসনভার গ্রহণের পর ভারতবাসীর শিক্ষা প্রসারে প্রথম দিকে তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। শাসনের অজুহাতে দেশবাসীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখাই ছিল তখনকার শাসককুলের উদ্দেশ্য। সেজন্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বারবার পরিবর্তন এনেছিল কিন্তু কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয়দের আগ্রহে এ দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্যবিদ্যার মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষার অবনতি দূর করার জন্য কলকাতায় একটা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোনস্-এর উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপিত হয়। ১৮১৩ সালের পরে সরকারিভাবে দেশীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। নতুন শিক্ষানীতি হয়। এ রকম একটি শিক্ষা পরিকল্পনা হচ্ছে লর্ড মেকেলের শিক্ষা পরিকল্পনা।[৬৯] এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা হবেন মধ্যস্থ।[৭০] উনিশ শতকের শেষ দিকে মেকেলের কল্পিত ইংরেজ শিক্ষা এবং রুচি অনুকরণকারী এ রকম একটি বাবু শ্রেণি তৈরি হয়েছিল।[৭১] এই বাবু শ্রেণি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। যারা বিদেশী পোশাক, ঘড়ি ছাতা ছড়ি ও মদ যেমন ভালবাসতেন তেমনি ইংরেজদের মত ফিটন গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোতেন।[৭২] ব্রিটিশদের ভাষা কাজে লাগিয়ে, তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে এদেশে শিক্ষিত চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। এরা নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনের মূল্যমানকে আবিষ্কার করতে চাইল অন্যদিকে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে কাজে লাগবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল।[৭৩] শুধু যে চাকরিজীবী

মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছিল তাই নয়, বিপুলসংখ্যক বাঙালি বেকারও তৈরি হয়েছিল, যাদের শিক্ষানুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। তবে ইংরেজ শিক্ষা গ্রহণ করে এদেশে একটা পেশাদারি মধ্যবিত্তের উদ্ভব হল। যাদের অধিকাংশই ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি পেশার মানুষ। এরা সংস্কার মুক্ত, উদারনৈতিক মানসিকতার অধিকারী এবং গণতন্ত্রকামী। ইংরেজদের একপেশে মনোভাবের কারণে উচ্চ পদে দেশীয়দের চাকরি হতো না। ফলে এ দেশীয় শিক্ষিত যুবকরা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থেকে নিম্নপদে নিযুক্ত হতেন। এই সরকারি চাকরির বেশির ভাগই পেত উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা।[৭৪]

মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে প্রথম দিকে অনাগ্রহ দেখালেও পরবর্তীকালে তাদের নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে এবং জীবনব্যবস্থা পরিচালনার অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে এ শিক্ষা তারা গ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির প্রাধান্য ও সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান থাকায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে তাদের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি।[৭৫] তবে উনিশ শতকের শেষপাদে ধীরগতিতে হলেও তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মতামত গড়ে ওঠে।[৭৬] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা পেশাগত কারণে বাংলার বিভিন্ন মফস্বলে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আধাগ্রামীণ আধানাগরিক সমাজে তারাই হয়ে উঠেছিল সমাজের নেতা। বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সভা সমিতি সংগঠন গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলায় গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ সামাজিক নেতৃত্ব গ্রহণে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে সচেতন ছিল। স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা তাদের জীবনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলার বেশির ভাগ মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে এরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভাবপ্রবণতা ও স্বার্থপরতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়।

আর্থ–সামাজিক অবস্থানের বিচারে উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত সমাজের দুটি শ্রেণিভাগ করা যায়। যেমন-

ক. উচ্চ মধ্যবিত্ত

ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তনের জমিদাররা এই পর্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণির মধ্যবিত্ত সমাজ সংস্কার এবং সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো।

খ. নিম্ন মধ্যবিত্ত

জমিবিহীন ছোটখাটো চাকরীজীবী এবং ব্যবসায়ী, কিংবা কিঞ্চিৎ জমি আছে।

বিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণির তিনটি বিভাজন করা যায় যথা :

ক. উচ্চ-মধ্যবিত্ত

খ. মধ্য-মধ্যবিত্ত

গ. নিম্ন-মধ্যবিত্ত।

তবে দিন যত বদলাচ্ছে সমাজের শ্রেণি বিভাজনের স্বরূপও বদলাচ্ছে। মধ্যবিত্ত এখন আর একটি বলয়ে নেই। এখন মধ্যবিত্তকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ করা হচ্ছে। (ছকের মাধ্যমে এই বিভাজন দেখান হলো)[৭৭] :

প্রাচীন বিভাজন

↓

উচ্চবিত্ত

↓

মধ্যবিত্ত

↓

নিম্ন মধ্যবিত্ত

আধুনিক বিভাজন

উচ্চবিত্ত

↓

মধ্যবিত্ত

↙ ↘

উচ্চ-মধ্যবিত্ত   নিম্ন-মধ্যবিত্ত

↓

নিম্নবিত্ত

অতি সাম্প্রতিককালের বিন্যাস

উচ্চ-উচ্চবিত্ত

↓

উচ্চবিত্ত

↓

উচ্চ-মধ্যবিত্ত

↓

মধ্যবিত্ত

↙ ↘

মধ্য-মধ্যবিত্ত   নিম্ন-মধ্যবিত্ত

↓

নিম্ন-বিত্ত

↓

নিম্ন-নিম্নবিত্ত

অতি সাম্প্রতিক কালের বিন্যাসের মধ্য থেকে শুধু মধ্যবিত্ত সংক্রান্ত বিন্যাসের বিশ্লেষণ দেখানো হলো :

ক. উচ্চ মধ্যবিত্ত

উচ্চ মধ্যবিত্তে যাদের জমি আছে, সমাজে উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী, সামাজিক উন্নয়নে পরিবর্তনে যাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে এরা সাহিত্যে-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। দেশভাগের পরও এই শ্রেণির উচ্চমধ্যবিত্তের দেখা পাওয়া যায়। যারা মেট্রোপলিটনের সংস্কৃতির অংশ হতে চেয়েছিল।

খ. মধ্য মধ্যবিত্ত

এই শ্রেণির মধ্যবিত্ত সামান্য জমি আছে এবং চাকুরিজীবী। এরা সমাজে সুবিধাভোগী, আত্মস্বার্থ সচেতন, আত্ম অহংবোধে তাড়িত, সামাজিক পদমর্যাদা সম্মানকে বড় করে দেখে, বুলিসর্বস্ব নীতিবাদী, কখনো কখনো মানবতাবাদী। ধর্মীয় বিশ্বাসে এদের একাংশ সেক্যুলার, আরেক অংশ রক্ষণশীল। এরা শ্রেণি সচেতন। সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের সমাজজীবনে রাজনৈতিক আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থের বদলে ব্যক্তিস্বার্থকে এরা বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই মধ্যবিত্তই সমাজ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেয়।

গ. নিম্ন মধ্যবিত্ত

জমিবিহীন ছোটখাটো চাকুরিজীবী, চাকুরির ওপর নির্ভর করে এদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এ শ্রেণির অধিকাংশই এদের ওপরের শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল।

এসব শ্রেণিভাগ ছাড়াও সাম্প্রদায়িক ভাবে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত এভাবেও আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।[৭৮]

বাঙালি মধ্যবিত্ত তাঁর উত্থানের সূত্র ধরেই বিভাজিত। ইংরেজ প্রশাসন শুরু থেকেই হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশে সহায়ক ছিল। ১৮৩৭ সালে শাসনকাজে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ও মাতৃভাষার প্রচলন[৭৯] হিন্দু মধ্যবিত্ত লুফে নেয়। এছাড়াও ১৮২৬ সালে আদালতে নিম্নপর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ইংরেজি সার্টিফিকেটধারী ভারতীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি চালু হয়।[৮০] হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের সরকারি ভাষার এই পরিবর্তন ছিল সুবিধাজনক। এই পরিবর্তন হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। তারা হিন্দু সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হয়। যার ধারাবাহিকতায় রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩),

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৪১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে নবজাগরণ ঘটে।[৮১]

ইংরেজ রাজশক্তির হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছিল। শাসককুলের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। ইংরেজ শাসন এবং শিক্ষার প্রসার বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় শিক্ষা নিয়ে সংশয়, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় শিক্ষা প্রসঙ্গটি মুসলমানদের কাছে জটিল রূপ ধারণ করে। মুসলমানরা তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়। অর্থবিত্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।[৮২] উইলিয়াম হান্টার তাঁর *The Indian Mussalmans* শীর্ষক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন :

> A Hundred and seventy years ago it was almost impossible for a wellborn Mussalman in Bengal to become poor : at present it is almost impossible for him to continiue rich.[৮৩]

হান্টারের এ মন্তব্য থেকে ব্রিটিশ আগমনের পূর্বাপর বাঙালি মুসলমানের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।[৮৪] কিন্তু মুসলমানরা খুব দ্রুত নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়। মুসলিম বুদ্ধিজীবীর উদারনৈতিক মানসিকতা এবং সেই সময়ে সরকারের শিক্ষা ও চাকরির ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশে সহায়ক ছিল।[৮৫] এছাড়া বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তদের সংগঠিত হওয়ার পক্ষে সহায়ক ছিল। মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য বহন করতো। ধর্ম-রাজনীতি-সমাজনীতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিম মধ্যবিত্তের মনোবৃত্তি ছিলো আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমানরা মুক্তবুদ্ধিচর্চা, জ্ঞানান্বেষণ ও রাজনীতিতে সচেতন হয়। নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলমান সমাজের অবস্থার পরিবর্তনে শক্তিশালী নেতৃত্ব দেন।[৮৬] এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন যেমন-সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৮)–এর মতো সংগঠন মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরেন। পাশাপাশি পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে, যে কারণে তারা শিক্ষায় মনোযোগী হয়। কলকাতার সাহেবদের খানসামারাও দরিদ্র মুসলিম ছেলেদের বাসস্থান ও অন্নের সংস্থান করে।[৮৭] এভাবে বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ হয়।[৮৮] মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), ইসমাইল হোসেন

সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯৩০-১৯৮৩), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৭০) প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য

মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় সকলেই মেধা মনন মনস্বিতা বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা প্রদর্শনে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অর্থ উপার্জনে উত্তরোত্তর সাফল্যে বিশ্বাসী এ শ্রেণির লোকজন মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে নিজেদের উচ্চবিত্ত এমনকি শিল্পপতি বা পুঁজিপতিদের স্তরে উন্নীত করায় সচেষ্ট থাকে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন কাহল তাঁর *The American Class Structurer* গ্রন্থে। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্ন ও উচ্চবিত্ত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্তদের রয়েছে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষিত করার আকাঙ্ক্ষা। সমাজবিজ্ঞানী সিলি মনে করেন এই শ্রেণিটির (মধ্যবিত্ত) রয়েছে শিক্ষা, সন্তান ও পারিবারিক জীবনের প্রতি দুর্বলতা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি বিকশিত করে। সে কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সব সময় নিজের শ্রেণিটাকে অতিক্রম করতে চায়। শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত জীবন যাপন করতে চায়। আমেরিকা এবং ইউরোপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত পেশাজীবীকে white colour বলা হয়। কায়িক শ্রম পরিহার করে মধ্যবিত্তরা জীবিকা অর্জন করে থাকে বলে এদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়।[৮৯]

বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি সরাসরি কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। ভূস্বামী কিংবা জমিদার হওয়া বা নিজে যথেষ্ট পরিমাণ জমির মালিক হওয়াকে এরা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি বলে মনে করে। এই শ্রেণিটির (মধ্যবিত্ত) সর্বদা সামাজিক পদমর্যাদা এবং উন্নত জীবনের প্রতি আগ্রহ। এ কারণে ক্রমশ এরা স্বতন্ত্র শ্রেণিতে পরিণত হয়। শিক্ষা সাহিত্য দর্শনে এদের শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নতুন সমাজ চেতনার জন্ম দেয়।

মধ্যবিত্তের নানা ধরনের স্তর বিন্যাস আছে। আভিজাত্যে ও কৌলিন্যে, উচ্চবিত্ত জমিদারগণ এবং উপার্জিত অর্থ সম্পত্তি অনুযায়ী উচ্চ বর্গের মানুষজনও আছেন এ শ্রেণিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী

সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উঠে এসেছিল উচ্চবিত্তের কাঠমোয়।

উনিশ শতক বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই শতকে মধ্যবিত্তের মানসলোকে সনাতন প্রাচ্য জীবনবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মনন ধর্মের অভিঘাত এসেছে। শেষ পর্যন্ত এই শতকের শেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার সমন্বয় হয়েছে। এই শতকের মধ্যবিত্তের মধ্যে অধিকার আদায়ে আপোষমুখিতা ও সংস্কারবাদ ছিলো প্রধান বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের একাংশ বিশেষত উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজজীবনের সমস্যার চেয়ে বিলাসব্যসনে বেশি সময় অতিবাহিত করেছে। তবে এই শতকের নবজাগরণ মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অধিকারবোধ জাগ্রত করেছে।[৯০] কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিরাচরিত মূল্যবোধের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) মধ্যবিত্তরা একাত্ম হয়। হিন্দু মধ্যবিত্ত বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে আর মুসলিম মধ্যবিত্ত এর পক্ষে দাড়ালো। বঙ্গভঙ্গ রোধের সংকল্পে সন্ত্রাসবাদী স্বদেশি আন্দোলন শুরু হল। সারা দেশের যুবচিত্ত এক দুর্জয় আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠল। এক আগ্নেয় বৈপ্লবিক চেতনায় বহ্নিমান হয়ে উঠল দেশের যুবসমাজ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মজফফরপুর হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড। অবশেষে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হল।[৯১] বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে বন্ধন মুক্তির আশার বীজ রোপিত হল। প্রথম মহাযুদ্ধে বিদেশের সহযোগিতায় অস্ত্রের সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করার গোপন প্রয়াস চালিয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিন্তু সফল হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ ভারতীয় জীবনে তেমন প্রভাব না ফেললেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি মধ্যবিত্তের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। চাকরির বাজার হ্রাস পেয়েছিল। চাকরি দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল।[৯২]

মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনা বাংলাদেশের উপর দুঃসহনীয় অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির আয়ের পথ অন্য প্রদেশে গিয়ে চাকরি সংগ্রহের পথ সংকুচিত হলো।[৯৩] মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা তৈরি হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি মধ্যবিত্ত ধরতে পেরেছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল তার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল মধ্যবিত্তের নতুন রাজনৈতিক বোধ। এর মধ্যে ঘটলো জালিয়াওয়ালবাগে হত্যাকাণ্ড। অপমানে আক্রোশে জাতি বিমূঢ় উদভ্রান্ত, জাতির সেই দুঃসহ যন্ত্রণাকে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তি দিলেন।[৯৪] এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত হলো। চৌরিচৌরায় অহিংস আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ

করায় গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। মধ্যবিত্ত যুবসমাজ অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করেছে তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর নেতিবাদের সুর দেখা দিল। প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি হতাশা, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা, অবসাদ, আত্মপ্রত্যয়হীনতা, ব্যক্তিজীবনে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, সামূহিক বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়েছে এ সময় বাঙালি মধ্যবিত্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদে ভুগেছে। এই বিপর্যস্ত মানসিকতা ও মূল্যবোধের ছবি আছে কল্লোল-কালিকলম পত্রিকায়।

বিশ শতকের তিরিশের দশকে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর বিশ্বমন্দার প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে বিশেষত কলকাতায় বেকারত্বের জ্বালায় এ সময় প্রায়ই আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটত :

> We sometimes hear of bragged due of unemployment and continued indigence overwhelming educated families. Witness the poisoning of his wife and children by a lawyer and later on his suicide.[95]

মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রসাধনা এই সময় চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। *কল্লোল* পত্রিকা এ সময় লিখেছিল :

> 'মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থা তাহা যাহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক নহেন তাহারা ঝুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াচে, একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশকীয় খাদ্য ও বস্ত্র যোগাড় হইয়া ওঠে না।[৯৬]

মধ্যবিত্তশ্রেণি প্রথম মহাযুদ্ধজনিত অভাব ও বিপর্যয় কাটিয়ে না উঠতেই নেমে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর।[৯৭] এই 'মন্বন্তরে'[৯৮] মধ্যবিত্তের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায়। অভাবে মধ্যবিত্তের স্বভাব নষ্ট হয়, সামাজিক বন্ধন ও নীতি নিয়ম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আত্মিক সম্পদ সব খুইয়ে দেউলে হয়ে বাঙালি কোনো রকম বেঁচে থাকে মাত্র।[৯৯] আত্মবিক্রয়ের মধ্য দিয়ে সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রবণতা এই সময় লক্ষণীয়। এই সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা স্বনির্ভরতা এবং সংসারে সহযোগিতার জন্য ঘরের বাইরে বের হয়ে চাকরি করেছে।

যুদ্ধের অভিঘাতে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অধ্যাত্মচেতনা প্রবলভাবে নাড়া খায়। মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব।[১০০] সাহিত্যে যথার্থভাব জীবনের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ এবং সামাজিক বিকারগ্রস্ততার প্রকাশ ঘটেছে। জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং দেশভাগের পর মধ্যবিত্ত উপরিভাগের ধারণা পাল্টিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাছে মধ্যবিত্তের আদর্শিক চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। অর্থনৈতিক-সামাজিক-মানসিক অভিঘাতে মধ্যবিত্তের মানসলোকে স্ববিরোধিতা, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুসংলগ্নতা, বিকারগ্রস্ততা ইত্যাদি নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশ এসেছে গ্রাম থেকে। অধিকাংশই নিজস্ব সংস্কার পরিত্যাগ করতে পারেনি। শহুরে জীবন তাদের কাছে আকর্ষণীয়। নাগরিক সুবিধা তারা উপভোগ করে। স্বার্থ আহরণ এবং জীবন বিকাশের ঊর্ধ্বগতি বিঘ্নিত হলে তারা হয়ে ওঠে বেদনাচঞ্চল অথবা হয়ে পড়ে উত্তপ্ত বিক্ষুব্ধ।[১০১] নাগরিক জীবনের সাথে সনাতন মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে তারা প্রায়ই জর্জরিত হয়।

মধ্যবিত্তের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা শ্রেণি মূল্যবোধে বিশ্বাসী, পুরাতন ধ্যান-ধারণার অনুগামী সেই কারণে অনেক সময় রক্ষণশীল আবার অন্যদিকে এই শ্রেণিই পরিবর্তনশীল সমাজপ্রেক্ষিতে নিজেকে বদলে নেয়। সামাজিক পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় এই শ্রেণিকেই।[১০২] ভাবালুতা মধ্যবিত্তের আরো একটি বৈশিষ্ট্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা দোদুল্যমান, কখনো প্রগতিশীল, কখনো বা প্রতিক্রিয়াশীল। যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে এরা হয়ে ওঠে দুর্বার এবং নেতৃত্বদানকারী।

আঠার শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসোন্মুখ সামন্ত-সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণির প্রাথমিক উপাদানসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হয়।[১০৩] আঠারো শতকের অন্তিমপাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই নবোত্থিত শ্রেণিটি নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করে। সমগ্র উনিশ শতক ধরে এই শ্রেণি পরাধীন স্বদেশের সম্পদ বিদেশী শাসকদের হাতে তুলে দিয়ে সেই শাসক শোষকদের উচ্ছিষ্ট লাভ করে বিকশিত হয়।[১০৪] ফলে উনিশ শতকের প্রারম্ভ ছিল মধ্যবিত্তের জন্য স্বর্ণযুগ। কিন্তু বিশ শতকে বিদেশী শোষণ-শাসনের যাঁতাকল, বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একটি অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা শ্রেণিতে পরিণত করে। তারপরও এই দুর্যোগের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় নবজাগৃতির অংশীদার হয়েছে, সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, অবহেলিত নিম্নবর্গের পাশে দাঁড়িয়েছে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নয়ন ঘটিয়েছে, নব নব মতবাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। যুক্তির আলোয় মুক্তির পথ খুঁজেছে, আশাবাদী জীবন দর্শনে স্থিত হয়েছে, সাহিত্যে নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মার্কস এঙ্গেলস-এর শ্রেণিভাবনা সামাজিক উৎপাদন নির্ভর। তাঁদের মতে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ শ্রেণি নিরপেক্ষ ছিলো। যেদিন থেকে সামাজিক উৎপাদন উদ্বৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিল, সেদিন থেকে সমাজে শ্রেণি বিভাজনের সূত্রপাত। দ্রষ্টব্য: সুধীর চক্রবর্তী, সম্পাদক, *বুদ্ধিজীবীর নোট বই* (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৫৯৬

২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (ঢাকা : বুক ক্লাব, ২০০০), পৃ. ১৩৯

৩. যতদুর জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সারভিয়াস তুলিয়াস(৫৭৮-৫৩৪ খৃ. পূ.) নামে জনৈক রোমান রাজা অস্ত্র ধারণ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সেনাগোষ্ঠী গঠন করেন এবং সেই সেনাদের তাদের নিজস্ব ধনসম্পত্তি (অর্থাৎ নিজস্ব অশ্ব, অস্ত্র ইত্যাদি) জোগান দেবার ক্ষমতা অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। তবে ইতিহাস অনুসারে সমাজজীবনে শ্রেণির প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রিস ও মেসোপটেমিয়াতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। সুধীর চক্রবর্তী, সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৭

৪. মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ১৫

৫. *তদেব*

৬. *তদেব*, পৃ. ১৬

৭. Max Weaber*: Essays in Sociology* (London, 1947), part 11, sec. V11, pp. 180-186

৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক* (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, ১৯৯২), পৃ. ১

৯. John Scott and Gordon Marshall (ed.), *Oxford Dictionary of Sociology* (New york, 2005), pp. 408-409

১০. *Laih Mclean* (ed.), *Oxford Concise Dictionary of Polictics,* (New York 1995), p. 320

১১. In Marxism, which defines social classes according to their relationship with the means of production, the "middle class" is said to be the class below the ruling class and above the proletariat in the Marxist social schema. Marxist writers have used the term in two distinct but related ways. In the first sense it is used for the bourgeoisie, the urban merchant and professional class that stood between the aristocracy and the proletariat in the Marxist model. However, in modern developed countries, some Marxist writers specify the *petite bourgeoisie* – owners of small property who may not employ wage labor – as the "middle class" between the ruling and working classes. Marx himself regarded this version of the "middle class" as becoming merged with the working classes. Communist League Britain, Marxism and Class: Some definitions. undated. http. www.mltranslations org/Britain/Marxclass htm at §The 'Middle Class' M. Rubel and T. B. Bottomore ed., *Karl Marx* (victoria: Penguin Books Ltd., 1960), p. 98

১২. Stewart Clegg, Paul Boreham, Geoff Dow; *Class, politics, and the economy*. Routledge. 1986. ISBN 978-0-7102-0452-3. Retrieved 2009-10-04

১৩. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩), পৃ. ১৭

১৪. শামসুজ্জোহা মানিক, *বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের উত্থান* (ঢাকা : ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ২০১০), পৃ. ৫

১৫. বুর্জোয়া কথাটি ফরাসি ভাষায় নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি; ব্যবসায়ী বা দোকানদার। বিশেষ অর্থে বোঝায় একটি সমাজ, যা কালচারে ধনী সম্প্রদায়ের এবং যারা শিল্প বা ব্যবসায়ে প্রভুত্ব করে ও যার আয় হচ্ছে ব্যবসায় ও শিল্পকর্ম যারা করে তাদের থেকে লব্ধ, অথচ যারা কায়িক পরিশ্রমে এসব কাজ করে। আরও বিশেষ অর্থে বোঝায় ইউরোপে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজে জাত প্রভাবশালী কালচার: আর পাক-ভারতে বোঝায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঞ্জাত পাশ্চাত্য কালচার অভিসারী নব্য সমাজ। আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৫৫

১৬. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

১৭. Henry Pratt Fairchilded (ed.), *Dictionary of Sociology* (New York; Greenwood Press, Reprint 1976), p. 193
১৮. *The World Book Encyclopedea* m.vol. 13, London, World Book Inc., 1943, p. 452 উদ্ধৃত : মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ* (বাংলা একাডেমি : ঢাকা ২০০৯), পৃ. ১
১৯. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫
২০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১
২১. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২
২২. A class of people who worked with their brain for thir livelhood. M A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal* (1576-1757), vol.2 (karachi: publishing House, 1967), p. 212. উদ্ধৃতঃ লোকমান হাকিম, *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ (১৮৫৭-১৯৪৭): শ্রেণীবিন্যাস ও সংস্কৃতির রূপান্তর*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস (কুষ্টিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪), পৃ. ৬৫
২৩. *তদেব*
২৪. Judy Pearsall (ed)., *The New Oxford Dictionary of English*, Vol.1 (New Delhi: Oxford University Press, Ist edn., 2000), p. 1170
২৫. Ibd; Henry Pratt Fairchilded, *op.cit.*, p. 193
২৬. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১
২৭. *তদেব*, পৃ. ২
২৮. Ibd; Henry Pratt Fairchilded, *op.cit.*, p. 193
২৯. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১
৩০. নীলরত্ন হালদার, সম্পাদক, *বঙ্গদূত*, ১৩ জুন ১৮২৯
৩১. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮
৩২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৮৭৪-১৯৭১* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৩
৩৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫
৩৪. Ram Gopal *How the British Occupied Bengal, Asia Publishing House,* (Bombay 1963), p. 212. উদ্ধৃতঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (ঢাকা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ২২
৩৫. স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫), পৃ. ১০৫
৩৬. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২
৩৭. *তদেব*
৩৮. *তদেব*, পৃ, ২৩
৩৯. নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯০, ২য় সংস্করণ), প. ১৩১
৪০. সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি (সম্পাদক), *বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস* (কোলকাতা : উবুদশ, ২০১১), পৃ. ১১
৪১. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮
৪২. Speciaelly Privileged and Conciously Superior group, economically dependented upon landed rents and professional and clerical empoloyment, Keeping its distance from the masses by its acceptance of high caste and command of education. J. H. Broomfield, *Elite Conflict in Plural Society: Twentieth Century Bengal* (Burkely: University of Calcutta, 1968), pp. 12-13
৪৩. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫) তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ১০৭
৪৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৪৫. নরহরি কবিরাজ, 'উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তর্ক ও বিতক' (সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ) *বাংলার জাগরণ ও ভদ্রলোক,* ' (কলিকাতা : কে পি বাগচি, ১৯৮৪), পৃ. ২৫১

৪৬. J. H. Broomfield, *Elit Conflict in Plural Society: Twentieth Century Bengal* (Barkely: University of Calcutta, 1968), pp. 13

৪৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৪৮. নরহরি কবিরাজ (সম্পাদক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১

৪৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৫৫-৫৬

৫০. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, ১৭

৫১. The renaissance was the product of intragtion between the Benglali intelligentia and British Orinetalists. Between 1800 and 1830, in Calcutta, the Bengali intelligentia constituted an uncertain but hopeful group of individuls selecting alien values and ideas to reform indigenous traditions. The established relationship with the British Both for material gain and to use them as windows to the west. It was their good fortoune that the distance between London and Calcutta was vast and the Orientalists with whom they associated had already become sufficiently indianized. The Bengalis of the west during the sympathetic Orientalist period helped to maintain good rapport and good will between the representatives of the two civilizations.

David Kopf and Safiuddin Joarder (edt.,), Reflections on the Bengal Resaissance, *Insitite of Bangladesh Studies*, Rajshahi 1977. p. 8. উদ্ধৃত : মোস্তফা তারিকুল আহসান, *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২৮), পৃ. ৫৪

৫২. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত, পৃ.* ২১

৫৩. মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাংলদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ১৯৪৭-৭০* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৯

৫৪. B. B Misra. *op. cit*,. p. 80-81

৫৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

৫৬. *তদেব*, পৃ. ২২

৫৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা শর্তে ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফররুখশীয়ারে (১৭১৭-১৭১৯) নিকট থেকে বাণিজ্যের সনদ পেয়ে এদেশে এজেন্সি হাউজ প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে এজেন্সি হাউসগুলো মূলত কলকাতায় গড়ে ওঠে

৫৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, উনবিংশ শতাব্দী, ১৯৮৭ উদ্ধৃত: সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক* (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ২৪

৫৯. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫

৬০. বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৯৩২-১৯৩৩, পৃ. ১৪১-৪২

The Govt. wants to develop the Srerampore weaving Institiute into a Textile College of Technology so that bhadralok youngmen will be able to start small factories employing handloom weaers in the first instance and gradually introducing power driven machinery some of which may develop in course of time into large organized factories in mufassal areas and under rural conditions', Annual Adm. Report of the Deptt. of Industries, Bengal, 1934-35 p. 4.

৬১. W. C Smith, *Modern Islam in India* 1946. p.164-165 (উদ্ধৃত : মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৯৪৭-৭০ পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

৬২. A. R. Mallick, British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Dacca, 1977, পৃ. 75 উদ্ধৃত : মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

৬৩. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্যে 'সূর্যাস্ত আইন' নামে একটি আইন সৃষ্টি করেছিল। এই আইনের বলে জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে তথা সূর্যাস্তের মধ্যেই খাজনা রাজকোষে পৌঁছে দিতে বাধ্য হতো। দ্রষ্টব্য : এম. এ রহিম, বাংলার মুসলমানের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ৪৭-৫০। আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭) (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ২৮৩

৬৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

৬৫. *তদেব*, পৃ. ১৫

৬৬. ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন এবং কৃষিকাজের সম্প্রসারণ উনিশ শতকে মহাজনদের জন্য স্বর্ণযুগ নিয়ে এল। দ্রষ্টব্য : ডানিয়েল অ্যান্ড এলিস থরনার. ল্যান্ড অ্যান্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া, বোম্বাই ১৯৭৪, পৃ. ৫৫। উদ্ধৃত : সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

৬৭. তদেব, পৃ. ১৬

৬৮. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯

৬৯. we may be interpreters between us and the millions whom we govren-a class of persons Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. উদ্ধৃতঃ বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬

৭০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬

৭১. মধ্যবিত্তের জন্মলগ্ন থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সময়ে মধ্যবিত্তের চরিত্রগত পরিবর্তনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, কোম্পানির বেনিয়ান মুৎসুদ্দি ইত্যাদি নানা শ্রেণির দালাল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা নানা ধরনের ভূমি মধ্যস্বত্বভোগী, তারাই ছিল সে সময়ের মধ্যবিত্তের উপরের দিকের স্তর বা উচ্চমধ্যবিত্ত, 'বাবু' নামে যারা অভিহিত। এদের নিয়ে সেই সময় অনেক ব্যঙ্গাত্মক নক্শা রচিত হয়েছে। এক সময় উচ্চমধ্যবিত্তের স্বার্থ আর ইংরেজদের স্বার্থে তফাৎ বিশেষ ছিলো না। অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

৭২. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬

৭৩. বদরুল হাসান, *উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ. ৯

৭৪. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫

৭৫. Bimanbihari Majumdar, *History of Political Thought*, vol 1 (calcata: university of calcata, 1924), p. 83

৭৬. উনিশ শতকের তৃতীয়ার্ধ থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। আর্থিক অসচ্ছলতা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। এছাড়া ধর্মীয় গোঁড়ামি, পুরাতন মূল্যবোধের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, আত্মঅহমবোধ মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। ১৮৭৪-৭৫ সালের পাবলিক ইনসট্রাকশন রিপোর্টে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের সংখ্যার হার নিম্নরূপ :

সারণি ১

বিভাগ	মোট জনসংখ্যায় মুসলমানের হার	মুসলমান ছাত্র	মোট জনসংখ্যায় হিন্দুদের হার	হিন্দু ছাত্র
বর্ধমান	১২.৮	৬.০	৫৮.৩	৯৩.৫
প্রেসিডেন্সি	৪৮.২	২৪.০	৫০.৯	৭৫.০
রাজশাহী	৬১.০	৪৫.০	৩৮.৫	৫৪.৫
ঢাকা	৫৯.১	২৭.০	৪০.০	৭৩.৫
চট্টগ্রাম	৬৭.৪	৪৩.০	২৯.০	৫৪.৫
মোট গড়	৪৮.৮	২৯.০	৫০.১	৭০.১

উৎস : Government of the Bengal, General Report on Public Instraction in the lower Province of The Bengal Presidency for 1874-75 (Calcutta: The Military Orphan press, 1876), Appindix-D, p. 100; ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধা দূরীকরণে সহায়ক হয়। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ইংরেজি জানা হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা নিম্নরূপ :

সারণি ২

বিভিন্ন ধর্মের নারী/পুরুষ	১৮৯১
হিন্দু পরুষ	৩৯%
হিন্দু নারী	৭.৫%
মুসলমান পুরুষ	১৬.৭%
মুসলমান নারী	১.৭%

উৎসঃ বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি* (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান লি., ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৫), পৃ. ৬৮-৭০।
এই সকল শিক্ষার্থীর অধিকাংশ ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।

৭৭. অনিক চট্টোপাধ্যায়. 'শ্রেণী', *ধ্রুবপদ* (সম্পাদক : সুধীর চক্রবর্তী), বার্ষিক সংকলন ২০০০ (কলকাতা : পুস্তক বিপণী), পৃ. ২৪৮-২৪৯

৭৮. মুহম্মদ ইদ্রিস আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

৭৯. অ্যাক্ট ২৯, ১৮৩৭, আইনের ক্ষেত্রে ফার্সির বদলে মাতৃভাষার প্রবর্তন Board Collection 73770

৮০. সুফিয়া আহমেদ, (অনুবাদ : সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ), *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২), *পৃ.* ৪

৮১. অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৯১), পৃ. ৬

৮২. রবিউল হোসেন, *সমকাল পত্রিকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা* (ঢাকা : ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ২০

৮৩. আবদুল হক (সম্পাদক), 'বাংলার মুসলমানের কথা', *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ৩৬১

৮৪. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদ, আবদুল মওদুদ (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস), পৃ. ৯৬-১৪০

৮৫. নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯২৮) প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুসলমান সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন, তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করেন। ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজে নবচেতনা জাগ্রত হয়। W. C. Smith, *Modern Islam in India* (London: Victor Gollanges, 1942), pp. 308-09

৮৬. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৫২১-৫২২

৮৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০১), পৃ. ৭৮-৭৯

৮৮. আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ, ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি, *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ৫ খণ্ড একত্রে, আতিউর রহমান, সম্পাদক (ঢাকা : দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ৪৫

৮৯. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

৯০. সম্পাদনা সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৯১. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬), পৃ ১৭৮

৯২. বেকার সমস্যা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল তার প্রমাণ, দিল্লিতে লেজিস্লেটিভ অ্যাসেমব্লির অধিবেশনে (জানুয়ারি, ১৯২৬) এই সমস্যার সমাধানের জন্যে গুরুতর চিন্তা করা হয়। A. Rangaswami Iyenger এই অধিবেশনে একটি প্রস্তাব করেন যে, মধ্যবিত্তদের বেকারত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তার সমাধানের পথ-নির্দেশের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হোক। তিনি বুদ্ধিজীবী বেকারদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং এজন্যে দায়ী করেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারকে। শিবস্বামী আয়ার প্রস্তাব করেন, এই সমস্যার সমাধানের জন্যে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এদেশে শিল্পন্নোয়নের প্রতি সরকারকে আরো সচেতন হতে হবে। রামেশ্বর শ, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৬), পৃ. ৫৮

৯৩. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৯

৯৪. *তদেব*

৯৫. limaye, P.M. `*The problem of unemployment in Historical and Economic studies'* edited by karve D. G Ponna, 1941, p. 110

৯৬. *কল্লোল*, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৪ মাঘ, ডাকঘর বিভাগ

৯৭. রামেশ্বর শ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩

৯৮. ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে মানুষের জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ বিপর্যয়। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ...বাঙালি মধ্যবিত্ত কেরানিবৃত্তি করে সংসার চালাতে ব্যর্থ হয়। ...এর সাথে যুক্ত হয় ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ইতিহাসে যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে পরিচিত। মোহা. সাইদুর রহমান, *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক (* ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১১), পৃ. ২৪

৯৯. রামেশ্বর শ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩

১০০. মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস (১৯৪৫-১৯৬০)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯*)*, পৃ. ১৬

১০১. মো. মুস্তাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

১০২. মধুমিতা আচার্য, *স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা* (কলকাতা : কমলিনী প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ১০

১০৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮), পৃ. ৫৭

১০৪. *তদেব*, পৃ. ৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা : মধ্যবিত্তের অবস্থান

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসের বিকাশধারা : মধ্যবিত্তের অবস্থান

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে উপন্যাস হচ্ছে আপাত-আধুনিক সৃষ্টি। উপন্যাসকে বলা হয় আধুনিক মানুষের জীবনবেদ ও জীবনার্থের মহাকাব্য। মহাকাব্যের মতোই এর পরিব্যপ্তি। আধুনিক মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনের কাহিনি, তাদের ভালোলাগা, ভালোবাসা সমস্ত কিছু উপন্যাসে বর্ণিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই মানবজীবনকে সমগ্রভাবে শিল্পে রূপদান করে। 'The novel is not merely fiction prose, it is the prose of mans life art to attempt to take the whole man and give him expression.[১] উপন্যাসের বাহন হচ্ছে গদ্য। আর এই গদ্যের সুসংহত রূপ প্রকাশের জন্য উনিশ শতকের একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে সাহিত্যিকদেরকে।[২] প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল পদ্যনির্ভর। মানুষ তখন ধর্মের কথা গানের মাধ্যমে বলেছে। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সেই সমস্ত গীতি শুনেছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন জটিল হতে শুরু করলে তাদের মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদের জায়গায় স্থান পেয়েছে মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদী শক্তিকে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় উপন্যাসের। মধ্যযুগীয় ধর্ম সংস্কারচ্ছন্ন গোষ্ঠীবদ্ধচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে যখন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটেছে, তখন তার অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য যথার্থ শিল্পমাধ্যম খুঁজেছে। আধুনিক যন্ত্রশিল্প এক্ষেত্রে কল্যাণী ভূমিকায় মানুষের সম্মুখে হাজির হয়ে আকাঙ্ক্ষাকে পরিণত রূপ দিয়েছে।

উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লেখা জীবন-আখ্যানের সামগ্রিক রূপায়ণ। সে কারণে উপন্যাস জীবনের বহুমুখী সমস্যা এবং সমাধানকে ধারণ করে। উপন্যাসে মানুষের ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনের কথা থাকে। ব্যক্তিজীবনকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন। অন্তর্জীবনে জীবসত্তা এবং মানবসত্তার যে দ্বন্দ্ব এবং উত্থানপতনের লীলা চলেছে তাই নিয়ে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর বহির্জীবনের রয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক।[৩] উপন্যাসে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশের তাগিদেই সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে পড়ে যায়। সমাজে নানান ধরনের শ্রেণি বিভক্তি বিদ্যমান। যেমন উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত। সমাজের উপরিতলে উচ্চবিত্তের অবস্থান। সাহিত্যে এর কথা কমই বলা হয়েছে। উপন্যাসে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জয়জয়কার। কেননা উপন্যাসের জন্মই মধ্যবিত্তের হাত ধরে। উপন্যাস প্রথমে মধ্যবিত্তের পাঠের বিষয় ছিল পরে তা অভিজ্ঞতা প্রকাশের বিষয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। কেননা 'উপন্যাসের কোনো পুরাতন ইতিহাস নেই; আঠারো শতকে এর সূচনা, বিংশ শতকে বহুবিচিত্ররূপে অন্য সব সাহিত্য শাখাকে অতিক্রম করে গেছে'।[৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক উপ্যাসের সংজ্ঞা ছিল অনেকটা এরকম :

> A prose narrative on a large scale. Like the short story, the novel defies accurate defination both because of the essential but unfixable element of length and because it includes so many different types and possibilities.[5]

কিন্তু জেমস জয়েস তাঁর *ইউলিসিস* উপন্যাসে উপন্যাসসংক্রান্ত পুরাতন ধারণা পাল্টে দিলেন, উপন্যাস হয়ে উঠলো প্রবহমান সময় ও সমাজ অন্তর্গত জীবনের রূপকল্প। উপন্যাসের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিকাশের সাথে সাথে উপন্যাসের বিকাশ সহজতর হয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার, গদ্যের প্রচার, সংবাদপত্রের বিস্তার, পাঠনক্ষম মেহনতি এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের সম্প্রসারণ সমাজের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটিয়েছিল। ইতিহাস, জীবনচরিত, স্মৃতিকথা, জার্নাল, চিঠিপত্রে রচনার বান এসেছিল। তখন এসব পড়ার ব্যপক আগ্রহ দেখা দিয়ে দিয়েছিল।[৬] মূলত সেই সময় সাহিত্যচর্চা এবং পরিবেশনের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিল তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজ।

রিচার্ডসন, হেনরি ফিলডিং এর মতো লেখকেরা আঠারো শতকের মধ্যবিত্তের নীতিবোধ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, ব্যঙ্গধর্মিতা এসব বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের উপন্যাসে। রিচার্ডসন-ফিলডিং-এর যুগের পর ইংরেজি উপন্যাসকে সুপরিণত ও সমৃদ্ধিরূপ দান করেন স্কট, জেন অসটেন, ডিকেনস, থ্যাকারি, ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয়, জর্জ এলিয়ট, মেরিডিথ ও হার্ডি।[৭]

ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে ফরাসি মধ্যবিত্ত সমাজ বিকশিত হতে থাকে। ফরাসি মধ্যবিত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি উপন্যাস বিকশিত হয়েছে। মারিভো তাঁর নাগরিক মন এবং মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন *মারিয়ান* (১৭৩১-৪১) নামক উপন্যাসে। লাসাজ এর *জিল ব্লা(Gil Blass of Santillance)* প্রেভো (Provost)-এর *মানোঁ লেস্কো*, (*Manon Lescaut)* উপন্যাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সমকালীন মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা।[৮] ভলত্যার (১৬৯৪-১৭৭৮) নিজে মধ্যবিত্তের ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি লিখেছেন কাঁ'দিদ (Canolide) *Social satire* উপন্যাস। দিদেরার (১৭১৩-৮৪) *The Alun* (*La Religieus*) (১৭৬০) পত্রোপান্যাস এক উচ্চমধ্যবিত্তের কন্যাসন্তান সুজানের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত। মূলত ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সাধারণ পাঠকের মননগত পরিবর্তন ঘটে।[৯] স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২), বালজাক প্রমুখ তাঁদের উপন্যাসে বাস্তবনিষ্ঠ নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে তুলে ধরেছেন। ১৮১৫ সালের পর থেকে ফ্রান্সে বুর্জোয়া সমাজ

অভিজাততন্ত্রের ওপর একের পর এক আঘাত হানতে থাকে। এ সময় থেকে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা প্রকাশিত হতে থাকে উপন্যাসে। ১৮৩০–এর পর থেকে ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠা পায়। শিক্ষিত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় উপন্যাসে এর যথার্থ প্রতিফলন ঘটে।

বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগের অবসান হয়। এরপর থেকেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগে ভারতের সমাজ ছিল মূলত গ্রামীণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত গ্রামীণ সমাজকে ভেঙে ইংরেজ বের করে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[১০] ইংরেজ তাঁর প্রয়োজনেই বাংলার নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনকে করেছিল দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রামীণ কুটির শিল্প ও কৃষির মূলে আঘাত হেনেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে হঠাৎ করে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সব জমিদারের দরকার হল বহু কেরানি ও হিসাবরক্ষকের। আবার অন্যদিকে ইংরেজের বাণিজ্যের সম্প্রসারণের কারণে শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ফলে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে একটা শ্রেণি কেরানির চাকরিতে ঢুকল। এরাই পরবর্তীকালে হয়ে উঠল উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত।[১১] বস্তুতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষা, চাকুরি সব মিলিয়ে নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হলো সেই মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটলো। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অভিব্যক্তি ঘটলো গদ্যের মাধ্যমে। গদ্যকে অবলম্বন করে তাই সৃষ্টি হল জীবন রূপান্তরের কাহিনি, উপন্যাস তারই ফল।

শহুরে নাগরিক জীবনের ভোগবাদিতা ও অর্থের স্ফীতিতে মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল বাবু শ্রেণির। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাবু শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এইরকম :

> …the term Babu signifying from the present time, a gentleman who has reached the acme of wealth and fame.

ইংরেজি অপর একটি ভাষ্যে এর ইঙ্গিত অনেকখানি স্পষ্ট :

> In Bengali a title of respect for an English speaking Hindu, Applied derogatorily by the British to semieducated bhadrolok and by extension to any bhadrolok.

বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ 'বাবু শ্রেণি'[১২]। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম 'বাবু শ্রেণি' নিয়ে লিখলেন *নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস*। নবোত্থিত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নানাবিধ সাধারণ কাজে আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে জমিদারি ক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্মান মর্যাদা দাবি করেছে। ভবানীচরণের রক্ষণশীল মন এ বিষয়টি মেনে নিতে পারে নি। নানাবিধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে

তিনি বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। ভবানীচরণকে বলা হয় মধ্যবিত্ত কলকাতার ভাষ্যকার।[১৩] তিনিই প্রথম নাগরিক মধবিত্ত জীবনের কাহিনি সাহিত্যে আনলেন। অবশ্য তারও আগে ১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণে প্রথম *বাবুর উপাখ্যান* প্রকাশিত হয়। এই বাবুর উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রথম আধুনিক কথাসাহিত্যের বীজ রোপিত হয়। যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, মৈয়মনসিংহ গীতিকার* মুসলিম লেখকদের কল্পকাহিনিতে উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ লক্ষ করা যায়।[১৪]

কোম্পানি আমলে যারা বড়লোক হলেন তাদের একপুরুষ বড়লোক বললে ভুল হয় না অর্থাৎ এক পুরুষের মধ্যে, প্রধানত একজন ব্যক্তির উদ্যম ও চেষ্টার ফলে, নবযুগের বাংলার নতুন ধনিক শ্রেণির পত্তন হয়েছিলো। সেই উদ্যম ও প্রচেষ্টার ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুরুষ পর্যন্ত কোন রকমে প্রবাহিত হয়ে, হয় একেবারে থিতিয়ে গেছে না হয় অন্য কোন খাতে চালিত হয়েছে।[১৫] *নববাবু বিলাসের* কেন্দ্রীয় চরিত্র জগদুর্লভ বাবুও সেই এক পুরুষের ধনী। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সম্পদ তিনি বাবুগিরি করতে গিয়েই নষ্ট করে ফেলেছেন, তিনি যৎসামান্য ইংরেজি শিখেছেন। যেমন রাসকেল, বেরি গুড ছোট নানসেন্স, গোটে হেল।[১৬] জগদুর্লভ ছাড়াও ঠক প্রবঞ্চক ভট্টাচার্য, তোষামোদকারী খলিপা যার প্ররোচনায় জগদুর্লভ বাবুর চরিত্রের নৈতিক স্খলন ঘটে এরকম কয়েক শ্রেণির চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গভীরে প্রোথিত হলেও আমাদের সমাজ কাঠামোর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভিত্তিতে জমা হয়েছিল চোরাবালি। এই চোরাবালির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মেরদণ্ডহীন ঐতিহ্য বিমোচিত বাবু সম্প্রদায়।[১৭]

নববিবি বিলাসের নববিবি মধ্যবিত্ত পরিবারের কুলবধূ। নাপিতিনীর প্ররোচনায় সে সংসার ত্যাগ করে। সংসার ত্যাগের নেপথ্যে গভীর মনোবেদনা ছিল। তার স্বামী তাকে পুনরায় গৃহে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সে বলে 'যে পুরুষ পরস্ত্রী অথবা সামান্যতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত, সে ব্যক্তি সস্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে প্রায়ই অশক্ত ... তাহার স্ববাসের সাধ্বী প্রায়ই অসাধ্বী হয়।[১৮] প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে বাবু সমাজের অমিতাচারের জন্য দায়ী ইংরেজি শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নয়, ইংরেজি বাণিজ্যের প্রসার।[১৯] মূলত ইংরেজি বাণিজ্যের প্রসারে উঠতি মধ্যবিত্ত আভিজাত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে ক্ষীয়মান সামন্ত পরিবেশকে গোঁজামিল দিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রাণন্তকর চেষ্টা করছে। বিদেশি বণিক শোষণে উৎক্ষিপ্ত সহজলভ্য ধনস্ফীতিতে এরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

নববাবু বিলাস প্রকাশের পঁচিশ বছর পর প্যারীচাঁদ মিত্রর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৮৮) প্রকাশিত হয়। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। নাগরিক

প্রতিবেশ থেকে লেখা কলকাতার ধনাঢ্য জমিদার বাবুর নষ্ট পুত্রের কাহিনি নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। নগর কলকাতার জীবন, বিপর্যস্ত গ্রামজীবনের অবশেষে, শহরতলীর বড় বড় মানুষ, পল্লিবাংলার বিপর্যস্ত চাষী, দেশী জমিদার, নীলকর সাহেব ও প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নগরী এককথায় গোটা ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিবেশ নানাভাবে স্পষ্টত পরস্পর অন্বয়ে যুক্ত হয়ে উপন্যাসের জীবনপট নির্মাণ করেছে।[২০] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের যেটা সত্যিকারের বাসনা ছিল তা হল ইংরেজের (উনিশ শতকীয় ইংরেজ) দেওয়া লেখাপড়া লিখে সৎ মানুষ হবার বাসনা।[২১] কিন্তু অতিদ্রুতই বাঙালির সে ভুল ভাঙে। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে মতিলাল পারিবারিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইচ্ছাশক্তিহীন একটি চরিত্র। তার ব্যক্তিসত্তা নেই। সে কেবল প্রতিবেশ বিক্ষিপ্ত বাসনাশক্তির একটি বিন্দুমাত্র, সমাজদেহে ছড়ানো বিষের ঘনীভূত বিষফোটক। মতিলালের অনুশোচনা ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নয়।[২২] তবে বাবুশ্রেণি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির খণ্ডাংশ মাত্র, সামগ্রিক রূপ নয়।

মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ফলে শিক্ষা ধর্ম রাজনীতি সমাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭-১৯), বাংলা প্রথম সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ* (১৮২০) প্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ নিবারণ আইন (১৮২৯) প্রভৃতি বাঙালি মধ্যবিত্তের জাগরণের ফল। আর উনিশ শতকের তিনজন যুগপুরুষ বাঙালির সংস্কারকে প্রাণময় করেছেন, স্থবির স্থানুকে করেছেন যৌবনদীপ্তিতে উজ্জ্বল রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)। এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। তিনি তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে বাংলা উপন্যাস রচনায় গতি আনলেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের আদর্শ ইউরোপ থেকে পেলেও তাঁর প্রেক্ষাভূমি ছিল ঔপনিবেশিক ভারত। ফলে উপন্যাসের কলাকৌশল এবং বিষয়গত বিবেচনায় বিশেষত পয়েন্ট অব ভিউ-এর বিচারে তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান এবং সামাজিক পরিস্থিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখছেন সেই সময় শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পেশাজীবী মধ্যবিত্ত আবার ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত। ফলে বঙ্কিমের অধিকাংশ পাঠক মধ্যবিত্ত সমাজের। তারা যেহেতু চাকুরিনির্ভর পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাই বঙ্কিম উপন্যাসের সামন্তবাদী চরিত্রকে সাদরে গ্রহণ করেছে। বঙ্কিম নিজেও চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিনিধি।[২৩]

বাঙালি মধ্যবিত্ত জন্মলগ্ন থেকেই অস্তিত্ব উন্মূলিত, শিকড় বিচ্ছিন্ন, বৃহত্তর দেশজ পরিপ্রেক্ষিত শূন্য। 'পরিবৃত্তিকালের সাহসী অভিযান এখানে লভ্য নয় : রবিনসন ক্রুশোর মত উপন্যাস লেখা হয় না

মধ্যবিত্ত চাকুরিনির্ভর বাঙালিদের জন্য, বরং সমাজ–অভিজ্ঞতা শূন্য কপালকুণ্ডলা সামাজিক পরিবেশে এলে কি হয়, তার চিত্রই বঙ্কিম আঁকেন অন্তঃতঃ উপন্যাসের সুব্যক্ত স্তরে; বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের অনুভবযোগ্য এ কাহিনি।'[২৪] সপ্তগ্রামের অধিবাসী এক মধ্যবিত্ত যুবক নবকুমার গঙ্গাসাগর তীর্থ করে ফেরার সময় সহযাত্রীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার পর বনের মধ্যে প্রবেশ করেন। এখান থেকেই কপালকুণ্ডলার (১৮৬৬) কাহিনির সূত্রপাত। সমুদ্রতীরস্থ এই বিজন বনভূমি উনিশ শতকের মধ্যবিত্তের স্বপ্নভূমি।[২৫] উপন্যাসের মূল চরিত্র নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, কাপালিক ও অধিকারী। ঐতিহাসিক চরিত্র জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসা। বনের মধ্যে পথ হারিয়ে সৌন্দর্যপিয়াসী যুবক নবকুমারের কপালকুণ্ডলার সাথে দেখা হয়। নবকুমারের জীবনের জটিলতার শুরু এখানেই। নবকুমার জানত এই গভীর অরণ্যে তার প্রাণনাশ হতে পারে। কপালকুণ্ডলা তাকে দেখে বলে 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'।[২৬] বিভ্রান্ত নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহযোগিতায় কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার পায়। এরপরই নবকুমারের সমাজে কপালকুণ্ডলার স্থান পাওয়া। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সমাজে স্থান পায় ঠিকই কিন্তু সেই অবরুদ্ধ সমাজ থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। যদিও উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা এবং নবকুমারের দাম্পত্য জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই তবে নবকুমারের প্রথম স্ত্রী মতিবিবির কূটকৌশলে তাদের দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাস আর সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কপালকুণ্ডলার অন্তরাত্মার সৌন্দর্যবোধ স্বাধীন পিয়াসী মন নবকুমারের বদ্ধ সমাজে গ্রহণীয় হতে পারে না। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বুঝতে পারে না কেননা বদ্ধ সমাজের রীতিনীতি তার অজানা। কপালকুন্ডলার জিজ্ঞাসা উক্তি বদ্ধ হিন্দু সমাজের কনভেনশন জালকেই ছিঁড়ে ফেলতে চায়, নবকুমার তথা বঙ্কিমের সময়কার মধ্যবিত্ত সৌন্দর্যচেতনা স্বাধীনতার জন্য সাময়িক উচ্ছ্বাসের ভিত্তিহীনতাকে স্পষ্ট করে তোলে।[২৭] নবকুমারের প্রাক্তন স্ত্রী পদ্মাবতীকে নবকুমার খুব সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে পারেনি। নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি যে অবিশ্বাস তা মূলত তার শ্রেণিজাত শিক্ষা এবং রুচি থেকে পাওয়া। তার যে সৌন্দর্যবোধ তা তৎকালীন মধ্যবিত্ত মননের সৌন্দর্যবোধ। কপালকুন্ডলা নবকুমারের বদ্ধ সমাজের জীবনাচরণ গ্রহণ করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত সে কাপালিকের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। নবকুমারের সন্দেহপ্রবণ মন শুধু একটি বিষয় জানতে চেয়েছে মৃন্ময়ী; কপালকুণ্ডলা...একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও– একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে গৃহে লইয়া যাই,[২৮] 'এ চীৎকার ব্যক্তি নবকুমারের যেমন, তেমনি বদ্ধ সমাজবদ্ধ মানুষের, বঙ্কিমের সময়কার মধ্যবিত্ত শ্রেণির'।[২৯]

নবকুমার শেষ পর্যন্ত জেনেছে কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী নয় কিন্তু জীবন দিয়ে এ জানার পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসে নবকুমারের সৌন্দর্য চেতনার অন্বেষণে ভেসে যাওয়া প্রতীকীমাত্র। মূলত উনিশ শতকীয়

মধ্যবিত্তের সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তন, বিপ্লবের সাথেই এই অন্বেষণ দৃঢ়তার সাথে যুক্ত। বঙ্কিম এই উপন্যাসে নিজ অভিজ্ঞতাকে নিজ সময় সমাজ সম্পর্কে ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছেন। আসলে তিনি মধ্যবিত্ত সত্তার ফাঁকি থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন।[৩০]

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) উপন্যাসে গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। শিক্ষিত চরিত্রবান জমিদার নগেন্দ্রনাথ। সূর্যমুখীর সাথে সুখী দাম্পত্য জীবন। কিন্তু কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর আগমনে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে, কুন্দর প্রতি আসক্তি থেকেই সে সূর্যমুখীকে বলে 'তোমাতে আমার সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী।'[৩১] তিনি আরো বলেন 'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি মদ খাই। আর পারি না ... শুণ কুন্দ তোমাকে বিবাহ করিব।'[৩২] অবশেষে সূর্যমুখীর সহায়তায় কুন্দর সাথে তার বিয়ে হয়। সূর্যমুখী বিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রর যথার্থ অনুতাপ হল, কুন্দনন্দিনীকে তার অসহ্য মনে হল। কুন্দকে ত্যাগ করে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরতে লাগল। নানা ঘটনার পরম্পরায় সূর্যমুখীর সাথে তার মিলন হয়। স্বামী সংসার বর্জিত কুন্দনিন্দিনী অভিমানে আত্মহত্যা করে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল সংযমের অভাবে সুস্থ জীবন কীভাবে ভেঙ্গে যায় তার একটি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি উপস্থাপন করা।[৩৩] বঙ্কিম যে সময় উপন্যাসটি লিখেছেন ততদিনে মধ্যবিত্তের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজ সমাজের আত্মিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। 'বাবু' শ্রেণির অমিতাচার অনেকটাই কমে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সুফলের অংশীদার আবার তার সমালোচক :

> ব্রিটিশ শাসনের কৃতিত্বের সঙ্গে হিন্দুতত্ত্বের সংমিশ্রণই হয়তো তাঁর কাম্য ছিল–ইউরোপীয় সভ্যতা, ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি ও বাঙালি মধ্যবিত্ত বাস্তব–এই তিনটাকেই তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন। স্থিতি চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর জীবনদৃষ্টিতেই ছিল দ্বন্দ্ব। ঔপনিবেশিক বদ্ধতা ও ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে চিন্তাগত যোগের মুক্তি এই দুইই যেমন তাঁর ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি তাঁর উপন্যাসের গঠনেও দ্বিধা দেখা যায়। বিষবৃক্ষের মত মুক্ত অভিজ্ঞতার উপন্যাস তাই চূড়ান্ত পরিণতিতে তিনি জোর করে রুদ্ধ করে দিলেন। ফলে উপন্যাসের প্রথমাবধি ঘটনা সংগঠন, উপন্যাসের মূল চরিত্রদের অভিজ্ঞতার ক্রমব্যাপ্তির ছকটি শেষে গিয়ে ভেঙ্গে গেল; যেমন ভেঙ্গে যায় বাঙালী মধ্যবিত্তের পঙ্গু ইতিহাস, হিগেমনি সৃষ্টি করতে না পারার চূড়ান্ত করুণ ব্যর্থতায়।[৩৪]

কলকাতাকে কেন্দ্র করে জমিদারদেও নেতৃত্বে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান হয়েছিল। উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ছিল শাসকের প্রতি অনুগত। কেননা ইংরেজ শাসক এ শ্রেণিকে দিয়েছিল আধুনিক জ্ঞান, শিক্ষা, উন্নত জীবন। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এ সময় জাতীয়তাবাদী মনোভাব জেগে ওঠে। বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* (১৮৮৪), *সীতারাম* (১৮৮৭), *দেবী চৌধুরানী* (১৮৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী ভাবনা আছে। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে একদিকে পরাধীনতার বেদনায় স্বাধীন হবার জ্বলন্ত

আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে উল্টো ইংরেজ প্রশস্তি। এই আপাত বৈষম্যমূলক আপোষধর্মীতা সে যুগের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির মানসচরিত্র।[৩৫] *আনন্দমঠ* উপন্যাসে যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল তা বঙ্কিমের স্বশ্রেণিজাত। এক সময় এই গ্রন্থের হিন্দু ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সহিংস জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণাই বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির অনুশীলন হয়ে উঠেছিল।[৩৬] পরবর্তীকালে *আনন্দমঠের* ধর্মযুক্ত সামন্তবাদী দেশভক্তির অনল উচ্ছ্বাস মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্যক্তির মূল্যায়ন আছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ থেকেই তো উপন্যাসের যাত্রা শুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুর্জোয়া উদারনীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে সামন্তবাদী মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) *সংসার* (১৮৮৬) উপন্যাসে শরৎ ও হেমচন্দের ভবিষ্যৎ চিন্তামূলক কথোপকথনের মধ্যে সে সময়ের মধ্যবিত্তের কলকাতা চিন্তার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়– শরৎ- এর বক্তব্য 'আপনারা কলকাতায় আসুন, আপনারা কি চিরকাল গ্রামেই বাস করবেন।' হেমচন্দ্রের বক্তব্য অনুরূপ 'কলকাতা অতি মহৎ স্থান'।[৩৭]

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস *কাহাকে* (১৮৯৮), *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৯)। *কাহাকে* উপন্যাসে শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্তের চিত্র পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষিত নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচিত।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বাংলা উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার। *নয়নতারা*, *যুগান্তর (১৮৯৫)*, *মেজবৌ* (১৮৮০) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সাংসারিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। *মেজবৌ* উপন্যাসের মূল চরিত্রে প্রমদা। নিশ্চিন্দপুর গ্রামের মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ। তার স্বামীর ওকালতিতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সুশ্রী গৃহনিপুণা রুচিশীল প্রমদার সংসারের প্রতিটি মানুষের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব। সংসারে শান্তি ও স্বস্তির জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু রোগ শোকে জীবনের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। *মেজবৌ* উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন প্রভৃতি বিষয় যুগপৎভাবে এসেছে। উনিশ শতকের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। 'ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের সূচনা হয়,[৩৮] আর এই নবজাগরণ হয়েছে মূলত কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে। নতুন স্কুল কলেজ

স্থাপিত হয়েছে, বিদ্যসাগার প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন চলেছে, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যেগে নেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে উনিশ শতকের নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

শিবনাথ শাস্ত্রী *যুগান্তর* উপন্যাসে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সংগ্রামকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিন্ধ্যবাসিনী। শিক্ষিতা এই নারীর বিয়ে হয় কুলীন পাত্র চারুচন্দ্রের সঙ্গে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে সে বিধবা হয়। বিধবা হয়ে কলকাতায় এসে কৃপাময়ী বিধবাশ্রমে শিক্ষকতা শুরু করে। বিন্ধ্যবাসিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক নারীজাতির শিক্ষা ও সংযমের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সময়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংশ্লেষণে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজবোধ। নারী পুরুষের সম অংশীদারিত্বে এগিয়ে চলে সমাজ। *নয়নতারা* (১৮৯৯) উপন্যাসে নারীশিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। উচ্চবিত্ত পরিবারের কন্যা নয়নতারা এবং নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক হরেন্দর বিয়েতে আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত বাকি জীবনটা নয়নতারা মুঙ্গেরে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে আর হরেন্দ্র কলকতার এক কলেজে শিক্ষকতা করেছে। এখানে প্রেমে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্ব, ও আভিজাত্য। প্রাধান্য পায় মেকি অহমিকাবোধ যা মধ্যবিত্তের একমাত্র সম্বল।

বঙ্কিমরচনার অনুসারী তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯২) পেশায় ছিলেন ডাক্তার কিন্তু সাহিত্যের রসসিঞ্চনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে তিনি কর্মসূত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। *হরিষে বিষাদ (১৮৮৭), অদৃষ্ট (১৮৯২), স্বর্ণলতা* (১৮৭৪) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *স্বর্ণলতা* উপন্যাসে যে সমাজজীবনের কথা বলা হয়েছে সেই সমাজজীবন সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গৃহস্থ জীবনের, নগরের বুদ্ধিজীবী সমাজের নয়।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যে বিপুল প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছিল। মহাকাব্য ব্যতিত সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ বিচরণ। বাংলা উপন্যাস তাঁর তাঁর আপন প্রতিভায় হয়েছে অনন্য।

তিনি যখন উপন্যাস লিখেছেন ততদিনে উপন্যাসের একটা সুস্থির অবয়ব তৈরি হয়েছে। মধ্যযুগীয় চিন্তা, চেতনা থেকে বেরিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের বিকাশ ঘটেছে। আর এই ব্যক্তির মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধে সঞ্চারিত হয়েছে। নবজাগরণের ছোঁয়ায় ব্যক্তিচেতনার জাগরণ ঘটেছে। মধ্যবিত্তের মানস ভাবনার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সামন্তবাদী চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে পুঁজিবাদী ভাবনায় উত্তরণ ঘটেছে। ঠিক এই সময়সংক্রান্তিতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা এবং অস্তিত্ব সংকটের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। সমালোচক নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের জীবন যদিও অভিজাত পরিবারে, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে আভিজাত্য ও সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে তাহা হইলেও তাঁহার মনন-কল্পনা আশ্রয় করিয়াছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এই অভিজাত পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত পালিত হইয়াও তাঁহার নিজের মন রস আহরণ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজ মানস হইতে। প্রিয়নাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশায় হইতে আরম্ভ করিয়া সতীশচন্দ্র সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিত চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রভৃতি তাহার সকল বন্ধু সুহৃদ সকলই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। ... এই মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ, দুঃখ, অন্তর ও বাহিরের বিচিত্র সরু মোটা দ্বন্দ্ব কলহ ও আনন্দ কোলাহল, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বিষাদ, আদর্শের বিরোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।[৪০]

দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনায় বিচলিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সুবেদী সুস্থিত জীবনবোধ।[৪১] মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গতা, নৈরাজ্যমুখিতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে এসেছে। মধ্যবিত্তের পরিব্যাপ্তি বিশাল। নাগরিক অভিজাত থেকে একজন কেরানি এর পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসের মহেন্দ্র বিনোদিনী, *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসের মধুসূদন প্রভৃতি চরিত্রে দাম্পত্য নিঃসঙ্গতা এসেছে। *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) উপন্যাসের শ্রীবিলাশ, *গোরা* (১৯২৯) উপন্যাসের গোরা, *শেষের কবিতার* অমিত নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন নায়ক। আর এই নিঃসঙ্গতার বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয় শিল্প বিপ্লবের পরে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার শ্রমবোধ থেকে, তার বিশ্রাম থেকে নিজের গোষ্ঠী থেকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাতিস্বিক সত্তা থেকে, তার প্রেম আর অনুরাগের অনুভূতি থেকে।[৪২] রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই শুধু নয়, তাদের জীবনভাবনাও বিদ্যমান। *শেষের কবিতা* উপন্যাসে শিক্ষিতা সুন্দরী ব্যক্তিত্বময়ী লাবণ্য, তার পিতা কলেজের অধ্যক্ষ অবিনাশ দত্ত সকলেই মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র। বিপত্নীক অবিনাশ দত্ত সাতচল্লিশ বছর বয়সে এসে এক বিধবা নারীকে ভালবেসে ছিলেন। লাবণ্য সেই ভালবাসাকে সম্মান জানিয়ে তাদের বিয়ে দেয় জোর করে। বাবার পূর্নবার বিয়ের পর সে সিদ্ধান্ত নেয় পৈতৃক সম্পত্তির কিছুই নেবে না এবং স্বাধীনভাবে উপার্জন করবে। যোগমায়া দেবীর কন্যা সুরমাকে পড়ানোর মধ্য দিয়ে সে স্বাধীন

উপার্জনের পথ পেয়ে গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনেক আগে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারীর স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষকতা পেশাকে পছন্দ করেছিলেন। আসলে 'সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতা, নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্ররাই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত।'[৪৩]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এদেশে ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র সহাবস্থানে চলেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নব্য জমিদার তৈরি হয়েছিল সেই জমিদারের আয়ের উৎস ছিল গ্রামের জমিদারি, শহরে তারা বিলাসী জীনযাপন করতো, তাদের বিলাসের যোগান দিত গ্রাম। ফলে গ্রামগুলি রিক্ত, শূন্য হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে কলকাতার নাগরিক সমাজের একটা অংশ ছিল শিক্ষিত চাকুরীজিবী মধ্যবিত্ত, আরেকটা অংশ ব্যবসায়ী যারা শিক্ষার চেয়ে বিত্তের দিকে আগ্রহী। পাশ্চাত্য প্রভাব এই দুটো শ্রেণিকে সমভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশ শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বাংলার যে নবজাগরণ হয়েছে, বিশেষত সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে জাগরণ, শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় এগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সাথে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী গ্রামীণ সমাজ দেখেছিলেন। ফলে তাঁর মানসগঠনে এবং উপন্যাসে এসব বিষয় যুগপৎভাবে এসেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজ জাত-পাতের দ্বন্দ্বে, বর্ণাশ্রমের কঠিন কাঠামোতে এবং রক্ষণশীলতায় পিষ্ট। তিনি নিজেও এই সমাজের অংশ। ফলে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার প্রভাবপুষ্ট নাগরিক মধ্যবিত্ত যখন সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত করেছে শরৎচন্দ্র পুরোপুরি তার সাথে একাত্ম হতে পারেননি। এক অর্থে বঙ্গীয় নবজাগরণের দ্বিধার তিনি উত্তরাধিকারী।[৪৪] স্বশ্রেণিজাত সংস্কারের সংকট থেকে তিনি বের হতে পারেননি। যার কারণে তাঁর উপন্যাসে বিধবাদের প্রাধ্যান্য আছে কিন্তু বিধবা বিবাহের সফলতার গল্প নেই। বিধবা বিবাহ নিয়ে মধ্যবিত্তের দোলাচল বৃত্তি আছে কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণের গল্প নেই। তাঁর জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে, মধ্যবিত্ত পাঠকের বৃহদংশ তিনি যে বিধবা বিবাহ দিলেন না শ্রেণিগতভাবে তারা সেটাই চেয়েছে। অথচ বিধবাদের জন্য করুণাও তারা চায়।[৪৫]

শরৎচন্দ্র প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি আভিজাত্য ও উচ্চবিত্তের মূল্যবোধ ভেঙে দিয়ে গ্রামীণ মধাবিত্তের জীবনচিত্র নির্মাণ করলেন। বালবিধবা, পতিতা, নারীর প্রেম, কৌলিন্য প্রথার কুফল, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এসব ছিল মধ্যবিত্তের জন্য বড় সমস্যা। *অরক্ষণীয়া* উপন্যাসে দরিদ্র ঘরের কুমারী মেয়ের বিয়ের সমস্যা, *বামুনের মেয়ে* উপন্যাসে কৌলিন্য প্রথার দোষে একটি

মেয়ের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরে প্রিয়নাথের একমাত্র কন্যার বিয়ের সমস্যা এখানে মূল সমস্যা।[৪৬] *পল্লীসমাজ* (১৯১৬) উপন্যাসে স্পষ্টভাবে মধ্যস্বত্বভোগীর চিত্র আছে যারা কর্মহীন, অলস এবং নানান ফন্দিফিকিরে কৃষক-প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে। *দেনা পাওনা* (১৯২৩) উপন্যাসে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী, *বিপ্রদাস* উপন্যাসে বিপ্রদাস ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। প্রজার স্বার্থের চেয়ে অর্থোপার্জন তাদের মূল লক্ষ্য।

পথের দাবী (১৯২৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী অপূর্বর দৃষ্টিতে ভারতের নাগরিকদের দুঃখ দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৭] এই উপন্যাসে পরাধীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবচিত্তের উগ্রতাকে লেখক সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছেন।[৪৮] এছাড়া নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রসঙ্গ আছে *গৃহদাহ* (১৯১০) উপন্যাসে। অচলা মহিমের দাম্পত্য জীবনে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। শহরে বেড়ে ওঠা অচলা যখন বিয়ের পর মহিমদের বাড়িতে গিয়েছে তখন গ্রাম সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ হয়েছে। মহিমের এই কদর্য গৃহে জীবন যাপন করিতে হইবে উপলব্ধি করিয়া তাহার যে বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল।[৪৯] *পথের দাবী* উপন্যাসে ব্রজেন্দ্র সব্যসাচীর পরিবর্তে নিজেকে নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে চায়; শেষ পর্যন্ত তাকে ব্রিটিশ পুলিশের 'ইনফরমার' হিসেবে কাজ করতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকের মানসিক দ্বন্দ্ব ঐ চরিত্রে প্রতীয়মান। মধ্যবিত্তের সত্তাবিচ্ছিন্নতা এসেছে কেদারবাবুর মধ্যে। ব্রাহ্ম বলেই তিনি আত্মীয় বিচ্ছিন্ন। গ্রামের সাথে শেকড়ছিন্ন শহুরে জীবনে অভ্যস্ত। সুরেশ পিতৃমাতৃহীন শেকড়শূন্য মধ্যবিত্ত যুবক। *গৃহদাহ* উপন্যাসের মূল বিষয় সুরেশ, অচলা, মহিমের প্রেম বা অচলার দোলাচলবৃত্তি নয়, মূল বিষয় নাগরিক অচলার ভারতবর্ষের গ্রামের সম্মুখীন হওয়া।[৫০] এছাড়া ঔপন্যাসিক মহিম মৃণালের প্রাচীন গ্রামকেন্দ্রিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অচলা-সুরেশের নাগরিক জীবনাদর্শের পাশে রেখেছেন।[৫১] মহিম ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ মধ্যবিত্তের উদারনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে অচলাকে পল্লিগ্রামের জীবনস্পন্দনের সাথে মেশাতে চেয়েছিল। কিন্তু সুরেশের উন্মত্ত লোভ অচলার ক্ষেত্রে তা হতে দেয়নি।[৫২] ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের ভাবালুতাকে উপন্যাসে প্রাধ্যান্য দিয়েছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসের মূল পাঠক মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা এবং যুদ্ধোত্তর জীবনভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। সমরপূর্ব ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনের কিংবা নাগরিক জীবনের সাধারণ জীবনচিত্র পাওয়া যায় কিন্তু সমরোত্তর ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতা লক্ষণীয়। বিচ্ছিন্নতা, যৌনবিকৃতি, বিকারগ্রস্ততা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা এ সময়ের উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রথম সমরোত্তর অবক্ষয় ও প্রত্যয়ভঙ্গের পটভূমিতে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর (১৮৮২-১৯৬৪) আর্বিভাব। 'মানুষের মানসিক অসুস্থতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বরূপের(Dark Nature) বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম সচেতন প্রকাশ ঘটে।[৫৩] যৌন মনস্তত্ত্বের উগ্রতা প্রকাশের কারণে তিনি সমকালীনদের থেকে পৃথক । বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন ও মনের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। সংসারে প্রতিদিনের কদর্যতা, যৌনজীবনের জটিলতা, সমস্যাসংকুল জীবন থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিভাস তাঁর উপন্যাস। কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠীর অগ্রজ এই লেখক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে অবিসংবাদী। যেমন *শুভা* উপন্যাসে শুভা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রমণী। বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন, স্বাধীনতাহীন দাম্পত্য জীবনের ক্লেদাক্ততা থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল। নিবারণের সাথে দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন করেছে, নিবারণের ভালোবাসাহীন আধিপত্য তার মধ্য থেকে বাঙালি নারীর সংস্কার ভেঙে দিয়েছে। সে বলেছে :

> 'বেশ্যাবৃত্তিতে এত ভয়ের কথা কি?
> অন্য উপায়ে যদি জীবিকা অর্জন না হয় তবে শরীর বেচিয়া খাইলে এমন কি অপরাধ।[৫৪]

ঘর ছেড়ে সে নগেনের গৃহসঙ্গী হয়েছে, নাটকের অভিনেত্রী হয়েছে, সবশেষে হাসপাতালের সেবিকারূপে স্থিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা, তীব্র আর্থিক চাপ, ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ প্রভৃতি কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীদের বাইরে বের হওয়ার পথ তৈরি করেছিল। দেহের তীব্র কামনাবহ্নি মধ্যবিত্ত সংসারের শান্ত সংযত বিধবা নারীজীবনকে কিভাবে দগ্ধ করেছে *বিপর্যয়* (১৯২৪) উপন্যাসে তার চিত্র আছে। মনোরমার অকাল বৈধ্যব্যের সংযত জীবন তার অবচেতন মনের দাবিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অমলকে বিয়ে করে অচরিতার্থ যৌবন তৃপ্ত করেছে।[৫৫] *পাপের ছাপ* উপন্যাসে মেঘনাদ নামক এক মধ্যবিত্ত যুবকের অবচেতন মনের নিষিদ্ধ যৌন সম্ভোগচেতনা এবং বাস্তব সচেতন বিবেকশাসিত মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্তের সমস্যা সঙ্কুল, গ্লানিকর জীবনচর্যার বিবরণ *পাপের ছাপ* উপন্যাস। মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, বিকৃতি, কদর্যতা নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫), *আর্বত* (১৯৩৭), *মোহনা* (১৯৪৩) ত্রয়ী উপন্যাস মধ্যবিত্তের মানস সংকট জীবনের দ্বান্দ্বিকতার বিবরণ। উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু অন্তর্মুখী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি। তিনি সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্তের নীতিহীনতা ও ভণ্ডামির পরিবেশে একাত্মতা খুঁজে পান না।[৫৬] স্ত্রী সাবিত্রীর সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব যোজন যোজন। স্ত্রীর সন্দেহপ্রবণ মনের কাছে খগেনবাবু ছিলেন অসহায়। স্ত্রীর আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুতে খগেনবাবু মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। এই মৃত্যুর পর রমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। এই ঘনিষ্ঠতা বা রমলার প্রতি আকর্ষণ তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে তিনি আত্মসমীক্ষা ও আত্মপলব্ধির প্রেরণায় পরিচিত সমাজ

সংসার ফেলে কাশীতে মাসিমার কাছে চলে যান। খগেন আত্মবিচ্ছন্ন মানুষ। মূলত সমাজ বিকাশের বহুমাত্রিক জটিলতা ও ঔপনিবেশিক শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি জন্মলগ্নেই দেশজ সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য থেকে আপন সত্তা থেকে হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত।[৫৭] খগেনের বিচ্ছিন্নতার আঁধারে নিমজ্জিত হওয়া, সাবিত্রীর প্রতি দায়িত্ব গ্রহণে অনীহা সমকালীন মধ্যবিত্ত মানসের বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা বিভঙ্গতার প্রকাশ। খগেন-রমলার কথোপকথনে খগেনের পড়ুয়া মননের পরিচয় পাওয়া যায় :

> রমলা: আচ্ছা ছেলেবেলা থেকে খুব পড়াশুনা করতেন বুঝি?
> খগেনবাবু: করতাম, স্কুলে পাঠ্যপুস্তক ভাল লাগত না, পড়তাম বাজে বই, যা পেতাম তাই।.. ..আমাদের সময় ধর্মঘট ছিল না। লেকচার শুনতাম নির্বাচন করে। বাকি সময়টা আড্ডা আর আড্ডা, তারপর গভীর রাতে পড়া। পাগলের মতো পড়তাম, বই কিনতাম আর পড়তাম, বই এর সঙ্গে ফাঁকি দিইনি। মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখতাম ও করতাম [৫৮]

খগেন নারী সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে। তবে তার নারীবিদ্বেষী মন রমলার প্রতি মুগ্ধ হয়েছে। ঔপন্যাসিক খগেন সম্পর্কে বলেছেন, একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল।[৫৯] *আবর্ত* উপন্যাসে রমলাকে নিয়ে তিনি মানসিক টানাপোড়েনে ভুগেছেন। জীবনের তাৎপর্য খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

> খগেন intellectual gaint মোটেই নয়, এ যুগের intellectuel type মাত্র, যার মননক্রিয়া বিশ্বযুদ্ধ নয়; স্মৃতিও ভাবমিশ্রিত।[৬০]

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহনা উপন্যাসে তথাকথিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী খগেনকে কাহিনির কেন্দ্রে এনে লেখক মানবজীবনের অন্তর্মুখী, আত্মদহনক্লিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী খগেনকে অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান সবকিছুতেই পরিভ্রমণ করিয়েছেন।

বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে পড়েছিল। ফলে সুজলা সুফলা গ্রামজীবনে সবার অলক্ষ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি বিষয় অবিভক্ত বাংলার গ্রাম, শহর, শহরতলির মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন এনেছিল। এইসব সংকট সমকালীন ঔপন্যাসিকদের কলমে মূর্ত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণদের কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা আছে।

বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশক থেকে বাংলা উপন্যাসে ঢুকে পড়ে ইউরোপীয়সহ নানা দেশের ভাব ও হাওয়া। মধ্যবিত্ত রুচি বদলের সাথে সাথে শোপেন হাওয়ার, নিটশে, ফ্রয়েড, মোপাসাঁ, হামসুন,

যোহান বোয়ার, পিরানদোল্লা, আঁদ্রে জিদ প্রমুখ লেখকদের প্রেরণায় উদ্দীপিত হলেন লেখকরা। ফলে উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন-ভাবনার বিবরণে অবধারিতভাবে ঢুকে পড়ল নানা ধরনের তত্ত্ব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) অধিকাংশ উপন্যাস গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক, তাঁর উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্তের উপস্থিতি খুবই সামান্য। কেননা 'নগর জীবনের উপন্যাস তিনি যখন লিখেছেন তখন ব্যর্থই হয়েছেন। গ্রাম তিনি যতটা চিনতেন, নগর ততটা চিনতেন না।'[৬১] *সপ্তপদী* উপন্যাসে কালাচাঁদ ওরফে কৃষ্ণেন্দু, *উত্তরায়ণ* উপন্যাসে রতন চরিত্রে নাগরিক মধ্যবিত্তের উদারনৈতিক সংস্কারহীন মানসিকতার পরিচয় মেলে। *বিচারক* (১৯৫৭) উপন্যাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একজন সুপ্রতিষ্ঠিত বিচারক। প্রেমিকার প্রতি দুর্বলতার কারণে অগ্নিদগ্ধ স্ত্রীকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় শৈথিল্য দেখা যায়। জীবন সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাভাবনা পোষণ করলেও সে পরবর্তীকালে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছে। স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ স্মৃতি সারাক্ষণ তাকে তাড়া করেছে। আইন বিষয়ে বিচক্ষণতা ও প্রণয়িনীর প্রতি দুর্বলতা ছাড়া তার আর কোন মানবীয় গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজজীবন, গোষ্ঠীজীবনে বিভক্ত বাংলার আদিবাসী বা আন্তবাসী জনসাধারণকে অবলম্বন করে তাঁর কাহিনি বয়ন সার্থক হয়েছে।[৬২] নাগরিক মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক যন্ত্রণার চিত্রভাষ্য তাঁর উপন্যাসে অনুপস্থিত হলেও মধ্যবিত্ত মননকে তিনি স্পর্শ করেছিলেন।

'এক অসুস্থ ও অস্থির যুগের স্থির ও প্রাজ্ঞ প্রতিনিধিরূপেই বাংলা উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) আর্বিভাব।'[৬৩] মানিক সমসাময়িক সময় এবং সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্তের জীবনভাবনার রূপ দিয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কিন্তু এই ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবনকে তিনি যতই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন ততই এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোশপরা হীনতা স্বার্থপরতা মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।[৬৪] মধ্যবিত্তের মেকি ছলচাতুরি, ভণ্ডামির মুখোশ তিনি খুলেছেন। *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে প্রমীলা বিমল শান্তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক দুর্গতি, হতাশা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে জীবন-যাপন করেও শেষ পর্যন্ত তারা নিজের নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নিতে চায়; আলাদা আলাদাভাবে বায়বীয় জীবনের অর্থ খোঁজার মধ্য দিয়ে নিজেদের আচ্ছন্ন রাখেন।[৬৫] *জীবনে জটিলতা* নামটি বিদ্রূপাত্মক, রচনাভঙ্গি বিদ্রুপাত্মক। সংকটগ্রস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি নৈরাশ্যগ্রস্ত জীবনের বিদ্রূপাত্মক ছবি।[৬৬] অর্থাভাবে কখনো কখনো মানুষ মানসিক পঙ্গুত্ব মেনে নেয়। বিমল সেরকমই যুবক-অর্থাভাবে বোনের মাকড়ী চুরি করে কিন্তু প্রেমিকার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিতে তার অহমিকা বোধে

বাধে। সে চাকরির প্রত্যাশায় বোনের প্রেমিকের পেছনে ঘুর ঘুর করে। ট্রামে উঠে কন্ডাকটরকে ভাড়া না দিয়ে মনে মনে ভাবে যে সে সত্যি চারটা পয়সা উপার্জন করেছে। তবে বিমল মানুষের অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করে আনন্দ পায়। শান্তার স্বামী বিকারগ্রস্ত চরিত্র, সে বিমল শান্তার প্রেমের কথা জানতে পেরে অস্বাভাবিক স্ত্রৈণ আচরণ করে। মানসিকভাবে শান্তাকে নিপীড়ন করে আনন্দ পায়। সে শান্তাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করে। বিমল শান্তাকে বাঁচাতে পারে না। কলকাতার যে মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে বিমল বেড়ে ওঠে সেখানে ভালবাসার ইতিবাচক মানে সে খুঁজে পায় না। শান্তার সাথে তার যে প্রেম তা মনোদৈহিক বিচিত্র বিকারের প্রকাশ।[৬৭]

অহিংসা উপন্যাসে সদানন্দ নৈতিকতার বিচারে শৃঙ্খলহীনতার পরিচয় দিয়েছে। বিপিন ব্যবসায়িক স্বার্থে রাধাই নদীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। সেই আশ্রমের গুরুজী সদানন্দ–'দেবতার মতোই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে।'[৬৮] সদানন্দ ঠক, ভণ্ড, ধর্ষকামী প্রতারক। তার কামুক মন সর্বদা আশ্রমে আশ্রিত মাধবীলতাকে কামনা করেছে। যৌন অবদমনের প্রচণ্ড চাপে সে মাধবীলতাকে ধর্ষণ করে। এই অপরাধবোধ থেকে সে অস্তিত্বের সংকটে ভোগে। ভূপতির মাধবীকে বিয়ে করাতে সে বিচলিত হয়েছে। নৈতিক স্খলনের দায়ে আশ্রম থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। এরপর ও অনিয়ন্ত্রিত অবদামিত কামনা বহ্নির তাপে সে মাধবীকে আবারও ধর্ষণ করতে চেয়েছে। কৌশলে উত্তেজিত জনতাকে লেলিয়ে দিয়ে ভূপতিকে হত্যা করেছে। পরিশেষে মাধবীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে নিজের চারপাশের কৃত্রিম আচরণ তৈরি করেছে। নৈঃসঙ্গিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে যৌনতার আশ্রয় নিয়েছে। সদানন্দ আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তিসর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানুষ। সদানন্দ চরিত্রের সাথে সমরেশ বসুর *স্বর্ণপিঞ্জর* উপন্যাসের পীযূষের সাদৃশ্য আছে। দুজনেই বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা এবং বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পেতে যৌনতাকে আশ্রয় নিয়েছে। বিপিন, মহেশ মধ্যস্বত্বভোগী মানুষের ধর্মবোধ ও দুর্বলতাকে পুঁজি করে ব্যবসা করেছে। বিপিন নিজেও মাধবীর প্রতি গোপন তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখে। বিভূতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক। নিজের শিক্ষা এবং রুচি থেকে সে সদানন্দকে প্রণাম করতে চায়নি। মাধবী সদানন্দের পাশবিক নির্যাতনে জীবনের স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। বিভূতির সাথে দাম্পত্য জীবনে সে সুখী হতে পারেনি। সদানন্দের বিকারগ্রস্ততা তাকে বেশি আর্কষণ করেছে। সে বার বার সদানন্দের কাছে যেতে চেয়েছে। তার মননের দ্বিচারিতা এখানে প্রকাশিত। প্রতিটি চরিত্রই জৈব অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছে। *চতুষ্কোণ* উপন্যাসে রাজকুমারের যে সংকট ও জিজ্ঞাসা তা কিন্তু বিকৃত মানসিকতাজাত নয়, উদগ্র যৌনবিভাবও নয়, বলা যেতে পারে প্রচলিত সমাজ ও মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ

খায় না এমন এক বিচ্ছিন্ন, বৃত্তের সম্পর্কশূন্য ব্যক্তির নিজেকে ও পরিপার্শ্বকে আবিষ্কারের চেষ্টা, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অন্বিত করার প্রয়াসই এ উপন্যাসে চিত্রিত।[৬৯] রাজকুমার বিচ্ছিন্ন নায়ক। চারকোনা ঘরে নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করেছে। 'নিজের চারকোনা ঘরে চারকোনা খাটে রাজকুমার চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে আর উত্তেজিত চিন্তায় ছুটাছুটি করে তার মন।' রাজকুমার ব্যতিক্রম চরিত্র। মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাস্রোতের সাথে তার চিন্তা খাপ খায় না। সে গিরির হার্টের স্পন্দন অনুভব করতে তার বুকে হাত দেয়। সরসীর নগ্ন দেহ দেখার আগে সব নারীকে তার গিরির জাতের জীব মনে হয়। নিজের মানসিক আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে সে নিজেকে চিনতে পারে যখন সে ধাক্কা খায়। শেষ পর্যন্ত সে শহুরে মধ্যবিত্তের অস্বাভাবিকতা, অবসাদকে জয় করে বলেই মানসিক রোগী রিনিকে বিয়ে করে। রাজকুমার শেষ পর্যন্ত সুস্থ জীবন প্রত্যয়ে বিশ্বাসী। 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবার কারণে বিংশ শতাব্দীতে এসে মধ্যবিত্তের এই বিচ্ছিন্নতা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। সময়ের এ পটে সমাজমানসের সকল বন্ধন ছিঁড়ে ব্যক্তিমানস হয়ে পড়েছে আরো বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ'।[৭০] *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) উপন্যাসে হেরম্ব বিচ্ছিন্ন নায়ক। প্রেমের সান্নিধ্যে এসে দুই নিঃসঙ্গ মানব মানবী গড়ে তুলতে পারে সঙ্গতার যে সোনালি ভুবন, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের সমাজ থেকে ক্রমে অপসৃত হয়ে গেছে সে সম্ভাবনা।[৭১] হেরম্ব এক বিন্দুতে স্থিত না। হেরম্বের ভিতরে আছে এক প্রবল শক্তি যা তাকে অনবরত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অপরকে প্রবল আকর্ষণ করে। হেরম্ব টেনেছে সুপ্রিয়া ও আনন্দ দুই নারীকে।[৭২] স্ত্রীর মৃত্যুতেও সে ব্যথিত না। তবে হেরম্বর কাছে আনন্দ শেষ পর্যন্ত শিল্পবোধ, পূর্ণতাবোধ আর অভিমানী ভালবাসা। মধ্যবিত্তের সুক্ষ্ম জীবনবোধ রূপায়ণের কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় মধ্যবিত্তের রূপকার।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে গাওদিয়া গ্রাম নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরে কিন্তু ঔপনিবেশিক নগর এক অলক্ষ্য ছায়ার মত সেখানে লেগেই থাকে।[৭৩] শশী আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত যুবক। আদর্শের কারণেই গ্রামে এসে ডাক্তারি করছে। শহরে দুদণ্ড থাকতে পারে না এই সব অশিক্ষিত নরনারীর প্রতি ভালবাসার টানে। শশী শত চেষ্টা করেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর মনে বৈজ্ঞানিক চেতনার সঞ্চার করতে পারে নি; যুক্তির আলোয় স্নাত করতে পারেনি। প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত, কল্পনা-চিন্তা নিয়ে খেলায় নিরত, ধরাবাধা জীবনের সীমানা লঙ্ঘনে পরান্মুখ শশী তীব্রভাবে তিরস্কৃত হয়েছে নায়িকা কুসুমের কাছে।[৭৪] শশী কুসুমের প্রেমে সাড়া দিতে পারেনি মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা থেকে। কুমুদ বোহেমিয়ান মধ্যবিত্ত যুবক। দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছন্নছাড়া এই যুবক শেষ পর্যন্ত মতিকে নিয়ে নিজের মত করে বেঁচেছে।

উপন্যাসে স্বল্প পরিসরে নন্দলালের উপস্থিতি। মধ্যবিত্তের ফাঁকি, রহস্যময়তা সবই আছে তার চরিত্রে। গাওদিয়ার বিন্দুকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, রক্ষিতা করে রেখেছে।

শহরতলী উপন্যাসে তিনটি সামাজিক স্তরবিন্যাস আছে। সমাজের উচ্চস্তরে রয়েছে সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, মধ্যবিত্ত শ্রেণিপ্রতিনিধি সত্যপ্রিয়ের প্রচার-বিভাগের পরিচালক জ্যোতির্ময়। নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে যশোদা। সত্যপ্রিয় ভণ্ড প্রতারক, আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সহৃদয় ভালোমানুষ। জ্যোতিমর্য়ের বিয়েতে নকল নেকলেস মখমলের বাক্সে উপহার দেয়। জ্যোতির্ময় আনন্দে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়। তবে যশোদা বুঝতে পারে 'যে ঐ ধুরন্ধর মানুষটি নরহত্যার থেকেও নৃশংস কাজ করতে পারে তাই তাকে তোষণ করা মধ্যবিত্ত মানুষের সংস্কার। যশোদা সেই সংস্কারে বিশ্বাসী নয়।'[৭৫] সত্যপ্রিয়কে খুশি করানোর জন্য অর্ধেক বয়সী একটি অপরিণত মেয়েকে জ্যোতির্ময়ের জীবনসঙ্গী করাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। যশোদা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছে :

> ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষী মুজুর যারা ঘেন্না করে, বড়লোকদের পা চাটে, ন্যকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামাকাপড় পরে, আরাম করে খেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না মেনে সবজান্তা হয় ...[৭৬]

জ্যোতির্ময় চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের তোষামোদী মনোভাব এবং যশোদার মধ্য দিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের প্রতি মানিকের ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। মানিক প্রথম জীবনে ফ্রয়েড, পরে মার্কস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্কস বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের কোনো জায়গা নেই, তাই যেন যশোদার মুখ দিয়ে বার বার ধ্বনিত হয়েছে জ্যোতির্ময় চরিত্রের স্ববিরোধিতা। সে কখনোই বিস্মৃত হয় না সে সত্যপ্রিয়র অনুগৃহীত। অল্প বয়সী রুগ্ন স্ত্রীকে উপহারের প্রাচুর্যে ভুলিয়ে রাখতে চায়। তার বোন সুবর্ণ নন্দর সাথে পালিয়ে গেলে সে কোনো খোঁজ করে না সম্মানহানির ভয়ে। ভূপেনের এই বিচ্ছিন্নতা আধুনিক মধ্যবিত্ত মননের অন্যতম চারিত্র্যলক্ষণ। ভূপেন এখানে কেবল ভারবাহক, সংসারের অংশীদারী নয়, বাস্তববাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এইভাবে মধ্যবিত্ত রোমান্টিক মোহের অবসান ঘটিয়েছেন।[৭৭]

জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্তের মেকি ছলচাতুরি ভণ্ডামির মুখোশ খুলেছেন। মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অস্বাভাবিকতা সব কিছুই সামনে এনেছেন।

জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) উপন্যাসে বাস্তব জীবন এবং সমকাল প্রকট। *পূর্ণিমা* তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করেছে তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা। চপলার উপার্জনে পিতৃমাতৃহীন ভাইবোনদের সংসার চলতো। কিন্তু চপলা

বিয়ে করে সংসারী হওয়া মনস্থির করায় হঠাৎ করে চাকরি ছেড়ে দেয়। এতে বিপর্যস্ত অর্থনীতির মুখে পড়ে অর্ধমৃতপ্রায় সংসারটি। চপলার বোন পূর্ণিমার স্বামী সন্তোষ শিক্ষিত কিন্তু বেকার। সমসাময়িককালে বেকার সমস্যা এতই গুরুতর ছিল যে বেকারত্বের জ্বালায় আত্মহত্যার মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। Limaye. P. M. এর *The Problem of Unemployment', in Historical and Economic Studies*- এ বলা হয়েছে :

> We sometimes hear of tragedies due of unemployment and consiquent indigence overwhelming educated families; witness the poisoning of his wife and children by a lawyer and later on his suicide [78]

উপন্যাসে আত্মহত্যার ঘটনা নেই কিন্তু অর্থের অভাবে পূর্ণিমা সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়। সন্তোষ বেকারত্বের জ্বালায় বার বার পূর্ণিমার মৃত্যু কামনা করেছে। পূর্ণিমার মৃত্যু সন্তোষকে মুক্তি দিয়েছে।

কল্যাণী উপন্যাসে সমকালীন যুগ যন্ত্রণার সাথে যুক্ত হয়েছে কন্যাদায়গ্রস্ত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতারিত হওয়ার গল্প। কল্যাণীর প্রেমিক অবিনাশ বেকার। তাই কল্যাণীর সাথে বিয়ে হয় চন্দ্রমোহনের। এই চন্দ্রমোহন একজন ঠগ, ধূর্ত, মিথ্যাবাদী এবং নিপুণ প্রতারক। নানাভাবে প্রতারণা করে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্যাণীকে বিয়ে করে। কল্যাণীর বাবা পঙ্কজবাবু নিজের বোধ-বুদ্ধি আদর্শবাদ সম্পর্কে অহংকারী, অন্যের কাছে নানাভাবে প্রতারিত জমিদার। তার দাদা প্রসাদ স্বার্থপর কিন্তু মননে আধুনিক। ভণ্ড চন্দ্রমোহনের দ্বারা অবিনাশ বাবুর পরিবার সমষ্টিগতভাবে প্রতারিত হওয়ার পর ক্রোধ পরবশ হয়ে কল্যাণীর সম্পূর্ণ সংশ্রব তারা ত্যাগ করে যা সেদিনের মধ্যবিত্তের মানসিকতার পরিচয় বহন করে।[৭৯]

জীবনপ্রণালী উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা বড় করে দেখানো হয়েছে। ১৯২৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি Council of State রিপোর্টে বলা হয় শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই বেকার সমস্যা প্রবল।[৮০] *বাসমতীর উপাখ্যান* উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ মধ্যবয়সী স্থানীয় কলেজের শিক্ষক। আদর্শের কারণে টিউশনি করে না। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এই নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষকের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত আর সংগ্রামমুখর জীবন কাহিনি। *জলপাইহাটি* উপন্যাসের চাকরিতে নায়ক বিরক্ত হয়ে কলকাতায় নতুন কর্মসন্ধানে যান। সেখানকার ব্যর্থতাবহ অভিজ্ঞতা তাকে পীড়িত করে। *সুতীর্থ* উপন্যাসে সুতীর্থ বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। সচ্ছল হয়েও সে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। নিম্নজীবী মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সে ধর্মঘটে অংশ নেয়। অথচ এসব তার কাছে অর্থহীন মনে হয়। কর্তৃপক্ষের সাথে আঁতাত করে কিন্তু তাদের সে ঘৃণা করে। আন্দোলনের স্বার্থে সে অর্থের যোগান দেয়, জেল খাটে, অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করে আবার সামান্য খুনের মামলায় ভীত হয়ে চাকরি

ছাড়ে। মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা, ভন্ডামী সবই তার মধ্যে আছে। এখানে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য ফ্রানৎস ফানোঁর উক্তি— মধ্যবিত্তের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কোনো সমাজের অকেজো অংশ; মধ্যবিত্তর, সকল অর্জন, সাফল্য, প্রগতির বিরুদ্ধে; মধ্যবিত্ত সকল রকম উদ্ভাবনায় অবিশ্বাসী; মধ্যবিত্তেরা তৈরি করে বদ্ধ সমাজ যে সমাজজীবনের কোনো স্বাদ নেই, উত্তাপ নেই; যে সমাজ বাতাস বদ্ধ, যেখানে মানুষ এবং তার চিন্তা কলুষিত। আমার বিশ্বাস যে ব্যক্তি এই আবদ্ধতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে চায়, সে এক অর্থে বিপ্লবী মানুষ।[৮১]

উপন্যাসে সুতীর্থ বিপ্লববাদে বিশ্বাসী নয়। আত্মপরতা আর আমিত্ব নিয়ে সে ব্যস্ত। *মাল্যবান* উপন্যাসে মাল্যবান নিজেই নিজের শ্রেণির নামকরণ করেছে স্বগতোক্তির মাধ্যমে :

> খুব একটা গরীব জাতের মানুষ মাল্যবান। তার চেয়ে ঢের দুস্থ নিষ্পেষিত মানুষ আছে; তাদের অবস্থা আরো ঢের খারাপ–কিন্তু তাদের পেটের সমস্যা এ-সব সমস্যাকে অনেকটা চেপে রেখেছে এ-সব সমস্যার সমাধানেও তাদের বেশি বেপরোয়া বা মরিয়া বা সাহসিক স্বচ্ছলতা আছে–যেমন অন্য এক হিশেবে উঁচু শ্রেণীর ভেতরে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাল্যবনের মতো মধ্যশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে। মাল্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর-না, মধ্য মধ্যশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্ন মধ্য বিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্য শ্রেণীতেই কেমন দুর্বিষহভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে, অথচ বাঙালি মধ্যশ্রেণীরা অন্তত ভাতকাপড় পেলে কেমন সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারে তা দেখবার জিনিস। [৮২]

বনফুলের *(১৮৯৯-১৯৭৯) তৃণখণ্ড* (১৯৩৫), *বৈতরণীতীরে* (১৯৩৬), *নির্মোক* (১৯৪০), *অগ্নীশ্বও* (১৯৫৯), *উদয়অস্ত* (১৯৫১)— এসব উপন্যাসের নায়ক পেশায় চিকিৎসক। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের চিকিৎসক পেশাজীবীরা অধিকাংশই দরিদ্র-দরদী এবং সমাজ সচেতন। *জঙ্গম* উপন্যাসে বৃহৎ পটভূমিতে ব্যক্তিকে ধরেছেন। উপন্যাসের নায়ক শঙ্কর মধ্যবিত্ত যুবক। তার ভাবনায় সমকাল উপস্থাপিত। *অগ্নি* (১৯৪৬) উপন্যাস '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। মধ্যবিত্ত সমাজ কীভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলের সাথে যুক্ত হয় এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হয় তা অংশুমনি, অন্তরা ও নীহার সেনের ভাবনার মাধ্যমে লেখক আমাদের জানিয়েছেন। *ডানা* (১৯৪৮) মধ্যবিত্তের উচ্চবিলাসী ভাবনা নিয়ে রচিত। উপন্যাসটি পক্ষিবিদ্যা (Ornithology) বিষয়ক ভাবনার নবতর ব্যঞ্জনা। উপন্যাসের নায়িকা ডানা বার্মা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় পক্ষি বিদার্থী অমরেশবাবুর কাছে। আনন্দমোহন এবং রূপচাঁদ এই দুই বিবাহিত পুরুষ ডানার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নানান প্রলোভনের মধ্যও ডানা তার পূর্বরাগ ভাস্করের প্রতি প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখে। নানান ঘাত প্রতিঘাতের পর যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভাস্করের সাথে দেখা হয়, ভাস্কর তখন অন্য মানুষ। মদ্যাসক্তি ও প্রবৃত্তি তার নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটিয়েছে। অমরেশ বাবুর পক্ষিশালা, আনন্দমোহনের কবিতা, রূপচাঁদের দেহজপ্রেম কোনকিছুই ডানাকে আটকে রাখতে পারেনি।[৮৩] ডানা সবকিছু ত্যাগ কওে বৈরাগী হয়ে যায়। পেশাজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবনার পরিচয় মেলে এই উপন্যাসে।

গোপাল হালদারের (১৯০২-১৯৯৩) *ভাঙন* (১৯৪৭), *স্রোতের দীপ* (১৯৫০), *উজান গঙ্গা* (১৯৫০) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের জীবনের নানা ভাঙনের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।[৮৪] বাঙালি মধ্যবিত্ত যুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রামজীবন থেকে অনেকখানি সরে আসে, আবার শহুরে ধনতান্ত্রিক সমাজে তারা আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগেছে। বিংশ শতাব্দীর বিশ শতক থেকে বাঙালির জীবনে ভাঙন আসে নানা দিক থেকে। পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরপুরুষেরা অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস; প্রত্যাখ্যান করে জীবন যাপনের রীতি ও ধর্ম, গ্রহণ করে নতুন মত ও পথ।[৮৫] *ভাঙন* উপন্যাস মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। পরবর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধের অবক্ষয় তাকে ব্যথিত করে। *স্রোতের দীপ* উপন্যাসে জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী পুত্রদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন সমসাময়িক নৈরাজ্যময় পরিবেশের কারণে। *উজান গঙ্গা* উপন্যাসে তিনি সমকালীন রাজনীতি এবং ভঙ্গুর সমাজের নীরব দর্শকমাত্র। ঔপন্যাসিক একটি সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রকে উপন্যাসত্রয়ের কেন্দ্রে এনে মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবর্তন দেখিয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) *বিবাহের চেয়ে বড়* (১৩৩৮) উপন্যাসে প্রভাত এবং অশ্রু এই দুজন তরুণ-তরুণীর প্রেমে পড়া এবং প্রেমের পরিণতি যে বিয়ে এই ভাবনা থেকে বের হয়ে এসে নতুন কোনো ভাবনার দিকে ধাবিত হওয়াকে লেখক সাধুবাদ জানিয়েছেন। প্রভাত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর অশ্রু উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। দুজনের প্রেমে শ্রেণিগত ব্যবধান বড় ব্যবধান। তবে শ্রেণি ব্যবধানকে অতিক্রম করে তারা অন্য ভাবনায় পৌছায় :

> উদয়াস্ত একসঙ্গে থেকে পরস্পরকে ক্ষয় করে ফেলা। অবারিত সান্নিধ্যই তো অনাদরের হেতু। অভ্যাস থেকেই শৈথিল্য, বিমুখতা। রক্তের মধ্যে জরার প্রবেশ।[৮৬]

এই যুগল বিয়ের চেয়ে প্রেমকে বড় করে দেখেছে। ‘তারা চায় বন্ধুতা একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা। সজ্ঞান সক্রিয় সংযত বন্ধুতা।’[৮৭] ঔপন্যাসিক বিবাহবহির্ভূত কোনো শারিরিক সম্পর্কের বর্ণনা দেননি। সদর্থক দৃষ্টিতে মধ্যবিত্তের প্রেমভাবনায় নতুনত্ব এনেছেন। *কাকজ্যোৎস্না* (১৩৩৮) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক ভাবালুতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। *প্রথম কদম ফুল* উপন্যাসে কাকলি ও সুকান্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে তাদের সংসারজীবনের স্বাভাবিক বর্ণনা করেছেন। প্রেম বিয়ে চাকরির বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক জীবনচর্চা দেখিয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) নাগরিক জীবনের কথাকার। *পাঁক* (১৯২৬) উপন্যাস বস্তিবাসী অশিক্ষিত মানুষের জীবনের কর্দযতা আর পঙ্কিল জীবনের কাহিনি। ‘বেকার কালাচাঁদ উলকী-কাটা’ মজুরণি কালা

চাঁদের প্রণয়িনী নেত্য, তিন কড়ি মুচি, আহলাদীর মা সকলেই এই পঙ্কিল পরিবেশে হাপিয়ে এ থেকে মুক্তি খোঁজে। কয়েকটি স্কেচে লেখক এদের জীবন-পরিবেশকে সজীব করেছেন। কখনো কখনো বস্তিবাসী অশিক্ষিত এই সব মানুষের মধ্যে লেখক অনেক সময় মধ্যবিত্তসুলভ ভাবপ্রণতা ও সংস্কার অধিক পরিমাণে আরোপ করেছেন।[৮৮] তবে নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারের ভাঙনের কথা লিখেছেন *উপনয়ন* (১৯৩৩) উপন্যাসে। বিশ্বযুদ্ধেও বৈনাশিকতার পরোক্ষ আঁচ এসে লেগেছিল নগর কলকাতায়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানুষের আর্থিক বিপর্যয়ের সাথে যে মানসিক বিপর্যয় হয়েছিল তার চিত্র *উপনায়ন* উপন্যাস। জন্মের পর থেকে বিনু নাগরিক জীবনের নীতিবিবর্জিত পরিবেশে বড় হয়েছে। নৈতিক স্খলিত পিতার সাহচর্যে চুরি, জোচ্চরি, মিথ্যা বলা সবই শেখে। অন্ধকার জীবনের নকুড় দাসের দলের সদস্য হয়ে সে। কিন্তু নকুড় দাসের বিকৃত বিকলাঙ্গ জীবন-পরিবেশে বাস করেও সে মুক্তি চেয়েছে :

> তাহার যেন মনে পড়ে নকুড় দাসের এই সংসারের বাহিরে কত বড় পৃথিবী তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ... সে পৃথিবীর সহিত তাহার কি পরিচয় হইবে না ।[৮৯]

শিশু মনস্তত্ত্বে কলঙ্কিত নাগরিক জীবন নিয়ে যে দ্বিধার জন্ম হয়েছে, বৈভবের আড়ালে যে পঙ্কিলতা বিনু দেখেছে তাই লেখক দেখিয়েছেন। *পা বাড়ালেই রাস্তা* (১৯৬২) উপন্যাসে বি এ পাস বেকার দিলীপ জীবনের প্রয়োজনে দুই বছরে বিশ রকমের পেশা বদল করে। Ice cream vendor, দাঁতের মাজন বিক্রেতা, বাসের কণ্ডাকটরি থেকে আখমাড়াই সব কাজই সে করে। শেষ পর্যন্ত যখন চৌধুরী ইণ্ড্রাস্ট্রিজের মালিকের অযাচিত দাক্ষিণ্য লাভ করে তখন তার মধ্যে কিছুটা রোমান্স তৈরি হয়। দিলীপ চরিত্রে আস্ফালন আছে, দাম্ভিকতা আছে। দিলীপ কিন্তু অফিসারের চাকরি, সুন্দর বাড়ি, অনেক টাকার প্রলোভনে সাময়িকভাবে উত্তেজিত হলেও আত্মসমর্পন করে না, করতে পারে না।[৯০] দিলীপের মধ্যবিত্ত মানসিকতা তার ব্যক্তিত্ব তাকে বাধা দেয়। ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে চাকরির বাজার দুর্মূল্য হয়ে পড়েছিল। মধ্যবিত্তর জন্য বি এ পাস করে কেরানির চাকরি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র যুদ্ধজনিত বিপর্যস্ত মূল্যবোধ আর অবক্ষয়ে দীর্ণ ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সর্বব্যাপী ভাঙনের প্রেক্ষাপটে ধসে যায় মানুষের যাবতীয় প্রত্যয় আর মূল্যবোধ। ভেঙে পড়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সনাতন সব সামাজিক ভিত্তি।[৯১] কালিক এই বৈনাশিকতার শিল্পভাষ্য বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) *শেষ পাণ্ডুলিপি* (১৯৫৬) *উপন্যাস*। বিশ্বাসের ভিত্তিমূল যখন ভেঙে যায় তখন মানুষ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। *শেষ পাণ্ডুলিপির* বীরেশ্বর গুপ্তর প্রেমিকাকে যখন তার বাবা বিয়ে করে তখন থেকেই বীরেশ্বরের মধ্যে আত্মবিকৃতি ও পরিবারবিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়।

দাম্পতজীবনে পরিবারের মূল স্রোতের সাথে বীরেশ্বর একাত্ম হতে পারেনি। ব্যক্তিত্বের সংকট আর মানসিক যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়েছে। *অদর্শনা* (১৯৪২) উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নগর কলকাতার বিপর্যয় আর বিপন্নতা উঠে এসেছে। *রাত ভরে বৃষ্টি* (১৯৬৭) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত যুগলের দাম্পত্য সংকট থেকে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়েছে।

> শরীরটাই আসল, চরম, সর্বস্ব; ওটাই স্বামী-স্ত্রীর নির্ভর; বিয়ের নির্ভর–তারই জোরে এমন একটা অসম্ভব আশা করা হয় যে দু'জন মানুষ বরাবর একসঙ্গে থাকবে। অথচ সেটা আর নেই আমাদের মধ্যে, তাই আমরা পরস্পরের অচেনা হয়ে গিয়েছি, পরস্পরের ভাষাও আর বুঝি না।...[৯২]

পাতাল থেকে আলাপ উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সামূহিক বিপর্যয় উদ্ভাসনে মগ্নচেতনাপ্রবাহ রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। 'মগ্নচেতনায় রাজীবলোচনের ভাবনা তার সামূহিক নৈঃসঙ্গ্য ও নির্বেদকেই নির্দেশ করে।'[৯৩]

> আমার মনে হ'লো সরমাকে আর চিনতে পারছি না, ওর ঘর, ওর হলদে-লাল কুশানগুলো ঝাপসা হ'য়ে এলো, আমি একটা লম্বা সরু খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, মাঝখানে দেখি পদ্মিনী নামছে উপর থেকে। ... কষ্টে আমার বুক যেন ভেঙে যেতে লাগলো– সরমা ম'রে গেছে ব'লে কষ্ট, পদ্মিনীর জীবনে ভেঙে গেছে ব'লে কষ্ট, আর যূথিকার জন্যেও কষ্ট, কেননা সেও শুধু অভ্যাসের বলে বেঁচে আছে ...।[৯৪]

কালো হাওয়া (১৯৪২) উপন্যাসে অরুণের বখে যাওয়া সমকালীন প্রত্যয়হীন, বিশৃঙ্খল পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়। ১৯৪০-৪১ সালের কলকাতা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প নিয়ে লিখলেন *তিথিডোর* উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর বিপন্ন-বিচূর্ণ সময় দ্বারা প্রভাবিত, আলোড়িত আক্রান্ত হয়েছে তিথিডোর উপন্যাসের প্রধান সব চরিত্র।[৯৫] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বাতী। তবে রাজেন বাবুর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের ভাঙাগড়ার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এসে লাগে রাজেনবাবুর পরিপাটি জীবনে। কালের বিনাশে তিনি ভেঙে পড়েন। এ যেন স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছন্দপতন।[৯৬] স্বাতীর ছোট ভাই বিজন সময়েরই প্রতিনিধি। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে একদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে চোরাকারবারি কালো বাজারি করে একদল মানুষের দ্রুত ফুলেফেঁপে ওঠা এই যুগল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল মানুষের সব প্রত্যয় আর প্রতিজ্ঞান'।[৯৭] কালের হাওয়া এসে লাগে বোহেমিয়ান এই যুবকটির গায়ে। বিজনের বিশৃংখল জীবন চল্লি-শের দশকের পরিবারবিচ্ছিন্ন সমাজমূলচ্ছিন্ন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের শিল্প স্বাক্ষর।[৯৮] শাশ্বতী-হারীতের দাম্পত্য সংকেটের মূলে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সঙ্কট :

> গুম হয়ে থাকা, থমথমে হাওয়া, তারপর রাত্রে কোনো এক রাত্রে সব ভুলে যাওয়া, সব ফিরে পাওয়া। কিন্তু সে আর কতক্ষণ ক মিনিট? তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুম, আর ঘুমের পরে দিন। আর পরের দিনই যদি আবার কিছু ঘটে, তুচ্ছতম কিছু তা' হলে আবার তাই, ভাবনার উল্টো, ইচ্ছার উল্টো, মুখ ভার, মন ভার, অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে হাওয়া তারপর আবার রাত্রি, কী ক্লান্তিকর দাম্পত্য। [৯৯]

মামফোর্ড বলেছিলেন–…the sensation of living without the direct experience of the life – a short spritual masturbation. জীবনের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তেজনানির্ভর এই বাঁচার প্রচেষ্টা হলো এক ধরনের আত্মিক আত্মমৈথুন (spritual masterbation).[১০০] এই ভুবন নির্মাণের দৃশ্যপট ধরা পড়েছে যুদ্ধকালীন মধ্যবিত্তের সমাজ বাস্তবতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কালের নতুন বাস্তবতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিহত স্বপ্ন ও নীতি মূল্যবোধের সংকট, সর্বোপরি মধ্যবিত্তের বিপন্নতা চিত্রিত হয়েছে এ সময়ের উপন্যাসে।[১০১]

ধূসর গোধূলি (১৯৩৩) উপন্যাসের বিষয় মধ্যবিত্তের প্রেম। প্রেম-উন্মত্ত নায়কের স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ থেকে উন্মাদ হওয়া এবং স্ত্রীর আত্মহত্যা এই হচ্ছে উপন্যাসের কাহিনি। বর্ণনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক প্রথম সমরপূর্বে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনাচরণের পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন। *একদা তুমি প্রিয়ে* (১৯৩৪) উপন্যাসে পলাশ সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কলেজে পড়ার সময় সমবয়সী প্রতিবেশী রেবার প্রেমে পড়ে। ঐ প্রেমে এক সময় ভাঙন ধরে। রেবা গার্লস কলেজের শিক্ষকতা নিয়ে বিহারে চলে যায়। পলাশ রেবার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে রেবার ছাত্রী পরমার প্রেমে পড়ে। যুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিয়েছিল বহু মাত্রিক ভঙ্গুরতা ও বিভঙ্গতা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিনের যুবমানস সেই ভঙ্গুরতা-বিভঙ্গতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। *যেদিন ফুটলো কমল* (১৯৩৩) উপন্যাসে পার্থপ্রতিম পিতৃমাতৃহীন সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। শীলতা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের প্রেমে সামাজিক শ্রেণিসমস্যা কোনো সমস্যা নয় সমস্যা তাদের হৃদয়গত। 'এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবন বাস্তবতার খণ্ডাংশের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেন বুদ্ধদেব মোহগ্রস্তভাবে।[১০২]

বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে মধ্যবিত্তমানসের নৈঃসঙ্গানুভূতির আবেগী রূপ উন্মোচন করেছেন, মধ্যপর্বের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের সামূহিক বিযুক্তি ও নৈঃসঙ্গ্যের শিল্পরূপ অঙ্কন করেছেন, অন্ত্যপর্বে অঙ্কন করেছেন প্রেমের আঁধারে অপ্রেমের যন্ত্রণা।[১০৩]

স্বাধীনতাপূর্ব অখন্ড ভারতবর্ষের অগ্নিগর্ভ আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখলেন *জাগরী* (১৯৪৫) উপন্যাস। মা, বাবা, নীলু, বিলু মাত্র চারটি চরিত্রের আত্মখননে, রাজনৈতিক বাস্তবতার অন্তরালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সরল আশা-আকাঙ্ক্ষা মনোবেদনা ক্ষোভ ও রিরংসার পরিচয় পাওয়া যায়। আগস্ট আন্দোলনে বন্দি হয়ে কারাগারে এসেছে একই পরিবারের তিনজন সদস্য বাবা, মা এবং বড় ছেলে বিলু। এরা পূর্ণিয়ার প্রবাসী বাঙালি।[১০৪] বাবা সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে গান্ধীবাদী দর্শনে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আশ্রম আর চরকা নিয়েই থাকেন। ফলে তার আর্থিক

সচ্ছলতা বিনষ্ট হয়। সময়টা আর্থিক মন্দার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাতাবরণ অনেকটাই পরিবর্তিত। ভারতবর্ষের মানুষ পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু আন্দোলনের পথ নির্বাচনে মধ্যবিত্ত সম্পূর্ণভাবে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন, অন্যদিকে ভাবাবেগ সমৃদ্ধ সন্ত্রাসবাদ এবং মার্কসীয় চিন্তার বিপ্লববাদ কোন পথটিকে যে মধ্যবিত্ত বেছে নেবে সে বিষয়ে সন্দিহান। নীলু বিলুর পরিবার রাজনৈতিক পরিবার। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত পরিবারটি বার বার জেল খাটে। কিন্তু এবার জেলের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিলুর ফাঁসির আদেশ হয়েছে। বিলুর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিলুসহ অন্যান্য চরিত্রের রাজনৈতিক দৃঢ়তায় কিছুটা ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেই স্থানচ্যুত। এই বিচ্যুতি মূলত মধ্যবিত্তের সংশয়দীর্ণ সমাজ বাস্তবতারই সমার্থক।

বিলুর স্বগতোক্তির মধ্যে তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের চিত্র পাওয়া যায়। এই বেড়ে ওঠার পরিবেশ মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কারঘেরা সংস্কৃতির মধ্যে চরিত্রটি নিজেকে মেলে ধরেছে। বাঙালি পরিবারের সেই চিরকালীন মুগ্ধ অনুভূতিগুলোর মধ্যেই। লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের মায়া মমতাময় রাজনৈতিক বোধকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।[১০৫]

বিলুর স্থান রাজনৈতিকভাবে ঊর্ধ্বে হলেও নিজের মধ্যে সে মধ্যবিত্ত মননের দ্বান্দ্বিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার মতে 'রাজনৈতিক কর্মীর বিবাহের স্বপ্ন রাখা উচিত নয়'। তবু বন্ধু নরেশের বিধবা ছোট ঠাকমাকে কেন্দ্র করে বিলুর রোমান্টিকতার উন্মেষ মধ্যবিত্ত রক্তমাংসের মানুষটিকেই প্রকাশ করে। রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গীকৃত বিলুর ভেতর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে একটি নিরাসক্ত আবরণ ছিঁড়ে পারিবারিক চেতনাপুষ্ট গৃহী সত্তার আর্বিভাব ঘটেছে। যা মধ্যবিত্ত জীবনচেনার প্রতিভূ। লোকে যতই 'বিলু বাবুকা' জয় বলে স্লোগান দিক বিলু প্রতিমুহূর্তে হৃদয়ের উচ্চতম স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এ সংকট তো মধ্যবিত্ত যুবকের স্বপ্ন ভাঙার সংকট; চরম হতাশায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সতীনাথ সমকালীন যে মধ্যবিত্ত চেতনাকে উপন্যাসে আনতে চেয়েছিলেন বিলু সেই চেতনার সার্থক চিত্রকল্প। বাবা চরিত্রটি নিজ পরিবারের চেয়ে রাষ্ট্রটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছে কিন্তু বিলুর ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে তার মনে হয়েছে :

> আজ রাত্রিটা যদি বিলুর কাছে থাকিতে পারিতাম। একসঙ্গে না থাকায় ভালই হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো দুজনেই ভাঙিয়া পড়িতাম–তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা তো বলিয়া লইতে পারিতাম।...হয়তো কথাই খুঁজিয়া পাইতাম না। ছেলেরা তো কোনো কালেই আমার সঙ্গে নেহাত কাজের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলে না।[১০৬]

সন্তানের জন্য পিতার যে আক্ষেপ তা বাঙালি মধ্যবিত্তের আক্ষেপ :

> ভগবান, বিলুকে শেষ মুহূর্তে অন্য কথা মনে করাইয়া দিও, অন্য কথা ভাবিবার ক্ষমতা দিও। অন্তিম মুহূর্তেও পূর্ব হইতেই, মৃত্যুভয়ে তিলে তিলে তাহাকে যেন মরিতে না হয়।[১০৭]

মা চরিত্রে বাঙালি মধ্যবিত্তের মাতৃসত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ। সকল কংগ্রেস কর্মীর মায়ের চেয়ে নীলু বিলুর মা হয়ে থাকতে চেয়েছে। সন্তানস্নেহ তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। শান্ত মসৃণ পারিবারিক জীবনের অভিলাষী মা বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন 'তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্যি কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাওনি।[১০৮] এই বাক্যটি শুধু পরিবারে মায়ের নয়। সমস্ত মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই সমালোচনা। অবশেষে যে মহাত্মাজীকে তিনি ভগবানের আসনে বসিয়েছেন তাঁকেই তিনি কটূক্তি করে বলেন, মহাত্মাজী না ছাই, ঐ কি সন্ন্যাসীর মতো চেহারা নাকি? উঃ কী করেছি এতদিন![১০৯] মা চরিত্রের এই পরিবর্তন বাংলার মধ্যবিত্ত মাতৃত্বমানসের দ্বান্দ্বিকতার স্ফুরণ।

নীলুর সাক্ষীতেই বিলুর ফাঁসির রায় হয়। বিলুর ফাঁসির দিনে নীলুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়। ঐ পরিবর্তন বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের পরিবর্তন, পরিবারের চেয়ে সে পার্টির আদর্শকে বড় করে দেখেছিল কিন্তু বড় ভাইয়ের ফাঁসির পূর্বমূহুর্তে পরিবারই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নীলুকে দেখি আত্মদগ্ধ, অনুশোচনাপ্রবণ, স্নেহের কাঙালরূপে। তার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় :

> দাদা এখন কী করিতেছে? হয়তো গরাদ ধরিয়া অন্ধকার নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিয়া চলিয়াছে। আমার কথাও কি একবার ভাবিবে? দাদা কখনই আমাকে ভুল বুঝিতে পারে না। এ সম্বন্ধে দাদার সহিত পরিষ্কার কথাবার্তা যদি বলিতে পারিতাম।[১১০]

রাজনৈতিক সত্তার চেয়ে পারিবারিক সত্তাটিই বেশি প্রকাশিত হয়েছে *জাগরী*তে। মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা, ভাবনা ও পারিবারিক শৃঙ্খলাকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এ উপন্যাসে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (১৯০৮-১৯৯৪) *কলকাতার কাছেই* (১৯৫৯), *উপকণ্ঠে* এবং *পৌষ ফাগুনের পালা* (১৯৬৫) উপন্যাসের সময়সীমা স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। শ্যামাঠাকুরণ ও তার পুত্র-কন্যাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাঁর দুই বোনের জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে।[১১১] লেখক শ্যামাঠাকুরণ ও তাঁর তিন পরিবারের কাহিনির মধ্য দিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালির বিশেষত অন্তঃপুরের জীবনাচরণের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দোলাচল, সামাজিক ভাঙন প্রভৃতি উপন্যাসে ধরা পড়েছে। শ্যামাঠাকুরণকে কেন্দ্র করে কাহিনি গতি পেয়েছে। দরিদ্র সংসারে স্বামীর অত্যাচার, আর্থিক দৈনতার কারণে কৃচ্ছতাসাধন, পুত্রকন্যাদের বিবাহিত জীবনে ক্রমশ নিঃসঙ্গতা শেষ পর্যন্ত বহু বঙ্কিম জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার প্রাত্যহিক জীবন। অন্য

মানুষ থেকে সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। বৃহদায়তন এই উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণির পারিবারিক জীবনচিত্র পাওয়া যায়।

আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯-১৯৯৫) *শশীবাবুর সংসার* উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারে কাহিনি নিয়ে রচিত। পুত্রবধূ সুমিত্রার চাকরি করতে যাওয়ার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে জটিলতা তৈরি হয়। চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকের শুরুতে অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার মেয়েদের চাকরি করাকে কিংবা নারীর স্বাবলম্বী হওয়াকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখেনি। আশাপূর্ণা দেবীর অধিকাংশ উপন্যাসই বাঙালি মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনি। *সুবর্ণলতা* (১৯৬৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ সুবর্ণ আমৃত্য সংগ্রাম করেছে প্রতিকূল সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধে।

সুবোধ ঘোষের (১৯১০-১৯৮০) উপন্যাসে একই সাথে মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা এবং ভাবালুতা স্থান পেয়েছে। *শতভিষা* (১৯৪৫) উপন্যাসে গোঁড়া রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা রজনী মিত্রের মানসিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। পুত্র অমিয় এবং পুত্রবধূ শুভার শুদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অনুভব করেন বহিরঙ্গের আদর্শের আড়ম্বরে জীবন কখনো পূর্ণতা পায় না, প্রাণের সুস্থতাই বড় কথা। *একটি নমস্কার* উপন্যাসে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণীর জীবিকার তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এবং স্বদেশী চাকরিতে তাঁর আত্মমুক্তির সন্ধান লাভ। *ত্রিযামা* (১৯৫০) উপন্যাসে একদিকে ম্যাকাডাম সড়ক, পিচঢালা এভেন্যু, বিদ্যুতের বাতি, ক্লাব পার্ক মার্কেট অন্যদিকে ডাস্টবিন ঘেঁষে কুকুর আর ক্ষুধার্ত ভিখারি মানুষ একই ভঙ্গিতে ঘুমায়।[১১২] শ্রেণিদ্বন্দ্বের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত যুবক কুশলের আত্মিক দ্বন্দ্বও উপন্যাসে প্রকট।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *বারো ঘর এক উঠোন* স্বাধীনতা-পরবর্তী নিম্নমধ্যবিত্তের বস্তি জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। বেকারত্ব তাদের মূল্যবোধকে গ্রাস করে। *মীরার দুপুর* মধ্যবিত্ত পরিবারের এক নারীর তিন পুরুষের প্রতি আসক্তির টানাপোড়েনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। স্বামী হিরেনের অধ্যাপকীয় পাণ্ডিত্য, শিল্পী মৃগাঙ্কের প্রতি রূপমুগ্ধতা এবং স্বামীর বন্ধু অমরেশের কর্তব্য ও ভক্তি বন্ধনে মীরার মন ও যৌবন অস্থির অসহায় বোধ করেছে। মীরার অসহায়তা, ভ্রান্তি, বিপথগামিতা, আত্মপরতা তখনকার নগর কলকাতার অসহায়তা নাগরিক মধ্যবিত্তের অসহায়তা বা ভ্রান্তি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২) সমাজের কদর্যতার বলিষ্ঠ উদ্ঘাটনে যেমন নিপুণ, তেমনি নিপুণ আদিম প্রবৃত্তির বীভৎসতার প্রকাশে।[১১৩] *বিশ্বাসের বাইরে* (১৯৭২) উপন্যাসে অবিনাশ বিনা অপরাধে তিন বছর জেল খেটেও ভেতেরের সৎ মানুষটিকে মরে যেতে দেয়নি। সময়ের প্রক্ষেপের কারণে সামাজিক বা আর্থিক অবনমন মানুষের মধ্যেও

পড়েছিল। মানুষ তাই হয়ে উঠেছিল মূল্যবোধহীন, নীতিহীন। *এই তার পুরস্কার* উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্তের ব্যক্তি বিদ্রোহটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই উপন্যাসে কবি রামানন্দ কবিতা ও শিল্পের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। রামানন্দের অগ্রগমন জ্যোতিরিন্দ্র দুঃসাহসের সাথে চিত্রিত করেছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *রাঙামাটি* উপন্যাসে উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন ভাবনার প্রকাশ আছে। লেখকের কৃষি বিপ্লব, সাম্যবাদ, মডেল, ফার্ম ইত্যাদি ভাবনার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রেণুকার প্রেম। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা রেনুকা শিক্ষিত, স্বাবলম্বী। রাঙামাটির গ্রামীণ জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নবকুমারের সাথে কলকাতায় আসে। নবকুমার রেণুকাকে কলকাতার উচ্চবিত্ত মহলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। বুদ্ধিমতি এই নারী অল্প দিনেই নগর কলকাতার ফাঁকি ধরে ফেলে। হিরণ, বিজনেশ এদের স্বার্থান্ধ প্রেমে বিরক্ত হয়ে সে আবার রাঙামাটিতে ফিরে যায়। উপন্যাসে হিরণ বেকার, সে রেণুকাকে শিখণ্ডি করে সমাজের উপরিতলে উঠতে চেয়েছিল। মনোরমা চরিত্রে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনোবিকলন ঠাঁই পেয়েছে। অভিজাত্যের অহমিকায় সে মাতৃত্বের অবমাননা করে। সন্তানকে সময় দেয় না। একসময় তার কন্যাসন্তানটি অসুস্থ হয়ে মারা যায়। নবকুমার খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবক। বিদেশ থেকে ডাক্তারি পাস করে এসে পুরোপুরি স্বদেশী। মধ্যবিত্তের সংকট দুরকম অর্থনৈতিক সংকট এবং ব্যক্তিত্বের সংকট। এই দুই সংকটের সম্মিলন *রাঙামাটি* উপন্যাস।

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকটকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কালোবাজারি, দুর্নীতি, যৌথ পরিবারের ভাঙন, তরুণ সম্প্রদায়ের বিপথগামিতা, তারুণ্যের মেধা রাজনৈতিক নেতার পোষ্যে পরিণত হওয়া প্রভৃতি সমস্যায় সমাজ ছিল জর্জরিত। মূল্যবোধের পতন ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার প্রভাবে মধ্যবিত্তের চেতনায় নেতি ও নৈরাশ্য প্রভাব ফেলেছে। প্রেমের প্রথাগত ছক ভেঙে আত্মভোগের পথে পা বাড়ানো ছিল সমকালীন বৈশিষ্ট্য। যুগদর্পণের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৭-১৯৭৫) *গোধূলি, দেহমন* (১৯৫২), *সহৃদয়া, দূরভাষিনী* (১৯৫২), *চেনামহলের* (১৯৫৩) *সঙ্গিনী, অনুরাগিনী, সুরের বাঁধন, অনমিতা* প্রভৃতি উপন্যাসে।

দেহমনের বিভাস, *চেনামহলের* অরুণ, *সূর্যস্বাক্ষী*র শশাঙ্ক প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বলয়ে বৃত্তাবদ্ধ। যুদ্ধোত্তর কলকাতার এক শিথিল মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে *চেনামহলের* কাহিনী। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই নিস্ফল। আর্থিক অনিশ্চয়তায় কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। একই পরিবারবদ্ধ হয়েও সবাই বিচ্ছিন্ন। ব্যতিক্রম শুধু অতুল। বোহেমিয়ান অতুলের স্বরূপ

উন্মোচন হয় তখন যখন সে জানতে পারে, ভাই-বোনের অবৈধ প্রণয়ের কথা জানাতে না পেরে বিজু আত্মহত্যা করেছে। তখন অতুল তার মাকে অনায়াসে বলে এই রকম সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে যখন হয় না কিন্তু দরকার পড়লে দিতে হয় মা তোমার কি মনে হয় না মরে গিয়ে কেলেঙ্কারি করার চেয়ে ওদের বিয়ে করে কেলেঙ্কারি করা অনেক ভাল ছিল।[১১৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত অর্থনীতিতে অস্তিত্ব রক্ষায় মেয়েরা স্বনির্ভরতার পথে নেমেছে। *মহানগর* উপন্যাসে আরতি সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় চাকরি করেছে। *তিনদিন তিনরাত্রি* উপন্যাসে মানসী ও মাধবী চাকরি করে বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব নেয়। *'দূরভাষিণী'* উপন্যাসে লেখক বীণার সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করেছেন। স্বাধীনতাপূর্ব পর্যন্ত নারীরা গৃহপরিবেশে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সব মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই পরিবারে আর্থিক নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এর *উপনিবেশ* তিন খণ্ডে রচিত বৃহৎ পরিসরের উপন্যাস। চর ইসমাইলকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের যুদ্ধের কাহিনি। আঞ্চলিক জীবনপ্রবাহকে রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক স্বপ্নবিলাসী মধ্যবিত্ত চরিত্র নির্মাণ করেছেন। গাজীসাহেব, হরিদাস, পোস্টমাস্টার সকলেই মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক লড়াই, জীবনজিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিষয় এসেছে *বৈতালিক*, *শিলালিপি*, *লালমাটি*, *সম্রাট*, *শ্রেষ্ঠী* প্রভৃতি উপন্যাসে। মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সংকটকে রূপ দিলেন *কাচের দরজা* (১৩৬৭) উপন্যাসে। সোম এবং প্রবাল দুজনেই ভিন্ন নারী-পুরুষে আসক্ত। সততা ও বিশ্বস্ততা দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তি। যুগযন্ত্রণার ক্ষতকে ধারণ করেই সোম এবং প্রবালের মধ্যে মূল্যবোধহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকম তিক্ততা ও অনীহা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে তারা জীবনের তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করেছে।

কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* (১৩৮৫) উপন্যাসে রিখিয়ার পটভূমিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাবু ঐতিহ্যের টান প্রভৃতি বিষয় এসেছে। উপন্যাসে মনিব ও মনিব পত্নী কলকাতার বাবু সমাজের প্রতিনিধি। সঘুরাই এবং তার পাখি বাবুসমাজের আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। সঘুরাই মনিবের কাছে আশ্রয় পাওয়ায় স্বশ্রেণিচ্যুত হয়েছে। আধুনিক হওয়ার সাথে সাথে সে তার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সঘুরাই নিজেই একসময় ভাবে পাখিটিকে শিক্ষিত ও আধুনিক করে বাবুদের উপযোগী করতে হবে। কিন্তু পাখি ভদ্র করে তোলার চেষ্টাই তার এবং পাখির জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। পাখিটি মৃত্যুবরণ করে। পাখির মৃত্যুর প্রতীকী ঘটনার ভেতর দিয়ে কমলকুমার আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় আধুনিকতার বিষে আদিম কৌম সংস্কৃতির মৃত্যুর করুণ গাথাকে উপন্যাসে শিল্পরূপ দান করেছেন।[১১৫] উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রই তার শ্রেণির প্রতিনিধি।

এছাড়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৯) *নগরপারের রূপনগর* (১৯৬৭) উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্ত ভাবনা নাগরিক নাস্তিবোধ থেকে আস্তিবোধের দিকে ধাবিত। *বলাকার মন* উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের কর্মক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখানো হয়েছে। মতি নন্দী তাঁর *কিছু অযথা বিভ্রম* উপন্যাসে মধ্যবিত্তের ভাঙন ও অসহায়তাকে দেখিয়েছেন। এক ব্যাংক কর্মচারীর চশমা ভাঙাকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপর্যয়কে তিনি চিহ্নিত করেছেন। অর্থনীতির ভাঙনে নিজেদের নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ততা অর্জনের কুশ্রিতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। গৌরকিশোর ঘোষের (১৯২৩-২০০০) *প্রেম নেই* উপন্যাস মুসলিম মধ্যশ্রেণি ও সাধারণ গ্রামীণ মুসলিম সমাজকে নিয়ে রচিত। *কমলা কেমন আছে* উপন্যাস নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের চালচিত্র। সেই সময় নারীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছে। যুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত অর্থনীতির চাপে পড়ে মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। কমলা অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তায় বাসের মধ্যে সহকর্মী কর্তৃক ধর্ষিত হয়। যুদ্ধোত্তর বৈনাশিকতায় মানুষের শুভবোধ আত্মবিনষ্টির অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। সেই বিনষ্টির আগ্রাসন থেকে কমলা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। অন্তঃসত্ত্বা কমলাকে তার স্বামী বিকাশ ছেড়ে যাবে না বলে কথা দেয়। *এই দাহ* উপন্যাসে লেখক ষাটের দশকের কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরালে ব্যক্তিসত্তার আত্মখনন করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোলক মজুমদারের ক্লোরোফর্ম খেয়ে আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তের স্মৃতিতে মূর্ত হয়েছে ঝর্ণা, মনোরমা, চারুলতা তিন নারীর সঙ্গে সম্পর্ক, অবদমন, মুক্তি প্রচেষ্টা প্রভৃতি প্রসঙ্গ। *মনের বাঘ* উপন্যাসে যুগপৎভাবে এসেছে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন এবং ভারতের মধ্যপ্রদেশের অরণ্যের আদিবাসী ও উদ্বাস্তু জীবন।

উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণির কল্পনা ও বুদ্ধির ক্রমবিস্তার ও সংকোচ শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের কীর্তিকে নির্দিষ্ট করেছে।[১১৬] মধ্যবিত্তের সমৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলা উপন্যাস বিচিত্র বিষয়-গৌরবে যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তার সাথে মধ্যবিত্তের জীবনভাবনার নানামাত্রিক দিক উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে। গ্রামীণ নিম্নবিত্ত, নির্বিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে যেমন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে, তেমনি মধ্যবিত্তের জীবনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসের জগৎ। এসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মানস-বৈশিষ্ট্যের কিছু সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে নগরমুখিনতা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূল্যবোধের জায়গায় বুর্জোয়া ভাবনার স্থিতি, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, যৌনতা, দেহনির্ভরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, মূল্যবোধর অবক্ষয়জনিত নেতি ও নৈরাশ্য ভাবনা, বিচ্ছিন্নতা, অস্বাভাবিকতা, মৃত্যুসংলগ্নতা, স্ববিরোধিতা, প্রেমহীনতা, খণ্ডিত স্বাধীনতাজনিত হতাশায় মার্কসবাদ প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনের আকাঙ্ক্ষা, সত্তা সংকটের সামূহিক যন্ত্রণা, সাম্যবাদী স্বপ্নের ভঙ্গুরতা, রাজনীতি বর্জিত মানসিকতায় সঙ্কীর্ণ বিবরগ্রস্ততা প্রভৃতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর উপন্যাসে বিধৃত মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্ত অনুসন্ধেয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. Ralph Fox , *The Novel and the People*, Eagle Publication, (Moscow : 1954), p. 2
২. কার্তিক লাহিড়ী, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ২
৩. জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯১), পৃ. ৩
৪. রবীন্দ্র গুপ্ত, *উপন্যাস জিজ্ঞাসা* (কলকাতা : গ্রন্থ নিলয়, ১৯৯৫), পৃ. ৮
৫. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯
৬. দেবীপদ ভট্টাচার্য, *বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্ব* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৬১), পৃ. ৩২
৭. *তদেব*, পৃ. ৭৫
৮. *তদেব*, পৃ. ৩৯
৯. *তদেব*
১০. রামেশ্বর শ, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ* (কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ২০০৬), পৃ. ৫১
১১. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২
১২. চলন্তিকা'য় রাজশেখর বসু 'বাবু' শব্দের অভিধা নির্ণয় করেছেন এইভাবে–'হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত যোগ্য উপাধি (মিঃ রামবাবু); কেরানী (অফিসের বড়বাবু); ভদ্র পরিবার কর্তা বা অন্য পুরুষ (বাবু বাড়ি নেই। ছোট বাবু); মধ্যবিত্ত মনিবকে বা ইতর কর্তৃক ভদ্রলোক সম্বোধন; শৌখিন বিলাসী'।

J. H. Broomfield: Elite Conflict in a Plural Society. University of California Press. 1968. Glossary, p. 333. উদ্ধৃত : আবুল কাশেম, *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৭৭। সম্বাদ কৌমুদি (প্রথম প্রকাশ, ১৮২১) পত্রের ৫ম সংখ্যায় বাবুদের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখের ক্যালকাটা জার্নাল-এ লেখা হয়েছিল– Avery entertaining account of a certain class of Baboos, who are known by the denomination of captains, দেবীপদ ভট্টাচার্য, *বাংলা উপন্যাসের কথা* (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৬১), পৃ. ১১২
১৩. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *ভবানীচরণ ও কলিকাতা কমলালয়*, পাণ্ডুলিপি চতুর্থ খণ্ড ১৩৮১, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৭
১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৫
১৫. বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* (কলকাতা : বাকসাহিত্য, ১৯৭৫), পৃ. ৪৮৭
১৬. নববাবু বিলাস, উদ্বৃত আবুল কাশেম, *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ২২৫
১৭. আবুল কাশেম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৯
১৮. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নববিবি বিলাস*, (সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়),(কলকাতা : রঞ্জন পাবলিসিং হাউস) ১৩৩৪ (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের লেখক বলে প্রচারিত হলেও আসলে লেখক অজ্ঞাত), পৃ. ৪
১৯. আবুল কাশেম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪
২০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৭৬
২১. *তদেব*
২২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
২৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৪), পৃ. ৩৩
২৪. *তদেব*
২৫. *তদেব*, পৃ. ৪২
২৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী উপন্যাস সমগ্র* (কলকাতা : তুলি-কলম, ১৯৮৬), পৃ. ৯৮
২৭. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪
২৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪১
২৯. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭
৩০. তদেব, পৃ. ৪২
৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩
৩২. তদেব, পৃ. ২৪২
৩৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* অষ্টম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫১
৩৪. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯

৩৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ৩৬
৩৬. *তদেব*, পৃ. ৪৪
৩৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২
৩৮. সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস* (কলিকাতা : দীপায়ন, ১৩৯৭), পৃ. ১০
৩৯. সম্পাদনা অরুণ সান্যাল, *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস* (কলিকাতা : ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৬৩
৪০. *তদেব*, পৃ. ৩৯৪
৪১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৫৬
৪২. অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ১৮
৪৩. মো. সাইদুর রহমান, *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক* (ঢাকা : বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০১১), পৃ. ২৯
৪৪. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯
৪৫. তদেব, পৃ. ১৫৯
৪৬. অরুণ সান্যাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬
৪৭. সফিকুন্নবী সামাদী, *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা: শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৫২
৪৮. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫
৪৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, সপ্তম সম্ভার* (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.), পৃ. ৬৭
৫০. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭
৫১. *তদেব*, পৃ. ১৬৮
৫২. *তদেব*, পৃ. ১৭১
৫৩. সরকার আবদুল মান্নান, *বাংলা উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৬৭
৫৪. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, *শুভা* (কলকাতা : এম. সি সরকার এন্ড সন্স, ১৩২৭), পৃ. ২৮
৫৫. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬), পৃ. ২৭৩
৫৬. অরুণ সান্যাল (সম্পাদক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৬
৫৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
৫৮. অন্তঃশীলা, *ধূর্জটিপ্রাসাদ রচনাবলী-১* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২), পৃ. ৮৭
৫৯. *ধূর্জটিপ্রাসাদ রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২১
৬০. *তদেব*, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯
৬১. সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ২০০৩), পৃ. ১০৬
৬২. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, *বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), পৃ. ২১৫
৬৩. মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), পৃ. ১১৯
৬৪. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৭
৬৫. সৌভিক রেজা, *কথাশিল্পের কথা* (ঢাকা : ধ্রুবপদ, ২০১২), পৃ. ৭৭
৬৬. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর ১৯২৩-১৯৮২* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১), পৃ. ৭৭
৬৭. সরকার আবদুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২০
৬৮. হায়ৎ মামুদ (সম্পাদক), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫), পৃ. ৪০৩
৬৯. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬
৭০. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯
৭১. *তদেব*, পৃ. ১৫৫
৭২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০
৭৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: বাস্তববাদের বহুমুখ* (কলকাতা : বাক-সাহিত্য (প্রা.) লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ৩৯
৭৪. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫
৭৫. চিত্রা সরকার, *সামাজিক সংকট আত্মিক সংকট প্রেক্ষিত বাংলা কথাসাহিত্য* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২), পৃ. ৫১
৭৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী* (২য় খণ্ড) (কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২), পৃ. ১৫৮

৭৭. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯
৭৮. Limaye, P. M. *The Problem of Unemployment', in Historical and Economic Studies'* edited by kwcve , D.G. poora 1941, p. 110
৭৯. অম্বুজ বসু, *একটি নক্ষত্র আসে* (কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ১৯৯৯), পৃ. ৪২৫
৮০. *Indian Anual Register 1928 Vol, 1, p. 257.* উদ্বৃত : রামেশ্বর শ পৃ. ৫৯
৮১. সালাউদ্দীন আইয়ুব, ফ্রানৎস ফাঁনো, *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৯), পৃ. ৮৬
৮২. জীবননান্দ দাশ, *জীবননান্দ সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ১৯
৮৩. *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৪
৮৪. আকিমুন রহমান, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২১
৮৫. *তদেব*
৮৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *বিবাহের চেয়ে বড়, অচিন্ত্য রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, বিশেষ সংস্করণ (কলকাতা : গ্রন্থলয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ১৫৫
৮৭. গোপীকানাথ রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৭
৮৮. *তদেব*
৮৯. *তদেব* পৃ. ৩০০
৯০. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৭৭
৯১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৭
৯২. বুদ্ধদেব বসু, *রাত ভরে বৃষ্টি* (কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯০), পৃ. ৯৪
৯৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৪
৯৪. বুদ্ধদেব বসু, *পাতাল থেকে আলাপা : মেঘ বৃষ্টি রোদ* (কলকাতা : কামিনী প্রকাশনী, ১৯৮৬ গ্রন্থে সঙ্কলিত), পৃ. ৩১৪-১৬, উদ্ধৃত; বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, পৃ. ২৬৪
৯৫. মুহাম্মদ রেজাউল হক, *পূর্বোক্ত*, *পৃ.* ৯১
৯৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯১
৯৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৬
৯৮. *তদেব*, পৃ. ২১১
৯৯. *বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ*, সপ্তম খণ্ড (কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৪৩৯-৪০। স্বাতী-সত্যেনের প্রেম 'দুই নিঃসঙ্গ মানব-মানবী একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে সঙ্গতির নতুন ভুবন, উদ্বৃত; বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ২১০
১০০. সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি (সম্পাদক), *বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮
১০১. সাইদুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২
১০২. আকিমুন রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭২
১০৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১০
১০৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩
১০৫. চন্দন ভট্টাচার্য (সম্পাদক), *সতীনাথের জাগরী: স্মরণে মননে* (কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১), পৃ. ৬৮
১০৬. সতীনাথ ভাদুড়ী, *সতীনাথ রচনাবলী* (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৮), পৃ. ৫১
১০৭. সতীনাথ ভাদুড়ী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪
১০৮. *তদেব*, পৃ. ১১৬
১০৯. *তদেব*, পৃ. ১১৭
১১০. *তদেব*, পৃ. ১৪৬
১১১. জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১
১১২. অরিন্দম গোস্বামী, *সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০১), পৃ. ১৭৩
১১৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৪
১১৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র, *চেনামহল* (কলকাতা : গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩ দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৬৪
১১৫. শোয়াইব জিবরান, *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ১৪৬
১১৬. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৩

চতুর্থ অধ্যায়
সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্যবিত্ত জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ
সমরেশ বসুর উপন্যাস : প্রথম পর্ব

উপন্যাস জীবন ও শিল্পের রূপায়ণ। ঔপন্যাসিক বস্তুজগতের আহরিত তথ্যকে সামঞ্জস্য পূর্ণ সূত্রে গেঁথে উপন্যাস রচনা করেন। মধ্যবিত্তজীবনের সক্রিয় ভাবনায় উপন্যাসের জন্ম। এই মধ্যবিত্তই উপন্যাসে গোষ্ঠীচেতনার স্থলে ব্যক্তিচেতনার সংযোজন ঘটায়।[১] ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ সাহিত্যে নবতর মাত্রা এনে দেয়। সমাজজীবনের নানামাত্রিক অসংগতি ও অসামাঞ্জস্যের সাথে ব্যক্তির সংকট ও সংঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তির সংকটই উপন্যাসে মূল উপজীব্য। সমরেশ বসু মধ্যবিত্তজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে প্রথম পর্বে গ্রামীণ এবং নগর উভয় পটভূমিতে মধ্যবিত্তের মানসলোককে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার নিম্নবিত্তের নাগরিক মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার ক্রমরূপান্তরও এসেছে তাঁর উপন্যাসে। সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এই পর্বে গুরুত্ব পেয়েছে। সমাজ-রাজনীতির বিরূপ পরিবেশে তাঁর নায়কেরা স্থিত হতে পারেনি। প্রেম এবং দাম্পত্যজীবনে নানাবিধ সঙ্কটে নিপতিত হয়েছে। স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কে মানসিক দূরত্ব বেড়েছে, প্রেমিক তার প্রেমিকার সম্মান রক্ষা করতে পারেনি। আবার একই সঙ্গে এই পর্বে প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু কিছু চরিত্র সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে ।

মধ্যবিত্ত জীবনের কথা যখন লিখেছেন সমরেশ বসু তখন অবক্ষয়ের পথে দ্রুত ধাবমান বাঙালির চিত্রই এসেছে।[২] সমরেশ বসুর প্রথম রচিত উপন্যাস *নয়নপুরের মাটি*- তে মধ্যবিত্ত জীবনের আভাস থাকলেও *শ্রীমতি কাফে*-তে মধ্যবিত্তের চিত্তসঙ্কট, দেশপ্রেম-রাজনীতি এবং দাম্পত্যসঙ্কটের শিল্পরূপ বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমতি কাফে*-এর নায়ক ভজুলাটের দৃষ্টিতে সমাজ-রাজনীতির পরিবর্তমান কালকে এনেছেন। *বাঘিনী*-তে দেখালেন সাতচল্লিশ-উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠের এক বেকার যুবকের চোরাকারবারি হওয়া এবং সেখান থেকে উত্তরণ। এই সময় দারিদ্র্যের কষাঘাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা অবলীলায় পতিতাবৃত্তিতে নিজের নাম লিখিয়েছে। শ্রেণিচরিত্র এবং মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে তারা নির্বিবাদে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে।

নয়নপুরের মাটি

সমরেশ বসু জীবনের বিচিত্রতার রূপকার। তাঁর উপন্যাস বৈচিত্রতার সন্ধানী। জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অনন্য। দীর্ঘ জীবনের উপন্যাসচর্চায় যে জীবনকে তিনি শিল্পিত করেছেন তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি *নয়নপুরের মাটিতেই*[৩] লক্ষ্যযোগ্য। নয়নপুরের মাটি গ্রামীণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে রচিত।

উপন্যাসটির বিষয়ে সমরেশ বসুর পরবর্তীকালের মন্তব্যটি স্মরণীয়-'মাটি এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র, কারণ প্রধান পুরুষ চরিত্র মাটির মূর্তি গড়ার গ্রামীণ শিল্পী, আর সেই সব মূর্তিই তার গৃহ সমাজ এবং ব্যক্তি জীবনের মূলধারে ছিল।'[৪] মহিমের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে তার শিল্পজিজ্ঞাসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে সত্য, শিব সুন্দরের পূজারী। শিল্প প্রকাশ করে শিল্পীর অনুভবকে, তার অপরোক্ষ অনুভূতিকে। শিল্পী হলো বেদান্তের স্বচ্ছ সত্তা, অনির্ভর, অসীম, ক্ষয়হীন। তাই শিল্প হল মানুষের চিন্ময়ী শক্তির লীলারূপ।[৫] মহিমের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। মহিম বাস্তববাদী জীবনশিল্পী। জীবনকে দেখার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তার শিল্পসত্য জীবনসত্যে রূপায়িত হয়েছে। মহিমের পরিবার নয়নপুরের আর দশটা নিম্নজীবী পরিবার থেকে একটু আলাদা। মহিমের বাবা দশরথ নিজের শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। উচ্চবর্ণের তাচ্ছিল্যের কারণ অনুসন্ধানে তিনি বুঝেছিলেন চরম দারিদ্র্যই এর কারণ। অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিম্নবিত্ত থেকে নিম্নমধ্যবিত্তের পর্যায়ে উঠে এসেছিলেন। শ্রেণি অবস্থান নিয়ে কিছুটা বিদ্রোহী দশরথ অনুধাবন করেছিলেন নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় না করতে পারলে বর্ণহিন্দুদের প্রতাপ থেকে মুক্তি নেই। 'বর্ণহিন্দু না হোক ভদ্দরলোক হতে তার আপত্তি কোথায়?'[৬] তার একক প্রচেষ্টা কার্যকর হয়েছিল। বর্ণহিন্দুরা তাকে সমীহ করে চলত। তিনি তার দুই সন্তান ভরত এবং মহিমকে কখনোই মাঠে চাষ করতে পাঠাননি। ইচ্ছা ছিল ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হবে। কিন্তু বড়ছেলে ভরত তাকে নিরাশ করেছিল। ছোট ছেলে মহিম শিল্পী হওয়ার স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিল। স্কুল পালিয়ে সে কুমোরদের মূর্তি গড়া দেখতো। মনের রূপকে মাটিতে রূপ দেওয়ায় তার আনন্দ।

উপন্যাসটি যদিও নিম্নজীবীদের[৭] জীবন নিয়ে রচিত তারপরও কিছু চরিত্র নিজ গুণে মধ্যবিত্ত সমশ্রেণিতে উঠে এসেছে। সমরেশ বসু মাত্র বাইশ বছর বয়সে *নয়নপুরের মাটি* লেখেন। স্বভাবত অপরিণত বয়সের ছাপ এই উপন্যাসে প্রকট। অধিকাংশ চরিত্রই স্কেচধর্মী। এখানে যেসব চরিত্রের প্রকাশের সুযোগ অতিমাত্রায় ছিল, সেগুলি লেখকের মনোযোগ বা অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হওয়ায় মাঝপথে তারা শিথিল, অসংলগ্ন ও পূর্বাপর সংগতিহীন সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮] তারপরও চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহিম একজন মৃৎশিল্পী। নয়নপুর গ্রামে বেড়ে ওঠা এই মহিমের শিল্পের কেন্দ্রস্থল তার গ্রাম। মৃৎশিল্পী হওয়ার অদম্য বাসনা আর কুমোরদের কাজ দেখে সে শেখে। তার গুরু কুমোর শ্রেষ্ঠ অর্জুনপাল। প্রথমে তার মনে হতো 'মনের চেহারা, হাতের মাটিতে দেয় না ধরা। আ! সে কি অসহ্য কষ্ট আর অশান্তি। যা চাই, তা কেন পাই না? আবার গেছে ছুটে ছুটে, দেখেছে কারিগরদের

কাজ। আবার তৈরী করেছে মূর্তি।[৯] এ যেন এক শিল্পীর মনের সত্যিকারের যন্ত্রণা-মনের চেহারা প্রকাশ না পাওয়ার বেদনা।[১০]

মহিমের স্বপ্নকে পরিশীলিত রূপ দেয় তার অসমবয়সী বন্ধু গৌরাঙ্গসুন্দর। মহিমের সে-ই আসল নিয়ন্তা। দেশি- বিদেশি শিল্পীদের কাহিনি শুনিয়ে সে মহিমের স্বপ্নকে দৃঢ় করে। স্বপ্নালু মহিম গৌরাঙ্গের হাত ধরে কলকাতায় পাড়ি জমায় বড় শিল্পী হওয়ার নেশায়। গৌরাঙ্গ মহিমকে কলকাতার আর্ট স্কুল, মিউজিয়ামের চিত্রশালা, দেশি কারিগরদের তৈরি নানান ধরনের মূর্তি দেখায় যা দেখে মহিমের মন ভরে যায়। কিন্তু তিন বছরের নগর জীবনে সে একসময় হাঁফিয়ে ওঠে। নাগরিক নিস্প্রাণতা আর অপরিচিতের ভিড়ে তার মন কেঁদেছে খালপাড়ের নয়নপুর গ্রামটির জন্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নালু গৌরাঙ্গের কাছে সে অসহায় বোধ করে। তাই তার দাদা-বৌদি যখন তাকে নিতে আসে মহিম অনায়াসে বৌদিদের সঙ্গে চলে যেতে রাজি হয়। গৌরাঙ্গ বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি— 'হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে পাগলা গৌরাঙ্গ প্রচণ্ড বেগে একটা ধমক দিয়ে কিল চড় মেরে মহিমকে শুইয়ে ফেলল তার পায়ের কাছে।'[১১] মহিমের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশে সে এই ব্যবহার করে। তিলে তিলে মহিমকে সে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত করেছিল মহিমের প্রত্যাবর্তন তার স্বপ্নের অকাল মৃত্যু যা সে মেনে নিতে পারেনি। এর পর থেকে প্রতিবাদস্বরূপ সে মহিমের সাথে চিরদিনের জন্য কথা বন্ধ করে দেয়।

মহিমের শিল্পসাধনা জীবনঘনিষ্ঠ। গৌরাঙ্গের সান্নিধ্য তাকে মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। গৌরাঙ্গের একটি মাত্র উক্তি— 'শিল্পসাধনা আপসের পথ ধরবে যদি না তুমি এ মানুষের বাঁচার তাগিদে ভাস'[১২] মহিমের জীবন পথের পাথেয় হয়েছে। মহিম তাই নয়নপুরের লড়াকু চাষি হরেরামের মূর্তি গড়ে, কালাচাঁদ অখিলের মূর্তি গড়ে, কুঁজোকানাইয়ের মূর্তি গড়ে। ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে মহিমের শিল্পসাধনা নয়নপুরের সংগ্রামী মানুষের সাথে একাত্ম হয়েছে। তাই উমার শত প্রলোভনে সে কলকাতায় যেতে রাজি হয়নি কিংবা জমিদারকে গান্ধীর মূর্তি বানিয়ে দিতে চায়নি। এমনকি জমিদারের বেতনভুক্ত আর্টিস্ট হয়ে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে চায়নি।

গৌরাঙ্গ উপন্যাসের অন্য চরিত্র থেকে ব্যতিক্রম। সে গ্রামের মানুষকে উদ্দীপিত করেছে, জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে। নয়নপুরের আপামর জনগণের সে অলক্ষ্য পরিচালক। ভাগচাষি ও ভূমিহীন চাষিদের জমিদারের শোষণ ও রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করার মন্ত্র সে-ই শিখিয়েছে।[১৩] সাম্যবাদী ভাবনায় দীক্ষিত গৌরাঙ্গ গোবিন্দকে বলে :

ভগবান নেই বা মানা-না মানার পক্ষে নয় তার যুক্তিটা হচ্ছে— সে ধর্ম নিয়ে থাকুক, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যাক যেথায় খুশি, কিন্তু সংসারের হাড়-কালি-করা মানুষের শ্রমের খাবারে সে কেন উদরপূর্তি করবে? মানুষের সবটাই হাতেনাতে। সে তার মগজে আর শরীরে খাটে, তাই সে খায়। তার কাজের অন্ত নেই। কিন্তু গোবিন্দ! বুঝলাম, হয়তো সে মানুষের চিত্তশুদ্ধির দায়িত্ব নিতে চায়, কিন্তু তা ধর্মের নামে কেন? দেশবাসী নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত। ধর্ম দিয়ে কি তা ভরাট হবে? ঘরে বাইরে কেবলি কলহ, বিবাদ, হানাহানি, মারামারি, ঘৃণা আর নীচতা। তার মূল তো ধর্ম নয়, তার অভাব, তার সমাজব্যবস্থা। যার পায়ের নীচে মাটি নেই, ধর্ম তার মাথায় কি ফুল ফোটাবে আপসে![১৪]

অধ্যাত্মমার্গের পথিক তন্ত্রসাধকের পুত্র গোবিন্দের মনে সে পরিবর্তন আনে। গৌরাঙ্গের ইহজাগতিক ভাবনা গোবিন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় গোবিন্দের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ফাটল ধরে। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। ঈশ্বর সম্পর্কে সে বলে— 'যা দেখতে পাই না, ছুঁতে পাই না তার কথা ভাবি না আমি।'[১৫] প্রগতিশীল মানবতাবাদী সংস্কারমুক্ত গৌরাঙ্গের কাছে কুঁজো কানাইয়ের জন্মের ব্যাখা ভিন্নরকম। সে মনে করে কুঁজো কানাইয়ের এই অভিশপ্ত জীবনের দায় সবার। তাই কানাইকে এই ভার বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে কেন? গৌরাঙ্গ উপন্যাসে বেশ কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারপরও উপন্যাসে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কম।

উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র নিজেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ভাবে সে হচ্ছে মহিমের বড় ভাই ভরত। যদিও তার অবস্থান নিম্নমধ্যবিত্তের পর্যায়ে। মিথ্যা ভদ্রলোকী আভিজাত্য ও অহংকারে সে কখনো শ্বশুড়বাড়ির আত্মীয়দের সম্মান দেখায়নি। অহল্যা চাষির ঘরের মেয়ে ভরতের সাথে বিয়ে হয়েও বিভ্রান্ত হয়নি কিন্তু ভরত বিভ্রান্ত হয়েছে। বাবার মতো সেও কখনো চাষবাস করেনি। সদর কাছারিতে মামলা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। রূঢ়ভাষী ভরতকে গ্রামের মানুষ পছন্দ করেনি। পোশাকে কথাবার্তায় সে স্বতন্ত্র। স্ত্রী পরিজনের মধ্যে থেকেও ভরত নিঃসঙ্গ। চরিত্রটির ট্রাজেডি হচ্ছে সে তার দুঃখের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। অন্যকে ঠকিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে তার চরম পরাজয় হয়। তার নিজের ভাই মহিম তাকে শনি বলে গালি দেয়। এরপর থেকে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সমস্ত মামলাতে তার পরাজয় হতে থাকে। জমিদারের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র মধ্যস্বত্বভোগী অক্ষয় জোতদার। দেনার দায়ে অখিলের মহিষ কালাচাঁদকে এনে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলে। এই মৃত্যুতে অক্ষয়ের কোনো অনুশোচনা নেই। অখিলের কান্না দেখে সে বলে— 'ওসব কান্নামান্না রেখে যাবি ডোমপাড়ায়, নাকি ধাষ্টামো করবি? এর পরে আবার পাওনা-গণ্ডার হিসাব-টিসাবগুলান দেখে যা, ন্যাকামো রাখ্'।[১৬]

জমিদার হেমবাবু ও তার পুত্রবধূ উমা ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তের শ্রেণি প্রতিনিধি। হেমবাবু গান্ধীর মতাদর্শে বিশ্বাসী। অসহযোগ অন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিন জেল খেটেছেন। গান্ধীর আদর্শে স্থিত হয়ে নয়নপুরের জমিদার বাড়িকে তিনি নতুন করে সাজিয়েছেন। তিনি সামন্তবাদী চরিত্র। সামন্তবাদী ভাবনায় আচ্ছন্ন। তার পুত্রবধূ উমা শিল্পের সমঝদার। উমার আগ্রহে তিনি মহিমকে জমিদার বাড়ি ডেকে আনেন। হেমবাবু মহিমকে জমিদারবাড়ির প্রতিমা গড়ার প্রস্তাব দেন কিন্তু মহিম তা প্রত্যাখ্যান করে। জমিদারের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রচেষ্টায় সাধারণ চাষিরা তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

উমা মহিমের শিল্পকে ভালোবাসতে গিয়ে একসময় শিল্পীকে গ্রাস করতে চেয়েছে। কিন্তু শত প্রলোভনের টোপে মহিম আত্মবিক্রিত হয়নি। উপন্যাসটির সফলতা এইখানেই যে নয়নপুরের এই মৃৎশিল্পীকে জমিদার জোতদার শত চেষ্টায় আত্মঅধিকারে আনতে পারেনি। মিথ্যা মামলায় খাজনার দায়ে যখন তারা গ্রাম ছেড়েছে তখন তাদের পেছনে হাজারো মানুষ। এই অন্তিম মুহূর্তে মহিম অহল্যাকে কথা দেয় সে তার পাথরের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

অকৃতার্থ শিল্পীর কাহিনি *নয়নপুরের মাটি।* এখানে নায়কের সাথে গ্রামের মানুষের অন্তরঙ্গতা ঘটেনি। মহিম গ্রামের মানুষের সংগ্রামকে বুঝেছে কিন্তু একাত্ম হতে পারেনি। সাধারণ চাষির অর্থনৈতিক লড়াইয়ে সে শামিল হতে পারেনি।[১৭] কিন্তু তার শৈল্পিক সত্তা তাদের দ্রোহকে প্রকাশ করেছে।

শ্রীমতি কাফে

ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল সমরেশ বসুর *শ্রীমতি কাফে*। উপন্যাসটির কালগত পরিসর **১৯২২-১৯৩৯** খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে পুনশ্চের মতো স্বাধীনতার পরের সালটি সংযোজিত হয়েছে। এই সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের দেশাত্মবোধ, রাজনীতিচেতনা, সংগ্রাম এবং মুক্তির প্রয়াস সবই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসটিতে সমকালীন রাজনীতির বাস্তবতা, ব্যক্তির মতাদর্শের ভিন্নতা, পরিবর্তমান কাল সবই এসেছে যুগপৎভাবে। গান্ধীবাদ-সন্ত্রাসবাদ-সাম্যবাদঃ মূলত এই তিনটি ধারার তর্ক বিতর্ক প্রয়াস-ব্যর্থতা, উজ্জীবন-ক্লান্তি চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসটিতে।[১৮] ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'শ্রীমতি কাফে কোনও রেস্তোরাঁ নয়।'[১৯] শ্রীমতি কাফে একটি রঙ্গমঞ্চ। রাষ্ট্রীয় জীবনের এক অস্থির দামাল সময় এই রঙ্গমঞ্চে মূর্ত হয়েছে।[২০]

উপনিবেশিত ভারতবর্ষে ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্তের রাজনীতি নিয়ে মতপার্থক্য, অস্তিত্বসংকট, দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা, নীতিবর্জিত মনোভঙ্গি, হতাশা, বিবমিষা ইত্যাদি বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় *শ্রীমতি*

কাফেতে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, উন্মুল মানসিকতা, অস্থির রাজনীতি, জীবনবিবিক্ত হতাশাগ্রস্ত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এটি রচিত। সমরেশ বসুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসে অনেক চরিত্রের আনাগোনা। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল প্রত্যেকেই সমকালীন ব্রিটিশরাজের শোষণে নিষ্পেষিত, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভজন হালদার। তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য চরিত্র আবর্তিত।

উপন্যাসের শুরুটা ভারতবর্ষের রাজনীতির এক অস্থির সময়কে কেন্দ্র করে। 'সময়টা উনিশশো বাইশ সালের বসন্তকালের শেষ দিক। সারা দেশটা যেন একটা বিরাট ছাইয়ের ভগ্নস্তূপ হয়ে আছে। ছাইয়ের স্তূপটা বিলেতি কাপড়ের। ...জাতীয় আন্দোলনের নিভানো চিতার ছাই প্রদেশ জেলায় ছড়িয়ে যেন একটা ধুসর আবছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।'[২১] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্দৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন। তিনি দেখলেন যাকে তিনি জাগাতে যাচ্ছেন 'সে একটা সুপ্ত হিংস্র সিংহ। অহিংসা বোঝে না সে।'[২২] এভাবেই ঔপন্যাসিক জাতীয় জীবনের টানাপোড়েনের সাথে চরিত্রদের মিলিয়ে দিয়েছেন।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে ঔপন্যাসিক পাঠককে বুঝিয়ে দেন উপন্যাসের চরিত্ররা চলমান জাতীয় আন্দোলনের জটিল আবর্তময় সময় পার করবে। সমালোচক এ সম্পর্কে বলেন :

> এখানে রাজনৈতিক মতামতের পারস্পরিক সংঘাত বা সমন্বয়ে আন্দোলনের স্বরূপ বাঁক নিয়েছে বিচিত্রভাবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির কাছ থেকে কখনও আবেদন নিবেদনের গোল টেবিল শুষ্ক পত্রে ভরে উঠেছে, কখনওবা তার প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা করে গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসের ধারালো অস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছে, আবার কখনও বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করে কলে-কারখানায় খেতে-খামারে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয়েছে।[২৩]

উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ দীর্ঘ আটাশ বছরের কালপরিসরে বাঙালি মধ্যবিত্তজীবনের আদর্শ ও অস্থিরতাকে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভজনানন্দ হালদার। ব্যক্তিগত জীবনে সে কিছুটা বিদ্রোহী এবং স্বাধীনচেতা। সে কখনোই পোষমানা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হতে চায়নি। যে কারণে বিদেশী শাসকের অধীনে চাকরি করবে না বলে মনস্থির করে। এই প্রত্যয় থেকে সে স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করে। বিএ পাস করে চায়ের দোকান দেয়। তার পেশা নির্বাচনে তার পরিবার এবং একান্তজনেরা হতাশ হয়। ভজন এ সংসারে চির অবিশ্বাসী। ওমর খৈয়ামের লেখা 'সে এক মরুর বুকে অবিশ্বাসী থাকত সুখে'[২৪] উক্তিটি তার প্রিয়।

কারণে অকারণে সে উক্তিটি আওড়ায়। সংসারে দাদা নারায়ণের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু দাদার চলার পথকে সে কখনোই নিজের পথ ভাবেনি। তাই দাদার মতো বিপ্লবী হতে চায়নি। তার মনে হয় 'ওটা একটা বৃথা কাজ, পাথরের দেওয়ালে অকারণ মাথা ঠোকা। যে কারণে সে সাধু হবে না সে কারণে হবে না বিপ্লবী। তাদের জন্য তোলা রইল নমস্কার।'[২৫] তার এই উক্তিতে লুক্কায়িত আছে তার চরিত্রের গতি প্রকৃতির মূল সূত্র।

ভজন তার সমাজে ব্যতিক্রম চরিত্র। সে কবি, অবশ্য ছাপার অক্ষরে সেই কবিতা কখনোই আলোর মুখ দেখেনি। সে এমন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখেছে যেখানে সে 'তার সমস্ত বেদনা যন্ত্রণা রাগ হাসি নিয়ে সে একজনের কাছে নিজেকে সঁপে দেবে।'[২৬] তার রোম্যান্টিক মন স্ত্রী হিসেবে কপালকুণ্ডলার মৃন্ময়ীকে কল্পনা করেছে। বিয়ের সময় পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী স্বচ্ছল পরিবারে যৌতুক নিয়ে তার বিয়ে হয়। জীবনে স্থিতি আনতে বোহেমিয়ান ভজনের বিয়ে দেওয়া হয়।

ভজন চা ও ঘুঘনি বিক্রি করে কিন্তু শিক্ষার কারণে ভজন থেকে ভজুলাট হয়ে ওঠা ভজন দুঃসাহসী এবং অবিশ্বাসী। এই অবিশ্বাসের মূলে আছে মধ্যবিত্তের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার সুপ্ত ইচ্ছা। তার জীবনে কোনো স্থিরতা নেই। সে অনেকটাই বেখেয়ালি এবং স্বাধীনচেতা। দাদার রাজনৈতিক সহকর্মীদের থেকে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতেই সে গভীর রাত্রে শ্মশানে 'শ্রী' লিখে আসে। জীবনযাপনের সামূহিক যন্ত্রণা থেকে তার মধ্যে হতাশার জন্ম নেয়। স্বাধীনতা নিয়ে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাছে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়। জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে তার মধ্যে পলায়নপর মনোবৃত্তি তৈরি হয়। এখান থেকে বাঁচতে সে প্রতি মুহূর্তে মদের নেশায় ডুবে থাকে। জীবনের কোথাও ভজন নিয়ম বা শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। ফলে বকুল মা কিংবা স্ত্রী যুঁই কেউই তাকে বাঁধতে পারেনি। যুঁইকে বিয়ের মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল বহুকাঙ্ক্ষিত মুক্তি সে পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু যুঁইয়ের সাথে নিবিড় দাম্পত্য সান্নিধ্যেও সে নৈঃসঙ্গের সংক্রাম থেকে মুক্তি পায়নি। প্রতিক্ষণে তার মনে হয়েছে সে একে চায়নি অথচ সে একেই চেয়েছিল। প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির বৈপরীত্য এবং অপচয়িত অভিশপ্ত জীবনের বহুমাত্রিক যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত। সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের দ্বান্দ্বিক মননের প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে। যুঁইয়ের নৈবদ্য তার অন্তরের জ্বালা মেটাতে পারেনি। শ্রেণিচ্যুতি ঘটিয়ে সে অবলীলায় বাঙালির সাথে মদ খায়। গাড়োয়ান ভনু তার সঙ্গী। কবিতাপ্রেমিক ভজনের মন মধ্যবিত্তের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। তাই সবকিছুতেই তার অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা। স্বশ্রেণির অনেক সুরাসক্ত ভদ্রলোক তার শ্রীমতি কাফেতে তার সান্নিধ্যে এসে অপদস্থ হয়। ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'একসঙ্গে মদ

খেতে গিয়ে ভদ্রলোকদের হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে হাটের মাঝে; তাছাড়া সে চিরকাল দুর্বিনীত, দুর্মুখ তাই বন্ধুহীন।[২৭]

ভজনের বিচ্ছিন্ন বোহেমিয়ান জীবনের একমাত্র দিশা শ্রীমতি কাফে। শ্রীমতির নামের পেছনে কাফে শব্দটি যুক্ত করে একে রেস্টুরেন্ট করেছে। 'এরই পায়ে ঢেলে দিয়েছে সে তার সব ধূলিকণাটুকু, তার অস্থির প্রাণের মমতা ও বুদ্ধি।[২৮] শ্রীমতি কাফে নিয়ে তার অনেক গর্ব, এখানে সে অনেক স্বাধীন। 'বড় সাহেব ছোট সাহেবের দয়াও নেই, চোখ রাঙানিও নেই। এখানে লাট বেলাট যাই বলো সবই ভজন।[২৯] ভজনের স্বাধীন সত্তা শ্রীমতি কাফেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

তবে শ্রীমতি কাফের মালিক হয়েও সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। হতাশা শূন্যতাবোধ ভজনের চেতনাকে বারবার আক্রমণ করেছে। সে মনে করে তার ব্যর্থ জীবনের সাথে জড়িয়ে যুঁই- এর জীবনও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। গ্রাজুয়েট স্বামীর কাছে স্বভাবতই তার কিছু প্রত্যাশা ছিল কিন্তু ভজন তাকে হতাশ করেছে। প্রতিবেশী গৃহবধূর সাথে তার কোন পার্থক্য নেই। দাম্পত্যসম্পর্ক কেবল স্বয়ম্ভূ নর-নারীর সম্পর্ক নয়, বরং তা সমাজ মনস্তত্ব নির্ধারিত ও আর্থনীতিক-সংস্কৃতি-সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান।[৩০] একান্নবর্তী পরিবারে ভজন-যুঁই এর হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের সুযোগ স্বল্প হলেও ভজনের উন্নাসিকতা এই দূরত্বকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। স্বামী হিসেবে সে কখনোই যুঁইয়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের দাম্পত্য সংকটের মূলে রয়েছে মধ্যবিত্ত সুলভ অসম মানসিকতা, অসচ্ছলতা এবং পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা। ভজুলাটের আত্মকেন্দ্রিকতায় তাদের দাম্পত্য জীবন হয়েছে বৈচিত্রহীন এবং প্রাণহীন। ভজনের অনাকাঙ্ক্ষিত অসফল কর্মজীবনের কারণেই যুঁইয়ের সাথে তৈরি হয়নি সুখী দাম্পপত্যজীবন। যুঁই-ভজন সারা জীবন একসাথে থেকেও পারস্পরিক অপরিচয়, অনন্বয়, ও ব্যক্তিত্বের বৈসাদৃশ্যে উভয়ই বিপর্যস্ত। যুঁই অনেক চেষ্টা করেও ভজনকে মদ খাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। মধ্যবিত্তের শিক্ষা স্বাতন্ত্রতা থেকে সৃষ্ট অমোচনীয় মনোযন্ত্রণা ভজনকে সবার থেকে আলাদা করেছে। ভজন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অসহায়ভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছে 'আচ্ছা যুঁই এই কী চেয়েছিলে? তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে...কিন্তু আমাকে একলা দোষ দিও না। দোষ যদি দাও তবে এ পুরুষশাসিত সমাজকে দিয়ো।[৩১] ভজনের এই বক্তব্যের পেছনে সমাজ সচেতন মনই ক্রিয়াশীল। তবে তার অনুচ্চারিত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় সে কখনোই পরিবারের একজন হয়ে উঠতে পারেনি।

স্ত্রী-পুত্রের প্রতি দায়িত্বশীল না হতে পারলেও তার মধ্যে একজন স্নেহশীল পিতা ছিল। সে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে। 'ওরা যে মাতালের ছেলে। যার ভবিষ্যত নেই, তারই ছেলে। কী আছে ওদের

ভবিষ্যৎ জীবনে।'[৩২] পারিপার্শ্বিকতায় ভজনের মনে হয়েছে তার সন্তানেরা হয়তো তার দোকানের কর্মচারি বিশের মতো দারুণ ক্ষুধায় মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে উঠবে।[৩৩] এ বেদনাবোধ তাকে নিরবলম্ব করেছে।

ভজন মাতাল হলেও মানবতাবাদী। মধ্যবিত্তের ভণ্ডামিকে সে ঘৃণা করে। নিজের শ্রেণির প্রতি ঘৃণায় সে শ্রেণিচ্যুত হতে চেয়েছে; কিন্তু পারেনি। মুক্তির আহ্বানকে সে বরণ করেছে তার মানসপ্রতিমা শ্রীমতি কাফের মাধ্যমে।[৩৪] শ্রীমতি কাফে নিয়ে সে কখনো লাভের চিন্তা করেনি। সে নিজে বাঁচতে চেয়েছে এবং অন্যকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাই দোকান থেকে তার কর্মচারি বিশে খাবার চুরি করে খেলে সে বিশেকে বলে 'দোকান থেকে খাবি কিন্তু এটাকে বাঁচিয়ে খাস্। খাস্ যা তোর প্রাণে চায়।[৩৫] আবার বিশের মৃত্যুতে তার মনে হয়েছে শ্রীমতি কাফের অভিশাপে তার মৃত্যু হয়েছে।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। সমকালীন রাজনীতির প্রতি সংক্ষুব্ধতা থেকে এই চেতনার উৎসারণ। তার সৃষ্ট চরিত্ররা ক্ষমতায় আসীন হবার আকাঙ্ক্ষায় কিংবা ক্ষমতার লোভে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে না। ব্রিটিশ শাসন শোষণ এবং নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদের প্রতিবাদ, সংগ্রাম থেকেই তারা উদ্ভূত। উপন্যাসে ভজনের রাজনীতি নিয়ে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কোনটাকে সে সমর্থন করে তার স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তবে ভজন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও অন্তরে রাজনীতি লালন করে। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের ফাঁকি সে ধরতে পেরেছিল। হীরেন মজুরদের যথার্থ শিক্ষা দিয়ে সত্যাগ্রহ করাতে চাইলে সে পুনরায় ব্যঙ্গ করে 'শিক্ষা দিবি সত্যাগ্রহ করবে, ওদিকে ইংরেজদের ঠ্যাঙানিতে যে সব পটল তুলবে বাবা। সত্যাগ্রহ বনাম কামান।'[৩৬] হীরেন সমকালীন রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতি ত্যাগ করতে চাইলে সে ব্যঙ্গ করে বলে 'পেঁয়াজি পেয়েছিস ...কাবলে দেখেছিস, পাওনাদার মরে গেলে কবরে লাঠিপেটা করে, কোথায় পালাবি?[৩৭]

উপন্যাসের পটভূমি ১৯২০ থেকে ১৯৩৯ সময়পর্ব। সময়টা এ দেশের ইতিহাসের একটি ক্রান্তিপর্ব।[৩৮] পরিবর্তমান পারিপার্শ্বিকতায় সে হতাশ, যুগ তার কাছে ক্রুদ্ধ, বীভৎস, বিভীষিকা আর বিশ্বাসঘাতকতার রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। পারিপার্শ্বিকতার কাছে ভজন হার মানতে চায়নি, তারপরও বোঝে এখান থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। নেশা তার আত্মরক্ষার কৌশলমাত্র। ভাবনা ভয় উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তির সাময়িক পথমাত্র। ভজন কখনো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসায় অর্থসাহায্য করে কখনো কানুকে কার্ল মার্কসের বই পড়তে দেয়, আবার কখনোবা গরিব দোকানদারের বিদেশী সিগারেটের দোকান

পিকেটিং প্রতিহত করে। তবে একটা জায়গায় তার বিশ্বাস অটল, সে তার দাদা নারায়ণ। নারায়ণের দ্বীপান্তরের শাস্তিতে তার মনে প্রশ্ন জাগে 'তবে কি পাপ করেছে আন্দামানের বন্দিরা? তাদের জন্য একটি কথা তোমরা বলেছ। বলি ফাইল বগলদাবা ক'রে ইংরেজের অফিসে গিয়ে কোন্ স্বরাজের জন্য তোরা লড়িস্ ? বন্দিদের এই তিলে তিলে মরণ, তোমাদের এ শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো আর পরস্পরের সাহায্যের রাজনীতির জন্যে ?[৩৯] ভজন চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মধ্যবিত্তজীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পরাধীনতার জ্বালাকে রূপায়িত করেছেন।[৪০]

মানবতাবাদী আধুনিক মানুষকে পদে পদেই আপস করে চলতে হয়। ইচ্ছার সঙ্গে ক্ষমতার এবং এক ইচ্ছার সঙ্গে অন্য এক বিরোধী ইচ্ছার টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বে ব্যক্তিমানুষের সব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটে। এভাবে অন্তিম পরিণতিতে ব্যক্তির অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন।[৪১] ভজন এই সমাজ-ইচ্ছাকে নিজস্বতা দিয়ে অতিক্রম করতে চায়। ক্রমেই ভজন চরিত্রে নেতিবাচকতা থেকে ইতিবাচকতায় উত্তরণ ঘটে। থেমে যাওয়া জীবনের অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে সে গাড়োয়ান ভনুকে বলে 'জীবনের ভাঙা পথে আমি যেন তোর মত গাড়োয়ান হতে পারি। আমাকে যেন কোন দিন থামতে না হয়। কোনওদিনও না।[৪২]

ভজন সমাজের সর্বত্রই বেমানান। নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। জীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছে কিন্তু শেষটায় দেখেছে সে বদ্ধ মাতাল। তাই হীরেনকে বলেছে 'মাইরী ভাঙা ছাড়া কিছু গড়তে পারলুম না এ জীবনে। তোরা গড় আমি দেখবো।[৪৩] সমস্ত কিছুর মধ্যে সে 'যেন এক বিচিত্র বিপজ্জনক খেলার দর্শক'।[৪৪] নিঃসঙ্গ ভজনের হাহাকার উপন্যাসের সর্বত্র বিরাজমান :

> সে তাকিয়ে দেখল সারা ঘরটা। অভিশাপ নয়, শ্রীমতি কাফে যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ওইখানে চিরমুদ্রিত চোখ দেশবন্ধুর। আর একদিকে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, সামনে তাকিয়ে আছে। গবাক্ষপথে কী যেন দেখছে তলোয়ারধারী সিরাজদ্দৌলা। ক্রুশে গাঁথা জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার এক দারুণ ও মহাপরিণতির প্রতিমূর্তি যীশুখ্রীস্ট। বিশ্বরূপে বিরাজিত র‍্যাফেলের মা ও ছেলে। আর ওই যে বিরাট ল্যান্ডস্কেপ দেখা যাচ্ছে, একটা বুড়ো বটের গোড়া ঘেঁষে পাক খেয়ে বেঁকে গিয়েছে একটা লাল রাস্তা। এঁকেবেঁকে মিশে গিয়েছে দিগন্ত, যেখানে আকাশ ঠেকেছে। ধু ধু পথ আকাশ।
> ভজনের মনটা যেন ঘর-বিমুখ বাউলটার মতো ছুটে গেল ওই পথে। হ্যাঁ, সে চলে যেতে চায় এই মুহূর্তে থেকে অনেক দুরে। এ বিশ্ব সংসারের বাইরে।[৪৫]

ভজনের সমাজটা নষ্ট। শৈশবে দেখা দূরসর্ম্পর্কীয় মাসিমাকে অর্থের কারণে ব্লেড দিয়ে হত্যা, প্রতিবেশীর নগ্ন চরিত্র, মাতাল বাবা কোনো কিছুই তার মধ্যে শুভবোধ জাগাতে পারেনি। তাই সে মদ খেয়ে বীরদর্পে পিতার সামনে হেঁটে গেছে আর স্বগতোক্তি করেছে ...কার তোয়াক্কা কীসের তোয়াক্কা, আর কীসের আশায়? জীবনটাকে কোনওরকম ক্ষয় করে ফেলা, এই তো জীবন![৪৬] জীবনের বেড়াজাল ভাঙতে

না পারার ক্ষোভ আজীবন বহন করেছে। নিজেকে সবসময় গোপন করেছে। প্রতিবাদী ভজন তার জীবনের ভিত উপড়ে বের হতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। তবে যারা বেরোবার, মধ্যবিত্ত বিবর ভাঙার পথে এগিয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।[৪৭] কেউই তার চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও ভজন মদ চায় আর ফিসফিস করে বলে 'কথা বল হে মৌন রাত/চোখ চাও/মুক্তি দাও'।[৪৮] ভজন মুক্তি চেয়েছে । মৃত্যু তাকে সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দিয়েছে।

উপন্যাসে আরেক নিঃসঙ্গ মানুষ ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাজীবন স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে। তথাকথিত মধ্যবিত্তের সৎ জীবনযাপন করেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে ভজনের সান্নিধ্যে এসে বুঝেছে জীবনের অচরিতার্থতা। ভজনকে সে বলে 'দেখো ভজু নিজের জীবনটার দিকে যতই ফিরে তাকাই, কেবলি দেখি কতগুলো ফাইল, কাগজ আর বাংলাদেশের কতগুলো স্টেশনের অন্ধকার ঘর...ছি ছি ছি আমার ঘেন্না ধরে গেছে ভজুলাট, ও জীবনটা আমি আর দেখতে চাইনে।'[৪৯] অখণ্ড অবসর আর অবসাদগ্রস্ত জীবনে এসে পুত্র-পুত্রবধূর দাম্পত্যজীবনের খুনসুঁটি দেখে চিন্তা করে জীবনে এরকম সময় পার করেছে কিনা। আবার নিজের অসফল জীবনের পুনরাবৃত্তি সন্তানের মধ্যে দেখে শিউরে ওঠে। ভজুর দাদা নারায়ণের মতো ছেলে তার কাম্য :

> ক্ষুদিরাম বলে এক বাঙ্গালী নাম শুনেছি, তাকে সরকার ফাঁসি দিয়ে খুন করেছে। তোমার দাদা নারান হালদার কত কথা বলেছে। ভাবি, এ মহাজীবনের এই মহামরণের পথেও যদি আমার ছেলেরা যেত।[৫০]

এই ভবনাথ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত এক নিঃসঙ্গ মানুষ। শ্রীমতি কাফেতে এসে লুকিয়ে মদ খাওয়া তার প্রাত্যহিক রুটিন। খোলস থেকে পুরোপুরি বের হতে পারে না বলে লুকিয়ে মদ খায় আর আত্মমোচন করে— 'আমি একটু হাওয়া চাই। আমার গুমোট ঘরে। আমি যেন আমাকে আর না দেখি।'[৫১] ভনুর স্ত্রী মুনিয়ার প্রতি ভালোলাগার মধ্য দিয়ে আত্মমুক্তির সন্ধান করেছিল কিন্তু অসম মানসিকতা, সমাজে অসম অবস্থান এই মুক্তির প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। ব্যর্থ জীবন নিয়ে সে চিরদিনের মত হারিয়ে যায়।

নারায়ণ বিপ্লবী বাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক। প্রথমদিকে সে গান্ধীবাদী, পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী তার সহযাত্রী হিরেন, কৃপাল তার কাছে রিভলবার দেখে হতবাক হয়। বর্দৌলির ডিসিশনের পর সে সন্ত্রাসবাদে ঝুঁকে পড়ে। গান্ধীর পথ থেকে সরে যায়। বর্দৌলির সিদ্ধান্তকে তার কাপুরুষোচিত মনে হয়। রাজনীতির কারণে সে বারবার কারাবরণ করেছে। প্রিয়নাথের সাম্যবাদের ব্যাখ্যা বুঝতে পারে না তারপরও বিশ্বাস করে প্রিয়নাথের দেখানো পথই হয়তো

একদিন অনুসরণ করতে হবে। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শঙ্কর ঘোষের কাছে মনে হয় নারায়ণ বালুচরে আটকা পড়েছে। যে রক্তপাতের নেশায় তারা মেতেছে গান্ধী সেই রক্তপাতকে ভয় পান। নারায়ণ জানে ইংরেজ সরকার রক্তপাত চালিয়ে যাবে— 'সেই রক্তখেগো বাঘটাকে শায়েস্তা করতে হলে, বল্লম দিয়ে তাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় না করলে তার মৃত্যু নেই।'[৫২]

যুঁই-ভজনের সংসারে নারায়ণ অনেকটা অযাচিত। শৈশবে সাধু হওয়ার বাসনা থেকেই সে সংসার বিবাগী। ভজনের মৃত্যুর পর যুঁই তাকে সংসারের দায়িত্ব থেকে একেবারে মুক্তি দেয়। তবে নারায়ণের মনে সংসারকে না দেখার একটা আক্ষেপ ছিল। অপ্রকাশিত কৈশোরক প্রেম পরিণত বয়সে তাকে নিঃসঙ্গ করে। প্রেমসম্পর্কিত এই আত্মিক সংকট থেকে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার জন্ম নেয়। রাজনীতি-জীবনে সবার মাঝে থেকেও সে নিঃসঙ্গ।

বিপ্লবী নারায়ণের পথে কেউই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জেল থেকে ফিরে নারায়ণ জানতে পারে তার কৈশোরের প্রেমিকা প্রমীলা মারা গেছে। প্রমীলার মৃত্যু, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পরিবারের প্রতি দায়িত্বহীনতা তার মনস্তাত্ত্বিক সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়। এই সংকটজনিত আত্মিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে তার পরিবার-পরিজন, রাজনৈতিক সহকর্মী কেউই অবলম্বন হিসেবে ধরা দেয় না। প্রমীলাকে দেওয়া কথা রাখতে সে প্রমীলাদের বাড়িতে যায় এবং জানতে পারে প্রমীলার অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার কথা। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই বধূটি নারায়ণকে ভালোবেসে তার সন্তানকে নারায়নের মত বিপ্লবী হতে নির্দেশ দিয়ে গেছে। নারায়ন শুধু সংগ্রামী নয় সন্ন্যাসী পর্যায়ের।[৫৩] মধ্যবিত্তের ঘেরাটোপে বন্দি না থেকে ছুটেছে বৃহত্তর মুক্তির আশায়।

নারায়ণের একসময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী হীরেন গান্ধী অনুসারী। স্বরাজ নিয়ে অনিশ্চয়তায় সে বেশ চিন্তিত। গান্ধীর অহিংস নীতিকে সমর্থন জানিয়ে সে মেথর বস্তিতে যায়। মধ্যবিত্তের ভাবালুতা থেকে তার মনে হয় 'না ! সে পথে নয়। চড়ার বুকে এসে গঙ্গার বান বেশি লাফালাফি করে। আমাকে যেতে হবে আরও তলায়, যেন যুগ যুগান্তরে হারিয়ে যাওয়া ভারতের আত্মার সন্ধানে। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই, অশিক্ষা নেই, যেখানে করুণাময় আমাদের সকলের হৃদয়ে সমানভাবে অধিষ্ঠিত। সেই হবে আমাদের নবভারতের জয়যাত্রা।[৫৪] এই প্রয়াস থেকেই সে ভিক্ষাজীবী রামাকে মিউনিসিপালিটিতে ঝাড়ুদারের কাজ দেয় – শোনায় গান্ধীর বাণী। রামার অভূতপূর্ব পরিবর্তন তাকে মুগ্ধ করে। হিরেন কল্পনায় গান্ধীকে রামার পাশে দেখে। হিরেন মধ্যবিত্তের স্বপ্নালুতায় রামার বস্তিতে। বস্তিতে পৌঁছে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। মদ খাওয়ার ঘোর বিরোধী হিরেন বস্তিতে পৌঁছে দেখে সবাই কমবেশি বেসামাল, অপ্রকৃতিস্থ। এরই মাঝে একজন

বলে ওঠে 'গান্ধীবাবাকো পাশ আপ হামারা আপিল লে যাইয়ে, উনকো বাতাইয়ে, হামারা মিনসইপল কি কমোশনার বাবুলোগ চুতিয়া হ্যায়। উঁ চুতিয়ানন্দন হ্যায়।'[৫৫] ব্রাত্যজনের মুখের এসব কদর্য ভাষার মাঝ থেকে হিরেন পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। হিরেন যে ভারতআত্মার কথা ভাবত, বাস্তবে সেই ভারত আত্মা সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অধঃপতিত রামাকে দেখে আহত হয়। আত্মহত্যার কথা ভাবে কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি অপার কৌতূহল তাকে নিবৃত্ত করে। রাজনীতি থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নেয়। সুতা কাটে, ধর্মগ্রন্থ পড়ে আর বেদ-বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখে। ভারতের মহাতীর্থ রূপটি খুঁজে পায় না। নিজেদের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও অপব্যবহারে বিরক্ত হয়। তার মনে হয় 'নিশীথ রাত্রির ঘুমন্ত ভারত, ঊষার মঙ্গলগান ও স্তোত্রে, ঘণ্টা ও কাঁসির ডামাডোলের বাজারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে সবাই।'[৫৬] লেখক বাস্তব সম্পর্কশূন্য মধ্যবিত্তের রাজনীতির অসারতা দেখিয়েছেন হীরেনের মধ্য দিয়ে। হিরেন এখানে প্রতীক মাত্র।

কৃপাল দত্ত কলেজের ক্লাসের দুর্ভেদ্য দেওয়াল পার হতে পারেনি। নারায়ণের রাজনৈতিক বন্ধু এবং শিষ্য। প্রথম দিকে কৃপাল হীরেনের মতো মদের দোকানে পিকেটিং-এ আগ্রহী। সুবিধাবাদী কৃপাল ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতে আগ্রহী। তারই প্রচেষ্টায় সারদা চৌধুরী কংগ্রেসের সভ্য হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সেও হীরেনদের সাথে জেলে যায়। শঙ্কর ঘোষকে গুরু মানে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজেই মদ খাওয়া ধরে। কৃপাল ১৯৪৮ সালে এসে কংগ্রেস থেকে এম.এল.এ নির্বাচিত হয়। শ্রীমতি কাফের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এর স্মৃতি বিস্মতপ্রায় হয়ে শ্রীমতি কাফেকে বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়।

শ্রীমতি কাফে-তে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক চরিত্র আছে। কেননা শ্রীমতি কাফে নিজেই একটি রাজনৈতিক মঞ্চ। রাজনৈতিক চরিত্রদের অন্যতম শঙ্কর ঘোষ মহাকুমা কংগ্রেসের সভ্য। তার বিশ্বাস নারায়ণকে স্বপথে ফেরাতে পারবে। রথীনের মত উগ্ররা তার অপ্রিয়ভাজন। এমনকি প্রিয়নাথের সাথে কথা বলে না মতার্দশের কারণে।

নবীন গাঙ্গুলী মহাকুমা কংগ্রেসের সভ্য। সে টেররিজম ছেড়ে রুশ বিপ্লবের কথা বলে। দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেসের এম. এল. এ হয়ে শ্রীমতি কাফে বন্ধ করে দিতে চায়।

ললিত মুখার্জি মুসলিমবিদ্বেষী। কংগ্রেসের প্রতি কোনো সমর্থন নেই। নিজের যুক্তিগুলো যাচাই করতে শ্রীমতি কাফেতে আসে। লিগ মিনিস্ট্রির জন্য ললিত মুখার্জি আন্দোলনের নতুন পথ পায়। শ্রীমতি কাফেতে এসে বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখে। মূলত নিজের যুক্তিগুলো যাচাই করতেই সে শ্রীমতি কাফেতে আসে।

প্রিয়নাথ সাম্যবাদে বিশ্বাসী কিন্তু সঠিক পথটি জানা নেই। রথীন রেলের ইউরোপিয়ন ইয়ার্ডের ম্যানেজারকে গুলি করে মারতে চাইলে সে বাধা দেয়। শ্রমিকদের বিপ্লব বোঝানোর চেষ্টা করে। তার কাছে শিবহীন যেমন যজ্ঞ হতে পারে না তেমনি শ্রমিক ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। মতাদর্শের কারণে নারায়ণের তার সাথে দ্বন্দ্ব। প্রিয়নাথের সাম্যবাদী ধারণা নারায়ণের কাছে পরিস্কার নয়। নারায়ণও শ্রমিক বিপ্লব চায় তবে তা সমিতি এবং তার কাজগুলো বাদ দিয়ে নয়। প্রিয়নাথের মুখেই প্রথম নৈহাটির শিল্পাঞ্চলের মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির্র কথা শোনে।[৫৭] 'প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অ্যালন হিউম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নামটা বিদেশী ও দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। নামের মাঝে কোথায় যেন একটা বিদেশের গন্ধ ছিল।...আজকে কমিউনিস্ট নামটা অনেকটা কংগ্রেসের মতো।.. যেন সভ্য ঋষির আশ্রমকুঞ্জে অসভ্য উলঙ্গ শিবের আবির্ভাব।[৫৮] ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে প্রিয়নাথ আত্মগোপন করে।

সুরজ সিং শ্রীমতি কাফেতে আত্মগোপন করে। এ উপন্যাসে রাজনীতি নিয়ে সে সব চেয়ে বেশি দ্বিধান্বিত। তবে রাজনীতির ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়াটি তার বক্তব্যে ধরা পড়ে। কখনো বলে গীতায় আমার বিশ্বাস আছে। নরনারায়ণই আমার পথদ্রষ্টা। আবার বলেছে রুশ রেভ্যুলিউশনের মতো আমরাও শ্রমিক আন্দোলন করব। আবার বলে মিরাট কনস্‌পিরেসি সাকসেস হলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত। বলে মুজঃফর আমেদ, ডাঙ্গে...[৫৯]

প্রসন্ন চাটুজ্যে শ্রীমতি কাফের খদ্দের। সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। ঘরে সুন্দরী বউ থাকতে ভনুর স্ত্রীর প্রতি নজর দেয়। টাকা না দিয়ে শ্রীমতি কাফেতে খাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করে ভজনের কাছে অপমানিত হয়। ভজনকে বোকা বানিয়ে উদরপুর্তির আশায় নিজেকে সৎ বামুন বলে দাবি করে।

তরুণ বাঙালি পুলিশ অফিসার পেশাজীবী মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। শ্রীমতি কাফে তার কাছে বিস্ময়ের নামান্তর। ভজন বেঁচে থাকতে এখানে সে কোনোদিন মাথা উঁচু করে প্রবেশ করতে পারেনি। ভজনের মৃত্যুর পর তার ছেলে নিতাইও তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। তালাবদ্ধ শ্রীমতি কাফে খুলে দেওয়ার আশ্বাস দিতে চাইলে নিতাই ক্র্যাচে ভর দিয়ে খট খট করে চলে যায়। অসহায় আক্রোশে সে উচ্চারণ করে 'সাপের বাচ্চা, শলুই! ননসেন্স।'[৬০]

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতি কাফে শুধু রেস্টুরেন্ট নয়, মধ্যবিত্তের রাজনীতিচর্চার কেন্দ্রস্থল। রাজনীতি পার্টি সবসময় শ্রেণিভিত্তিক হয়। জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন— 'আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণির অর্থাৎ বুর্জোয়া রাজনীতি। অবশ্য তখন (এখনো বহুল পরিমাণে) রাজনৈতিক আন্দোলন

মধ্যশ্রেণির আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী– একই শ্রেণিভুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণিগত উন্নতিতে আগ্রহান্বিত; কেবল পথ বিভিন্ন।[৬১] শ্রীমতি কাফের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীমতি কাফেতে রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টিকারী সকল চরিত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণির।

ইতিহাসের সন্ধিলগ্নের এক নীরব সাক্ষী *শ্রীমতি কাফে*। যেখানে পরস্পরবিচ্ছিন্ন মুক্তিপ্রত্যাশী কতগুলো চরিত্রের সরব উপস্থিতি। তবে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি এবং স্বাধীনতা নিয়ে অনুচ্চারিত স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বয়ান *শ্রীমতি কাফে*। ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'মানুষ না থাক, শ্রীমতি কাফের ইটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইন্ধন। শ্রীমতি কাফে যতদিন থাকবে, ততদিন এ অঞ্চল নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।[৬২]

একটি বিশেষ সময়কে *শ্রীমতি কাফে* প্রতিনিধিত্ব করেছে। দীর্ঘ আটাশ বছরের পরিসর উপন্যাস বর্ণিত। ঔপন্যাসিক কখনো কখনো কয়েক বছরকে একটি বাক্যে ধরে রেখেছেন। যেমন চরিত্রদের দেড় বছর সময় পার করা ভজনের একটি মাত্র বাক্যে বোঝা যায়। বাড়ুজ্যেদা, রোজ ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা করে বছর চলে যায়। চুল যে আমার সব পেকে যাচ্ছে।[৬৩] আবার শেষে এসে কয়েকটি বাক্যে নয় বছর সময় অতিক্রম করেছেন— 'মাঝখানে যুদ্ধ ও মন্বন্তর গিয়েছে। মানুষ মরেছে লক্ষ লক্ষ। শহিদ হয়েছে শত শত, বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে, ছেচল্লিশের আজাদ হিন্দ দিবসে।[৬৪]

উপন্যাস জীবননির্ভর গদ্যসাহিত্য তাই সেখানে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয় :

> কবিতার মতো উপন্যাসে ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অনুমানের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষা ব্যবহারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিদর্শন দ্বারা লেখকের ঔপন্যাসিক রস সন্ধানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের সঙ্গে ভাষা ওতপ্রেতভাবে জড়িয়ে আছে।[৬৫]

প্রত্যেক সাহিত্যিকের নিজস্ব ভাষারীতি বিদ্যমান। সমরেশ বসু, উপন্যাসের ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় দিক বাস্তববাদিতা। উপন্যাসে মধ্যবিত্তের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য প্রকাশে পরিবেশের সাথে সাজুয্য রেখে মধ্যবিত্তজীবন কেন্দ্রিক বাস্তবানুগ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। *শ্রীমতি কাফেতে* ভজন হালদার অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বৈষম্যমূলক সমাজের অংশ হওয়ায় তার ভাষা ব্যাঙ্গাত্মক :

> শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। চল তবে সবসুদ্ধ জেলে যাই।[৬৬]

কখনো কখনো ভনুর মতো নিম্নবিত্তের সংলাপে মধ্যবিত্তের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে–

এ শালা বাবুগুলোর কী হয়। কেতাব পড়ে, সুতো কাটে আর সারাদিন বসে থাকে চা খানায়। মাঝে মাঝে আপদের মতো সরাপের দোকানে সরাপ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়। জেল খাটে। জোয়ান বয়সের মরদ, বাপের পয়সা আছে, বাপু বিয়ে শাদি কর। ঘর আগলাও। তা নয়, জিন্দিগি ফালতু কাটাচ্ছে।[৬৭]

ব্রাত্যজনের মুখে মধ্যবিত্তের চরিত্র বিশ্লেষণের এমন নিরাসক্ত নির্মেদ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল।

অপভাষা :

ক. কিন্তু তাদের তো সাহস নেই। একজন বলল, 'মাইরি খচে গেছে'[৬৮]

নারীর প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহারে সাবলীল :

শুনি দেশোদ্ধারে সবাই মেতে উঠেছে। ভাবি, আমাদের উদ্ধারের জন্য আমরা কবে দাঁড়াব।[৬৯]

উপন্যাসে ভজন নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে কখনো কখনো গান গেয়েছে। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছে :

ক. ডুব দে রে মন জয় কালী বলে।
খ. মায়ার বাঁধন ছাড়া কিগো যায়।
যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি,
মহামায়া আমার পিছনে ধায়[৭০]

ভজন মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আরবি কাব্যের বুলি আওড়ায় :

নমননাখ্ অয়গুল ঔ রিন্দিকুন ও থুশ্বাশ,
বাশ তৌরে অজবলজিমে ঐয়ম-ইশবাহস্ত।[৭১]

কবিতা :

ক. তোমার পায়ে নূপুর বাজে——
এখন এত কাজের মাঝে,
নয়ন মেলি এমন সময় কোথা?
জান নাকি কাজের মানুষ সব সময়ে ভোঁতা।[৭২]

খ. এ মহানিদ্রা ঘুচিবে জানি
আকাশে ধ্বনিবে অভয় বাণী।[৭৩]

*শ্রীমতি কাফে*তে সমরেশ বসুর সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতিভাবনার পরিচয় সুস্পষ্ট। রাজনীতির প্রভাব কীভাবে ব্যক্তির মনোজগতে পরিবর্তন আনে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। দাম্পত্যসম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তির আত্মিক সংঘাত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ঔপন্যাসিক মধ্যবিত্তশ্রেণির একজন বলেই মধ্যবিত্তের জীবনবোধ এবং দ্রোহ সম্পর্কে

জানতেন। এ কারণে উপন্যাসে ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকের কলকাতার অদূরবর্তী মফস্বলীয় মধ্যবিত্তের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

বাঘিনী

সমরেশ বসু *বাঘিনী* উপন্যাস যখন লেখেন তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। বাস্তবসংলগ্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি উপন্যাসটি নির্মাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য :

> এ উপন্যাস এমন একটি দর্পণ, যে ধাতু আমি তরল করেছি, ছাঁচে ফেলেছি। তবু যদি কেউ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন সেটা লেখকের অনিচ্ছাকৃত। তার জন্য এ দর্পণের কোনো দোষ নেই।[৭৪]

বাঘিনী সমরেশ বসুর কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা নিরেট গ্রামজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। উপন্যাসের ঘটনাভূমি হুগলী জেলার দূর অভ্যন্তরে অবস্থিত। তবে উপন্যাসে সাধারন গ্রামীণজীবনের অতিরেক কিছু বিষয় আছে।

সুসংহত কাহিনি নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে চরিত্র সমূহের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশের পাশাপাশি মতপার্থক্যহেতু ব্যক্তিচরিত্রেরও সংঘাত দেখানো হয়েছে। সেই জন্য উপন্যাসের কাঠামোয় মাঝে মাঝে নাটকীয় দ্বন্দ্বের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়েছে।[৭৫] উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চিরঞ্জীব-দুর্গার মাধ্যমে লেখক ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙন এবং নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সংগ্রামকে দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের লেখক হয়েও তিনি মধ্যবিত্তের ভাবলুতাকে পরিত্যাগ করে নির্মোহ দৃষ্টিতে সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

দুই বছর আগে মদ চোলাইকারী বাঁকা বাগ্‌দির মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। যার জন্য শোক করা সমাজে অসম্মানজনক। তারপরও তার মেয়ে দুর্গা কেঁদেছিল। এই কান্নার কারণ শুধু পিতার মৃত্যু নয়। আঠারো বছরের সুন্দরী তন্বীর অসহায়ত্বের কান্না, একাকিত্বের যন্ত্রণা ভয়ংকর। তারপরও দুর্গা বুঝেছিল ‘শক্ত পায়ে শক্ত হয়ে না চললে, পায়ের তলে মাটিও কোনদিন না জানি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।’[৭৬] দুর্গা সচেতন হয়েছিল নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে। আত্মরক্ষার তাগিদে সেই বহিরাবরণে আরো সাহসী হয়েছিল। সে বুঝেছিল কেঁদে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না।

পিতার পেশাকে দুর্গা ঘৃণা করত। পিতার অনুপস্থিতিতে জীবিকার টানে পিতার পেশায় স্থিত হয়। আর এ কাজে সহযোগিতা করে মধ্যবিত্ত যুবক চিরঞ্জীব ব্যানার্জি। শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে মাটি কাঁপিয়ে এসে দুর্গাকে বলেছিল ‘তুই ও তো চোলাই কারবার করতে পারিস।’[৭৭] মুখরা, বুদ্ধিমতি দুর্গা অল্পদিনেই এই

পেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আবগারি বিভাগের কাছে সে শুণ্ডিনী নামে পরিচিতি পেয়েছিল। দুর্গা মানেই ত্রাস। আবগরি কর্মকর্তা সুরেশ দুর্গার নাম দিয়েছিল বাঘিনী। দুর্গার স্বৈরিণী হতে বাধা ছিল না কিন্তু 'সে সব কিছুর ওপারে দাঁড়িয়ে শুধু একজনের দিকে তাকিয়ে আছে, একজন করে একটু আঙুল তুলে ডাক দেবে, শোনবার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে আছে, সেই কথাটি ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ে।'[৭৮] চিরঞ্জীবের 'অসমসাহসী নিঃশঙ্ক প্রেমই দুর্গার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছিল, এক দুর্ভেদ্য দুর্গবলয় সৃষ্টি করেছিল।'[৭৯]

চিরঞ্জীব বলু বাড়ুজ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তার পরিবারটি ঐতিহ্যমণ্ডিত, বর্তমানে সেই ঐতিহ্য 'ভাঙাচোরা পুরনো ইট বের করা একতলা বাড়িটার গায়ে ভূতের মতো চেপে আছে।'[৮০] রাজনৈতিক দর্শনে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল। কলেজে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছে। কৃষক সমিতির একজন লড়াকু সদস্য ছিল। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই কৃষকদের সংগঠিত করেছে। তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু বামপন্থী কৃষক নেতা শ্রীধর দাস বিমলাপুরকে কৃষক আন্দোলনের দুর্গ বানিয়েছিল। সারা ভারত যেমন একদিন চিৎকার করেছিল, চলো চলো দিল্লি চলো, তেমনি সারা জেলাটা সেদিন গর্জে উঠেছিল, চল চল বিমলাপুর চল![৮১] ভূমিহীন, নিরন্ন কৃষকদের দক্ষ সংগঠক পুলিশের চক্রব্যূহ ভেদ করে তার ছাত্রবাহিনী ডিনামাইটের মতো ফেটে পড়েছিল বিমলাপুরে। কাস্তে হাতে নিয়ে ফসল কেটেছিল। চিরঞ্জীবের কর্মস্পৃহা দেখে শ্রীধর দাস গুপ্তাবাস ত্যাগ করে জনসম্মুখে এসেছিল। অথচ এই চিরঞ্জীবই অর্থাভাবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারেনি। কৃষক সমিতি মণ মণ ধান নিরন্নদের মাঝে বিতরণ করেছে, অন্যদিকে বাড়িতে তার মা, দিদি অভুক্ত থেকেছে। সাতাশ বছরের অরক্ষণীয়া দিদি অর্থাভাবে বেশ্যাবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে, যা তার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অমোঘ নিয়তি। চিরঞ্জীবের মায়ের অসহায় নির্বাক দৃষ্টি, দিদির স্খলন তার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতি ঘৃণায় প্রতিশোধের স্পৃহায় সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সমরেশের অন্যান্য নায়কের মতো চিরঞ্জীবের তার বাবার প্রতি আক্রোশ। তার মনে হয় 'লোকটিকে জীবিত পেলে এক্ষুনি নখে টিপে নিকেশ করতাম।'[৮২] মা সম্পর্কে তার অভিমত 'বড় ভালো মানুষ। কিন্তু পরতে পরতে ঢাকা নষ্টামো নোংরামো, সবকিছুই জানিনে, কিছুই বুঝিনে ভাব করে সে সবই জেনে বুঝে চোখের সামনে অনেক অন্যায় ঘটতে দিয়েছে। অনেক পাপ ঘটতে দিয়েছে। শুধু স্বার্থের খাতিরে, জেনে বুঝেও একটা সর্বনাশকে তিল তিল করে বাড়তে দিয়েছে। তারপর ঘটতে দিয়েছে শেষ সর্বনাশ।'[৮৩] মা যেন তার নিজের মা নয়। একই ছাদের নিচে নিঃসম্পর্কীয়র মতো বসবাস। দুর্গার সাথে প্রেম তার মা

মেনে নেয় না। অথচ ছেলেক আটকানোর ক্ষমতা তার নেই। একমাত্র বোন কমলার অধঃপতনের নীরব সাক্ষী সে। সংসারে মায়ের ভূমিকা, বাবার অকার্যকারিতায় তার মুখে ধ্বনিত হয় কী করব! আমি কী করব![৮৪]

বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্রীরামপুর, চুঁচড়া, চন্দননগরের আশোপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। চরম হতাশায় দিদি কিংবা চাকরি কোনোটারই সন্ধান করেনি। কৃষক সমিতি আর করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। দিগ্‌ভ্রান্ত চিরঞ্জীব জটার সাহচর্যে মদ স্মাগলিং শুরু করে। এক সময় আবগারি বিভাগের ত্রাস সঞ্চারকারী স্মাগলারে পরিণত হয়। সবাই তাকে বাঁকা বাগদির প্রেতাত্মা ভাবতে শুরু করে।

চিরঞ্জীব মদ চোলাই করলেও নীতিভ্রষ্ট না। জটার মতো প্রেমিকাকে ব্যবহার করে ওপরে উঠতে চায়নি। মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে তার স্মাগলার হওয়া। নারী, মদ কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি। পঙ্কিলতার মাঝে থেকেও পঙ্কর বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম।

আবগারি কর্মকর্তা বলাই সানাল্যের বাকচাতুর্যে বেরিয়ে আসে তার মানবিকতা। তার অধঃপতনের জন্য অনেকটা ভাগ্যকে দোষ দেয়। 'আমার তো ধারণা যাদের যে লাইনে যাবার কথা ছিল, সবাই তার উলটো পথ ধরেছে। নিজে থেকে ধরেনি, কপালে জুটে যায় বোধহয়। বলাই-এর দেয়া সৎজীবনে ফেরার উপদেশে চিরঞ্জীব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলে 'যার পেট ভরল না, তবু ঘরের ইজ্জত গেল, তার মরণের দুঃখের কথা খবরের কাগজে পড়তে আমার ঘেন্না করে।'[৮৫] নিজেকে সে বারোয়ারি তলার পুজোর ঢাকের সাথে তুলনা করে, যে আসবে সে-ই একবার চাটি মারবে। বলাই সান্যালকে আক্ষেপ করে বলেছে 'জানেন না আমাদের ট্র্যাডিশন আজকে মহকুমা শহরে বারোয়ারি বাজারে বিকোয় ? তাতে এদেশের কোথায় কতটুকু এসে গেছে।'[৮৬]

কৃষক সমিতির সাথে সম্পর্কচ্যুতিতে শ্রীধর দাস মানসিকভাবে আহত হয়েছিল। এজন্য চিরঞ্জীবকে মেরেছিল, অপমান করেছিল। সমিতির সভ্যদের নির্দেশ দিয়েছিল 'গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দিন। যেখানে পাবেন ধরে শায়েস্তা করুন।'[৮৭] সমিতির সদস্যরা তার মদ চোলাইয়ের সরঞ্জাম নষ্ট করে দেয়। বাজারে, স্টেশনে তার নামে অজস্র পোস্টার ছেয়ে যায়। কৃষক সমিতির অভিযোগ চিরঞ্জীব দরিদ্র কৃষকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের অবৈধ মদ চোলাইয়ের কাজে লাগাচ্ছে। ফলে কৃষক সমিতির সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সে কারণেই কৃষক সমিতি চিরঞ্জীবকে বর্জন করে।

সমরেশের অন্যান্য নায়কের মতো চিরঞ্জীব নিঃসঙ্গ নায়ক। সমকালের বৈরী পরিবেশ তাকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা দিয়েছে। নিজেকে অসহায় ভেবেছে। যে ক্রোধানল থেকে সে এই পথে এসেছিল ক্রমেই সেই আগুন বাড়তে থাকে। বিষন্নতা নিঃসঙ্গতায় তার মনে শূন্যতাবোধের জন্ম নেয়। 'দুর্বার ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করছে তার।'[৮৮] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রীধরের ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যবাণ যা তাকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা দিয়েছে।

চিরঞ্জীবের চারপাশে যেসব মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষ আছে তারা সবাই সুবিধাবাদী। সুযোগ বুঝে শ্রীধর দাসের বিপক্ষ দলের নেতা বিহারীলাল তাকে কোণঠাসা করে ফেলে। চিরঞ্জীব জানে সোলেমান, সনাতন, অক্রুর এই সব ধূর্ত সুযোগসন্ধানীরা অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করে ফুলে ফেঁপে উঠবে, অ্যাসেম্বলির প্রতিনিধি হবে, মন্ত্রী হবে। শুধু অসামাজিক থাকবে চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব কোনো শোধন মন্ত্র চায় না, সে অপেক্ষা করেছে মহা সর্বনাশের। স্বাধীনতা-উত্তরকালের শিক্ষিত বেকার বিপথগামী যুবকদের যন্ত্রণাদীর্ণ মানসিক অবস্থার চিত্র চিরঞ্জীবের মধ্যে আঁকা হয়েছে।[৮৯] স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক চাপ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল মধ্যবিত্তের ওপর। বহু শিক্ষিত যুবক উপযুক্ত কর্মসংস্থান না পেয়ে বিপথগামী হয়েছিল। যেনতেনভাবে অর্থোপার্জনের দিকে মনোযোগী হয়েছিল।

চিরঞ্জীবের মতো যুবকেরা রাজনীতিতে কোনো ভরসা খুঁজে পায়নি। বেঁচে থাকার সংকট তাদের কাছে বড় সংকট। ভোটের লড়াইয়ে তার মতো যুবকেরা আস্থা রাখতে পারেনি। চিরঞ্জীবের ধারণা 'ওটা একটা খারাপ ব্যায়ামের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সাধারণ মানুষকেই যেন বিষাক্ত এবং হতাশ করা হচ্ছে।'[৯০] একটা সময় 'চাষীর হাতে জমি'র জন্য লড়েছিল, কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি থেকে সরানো গেল না। সব ক্ষেত্রে রাজত্ব, পার্লামেন্ট, অ্যাসেম্বলি কথাকারদের কথার কারখানা। সেখানে ফাইলবন্দি হয়ে সব সিদ্ধান্ত বছরের পর বছর পড়ে থাকে। সে বোঝে 'কৃষকদের হাতে জমি দাও'[৯১] এই স্লোগান কোনদিন বাস্তবে রূপ পাবে না। সে কারণেই তাদের অবক্ষয়, ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে নিজেকে নিঃশেষ করা। একদিকে নৈরাশ্য, গ্লানিবোধ, তুচ্ছতাবোধ অন্যদিকে যে কোনোভাবে বেঁচে থাকার আনন্দ এই দ্বৈতধারায় প্রভাহিত হয়েছে তার জীবন।

চিরঞ্জীবের বেঁচে থাকার একমাত্র আনন্দ দুর্গা। সমাজবিচ্ছিন্ন এই মানুষটির দুর্গার সাথে সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো। যদিও সামাজিকভাবে তাদের বিয়ে হয়নি। ভালোবাসার বিশ্বাস তাদের একমাত্র বন্ধন। তার স্বপ্নচারী মন দুর্গাকে সর্বালঙ্কারে সাজাতে চেয়েছে। তাই দুর্গাকে সোনার হার উপহার দিয়েছে। এই হারই শেষ পর্যন্ত তাদের ভালোবাসার প্রতীক হয়ে থেকেছে। দুর্গাকে নিয়ে সর্বদা শঙ্কিত থেকেছে। তাই

বলেছে 'আমার খালি ভয় হয়। কী বা আমার মানসম্মান। তবু এক ভয় দুর্গা তোকে না কোনও দিন খাটো করে ফেলি।'[৯২] দুর্গাকে সে অসম্মানিত করতে চায়নি। বর্ণবৈষম্য তাদের প্রেমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও দুর্গার হাতে খাওয়ার কারণে চিরঞ্জীবের মা চিরঞ্জীবের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিল। সমস্ত বিরূপতার মধ্যে চিরঞ্জীব দুর্গাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। দুর্গার চোলাই মদসহ ধরা পড়া, ভোলাকে খুন এ সমস্ত আকস্মিক ঘটনায় চিরঞ্জীব মুষড়ে পড়েছিল। বিষণ্নতা, হতাশা, শূন্যতা তাকে গ্রাস করেছিল। তার আত্মকথনে জানা যায় :

> 'এই গ্রামে থাকা যায় না, এই দেশে থাকা যায় না। কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাদ দিয়ে কি বাঁচা যায়? ছিন্নবাধা দুর্বিনীত হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে কি নামটা বাজবে না? অহর্নিশ চলার বেগের ছন্দটা কি ফাঁকি মানবে? সে কি বেয়াদপ বিদ্রোহী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াবে না? দুর্গা কি কখনও ছেড়ে যাবে? এই তো সবে শুরু। দুর্গার এই তো সবে শুরু। কারণ এই বাড়ি থাকবে, চিরঞ্জীব থাকবে। তাই আর এক দুর্গার শুরু হবে, এই বাড়ি দেখিয়ে লোকে বলবে। চিরঞ্জীবকে দেখিয়ে লোকে বলবে। চিরঞ্জীবের সকল পারের ঘাটে ঘাটে নিরন্তর খেলায় দুর্গা বসে থাকবে তার নিশিন্দাওপাতা আয়ত চোখ দুটি তুলে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে।'[৯৩]

চিরঞ্জীবের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ উপর্যুক্ত উক্তিতে প্রকাশিত।

দুর্গাকে হারিয়ে চিরঞ্জীবের শরীর মন ভেঙে পড়ে। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে। জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছে। অনুধাবন করেছে এভাবে মা আর দিদির মুক্তি সম্ভব নয়। কারণ তাদের মুক্তি তার একার হাতে নেই। শেষ শোধ নেওয়া, সোনার লঙ্কা পুড়ানো কোনো কিছুই আর সম্ভব নয়। সে নিজেও জ্বলেছে। দুর্গাকে জ্বালিয়েছে। জীবনের কাছে সে প্রতারিত, বঞ্চিত। ব্যক্তি সংবেদনা এবং সমাজভাবনার পরস্পর বৈরিতায় ব্যক্তির চেতনায় জন্ম নেয় নৈঃসঙ্গ্যবোধ।[৯৪] দুর্গার শাস্তিতে চিরঞ্জীব মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে নিঃসঙ্গতা ও নির্বেদ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই মূলছেঁড়া অনিকেত একাকিত্বের ধূসর অনুভূতি আধুনিক কালের নায়কের মনের ছবি।[৯৫]

সমরেশ বসু বিশ্বাস করেন প্রেমের মঙ্গলদ্বীপই মানুষকে নবজন্ম দেয়। দুর্গার অভিভবের যন্ত্রণা চিরঞ্জীব সামলে নিয়েছে। আগামী দিনের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবলায় সে গঠনমূলক প্রস্তুতি নিয়েছে। মানস বিপর্যয় কাটিয়ে দেশের বৃহত্তর মুক্তির আশায় ফিরে এসেছে শ্রীধরের কাছে। চিরঞ্জীব তার ভেঙে যাওয়া গলায় বলে 'ফিরে এলুম শ্রীধরদা। আবার শুরু করব, আবার'।[৯৬] চিরঞ্জীব মিশে যেতে চেয়েছে মানুষের মধ্যে। চিরঞ্জীব মধ্যবিত্তের শ্রেণি প্রতিনিধি হয়েও সুবিধাবাদী কিংবা স্বার্থপর হতে পারেনি। দুর্গার ভালোবাসা তাকে জীবনের সদর্থক ভাবনায় স্থিত করে।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র আবগারি অফিসের কর্মকর্তা সুরেশ, যিনি মাদকের চোরাচালান জব্দ করতে গিয়ে নিজেই মাদকের মরণ নেশায় নিমজ্জিত হন। অবশ্য মদ খাওয়ার সপক্ষে সে যুক্তি

দাঁড় করায় 'অপরাধীদের সাজা দাও চোরা-চোলাইয়ের জন্য। মদ্য নিবারণের দারোগা তো তুমি নও। অপরের নেশা নিবারণ করতে গিয়ে যদি তুমি নেশা করতে, তবে তোমার অ-মহম্মদী দোষ হত।'[৯৭] তার স্ত্রী তাকে মদ খাওয়ার জন্য তার পেশাকে দায়ী করে। ব্যক্তিগত জীবনে সদা হাস্যোজ্জ্বল কিন্তু কর্মজীবনে অসৎ ঘুষখোর। চোরাকারিদের সাথে অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করত। বলাই স্যানালকে সে তরাইয়ের বাঘ এবং দুর্গাকে বাঘিনী নামে বিশেষায়িত করে। একটা সময় এসে সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।

আবগারি বিভাগের আরেক কর্মকর্তা বলাই সান্যাল। তরাই থেকে বদলি হয়ে আসে। পেশাজীবী মধ্যবিত্তের শ্রেণি প্রতিনিধি, তবে নিজ পেশা নিয়ে তৃপ্ত নয়। একটা সময় চ্যালেঞ্জিং এই পেশাকে উপভোগ করেছে। কিন্তু স্ত্রী মলিনার সান্নিধ্যে সে জীবনের ভিন্ন অর্থ খুঁজে পায়। মলিনার সাথে তার দাম্পত্যজীবন অসীম শূন্যতায় ভরা। মলিনা কখনোই তার জীবনের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেনি। মলিনা তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছে। আত্মময়তার ভুবনে নিজস্বতা খুঁজে নিয়েছে। বলাই তার পেশা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। মলিনার শ্লেষপূর্ণ ব্যঙ্গময়তা বলাইকে আহত করেছে। বলাই তার পেশার কারণে মলিনার ব্যক্তিত্বর কাছে নিষ্প্রভ। ভেতরে ভেতরে চিরঞ্জীবের প্রতি স্বশ্রেণিজাত ঈর্ষায় কাতর হয়েছে। চিরঞ্জীবকে ধরার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছে। তরাইয়ের এই বাঘের মধ্যে বাধা অতিক্রমের সচেতন আগ্রহ ও কর্মস্পৃহা লক্ষ করা যায়। চিরঞ্জীবের কাছাকাছি এসে জানতে চেয়েছে সে কেন এই পথে এসেছে। অর্থাৎ সমকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের বিপথগামিতা তাকে ভাবিত করেছে। বলাইয়ের সাথে চিরঞ্জীবের একটা জায়গায় সাদৃশ্য আছে। উভয়েই শৈশবে স্বপ্ন দেখেছে। বলাইয়ের 'স্বপ্নগুলি হয়তো মধ্যবিত্ত মনের বাঁধা-ধরা ছকের মধ্যে ছিল। কিন্তু আবগারি বিভাগটা একেবারে সেই ছকের মধ্যে দেখতে পায়নি।'[৯৮] চাকরিতে যোগদান করেও বোঝেনি তার পথ পরিবর্তিত হয়েছে। চাকরির রোমাঞ্চকে সে উপভোগ করেছিল। সে মনেপ্রাণে আবগারি অফিসার হতে চেয়েছিল। স্ত্রী মলিনার সংস্পর্শে সে জেনেছে এই পেশা তার জন্য নয়। অথচ ফিরে যাওয়ার পথ নেই। বাঙালি মধ্যবিত্তের অধিকাংশের চাকরি সূত্রেই জীবনজীবিকা নিয়ন্ত্রিত। তাই সে পেশাটাকে আরো শক্তভাবে ধরে। কারণ সুরেশের মত অফিসারের ভয়ঙ্কর পরিণতির সে প্রত্যক্ষদর্শী। বলাই চিরঞ্জীবকে ঈর্ষা করেছে। চিরঞ্জীবকে তার পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে ফিরে আসার অনুরোধ করেছে। চিরঞ্জীব-দুর্গার সম্পর্ক তাকে বিস্মিত করেছে। মনে মনে তাদের সাহসের প্রশংসা করেছে। স্ত্রী মলিনার পরোক্ষ প্রভাব এখানে ক্রিয়াশীল। চিরঞ্জীবকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, চিরঞ্জীবকে সে কখনোই অক্রূরদের মতো চরিত্রহীন ভাবে না। অন্য কোনো ব্যবসায়ী হলে তাকে এই কথা বলত না। শেষে ব্যর্থ হয়ে ক্ষিপ্ত

হয়ে বলেছে 'একটা বাগ্দি মেয়েকে রক্ষিতা রেখে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা যে করে তার বড় বড় কথা সাজে না।'[৯৯] বলাই শুধু চিরঞ্জীবকে অপমানিত করেনি তার ভেতরের সত্তাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছে। অখিল, কাসেমকে নিয়ে দুর্গার ঘর তল্লাশি করতে এসে অপমানকর মন্তব্য করেছে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারা হয়ে কৌশল অবলম্বন করেছে। তাতে চিরঞ্জীবের কাছে সে ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রীধর বামপন্থী কৃষক নেতা। চিরঞ্জীবের দীক্ষাগুরু। চিরঞ্জীবের সত্তাকে নিজ হাতে জাগিয়ে ছিল। চিরঞ্জীবের স্খলন শ্রীধরকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। চিরঞ্জীবকে বিশ্বাসঘাতক বলে। মানসিকভাবে আক্রমণ করে পর্যদস্ত করে। 'আগে বুঝতে পারিনি, তোরা, তোর বোন, তুই; তোরা এরকমই। এসবই তোদের পেশা।'[১০০] কৃষকের সন্তান বলে কৃষকের কষ্টটা সে বোঝে। কৃষকদের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর। চিরঞ্জীবের বোনের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। বর্ণবৈষম্য তাকে তার সুপ্ত প্রেমকে প্রকাশিত হতে দেয়নি। পার্টির আনুগত্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সেই দুর্বলতাকে সে প্রকাশ্যে আনেনি। এমনকি কখনো কমলার নাম উচ্চারণ করেনি। চিরঞ্জীবের পতনে শ্রীধর রাগে দুঃখে তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছে। আবার কৃষক সমিতিকে নির্দেশ দিয়েছে চিরঞ্জীবকে বয়কট করার জন্য। 'আঘাত করুন। গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দিন। যেখাবে পাবেন ধরে শায়েস্ত করুন।'[১০১] গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনে চিন্তিত হয়েছে। তবে ভাঙনের সূত্রটা ধরতে পারেনি। তাই চিরঞ্জীবের ওপর খাপ্পা হয়েছে। শ্রীধর বোঝেনি কর্তৃপক্ষের শাসনের জন্য এই ভাঙন সুবিধাজনক। এই অবনতি শ্রীধরের নির্বাচনে পরাজয় বয়ে আনে। তার বিশ্বাস ছিল গরিব মানুষগুলো ভাঙবে তবু মচকাবে না। তারা বিপথে যাবে না। তারা বিদ্রোহ করবে তবু বিশ্বাস হারাবে না। গ্রামীণ সংস্কৃতির পুরোটাই তার অধীত। তারপরও বুঝতে পারেনি কেন কিষেনবাগ-এর ইউনিয়ন বোর্ডের হাইস্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে ডাকাতি করে, বোমা তৈরি করে, দেশীয় বন্দুক সংগ্রহ করে। প্রজন্মগত দূরত্ব একটা বড় ব্যাপার। শ্রীধর নেতৃত্বের জায়গা থেকে বিচার করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সারিতে নেমে বিচার করেনি, তাই নির্বাচনে তার ভরাডুবি হয়।

অর্থনৈতিক দীনতায় মধ্যবিত্তের অবনমনের চিত্র পাই কবিরাজকন্যা সুশীলার চরিত্রে। গৃহস্থ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও অর্থের প্রয়োজনে দুর্গার সাথে হাত মেলায়। কবিরাজ গিন্নিও তাদের সহযোগিতা করে।

ভোলা, কেষ্ট নারী মাংসলোভী নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্র। আবগারি অফিসের ইনফর্মার। দুর্গাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখেছে। উপন্যাসের শেষাংশে কালকাসুন্দের বনে দুর্গাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে গিয়ে ভোলা নিহত হয়। 'দুর্গা একটা ভয়ঙ্কর গর্জন করল। মনে হল মাটি ফাটল। আকাশ কুটি কুটি হল। সেই সঙ্গে ভোলার অন্তিম চিৎকার শোনা গেল দুগ্-গা।'[১০২]

ওকুর দে নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্র। তিলিপাড়ার বাসিন্দা। জীবিকার তাগিদে নানা ধরনের ব্যবসা করেছে। কাপড়ের, রিকশা সাইকেলের, কখনোবা চোলাই মদের। পেশাগত কারণে চিরঞ্জীবকে সবসময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে। চিরঞ্জীবকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলাই সান্যালকে সহযোগিতা করেছে।

মলিনার মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপন্যাসে সে-ই একমাত্র মধ্যবিত্ত নারী চরিত্র। সে ভুলে যেতে চেয়েছে সে আবগারি দারোগার স্ত্রী। মনে মনে বলাইয়ের পরাজয় কামনা করেছে। সে বোঝে পাপের জ্বালা কোথায়। বড়দের গায়ে হাত দেওয়া যায় না, তাই ছোটদের নিয়ে টানাটানি।[১০৩] দুর্গার শাস্তি হওয়ার পর মলিনা চিরঞ্জীবকে দেখে কেঁদে ফেলেছিল— 'দেখুন তো কী হল! আর কি তাকে ফিরে পাবেন ? থাকতে বোঝেননি, আর আপনার কী রইল ?'[১০৪] মলিনা বুঝেছিল সমাজের গভীর স্তরে পাপ কোথায়। বিচারকতো শুধু সাজার খাতায় সই করে। আসামির মনের খবর রাখে না। বলাই মলিনার বাকচাতুর্যকে ভয় পেত। নিঃসন্তান এই দম্পতি উভয়ে নিজেদের জগৎ নির্মাণ করেছিল। বিচ্ছিন্নতা আর নিঃসঙ্গতায় মলিনা নিমজ্জিত। তার ভাবনাস্রোতে দেখা যায় নৈঃসঙ্গ্যের দুঃসহ যন্ত্রণা :

> মলিনার নিজের জীবনে কোথায় একটা অপূর্ণতা আছে। একটি ব্যথা-ভরা শূন্যতা । সেটা যে শুধু নিঃসন্তান কিংবা নারীজীবনের শূন্যতা তা নয়। জীবনের এই অসার্থক দিকটা জড়িয়েই সেটা যেন ভালবাসার শূন্যতা। যে শূন্যতার দায় বলাই বুঝি ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারে না। যদিও মলিনা নিঃসংশয়, নিঃশেষে ভালবেসেছে বলাইকে। তবু সেই চিরকালের ব্যথাটা বুঝি একটু বেশি করেই বাজে তার। স্বামীর মধ্যে মনের মানুষের পূর্ণ রূপ সে খুঁজে ফিরেছে। কে পায়। কজনা পায়, কে জানে।[১০৫]

উদ্ধৃতাংশে মলিনার মননের নিঃসঙ্গতার ভয়াবহ রূপটি ফুটে উঠেছে। আদর্শগত পার্থক্যের কারণে তাদের দাম্পত্যসম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

উপন্যাসের নামকরণ 'বাঘিনী' সার্থক। বাঘিনী শব্দটির সাথে আদিমতার সংশ্লেষণ আছে। উপন্যাসটির নামকরণ একটি চরিত্রানুসারে হলেও স্বাধীনতাত্তোর বাঙালি শিক্ষিত যুবকের বিপথগামিতার চিত্রই প্রধান। রাজনৈতিক সংঘাতজনিত জীবন সত্যের আলোকেই এখানে নায়ক স্নাত হয়েছে, নবোদিত আদর্শের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছে।[১০৬]

ঔপন্যাসিক তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে বাচনিক সৌকর্য দিয়ে উপন্যাসে উপস্থাপন করেন। তাই 'ভাষা নিছক দৈনন্দিন জীবনকে প্রতিফলিত করে না, তাকে পুনর্নির্মাণ করে।'[১০৭] সাহিত্য সমালোচক আশিসকুমার ভাষাকেই উপন্যাসের শৈলীর প্রথম বিচার্য উপাদান বলে মনে করেন :

> সমস্যা, চরিত্র, বিষয়, বর্ণনা, বাস্তবতা, সংলাপ সবকিছুই ফুটে ওঠে ভাষায়। ভাষার সাহায্যে লেখক যে অসাধারণ উপন্যাস প্রতিমা তৈরি করেন, তার দুর্বলতার জন্য মহৎ বিষয়ও কালের গর্ভে লোপ পায়। গঠনের বিচার উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য এবং ঔপন্যাসিকের মানসিকতাকে যেমন প্রমাণ করে, তেমনি উপন্যাসের ভাষা আলোচনা না করলে এই শৈলী বিচার অসম্পূর্ণ থাকে।[১০৮]

*বাঘিনী*তে লেখক চমৎকার ভাষার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। উপন্যাসে চিরঞ্জীব, শ্রীধর, বলাই সান্যালের ভাষার মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাষার ছাপ পাওয়া যায়।[১০৯] যেমন দুর্গাকে মদ চোলাই-এর প্রস্তাব দিতে গিয়ে চিরঞ্জীব বলেছিল 'তুই-ও তো মদ চোলাই কারবার করতে পারিস।[১১০] আবার দুর্গাকে দেওয়া কথা রাখতেই সে বলে— 'যেতে হবে ওই ঘরে। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে মাজা গেলাসে জল পান করে অনিশ্চিত অন্ধকার বিহারের পথে যেতে হবে।[১১১] চিরঞ্জীবের প্রেম দ্রোহ সমস্ত কিছুর মধ্যে মধ্যবিত্তের মনোযন্ত্রণার ছাপ আছে। দুর্গার সাথে তার কথোপকথন, তার মদ চোলাই সমস্ত কিছুর মধ্যে মধ্যবিত্তের রুচির ছাপ পাওয়া যায়।

উপন্যাসটি যেহেতু গ্রামজীবন কেন্দ্রিক তাই গ্রামীণজীবন ও পরিবেশ বর্ণনায় লেখক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেছেন :

ক. নক্কী মা আমার দরজা খোল।[১১২]

খ. অনেক উবগার করেছ তোমরা।[১১৩]

খ. যারা নেকচার দেয়, তারা ভাল। বাকা বাগ্‌দীরা মন্দ, ওরা নেকচার মানে না।[১১৪]

প্রবাদ :

ক. আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও [১১৫]

খ. যেখানে জোঁক সেখানেই নুন। [১১৬]

গ. মুরোদ বড় মান তার ছেঁড়া দুটো কান।[১১৭]

ঘ. লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়।[১১৮]

ঙ. ভাত দেবার মুরোদনে কি মারার গোঁসাই হয়েছে।[১১৯]

অপভাষা :

দুর্গা নিজের সম্মান বাঁচাতে অপভাষা ব্যবহার করেছে :

ও সব খচ্চর মিনসের বুকে বসে নোড়া থেতো করা দরকার।[১২০]

দুর্গার চরিত্রে গভীরতা বোঝাতে ঔপন্যাসিক উপমাবহুল ভাষা ব্যবহার করেছেন:

> দুর্গা রক্তেমাংসের মন দিয়ে গড়া সাধারণ মেয়ে। তার কোথাও কোনও জটিলতা নেই। রক্ত মাংস মন কোনওটাই এ সংসারে সোনা দিয়ে ভরেনি! সে মাটির মতো পূর্ণতা চেয়েছে। পরিপূর্ণ সতেজ প্রাচুর্যভরা গাছের মতো বাঁচতে চেয়েছে। সে রোদে নিজেকে মেলতে চেয়েছে বৃষ্টির কামনা করেছে। তার জন্যে, ঘরে বাইরে কোথাও সে কোনও লজ্জা রাখেনি। আকাশের তলায় প্রকৃতির মতো মুক্ত রেখেছে নিজেকে। [১২১]

উপন্যাসে মিথের ব্যবহার আছে। যেমন যযাতি, ইন্দ্র, দুর্গার বীর্যশুল্কা হওয়ার গল্প আছে।

বৃত্তিভাষিক শব্দ :

উপন্যাসে মদ তৈরির ক্ষেত্রে 'জাওয়া' বসানো শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মদ চোলায়ের জন্য প্রগৈতিহাসিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাটার নাম জাওয়া বসানো। এছাড়াও সাইকেলের টিউবে কিংবা ঝাকায় করে মদ চোলাই করা হয়। দুধের পাত্র সিল করে তাতেও মদ চোলাই করা হয়। খাবার রাখার জন্য সিকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের সাথে অভাবের তাড়নায় গ্রামজীবনও মদ চোলাইয়ে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামজীবন-কেন্দ্রিক অনেক অনুষঙ্গই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

সঙ্কেত ভাষা :

প্রতীকের মাধ্যমে রূপান্তরিত সঙ্কেতমালা হচ্ছে ভাষা।[১২২] *বাঘিনী* উপন্যাসে চরিত্রের প্রয়োজনে ভাষার ক্ষেত্রে কখনো কখনো সঙ্কেত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সাপকে দুর্গা রাত্রে লতা বলে। রাত্রে সাপ উচ্চারণে একধরনের সংস্কার কাজ করে।

স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সবাই আশাভঙ্গের আঘাতে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়। জীবিকার জন্য কোনো পেশাই তাদের কাছে ঘৃণ্য মনে হয় না। বেঁচে থাকাটাই মূল কথা। সমরেশ বসু *বাঘিনী*তে সেই টিকে থাকার লড়াইয়ের কথাই বলেছেন।

দুরন্ত চড়াই

পশ্চিমবাংলার সমাজ-রাজনীতিতে স্বাধীনতাপরবর্তীকালে ক্রমশ গাঢ়তর হয়েছে নৈরাজ্য ও অন্ধকার। সেই নৈরাজ্যের রূপায়ব দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে যৌনতা, প্রেম, বিকার ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে বাংলা উপন্যাসে এমন কিছু বিষয় চলে এসেছে যা ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে ছিলনা।

দুরন্ত চড়াই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, তারপরও উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি, '৩৯ থেকে '৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সংকট, '৪৭- এর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতাপরবর্তী রাজনৈতিক- সামাজিক বিপর্যয় যুগপৎভাবে এসেছে। উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে মধ্যবিত্ত ঘরের অরক্ষণীয়া বিনুকে কেন্দ্র করে। এই বিনুর সূত্র ধরে উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে মধ্যবিত্ত জীবনের হীনমন্যতা, প্রেমের ক্ষেত্রে দেহসর্বস্বতা-দ্বিধা-দোলাচলতা, মানসিক রূপান্তর এবং আত্মজাগরণ দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনু, ভবানীপুরের বসু পরিবারের মেয়ে। বর্তমান অর্থনৈতিক বৈরী পরিবেশে পরিবারের ঐতিহ্য ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার ঠাকুরদা বাবার সময়ে চাকরি এবং ঐতিহ্য নিয়ে

পরিবারটি ভালই ছিল। যুদ্ধের অভিঘাতে তারা বিপর্যয়ের শিকার। মুদ্রাস্ফীতিতে বিনুর বাবার বেতন দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক দৈন্যতা ঘোচেনি। পরিবারটির ঐতিহ্য রক্ষার্থে বড় দুই বোনের অফিসারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। এই বিয়ে দিতে গিয়ে বিনুর বাবা সর্বস্বান্ত। তারপরও বিনুর মোটামুটি মানের বনেদি পরিবারের অফিসারের সাথে বিয়ে দিতে আগ্রহী। বয়স পার হওয়ার পরও তাকে পাত্রস্থ করতে না পারায় তার ছোট ভাই সাধন তাকে সাঁওতাল পরগনায় চেঞ্জে নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য চেহারার ঔজ্জ্বলতা বাড়িয়ে বন্ধু অনাদির সাথে বিয়ে দেওয়া। সমরেশ বসু বিনুর জীবনের অনালোকিত অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করে মধ্যবিত্ত নারীর মনস্তত্ত্ব ধরতে চেয়েছেন।

বিনু প্রেমের নামে অপ্রেমের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসর্মপণ করে। উপন্যাসে বিনুর চোখে একে একে তার প্রেমিকদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তার প্রথম প্রেমিক বরুণ তারই পিসতুতো ভাই। কৈশোরিক ভাললাগা ভালবাসায় রূপ নিয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন অর্থহীন। বরুণের শারীরিক আবেদনের কাছে বিনু অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। বরুণের মোহ ভাঙতেই বিনুকে উচ্ছিষ্টের মতো ত্যাগ করেছে। বিনুর দ্বিতীয় প্রেমিক রণেন মানসিক বৈকল্যের শিকার। রণেনের মেয়েলিপনা তার অসহ্য লেগেছে। যুদ্ধের অভিঘাত এবং সংসার-সমাজ থেকে সে অনেক কিছু শিখেছে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে সে রণেনের জন্য কোনো ভালোবাসা খুঁজে পায়নি। রণেন ইহজাগতিক প্রেম আর ঐশ্বরিক প্রেম এক করে বিনুকে পেতে চেয়েছিল। '... দেখুন, প্রেম শুধু পাত্রপাত্রীর মধ্যে একটা স্থূল ব্যাপার নয়। আমি মনে করি, ঈশ্বর আর প্রেম, অর্থাৎ আমার ঈশ্বর আর প্রেমিকা, আমার কাছে এক হয়ে উঠুক।'[১২৩] বিনু এই কথায় কোন আবেগ পায়নি। বরং রণেনের মোটা হাত দুটি তার কাছে অবশ, অসুস্থ, অনঢ় আর নিশ্চল মনে হয়েছে। রণেনের বেকারত্বের কারণে বিনুর বাবা-মা রণেনের ওপর খুশি হতে পারে নি। বিনুরও মনে হয়েছে তার অর্থহীন বাক্য বেকারত্বের অপলাপ মাত্র। এক বছর পর চাকরি পেয়ে রণেন বিনুর জীবন থেকে নিজেই সরে গিয়েছিল। এই সময় বাঙালি মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুর্গতির চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল নৈতিক চরিত্রহানির দুর্গতি। বিনুর প্রথম প্রেমিক বরুণের চরিত্রের নৈতিক অবক্ষয় হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বরুণ বিনুর কাছে এসেছিল। বিনু পুনরায় বরুণের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বরুণ প্রেম সম্পর্কিত সকল মূল্যবোধ ত্যাগ করে নগ্ন সিনেমায় মেতেছিল। শরীর তার কাছে প্রধান বিষয়। বরুণের কাম-উদ্দীপক গল্পের বিপরীতে বিনুর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে 'রাস্তার কুকুর, গোরু, ভেড়া, ছাগল।'[১২৪]বরুণের অশ্লীল আহবানে বিনু আর সাড়া দেয়নি। বরুণের প্রতি হৃদয় থেকে শুধু ঘৃণা আর বিদ্বেষ উৎসারিত হয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে একের পর এক প্রত্যাখ্যানে বিনুর শরীর ভেঙে পড়ে। বিনু আশায় থেকেছে একটি ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবেই। বিশ্বাস নিয়ে একটি দিনের জন্য নিজেকে তৈরি করেছে।

বিনুর বাবা রক্ষণশীল। যুদ্ধের অভিঘাতে পরিবারের অর্থনৈতিক ভিতটি নড়ে গেলে মেয়েকে কলকাতার আদিবাসিন্দা কায়স্থের সাথে পাত্রস্থ করতে চান। এই সংস্কার থেকে বিনুর বাবা বের হতে পারেননি। তার দেখা প্রতিষ্ঠিত সকল কায়স্থ পাত্রই পূর্ববঙ্গের। তাছাড়া কেরানি, লেবার সুপারভাইজার কাউকেই বিনুর বাবার পছন্দ হয় না। মধ্যবিত্তের এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি থেকে বের হতে পারেননি বলে তার মেয়ে দীর্ঘদিন অরক্ষণীয়া থেকে যায়।

বিনুকে পাত্রস্থ করার শেষ চেষ্টা করে সাধন। বিনুকে নিয়ে হাজারীবাগে যায় বোনের স্বাস্থ্য ফেরাতে। মনোরম পরিবেশে বিনুর সৌন্দর্য ফিরলেই অনাদির সাথে বিয়ে দেবে। অনাদি বি টি রোডের কারখানার অ্যাসিস্টেন্ট লেবার অফিসার। অনাদি বিনুর বয়স জানতে পেরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সাধনকে তাচ্ছিল্যের ভাষায় বলে :

> ততটা ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। এখনও সে বেশ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর ভান করলেও সত্যি খুব শালীন আর রুচিশীল বলেই মনে হয়। আরো চেষ্টা করো। সাকসেসফুল হবে।[১২৫]

এই অনাদি যখন বিনুর প্রতি অলোকের মুগ্ধতা লক্ষ করে সে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। নিজের বোনের জীবনের পুনরাবৃত্তি বিনুর মধ্যে দেখে। তার বোন লীলারও বয়স কমিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনাদি চরিত্রে মধ্যবিত্তের দ্বৈত মনোভাব প্রকাশিত। ভাবী স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যানের পর তার প্রতি পুনরায় ভালোলাগা মনের কুটাভাষ প্রমাণিত।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক সাধনের কাছে বোনের বিয়ের সমস্যা বড় সমস্যা। এর থেকে উত্তরণের জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়। বুড়ো বলে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবচেতনে শীলাকে আসল সত্যটি বলে দেয় ‘সত্যি বলছি শীলু, তোমাকে বলছি, আমি এখনও এখনও আসলে আমি ছোট। [১২৬] সাধনের সত্য ভাষণ এবং বিকৃত দেহজ কামনার আকাঙ্ক্ষায় শীলার সাথে তার প্রেমের সমাধি রচিত হয়েছে।

সমরেশ বসু উপন্যাসে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রকে সমান প্রাধান্য দিয়েছে। পুরুষ চরিত্রের সামূহিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি নারী মনস্তত্ত্ব প্রকাশে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত।

বিনুর প্রেম এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া তার জীবন বাস্তবতার প্রতিরূপ। মনের জান্তব অন্ধকার বারবার বিনুকে গ্রাস করতে চেয়েছে। একাকী নির্জন ঘরে তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হতে চেয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাকে মুক্ত করে অলোক। অনাদির সাথে বিচ্ছিন্নতায় অলোক তাকে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে। তার কাছে বিনুর চেহারা মুখ্য না, তার সহজ-সরল সাবলীলতা প্রধান বিষয়। বিনুর আত্মময়তার দুর্ভেদ্য

দেয়াল ভেঙে বিনুকে আলোকিত করেছে। বিনু সাহসী হয়ে অলোককে গ্রহণের ব্যাপারে বাবা মার সাথে নিজেই কথা বলতে চেয়েছে। বিনুর আত্মবিশ্বাস বিনুকে সত্যের কাছে নিয়ে গেছে।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র ভবতোষ মিত্র। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আমলা। দীর্ঘ সংসার জীবনে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বুঝেছে অন্তঃসারশূন্যতা। 'নিজের জন্য কিছু অর্জন করেনি। প্রাক-যৌবনে গুরুকন্যা ইন্দিরাকে ভালোবেসেছিল। প্রতিষ্ঠার লোভে এই প্রেমকে তুচ্ছ করে ধনীর কন্যাকে বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল। ইন্দিরাও তাকে সরাসরি ভালোবাসার কথা জানায়নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একাকিত্বের দুর্মহ যন্ত্রণা আর ভয়ংকর ব্যর্থতায় নিজেকে প্রশ্ন করেছে 'এখন আমি কী করব?'[১২৭] প্রথমে ভেবেছিল ঈশ্বরে সমর্পিত হবে কিন্তু ঈশ্বরানুসন্ধানে মুক্তির পথ তার নয়। তাই সে বেরিয়ে পড়েছে প্রকৃতি আর মানুষের সান্নিধ্যে। বৈরাগীর বেশ ধরে নয়, নিজের মনকে বুঝে। সে-ই অলোককে পরামর্শ দেয় সত্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার। নিজের মনকে প্রাধান্য দিতে।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র অধ্যাপক নলীনাক্ষ ভট্টাচার্য। সংসারে একটু বেশিই কৌতূহলী। নলীনাক্ষের প্রগলভতা দেখে সহজেই প্রতীয়মান হয় মানসিকভাবে অসুস্থ। অসুখী দাম্পত্য এই অসুখের মূল কারণ। দরজা বন্ধ করে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছাত্রীকে বিয়ে করায় এক ধরনের হীনম্মতা এবং মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। স্ত্রীর অসম মানসিকতা তার দাম্পত্য সংকটের মূল কারণ। স্ত্রীর ভোগাকাঙ্ক্ষার অসহায় বলি হয় তাদের একমাত্র কন্যা মঞ্জুলিকা। বাবা-মার অসুস্থ দাম্পত্য জীবন তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। সে পুকুরের পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করে।

উপন্যাসে মঞ্জুলিকা চরিত্রটির উপস্থিতি স্বল্প। সামান্য উপস্থিতিতে চরিত্রটি সমকালীন যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে। বাবা-মায়ের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন তার কিশোর মনকে ভাবিয়েছে। সৎ মা এবং বাবার প্রাত্যহিক কলহ দেখে সে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে :

> আমার নিজের মা যদি বেঁচে থাকত, তবে কী হত আমি জানি না। আমার এই মাকে বাবা বেশ্যা বলে।...নতুন মার অনেক ব্যাটাছেলে বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে মা থিয়েটারে যায়। অনেক রাত্রে বাড়ি আসে। সারা রাত ঝগড়া হয়। বাবা ভয় পায় নতুন মাকে। বাবার চাকরিও নাকি নতুন মা খেয়ে দিতে পারে।...আমাদের পাড়ার বিভূতিদা আমাকে খারাপ খারাপ চিঠি লিখত। তার সঙ্গে পালাতে বলত। আমার ঘেন্না হয়। তার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল।[১২৮]

নলীনাক্ষের বিকারগ্রস্ত দাম্পত্যজীবনের বিপরীতে বিনু-অলোকের প্রেম-দাম্পত্য আকাঙ্ক্ষাকে দাঁড় করানো হয়েছে। সুস্থ দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসই মূল কথা— এটাই ঔপন্যাসিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উপন্যাসে বিনুই একমাত্র আত্মবিশ্লেষক। মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে :

> ছেলেবেলা থেকে মিথ্যে ছলনা কি কম দেখেছে বিনু। হয়তো এটাই সংসারের আসল রূপ। কোথাও সে অত্যন্ত প্রকট কুৎসিত। কোথাও প্রত্যহের নানান গ্লানির সাথে মিশে থাকে।[১২৯]

দুরন্ত চড়াই নারী মনস্তত্ত্বনির্ভর উপন্যাস। বিনুর শেষ চড়াই আবিষ্কারের মধ্যে ধরা পড়েছে মধ্যবিত্তের ফাঁকি। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> ছেলেবেলা থেকে মিথ্যে ছলনা কি কম দেখেছে বিনু। হয়তো এটাই সংসারের আসল রূপ। কোথাও সে অত্যন্ত প্রকট কুৎসিত। কোথাও প্রত্যহের নানান গ্লানির মধ্যে মিশে থাকে। এত বড় হয়েছে বিনু। নিজের বাবা-মাকে সেই বা কতটুকু চেনে। তাদের সংসারেও নৈতিকতা থেকে জীবনের প্যাটার্ন বজায় রাখাটাই চিরকাল দেখে এসেছে। যেখান থেকে এখানে সে এসেছে– আবার সেখানেই ফিরে যাবে। এবং আর সকলের মতো, আর সকলের মধ্যে, তাদের সমাজে এবং স্তরে।[১৩০]

উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের সমাজ-প্রতিবেশ বিপর্যস্ত অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে। এই সময়টাতে বনেদি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যায়ে নেমে এসেছিল। আবার এই মধ্যবিত্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নিচে নামতে পারেনি। ফলে বিরূপ সমাজ-প্রতিবেশে তাদের আত্মশ্লাঘা নিয়ে বাঁচতে হয়েছে। বিনুর বিয়েসংক্রান্ত জটিলতা দিয়ে ঔপন্যাসিক বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

শেষ দরবার

শেষ দরবার উপন্যাসে সমরেশ বসু বেকার মধ্যবিত্ত যুবসমাজকে দাঁড় করালেন প্রত্যাশ-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং নীতি নৈতিকতার দ্বন্দ্বের মাঝখানে। উপন্যাসের একেবারে শেষপর্যন্ত তিনি যুব সমাজের ওপরে বিশ্বাস হারাননি। উপন্যাসের নায়ক বিদ্যুৎবরণ গাঙ্গুলি নাগরিক জীবনের ক্রুরতা ভণ্ডামি, নগ্নতা, হতাশা এবং আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তি পেতে সাঁওতাল অধ্যুষিত বাজসিদ্ধি গ্রামে আসে। উদ্দেশ্য টেরাকোটার মূর্তি চুরি করা। এর বিনিময়ে শহরে ফিরে গিয়ে সে একটা চাকরি পাবে। সুদিনের প্রত্যশায় পথ চেয়ে থাকা প্রেমিকা মিনাক্ষীকে নিয়ে ছোট্ট একটা সংসার পাতবে। আর দশটা বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো গৃহী স্বপ্নে বিভোর হয়ে রুদ্রবৈভবের মন্দির থেকে টেরাকোটার মূর্তি চুরি করতে রাজি হয় সে। তার মধ্যে নীতি-নৈতিকতা বড় কথা নয় বেঁচে থাকাটাই আসল ব্যাপার।

বিদ্যুৎবরণ গাঙ্গুলি সমাজের নগ্নতার কাছে নতি স্বীকার করে। অর্থের প্রয়োজনে বড়লোকের কন্যা চিনু মণ্ডলের যৌনদাস হয়। অনিচ্ছায় আর ঘৃণায় চিনুর প্রতিটি ইচ্ছা সে পূরণ করে। কিন্তু তারপরই নিঃসঙ্গতা তাকে ঘিরে ধরে। মুক্তি পেতে মীনাক্ষির কাছে গিয়েছে। কিন্তু অস্থিরতার কথা মীনাক্ষিকে জানাতে পারেনি। সমকালের যুগযন্ত্রণাকে ব্যঙ্গ করে তাই বলেছে 'রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলি কি জানেন এ সব? চেনেন এ যুগকে ?'[১৩১]

নগর কলকাতা তার মনে যে মূল্যবোধের জন্ম দেয়নি বাজসিদ্ধি গ্রামে আবছা আলোয় স্বল্প পরিচিত আভা তার মধ্যে সেই মূল্যবোধ জাগায়। পিতৃমাতৃহীন আভা ডোমেন চক্রবর্তীর বাড়ির আশ্রিতা। আশ্রিতা বলেই তার দৃষ্টিভঙ্গি সবার থেকে ভিন্ন। আভার আন্তরিকতা এবং আতিথেয়তায় বিদুৎ ক্ষণিকের জন্য হলেও কর্তব্য ভুলে যায়। মনে মনে আভার সান্নিধ্য কামনা করে। আভাকে স্পর্শ করে সাময়িক সুখ অনুভব করতে চায়। নগরজীবনের ব্যর্থতা থেকেই তার মধ্যে আভার প্রতি ভালোলাগা সৃষ্টি হয়।

বিদ্যুৎ তার পিতাকে ঘৃণা করে। একই সাথে সে নিজের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিকেও ঘৃণা করে। অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং অন্তর্গত গ্লানিবোধ থেকে তার মধ্যে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ভয়াবহ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ শেষ পর্যন্ত মূর্তি চুরি করতে পারেনি। ডোমেন চক্রবর্তীর আত্মহত্যা, আদিবাসী এসব নরনারীর বিশ্বাস ভালোবাসায় বিদ্যুৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আদিম অন্ধকার আর আলোর দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়। আভার কাছে সে পরাজিত হয় এবং আলোকিত মানুষ হতে চায়। আভা হচ্ছে এই উপন্যাসের বিবেক।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত পুরুষদের মতো নারীরাও জৈবিক চাহিদা পূরণে স্বেচ্ছাচারী। বিদ্যুৎ-এর মীনাক্ষির প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে ছিল স্বেচ্ছাচারী। অবাধ যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তারপরও নায়ক মীনাক্ষিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়।

উপন্যাসটি শিল্পমান বিচারে সফলতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নাও মনে হতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্তের জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশে অনন্য। মধ্যবিত্তের ভাষা প্রয়োগে ঔপন্যাসিক সার্থক :

> কলকাতায় তাকে বাঁচতে হবে। দূর থেকে নয়, চটচটে মাছির মতো, ঘনিষ্ঠভাবে এই পৃথিবীর হত্যা, রক্ত, উন্মত্ত প্রমোদের মধ্যেই তাকে টিকে থাকতে হবে।[১৩২]

মধ্যবিত্তজীবনের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে উপর্যুক্ত উক্তিতে। সমরেশ বসু সহজ-সরল ভাষায় অসাধারণ দক্ষতায় মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতা নির্মাণ করেছেন।

ফেরাই

ফেরাই উপন্যাসে সমরেশ বসু নারীর প্রেমভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর আত্মগত দ্বন্দ্বকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সনাতন প্রেমভাবনার বাইরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে এক মধ্যবিত্ত নারী। উপন্যাসটি শুরুও হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত নারীর মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে :

> বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের মন যতই সংকীর্ণ হোক, জীবনটা তো এমনই। 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না।' পুরুষের সমাজে বাস করব, কিন্তু যত কলঙ্কই হোক, পুরুষ নিয়ে কলঙ্ক যেন না হয়। ওটাই সবচেয়ে বেশি ধিকৃত করে আমাদের। তাই সাবধান! প্রতি পদে পদে ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত উঠিয়ে আছে সর্বত্র। ওদিকে নয় এদিকে। এখানে নয়, ওখানে। কতখানি মানা হল কি না মানা হল, সে তো মেয়েটির ব্যক্তিজীবনের গোপন বিষয়। কিন্তু এটাই সমাজ। আর এটাকে মেয়েরা এড়িয়ে চলতে পারে না।[১৩৩]

উপন্যাসটি নায়িকা-প্রধান। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে কীভাবে নারী হয়ে ওঠে সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিকশিত হয় সেই নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে কাহিনি গতি পেয়েছে।

দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ নারী। এই নারীর একটা বৃহত্তর অংশ গৃহকোণে বন্দি। অতীতকালে নারীরা কৃষিকাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখতো কিন্তু আধুনিককালে নারী সমাজকে গৃহকোণে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে নগরকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আপস করতে বাধ্য হয়। বাঙালি মেয়েরা বাইরে বের হয়। নারীর স্বতন্ত্রতা বিকশিত হয়। সমরেশ বসু *ফেরাই* উপন্যাসে এরকমই এক নারীর জয়গান করলেন। এ উপন্যাসে নায়িকার প্রাতিস্বিক প্রেমের উদয়-বিলয়ের সংকট মোচনের উদ্ভাসটুকু শুধু কাহিনির করপুটে আশ্রয় পেয়েছে।[১৩৪]

তুলিকা আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মতোই। তবে তার অভিজ্ঞতা অন্য সবার থেকে আলাদা। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে নিজেকে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখার সাধনা সে শুরু করে। তবে পরপর চারজন পুরুষের প্রেম এবং দর্শন তার জীবনকে দোলাচলতায় ফেলে দেয়। এক-একটি চিঠির মাধ্যমে এক একটি চরিত্রের মানসপ্রবণতা জানা যায়। এদের কেউ শিল্পী, কেউ অধ্যাপক, কেউ ধনী ব্যবসায়ী, কেউ বা রাজনীতিবিদ। তবে এই চারজন ভিন্ন দর্শনের মানুষের এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে— সবাই তুলিকার প্রেমিক হতে চেয়েছে। তবে তাদের জীবনদৃষ্টির ভিন্নতায় ভালোবাসার রঙ পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথম প্রেমিক শিবেন বোহেমিয়ান যুবক। কর্মজীবনের শুরুটা হ্যারিকেন কোম্পানির নকশা আঁকা দিয়ে শুরু করলেও জীবনে নানান ধরনের পেশা বদল করেছে। কখনো কর্পোরেশনের ওভারসিয়ারের কাজ করেছে, কখনো পোর্ট্রেট নকল করেছে। বৈচিত্র্যময় কর্মে পরিপূর্ণ তার জীবন। সে জানে প্রকৃতির ক্রীড়নকের মতো ভালোবাসার সর্বগ্রাসী অনুভূতিটা মেয়েদেরকে কেন্দ্র করে হয়। শিবেন বাস্তববাদী। প্রেম প্রেম খেলা তার অসহনীয়। তুলিকাকে সে নিজের মতো করে প্রেম নিবেদন করে। তুলিকা ভেতরে আজন্ম লালিত মধ্যবিত্তের সংস্কার, দ্বিধা থেকে সে শিবেনের কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় যে নায়ক তুলিকার জীবনে আসে সে বিত্তবান। তুলিকা বন্যায় আর্তদের সেবার জন্য চাঁদার অর্থ সংগ্রহ করতে এসেছিল সৌমেন মুখার্জির কাছে। তুলিকার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে সৌমেন পাঁচশ টাকা দেয়। এরপরই সৌমেন তুলিকাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখে। এই চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভালোলাগার ইঙ্গিত ছিল :

> সেই কালকুটে বর্ষার দিনটায় আপনার সবুজ পাড় দেওয়া অত্যধিক শাদা শাড়িটা অদ্ভুত রিফ্লেক্ট করেছিল। যদি আরও অনুমতি দেন, তা হলে বলি, আপনার দেহের বর্ণই বোধহয় বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ঘরের মধ্যে। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়া যদি অন্যায় না হয়, তা হলে ন্যায়তই আমার তা হয়েছিল। এবং যে কথাটা আপনাকে বোধহয় জন্মের কাল থেকে শুনতে হচ্ছে, তারই পুনরাবৃত্তি করি, আপনি রূপসী।[১৩৫]

সৌমেনের দ্বিতীয় চিঠিটাও আমন্ত্রণ জানিয়ে। সৌমেনের বাড়িতে একজন বিখ্যাত সানাই বাদক এবং একজন গায়ক আসবে সেই উপলক্ষে। সৌমেনের তৃতীয় চিঠিটা সানাইয়ের আসরে তুলিকার নীরবতা প্রসঙ্গে। তুলিকার মৌনতা, মাধুর্য এবং ব্যক্তিত্ব সবই সৌমেন উপভোগ করে। প্রথম চিঠিটার সম্বোধন শ্রীমতি তুলিকা চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় চিঠিটার সম্বোধন প্রীতিভাজনেষু তৃতীয় চিঠিটার সম্বোধন সহৃদয়াসু। সৌমেন সর্বমোট এগারোটি চিঠি লিখেছিল। প্রতিটি চিঠিতেই ভালোলাগার আবেশ থাকলেও কিছু বিষয়ে সে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিল। সে মালিকপক্ষের লোক হওয়ায় সারদা বসুর মতো ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকে পছন্দ করেনি। আবার শিবেনের মতো মদ্যপ কমার্শিয়াল শিল্পীকে সে ঘৃণা করেছে। তুলিকার সাথে শিবেনের ঘনিষ্ঠতায় ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

তুলিকার মার্জিত রুচি, পরিশীলিত ব্যবহার, আকর্ষণীয় চেহারা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তুলিকা সৌমেনের বন্ধু হয়েছে কিন্তু হৃদয়ের সারথি হতে চায়নি। সৌমেন যখন তার হাত ধরেছে তুলিকা সৌমেনকে ছেড়ে চলে গেছে। তুলিকা সৌমেনকে চিঠিতে লিখেছে সৌমেন তার হাত ধরাতে সে কিছু মনে করেনি। বন্ধুর হাত কখনো কলুষিত হতে পারে না। তবে সৌমেনের মতো পারভার্টেড জিনিয়াসকে কখনোই সে জীবনসঙ্গী করতে চায়নি। সৌমেন বিদেশে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তুলিকাকে বিয়ে করে বিদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছে। তুলিকা প্রতুত্তরে লিখেছিল সে সংশয় থেকে মুক্ত হতে চায়। এই কারণে সৌমেনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তুলিকার প্রত্যাখ্যান সৌমেনকে অভিভূত করে। সে বলে :

> আমার দাবী খুব বেশি নয় একটু পরিচয় রাখা, অসুবিধা না হলে, একটু দেখাসাক্ষাৎ করা। আমি জানি, এ দাবীও আমাদের দেশে একটি মেয়ের কাছে করা খুব মুশকিল। তবু সেই মুশকিলের আবেদনটাই রাখলাম।[১৩৬]

এরপর তুলিকার জীবনে আসে সারদা বসু। তুলিকার প্রগতিভাবনা, রাজনৈতিকবোধ সারদা বসুকে মুগ্ধ করে। স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে চিঠিতে তুলিকাকে রাজনীতি করতে নিষেধ করে না, তবে সাবধানে পা ফেলতে বলে। তুলিকার বক্তৃতায় সারদা বসু অভিভূত হয়। নারীর রাজনীতি নিয়ে সারদা বসু স্বতন্ত্র মতামত

প্রকাশ করেছে। অনেক মেয়ে রাজনীতিতে আসে কিন্তু প্রবৃত্তি ও বাসনার লাগাম ধরে রাজনীতির আসনে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। নিজে ভেসে যায়, অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তুলিকাকে সে এদের থেকে ভিন্নতর ভাবে। আর এই ভিন্নতরের সংখ্যাও নগণ্য।

সারদা বসু সংগ্রাম করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উঠে এসেছে। শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কেলিয়ারের অফিসে কাজ নেয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করে। কেলিয়ারে প্রথম ধর্মঘট করে এবং সফলও হয়। এভাবে সারদা বসু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। একসময় বড় নেতায় পরিণত হয়।

পিতৃমাতৃহীন সারদা বসুর সংগ্রামমুখর জীবনে তুলিকা ক্ষণিকের আশার আলো। সে উপলব্ধি করে প্রেমের সাথে রাজনীতির কোনো বিরোধ নেই। তবে তার রাজনীতি এবং ব্যক্তিজীবনের কোনো সাদৃশ্য নেই। তুলিকার এক প্রশ্নের জবাবে সে বলে, “রাজনীতির মধ্যে যে কী ঘোর পাপ আছে, তুমি এখনও সবটা টের পাওনি। কারণ তুমি রাজনীতির মধ্যে এখনও সেভাবে প্রবেশ করনি। জানি না, তুমি কোত্থেকে শুনেছ যে আমাকে অনেকে ‘ট্রাইকিলার রেড্’ বলে। কিন্তু জেনো সেটা বাইরের লোকেরা বলে না। আমার দলের লোকেরাই আমার এই বিচিত্র রংটা খুঁজে বার করছে। যেদিন তারা সুযোগ পাবে, আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।”[১৩৭] সে জানায় সবকিছুর মতো পার্টিরও চক্র আছে। সে নিজেও এর ভেতরের একজন এর বাইরে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। সারদা বসু শাসকচক্রের লোক। সে জানে তার নির্দিষ্ট পাওনা সে পায়নি। এই ক্ষোভ নিয়ে সারাজীবন দলের মধ্যে চিৎকার করে মরতে হবে। কেননা দলত্যাগী হয়ে টিকে থাকা অসম্ভব। সে কখনোই রাজনীতিবিবর্জিত মানুষ হতে চায়নি। আবার ক্ষমতা দখলও তার উদ্দেশ্য নয়। তবে সে জানে এইভাবে পার্টির অস্তিত্ব বেশিদিন টিকে থাকবে না। ছদ্মবেশী দেশপ্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর তাই দেশের আজ এই দুর্দশা। সুস্থ রাজনীতির প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই, তবে ভণ্ড রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সে ঘৃণার অগ্নিবলয় নিক্ষেপ করেছে। সে বিশ্বাস করে ‘রাজনীতির শুভদৃষ্টিই মানুষকে সৎ সত্যবাদী সহজ ও মহৎ করতে পারে। সমগ্র দেশব্যাপী নতুন রক্তের জোয়ার আনতে পারে।’[১৩৮] সারদা বসুর রাজনীতিভাবনার সাথে ব্যক্তি সমরেশ বসুর রাজনৈতিক প্রত্যয়ের অনেক মিল পাওয়া যায়। সারদা বসুর মতো তাঁরও পার্টির প্রতি অভিমান ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্মৃতি তাঁর সুখকর ছিল না। *ফেরাই* যদিও রাজনৈতিক উপন্যাস নয় তবু ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক দর্শন এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

সারদা বসু নিঃসঙ্গ নায়কদের প্রতিভূ। চল্লিশ বছরের দীর্ঘ জীবনে তুলিকার সান্নিধ্য কিছুটা রঙ লাগায়। আত্মমুক্তির আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তুলিকা এখানেও সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। আমিত্বের অবমাননার ভয়ে সে শঙ্কিত হয়। সংগত কারণেই এই সম্পর্কও সে ছিন্ন করে।

এরপরে তুলিকার জীবনে আসে মিহিরঞ্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবিতা লেখে। পাণ্ডিত্যের আভিজাত্যে যে অনেকটাই নিঃসঙ্গ। তুলিকার সান্নিধ্যে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি চায়। জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসুর নায়কদের মতো সমরেশ বসুর অধিকাংশ নায়ক নিঃসঙ্গ এবং সত্তাবিচ্ছিন্ন।

মিহিররঞ্জনের মনে অনেক যন্ত্রণা, কারণ— এ দেশ তাকে হতাশ করেছে। কেউ তাকে বোঝেনি কিংবা বুঝতে চায়নি। সে কারণে দেশের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। তার স্বগতোক্তি থেকে জানা যায় 'নির্বিচার অনধিকারচর্চা এদেশে, আমারই প্রত্যেক ভাইয়ের। এ ভাইদের আমি ঘৃণা করি। আমি ভ্রাতৃদ্বেষী। এ দেশে কোথাও আমার নিজের ঘর নেই।'[১৩৯] এ দেশে তার জন্ম আকস্মিক। কিন্তু তার মত এবং বিশ্বাস সিন কিংবা রাইন নদীর ধারের বাসিন্দাদের মতো। এদেশে সে অনেকটাই উপহাস্য। তবে এই ক্ষোভ এবং অসহায়তার মধ্যেও সে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। তুলিকা মিহিররঞ্জনের মনোভাবনায় সিনিসিজমের প্রভাব দেখতে পায়। তুলিকা এখানেও নিঃসহায়, তাই এই সম্পর্কও স্থায়ী রূপ পায় না।

উপন্যাসের শেষ প্রান্তে এসে তুলিকা মনস্থির করে সে, শিবেন রায়ের কাছে আত্মসর্মপণ করবে। এ ক্ষেত্রে সে আপোস করবে না। সৌমেনের পাহাড়প্রতিম প্রতিপত্তির কাছে তুলিকা অসহায় বোধ করে। সারদা বসুর নিশ্চিত শান্ত জীবনে তুলিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। মিহিররঞ্জনের কাব্যিক পঙক্তিময়তায় তুলিকা একেবারেই সাধারণ। একমাত্র শিবেনই তার যোগ্য। শিবেনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার যে লড়াই তুলিকা তাকে শ্রদ্ধা করে। শিবেনের প্রাণবন্ত জীবনস্ফূর্তিতে তুলিকা জীবনের কাঙ্ক্ষিত আনন্দ পায়। শিবেনের মতো মধ্যবিত্তের সংগ্রামমুখর জীবনে বেঁচে থাকার রসদের কোনো অভাব হয় না। তাই শিবেনকে তুলিকা গ্রহণ করে। কারণ সে কখনোই অভ্যস্ত নিরুত্তাপ দাম্পত্যজীবন চায়নি। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামময় জীবনই তার কাম্য।

সমরেশ বসুর উপন্যাসের নায়িকারা সাধারণত সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং আধুনিক। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে তারা অন্তরাত্মাকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

তুলিকার পরিবার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার হলেও গোঁড়ামিকে প্রাধান্য দেয়নি। তুলিকার ভালোলাগাকে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সন্দিগ্ধ মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চিন্তিত হয়েছে কিন্তু মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে। তুলিকার মা বলে— 'বললেও তো পারিস কাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। শুধু টো টো করে ঘুরে বেড়াস?'[১৪০]

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের জীবনসঙ্গী নির্বাচনে দ্বিধা উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে তুলিকার আত্মকথনে। তবে *ফেরাই* আত্মকথনধর্মী উপন্যাস নয়। কেননা তুলিকার স্বগত কথনের পরপরই চারজন নায়ক ধারাবাহিকভাবে চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসে প্রবেশ করে। তাই উপোদ্ঘাতে কিছুটা আত্মকথনধর্মী হয়েও শেষ পর্যন্ত পত্রোপন্যাস সমধর্মী হয়ে উঠেছে।[১৪১] পত্রের ব্যাবহার বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২) পত্রকাব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *প্রিয়তমাসু*, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *পোনুর চিঠি* পত্রোপন্যাস। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *ক্রৌঞ্চ মিনু*ও পত্রোপন্যাস সমশ্রেণির রচনা। এই ধরনের উপন্যাসে নানা ধরণের চরিত্র পত্রলিখনের মাধ্যমে উপন্যাসে উপস্থিত হয়।

মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক জীবননির্মাণে সমরেশ বসু অনন্য। সহজ স্বাভাবিকতা দিয়ে মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনকে ধরতে চেয়েছেন। সরল বাক্-নির্মিতি দিয়ে খুব সহজেই পাঠকের কাছকাছি আসতে পেরেছিলেন। *ফেরাই*- এর সকল চরিত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। মধ্যবিত্তের কথনভঙ্গি উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে।

ধূসর আয়না

নাগরিক মধ্যবিত্তের ইন্দ্রিয়গত অবক্ষয়, আদর্শিক অসঙ্গতি আর মানবিক বিপর্যয়ের শিল্পভাষ্য *ধূসর আয়না* উপন্যাস। স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষে মফস্বলের একদল তরুণ-তরুণীর প্রেম, বিবাহভাবনা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বর্ণনা পাই এই উপন্যাসে। সমকালীন যুগমানসের বৈরিতায় উপন্যাসে বিধৃত প্রতিটি চরিত্রই বিভ্রান্ত। সমরেশ বসু ব্যক্তিগত জীবনে যা অবলোকন করেছেন তাই- সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের কুণ্ডলায়িত পাপ সম্ভাবনাময় যুবসমাজকে কীভাবে রক্তাক্ত করেছে তারই চিত্র *ধূসর আয়না*। চরিত্রদের প্রত্যেকেরই যেন নিজ দর্পণে আত্মাবলোকন করেছে এবং সে আয়না নিজেদেরই তপ্ত অথবা বিষণ্ন নিশ্বাসে ঝাপসা হয়ে গেছে।[১৪২] তাদের এই আত্মানুসন্ধান ও পঙ্কিলতাময় জীবন ব্যর্থতারই নামান্তর। সমরেশ বসু উপন্যাসটি যখন লেখেন তখন নাগরিক মধ্যবিত্তের বৃত্তাবদ্ধ জীবন তার অনেকটাই অধীত ফলে মধ্যবিত্ত জীবনবৃত্তের সন্ধিসংকটই ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে নিনা নামের এক নারীর মনোদৈহিক সংকটের মধ্য দিয়ে। নিনার গোপনে অহীনকে বিয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঞ্জীবের নিকট দেহদানের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে সংকটের শুরু। একদিকে অহীনের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্যদিকে ক্ষণিকের দুর্বলতায় নারীত্ব হারানো বেদনায় সে দগ্ধ। নিনার আত্মকথনের মধ্য দিয়ে সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তরালবর্তী ক্ষয় ও নৈতির চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে।

চরিত্রের স্বীকারোক্তি বাংলা উপন্যাসে নতুন কিছু নয়।[১৪৩] কিন্তু নিনার স্বীকারোক্তি এবং সত্তাসংকটের জটিলতায় সমাজ-অন্তরালবর্তী সমকালীন যুবমানসের বিকার ও বিনষ্টির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বিএ পরীক্ষার পরবর্তী অখণ্ড অবসরে সংস্কৃতি জগতে প্রবেশের বাসনায় বন্ধু সুহৃদের সাথে রাণীর বাড়িতে আসে নিনা। রাণীর বাড়িটি লেখকের ভাষায় 'মুর্শিদাবাদের শাহীপুরের অন্ধকার গুহা'।[১৪৪] নিনা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নিনা ভালো নাচে গান গায়। সে কারণে সবার কাছে তার আলাদা কদর। সবাই নিনাকে পেতে চায়। নারী হিসেবে এই চাহিদায় সে গর্ববোধ করে। পারিবারিক শিক্ষা থেকেই সে সামাজিক অনুশাসনের প্রতি সম্মান এবং ব্যক্তিচরিত্রে সংযম করতে শিখেছে। সে কারণে রাণীর বাড়িতে সবার থেকে সে ব্যতিক্রম। রাণীর বাড়িতে সে কখনোই সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে না। শহরের সবাই রাণীর বাড়ির অপকীর্তি সম্পর্কে জানে। নিনারও অজানা নয় কিন্তু গুহায়িত অন্ধকারের প্রতি অবদমিত আকাঙ্ক্ষা এবং অহীনের প্রতি ভালোবাসা থেকে সে রাণীর বাড়ি ছাড়তে পারে না। সুস্থ সংস্কৃতিচর্চায় বিশ্বাসী নিনাও একময় পাপের চক্রব্যূহে পড়ে যায়। রাণীর কৌশলে সঞ্জীবের ফাঁদে ধরা পড়ে। স্টীমার পার্টির নাম করে আলো-আঁধারের পরিবেশে সঞ্জীব নিনাকে ভোগ করে। এরপরই নিনার মধ্যে জন্ম নেয় পাপবোধ। একদিকে অহীনের প্রতি দায়িত্ববোধ অন্যদিকে নিজের বালখিল্যতায় ভাবতে শুরু করে সে প্রেগন্যান্ট। এর সাথে যুক্ত হয় খবরের কাগজে পড়া শ্যামলী নামের এক গর্ভবতী নারীর রেললাইনে মালগাড়ির নিচে পড়ে আত্মহত্যা। এসবই অবচেতনে তার জীবনের প্রতীক হয়ে ধরা দেয়। পরাবাস্তববাদী আবহাওয়ায় সে ভয় পেতে থাকে :

> নিনা সামনে তাকাতে ভয় পেল যেন। ও নীচের দিকে তাকিয়ে চলেছে। যদিও চোখ ক্রমেই ভয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং নিশ্বাস সত্যি বন্ধ হয়ে আসছে। ট্রাঙ্কের শব্দটা ওর কানে বাজছে এখনও। যেন, চলার তালে তালে,মুখ-বন্ধ তালাটা বাজছে ঠক ঠক ঠক। সামনেই অনেকগুলো রেললাইন। মালগাড়ি চলছে ঝুকঝুক করে, সে শব্দ ওর কানে গেল না। বাতাস না পেয়ে যে এঞ্জিনের ধোঁয়া ওকে গ্রাস করছে, খেয়াল করল না। অন্ধকার আকাশের গায়ে রেলওয়ে ওভারব্রিজটা এখনও ওর চোখে পড়েনি। অনেকখানি লম্বা ব্রিজ। যে-ব্রিজটার ঠিক মাঝখানে একটি মাত্র টিমটিমে আলো জ্বলছে এবং দূর থেকে ব্রিজটাকে দেখাচ্ছে যেন শূন্যে ঝোলানো, লোহার জটিল বেড়ায় ঘেরা একটি সুদীর্ঘ ফাঁদ। নিস্পন্দ, শিকারের জন্য অপেক্ষমাণ স্তব্ধ ফাঁদ।
>
> নিনা ওভারব্রিজের সিঁড়িতে পা দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখল, সিঁড়ির সামনে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে, ফণীমনসার ঝাড়ের কাছে, একটা ট্রাঙ্ক খুলে পড়ে রয়েছে। তার ভিতরে দুমড়ে মুচড়ে গুঁজে রাখা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মেয়েটির মুখে সদ্য আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। মাথায় কপালে সিঁদুর মাখানো। শাড়িটা একপাশে গোঁজা। ব্লাউজের বুক খোলা, কোঁচকানো। শায়াটা কোনওরকমই আব্রু রক্ষা করতে পারেনি, এবং রক্তাক্ত। চুলগুলো তেলহীন, রুক্ষ, খোলা। মেয়েটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে, কষ্টে নিশ্বাস ফেলেছে, আর বোধহয় ফোঁপাচ্ছে।
>
> নিনা দু হাতে মাথা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠতে গেল। ওভারব্রিজের ওপর দুম দুম করে ভারী পায়ের শব্দ বেজে উঠল। তাকিয়ে দেখল, সারা গায়ে চাঁদর মুড়ি দেওয়া একটি লোক নেমে আসছে। জোরে জোরে পা ফেলে নামছে; কিংবা ভয়ে, বা ভয় দেখাবার জন্যেই। নিনা দেখল সিঁড়ির সামনে ফণীমনসার ঝাড় নিশ্চল, এবং সেখানে কোনো ট্রাঙ্ক নেই... ।[১৪৫]

নিনা অহীনের ভালোবাসায় পরিস্নাত হয়ে শুদ্ধ জীবন-প্রত্যাশী। কিন্তু সঞ্জীবের সাথে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে শুদ্ধ হয়ে অহীনের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দোলাচলতা তার চরিত্রে প্রতীয়মান। সে যখন জানতে পারে সঞ্জীব তাকে গভীরভাবে ভলোবাসে তখন তার মনে হয় আগে জানলে লুকিয়ে অহীনকে বিয়ে করত না। আবার অহীনকে হারানোর ভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অহীন যদি সব জানতে পারে তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে কি না এই প্রশ্ন তাকে দগ্ধ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাণীর কৌশল। রাণী তাকে বোঝায় সঞ্জীবকে ত্যাগ করলে সে দুকূলই হারাবে তারপরও নিনা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে অহীনের কাছে সব স্বীকার করেছে।

নিনা পচে যাওয়া সমাজের অংশীদার। শৈশবে মায়ের পর পর দুটি ভ্রূণ হত্যায় নিনার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়নি, যদিও তার দাদারা খুশি হয়েছিল। শুধু মা-বাবার নিশ্চল আদর্শের মূর্তিটাতার কাছে একটু নড়ে গিয়েছিল। কৈশোরে স্কুলে অঙ্কের দিদিমণির সাথে পিয়নের প্রেমে দুর্বিনীত অশ্রদ্ধার হাসি হেসেছিল। আর প্রধান শিক্ষিকার গভর্নিং বডির সেক্রেটারির সাথে প্রেম তার অস্বাভাবিক লেগেছিল। প্রৌঢ়া হয়ে প্রসাধনপটিয়সী হাসিখুশি শিক্ষিকার জন্য তার মনে কোনো ভক্তি ছিল না। স্বাধীনতাত্তোর পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে মানবিকতা প্রকাশের জন্য যে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ প্রয়োজন তার অনেকটা বিনষ্ট হয়েছিল। সম্ভাবনাময় যুবসমাজ সঠিক পথের অভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অহীনের মতো যুবকেরা নিজ চেষ্টায় কর্মসংস্থান করেও পরিবারের যথার্থ সমর্থন পায়নি। বরং পারিবারিক আভিজাত্যে তার ছোট চাকরি করে স্বাবলম্বী হওয়া তার দাদার আত্মসম্মানবোধে লেগেছে। ডাক্তার রোগীর সহায়ক না হয়ে অসহায়তাকে উপভোগ করেছে। কেটির মতো মেয়ে নকলের অভিযোগে পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়ে শিক্ষককে হুমকি দিয়েছে— 'এর প্রতিশোধ আমি নেব, হেডমিস্ট্রেস বন্দনা গাঙ্গুলির রক্তদর্শন করব আমি'।[১৪৬] যেন সমাজটাই পচা-গলা।

নিনার পরিবার ১৯৫০-এ পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছিল। নিনার বাবা স্কুলশিক্ষক। ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী। কিন্তু নিজে গৃহকোণ থেকে বের হন না। মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়াকে তিনি যুগের চাহিদা মনে করেন। তাই নিনার টিউশনি করে পাওয়া আশি টাকাকে সংসারের জন্য আশীর্বাদই ভাবেন। তবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নেন না। নিনার অধিক রাতে বাড়ি ফেরা তার কাছে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। প্রবাসী ছেলেদের পাঠানো মাসিক পাঁচশ টাকা এবং তার গচ্ছিত টাকা দিয়ে সংসার চলে যায়। অহীন যখন নিনাকে নিয়ে যাবার জন্য তার কাছে অনুমতি প্রর্থনা করেছিল তখন তিনি বলেছিলেন 'নিনাকে নিয়ে তুমি সংসারের পথে যাও। আমি বুঝতে পারছি, একটা ঘোর কুটিল অন্ধকার থেকে তোমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছ।'[১৪৭] মধ্যবিত্ত পরিবারের এই গৃহকর্তা পারিবারিক বন্ধনকে অটুট রাখতে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

নিনার মা কর্তব্যপরায়ণ গৃহবধূ। সংসারে স্বামীকে ভয় এবং ভক্তি করে। নিনার অধিক রাতে বাড়ি ফেরা সব সময় স্বামীর কাছে লুকান। ধর্মভীরু এই নারী সংসারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য নিনাকে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করেন। নিনার রাণী সান্যালের বাড়িতে যাওয়া তিনি স্বাভাবিকভাবে নেন না। নিনার লুকিয়ে বিয়ের সংবাদে শঙ্কিত হয়ে মেয়েকে শাসন করার চেষ্টা করেন।

রাণী পুরুষের জৈবিক পশুবৃত্তির শিকার। শৈশবে মায়ের দ্বিচারিতা, বাবা নির্লিপ্ততায় তার জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। পুরুষ মানেই তার কাছে মধুকর। স্বামী হিসেবে যাকে পেয়েছিল সে বদ্ধ উন্মাদ। মায়ের প্রতি ক্ষোভ থেকেই মায়ের প্রেমিকের সাথে জৈব সম্পর্কে জড়িয়েছিল। তার সমবয়সী ছেলেদের তার কখনো পুরুষ মনে হয়নি। স্ত্রীর প্রতি আধিপত্য বিস্তারের অক্ষমতায় তার বাবা আত্মিক সংকটে ভুগেছে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর পরকীয়াকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাণী তার বাবার ভগ্নস্বাস্থ্য এবং দুর্বল মানসিকতার কারণে বাবাকে করুণা করত। মা-বাবার দাম্পত্যজীবনের অতলান্ত শূন্যতা তাকে প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কে ঈর্ষাকাতর করেছিল। তাই নিনাকে অবলীলায় সঞ্জীবের হাতে তুলে দেয়। আবার নিনার গর্ভধারণের খবর জেনে তাকে অ্যাবরশনের জন্য ঔষধ এনে দেয়। বহিরাবরণে সে সাত্ত্বিক বিধবা। মাছ, মাংস খায় না, বিধবার আচার পালন করে কিন্তু সন্ধ্যা হলেই মদের নেশায় ডুবে যায়। নিশিকান্তর প্রচ্ছায়ায় সে ক্রমেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। সমরেশ বসু যেমন অধঃপতিত পুরুষ চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তেমন অধঃপতিত নারীচরিত্র নির্মাণ করেছেন।

উপন্যাসে আরো একটি অধঃপতিত পুরুষচরিত্র নিশিকান্ত চ্যাটার্জি। তার ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবনের মূলে রয়েছে নারীর প্রতি ভোগাকাঙ্ক্ষা। রাণী এবং তার মা দুজনকেই সে ভোগ করে। সে ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ঠগ, প্রতারক। অবৈধভাবে খুব সহজেই সমাজের উপরিতলের অংশ হয়। ভোগ ও রিরংসায় নিমজ্জিত চরিত্রটির কোনো সদর্থক উত্তরণ নেই।

সঞ্জীব রাণী সান্যালের প্রাক্তন প্রেমিক। শিক্ষা ও প্রতিপত্তির প্রভাব তাকে নিঃসঙ্গ করেছিল। বিষন্নতা আর বিকারগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে নিনাকে ভালোবেসে স্বাভাবিক হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিনার প্রত্যাখ্যানে সে আগ্রাসী হয়। কৌশলে সে নিনাকে ভোগ করে। পরক্ষণে তার মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম হয়। শেষপর্যন্ত নিনা অহীনের সুস্থস্বাভাবিক জীবন প্রত্যাশায় সে আত্মহত্যা করে।

উপন্যাসে নামকরণ কাহিনির সাথে সাজুয্যপূর্ণ। ‘নিনা, রাণী, সঞ্জীব, অহীন সবাই ধূসর আয়নায় আত্মবিম্ব দেখতে চেয়েছে। পারিপার্শ্বিক পঙ্কিলতার গভীর আবর্তে সবাই নিমজ্জিত। নিনা স্বপ্ন দেখে রূপকথার রাজকুমারের মতো অহীন তাকে মুক্ত করবে। রাণীর কোনো স্বপ্ন নেই। প্রত্যাখ্যাত সঞ্জীব

আত্মহননে সারাজীবনের জন্য মুক্তি পায়। অহীন হৃদয়ের বিশালতা দিয়ে পরিশুদ্ধ নিনাকে পেতে চেয়েছে। একারণে ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিনার অ্যাবরশন করায়। প্রতিটি চরিত্রই প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, হতাশা এবং যন্ত্রণায় দীর্ণ।

উপন্যাসের বিষয়বৈভব ও প্রকরণের বিনির্মাণে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।...বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, ...যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে... ।[১৪৮]

সমরেশ বসু উপন্যাসের ভাষা নির্মাণে বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দেন। জটিল ও দুরূহ শব্দ পরিত্যাগ করে চরিত্রের দৈনন্দিন ভাষাকে প্রাধান্য দেন। ফলে তাঁর উপমা-উৎপ্রেক্ষা কখনোই জটিল কিংবা দুরূহ নয়, বরং তা শাব্দিক সৌকর্যে অনন্য। যেমন :

কাহিনির প্রয়োজনে কখনো কখনো সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে :

> কোথায় যাইতেছ, জায়গার নাম না বলিয়া যাওয়ায় এমনিতেই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এখন তোমার চাকরির কথা জানিয়া আরও উদ্বেগবোধ হইতেছে; বিদেশে দেড়শো টাকার চাকরি করিয়া তোমার জীবনধারণ অসম্ভব... ।[১৪৯]

উপন্যাসের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কয়েক ধরনের ভাষা নির্বাচন করতে পারেন, যথা— লেখক-কেন্দ্রিক, পাঠককেন্দ্রিক, এবং চরিত্রকেন্দ্রিক।[১৫০] সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলতে গিয়ে এই তিন ধরনের ভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে নাগরিক শূন্যতা, নৈরাশ্য, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বেদনা প্রভৃতি অনুষঙ্গ তাঁর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই পর্বের উপন্যাসে সমরেশ বসু চলমান জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিল্পে রূপ দিয়েছেন। সেই সাথে জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ সময়কে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের প্রভাব স্বাধীনতাত্তোর পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা, কলকারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, ছাত্র আন্দোলন, কৃষকদের মধ্যে জোতদার-হানাদার বিরোধী সংগ্রাম, সরকারবিরোধী বামপন্থী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এই পর্বে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত মধ্যবিত্তকে পাচ্ছি পরবর্তী পর্বে আমরা অস্তিত্ব-উন্মূলিত মধ্যবিত্তকে পাব, যারা নেতির মধ্যে ইতিবাচকতার সন্ধানে রত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, *বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), পৃ. ২৪

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *হৃদয়ের একূল-ওকূল* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১২৮

৩. *নয়নপুরের মাটি* সমরেশ বসু পরিকল্পনা করেছিলেন 'আদাব' রচনারও আগে। এই উপন্যাসটি তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। তাঁর লিখিত প্রথম উপন্যাস *নয়নপুরের মাটি*। মাসিক *পরিচয়ে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির ভূমিকায় সমরেশ লিখেছিলেন— *নয়নপুরের মাটি*-তে একটি লাইন আছে, আহা! বাঁধা বীণার তারে বেসুর কী গভীর! সেই সুর বাঁধারই প্রথম উন্মাদনা 'নয়নপুরের মাটি' আমার প্রথম লেখা উপন্যাস। দ্রষ্টব্য : সমরেশ বসু, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭), ভূমিকাংশ, বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপন্যাসের উদ্ধৃতি সমূহ রচনা সংগ্রহের গ্রন্থপাঠ থেকে উৎকলিত।

৪. সমরেশ বসু, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯৯

৫. সুধীর কুমার নন্দী, *নন্দনতত্ত্ব* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬), পৃ. ২৯

৬. সমরেশ বসু, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, *পূর্বোক্ত* , পৃ. ২১

৭. নিম্নজীবী বলতে আমরা বুঝি প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে দারিদ্র সীমা বা তার নিচে থাকা মানবগোষ্ঠী, যাদের অবস্থান সমাজের প্রান্তসীমায়। ঝুমা রায় চৌধুরী *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন, প্রথম খণ্ড* (কলকাতা : পূর্বাশা ২০০৭), পৃ. ১২৬

৮. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬), পৃ. ৯

৯. সমরেশ বসু, *নয়নপুরের মাটি, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১

১০. ঝুমা রায় চৌধুরী *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২৮

১১. সমরেশ বসু, *নয়নপুরের মাটি, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ.২৪

১২. *তদেব*, পৃ. ২৪

১৩. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১*

১৪. সমরেশ বসু, *নয়নপুরের মাটি, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯

১৫. *তদেব*, পৃ.৬২

১৬. *তদেব*, পৃ.৭১

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য : এপার বাংলা-ওপার বাংলা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯) পৃ. ১২৫

১৮. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৮৯), পৃ ৩৬

১৯. সমরেশ বসু, *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭) পৃ. ২৮৫

২০. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬) পৃ .৫৪

২১. সমরেশ বসু, *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৭

২২. *তদেব*, পৃ. ২৮৭

২৩. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬

২৪. সমরেশ বসু, *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৫

২৫. *তদেব*

২৬. *তদেব*

২৭. *তদেব*, পৃ. ৩১৮

২৮. *তদেব*, পৃ. ৩১৯

২৯. *তদেব*

৩০. সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার* (ঢাকা: ঐতিহ্য,২০০৬) পৃ. ২০৭

৩১. সমরেশ বসু, *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২২

৩২. *তদেব*, পৃ. ৩৪০

৩৩. *তদেব*, পৃ. ৩৩৫

৩৪. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন, পৃ. ৪৩

৩৫. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৫

৩৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭৫

৩৭. *তদেব*, পৃ. ৪১৭
৩৮. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫
৩৯. *শ্রীমতি কাফে*, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৭
৪০. হিতেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু মুক্তিপন্থার সন্ধান (কলকাতা : প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫) পৃ. ১৪৫
৪১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ১৮৫
৪২. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২১
৪৩. *তদেব*, পৃ. ৩২৬
৪৪. *তদেব*, পৃ. ৩১৮
৪৫. *তদেব*, পৃ. ৩৪৩
৪৬. *তদেব*, পৃ. ৪২১
৪৭. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩
৪৮. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩২
৪৯. *তদেব*, পৃ. ৪২০
৫০. *তদেব*
৫১. *তদেব*
৫২. *তদেব*, পৃ.৩৭০
৫৩. ঝুমা রায় চৌধুরী *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬
৫৪. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৫
৫৫. *তদেব*, পৃ. ৩৮০
৫৬. *তদেব*
৫৭. ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার চেষ্টা করা হয়। রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়।...১৯২৩ সালে তিনজন কমিউনিস্ট ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে স্টেট প্রিজনার (বিনা বিচারে রাজবন্দি) হন।...শুরুর দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়নি। পার্টির প্রথম কমিটি গঠিত হয় ১৯২৫ সালে। পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। উদ্ধৃত : মুজফ্ফর আহমদ, *সমকালের কথা*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (কলকাতা : চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৬) পৃ. ২৭
৫৮. *তদেব*, পৃ. ৪১৩
৫৯. *তদেব*, পৃ. ৩২৫
৬০. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৯
৬১. মুজফ্ফর আহমদ, *সমকালের কথা*, পৃ. ৯২
৬২. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪
৬৩. *তদেব*, পৃ. ৪২৯
৬৪. *তদেব*, পৃ. ৪৩৩
৬৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক দর্পণ* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৯
৬৬. *শ্রীমতি কাফে, সমরেশ বসু রচনাবলী-১*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৩
৬৭. তদেব, পৃ. ৩৮৩
৬৮. তদেব, পৃ. ৩৫১
৬৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬৬
৭০. *তদেব*, পৃ. ৪০১
৭১. *তদেব*, পৃ. ৪০৩
৭২. *তদেব*
৭৩. *তদেব*, পৃ. ৩৫৩
৭৪. *তদেব*, পৃ. ৮৭৮
৭৫. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭১
৭৬. সমরেশ বসু, *বাঘিনী*, সমরেশ বসু রচনাবলী-২, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯), পৃ. ৩৩২

৭৭. *তদেব*, পৃ. ৩৪৫
৭৮. তদেব, পৃ. ৩৮৬
৭৯. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১
৮০. *বাঘিনী*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-২*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৯
৮১. *তদেব*, পৃ. ৩৯৩
৮২. *তদেব*, পৃ. ৩৯৫
৮৩. *তদেব*
৮৪. *তদেব*
৮৫. *তদেব*, পৃ. ৪১৯
৮৬. *তদেব*, পৃ. ৪২০
৮৭. *তদেব*, পৃ. ৪২১
৮৮. *তদেব*, পৃ. ৪৬৩
৮৯. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬
৯০. *বাঘিনী*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-২*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯১
৯১. *তদেব*
৯২. *তদেব*, পৃ. ৪৩০
৯৩. *তদেব*, পৃ. ৪৯০
৯৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নৈঃসঙ্গ্য চেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ১৬
৯৫. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০
৯৬. *বাঘিনী*, *সমরেশ বসু রচসাবলী-২*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯৫
৯৭. *তদেব*, পৃ. ৩৫১
৯৮. *তদেব*, পৃ. ৪১৯
৯৯. *তদেব*, পৃ. ৪২২
১০০. *তদেব*, পৃ. ৩৯৫
১০১. *তদেব*, পৃ. ৪২১
১০২. *তদেব*, পৃ. ৪৮৪
১০৩. ঝুমা রায় চৌধুরী *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫২৮
১০৪. সমরেশ বসু, *বাঘিনী*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-২*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯), পৃ. ৪৯২
১০৫. *তদেব*, পৃ. ৪১৮
১০৬. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৩
১০৭. তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের প্রতিবেদন* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৯), পৃ. ৩১
১০৮. আশিসকুমার দে, *উপন্যাসের শৈলী তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৮৩), পৃ. ৭
১০৯. মোঃ খোরশেদ আলম, 'সমরেশ বসুর উপন্যাস : ভাষা নির্মিতির বৈচিত্র্য', *সাহিত্যিকী*, সম্পাদক প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ, ত্রিচত্বারিংশ সংখ্যা, জুন ২০১৩ পৃ.৮৭
১১০. *বাঘনী*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-২*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৫
১১১. *তদেব*, পৃ. ৪৯০
১১২. *বাঘনী*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-২*, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৩৩৫
১১৩. *তদেব*, পৃ.৩৭৫
১১৪. *তদেব*, পৃ ৩৪৩
১১৫. *তদেব*, পৃ.৩৫১
১১৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭৯
১১৭. *তদেব*
১১৮. *তদেব*, পৃ. ৩৮২
১১৯. *তদেব*, পৃ.৪৩১
১২০. *তদেব*, পৃ. ৩৮০

১২১. *তদেব*, পৃ. ৪২৮
১২২. রফিকুল ইসলাম, *ভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা : বুক ভিউ, ১৯৯২) পৃ. ১
১২৩. সমরেশ বসু, *দুরন্ত চড়াই*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০১), পৃ. ২৯
১২৪. *তদেব*, পৃ. ৩২
১২৫. *তদেব*, পৃ. ৯৮-৯৯
১২৬. *তদেব*, পৃ. ৯৬
১২৭. *তদেব*, পৃ. ৭৬
১২৮. *তদেব*, পৃ. ১০৯
১২৯. *তদেব*, পৃ. ৯১
১৩০. *তদেব*
১৩১. *শেষ দরবার*, *সমরেশ বসু রচসাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১২৯
১৩২. *তদেব*, পৃ ১৮০
১৩৩. *ফেরাই*, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৫
১৩৪. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩
১৩৫. সমরেশ বসু, *ফেরাই*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০১), পৃ. ৩১৩
১৩৬. *তদেব* পৃ. ৩১৭
১৩৭. *তদেব*, পৃ. ৩৩৫
১৩৮. *তদেব*, পৃ. ৩৩৬
১৩৯. *তদেব*, পৃ. ৩৪১
১৪০. *তদেব* পৃ. ৩৪২
১৪১. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৪
১৪২. সমরেশ বসু, *ধূসর আয়না*, *সমরেশ রচনাবলী*-৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বি মু, ২০০০), ভূমিকাংশ, পৃ. ৬
১৪৩. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৭০
১৪৪. সমরেশ বসু, *ধূসর আয়না*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৩৯১
১৪৫. *তদেব*, পৃ. ৩৪৮
১৪৬. *তদেব*, পৃ ৩৫৮
১৪৭. *তদেব*, পৃ. ৪০৭
১৪৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষা*, যোগেশচন্দ্র বাগল, সম্পাদক, *'বঙ্কিম রচনাবলী'*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ ন-মু,১৩৯২) পৃ ৩৭৩
১৪৯. *তদেব*, পৃ. ৩৬৭
১৫০. পরেশচন্দ্র মজুমদার, *তারাশঙ্কর : ভাষা জগৎ*, *বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন*, সম্পাদক, পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), পৃ. ২৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্য পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সমরেশ বসুর উপন্যাস : মধ্য পর্ব

সাহিত্যে বাঁক বা পরিবর্তন স্বাভাবিক বিষয়। পূর্বতন ধ্যানধারণা পরিবর্তন হয়ে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রতিভাবান স্রষ্টাই একটা নতুন ধারার সূচনা করেন— তিনি নিজেও ঠিক জানেন না, কী অভিনবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।[১] সমগ্র সমরেশ সাহিত্যে *বিবর* একটি বাঁক। *বিবর* উপন্যাস থেকেই তিনি তাঁর অবস্থার পরিবর্তন করেন। *বিবর* থেকে শুরু হয় তাঁর মধ্য পর্ব। যেখান থেকে তিনি নাগরিক মধ্যবিত্তের অসঙ্গতিময় ক্লেদাক্ত অন্ধকার জীবনকে সামনে এনেছেন। এই পর্ব থেকেই মধ্যবিত্তের ক্রূরতা, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তাসহ নানামুখী দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

এই পর্বে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মধ্যবিত্তের রাজনীতি। মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌথজীবন, তার নৈতিক মানসিক আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন, তার শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা, শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে রাজনীতি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবন চলতে পারে না।[২] এই পর্বে মূলত ষাটের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনীতি এবং রাজনীতিবেষ্টিত জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। এই দশক থেকে মধ্যবিত্ত জীবনে হতাশার কুয়াশা জমতে থাকে। স্বাধীনতা নতুন জীবনের সূর্যোদয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দু'দশকের কংগ্রেসী শাসনে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারল না। কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভ্রান্তি এল সংসদীয় পথ নিয়ে।[৩] আবার নকশাল আন্দোলনের ছত্রছায়ায়ও মধ্যবিত্তের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি মিলল না।

এই পর্বের উপন্যাসে সমরেশ বসু ষাটের দশকের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে মধ্যবিত্তের নৈরাশ্য, অতৃপ্তি আর যন্ত্রণার শিল্পিত রূপ দিলেন। ব্যক্তি সমরেশ বসু সাহিত্যজীবনের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝিতে মুক্তি পান। সমরেশ বসু রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছিলেন পি. সি. যোশীর নেতৃত্বের আমলে। পি. সি. যোশীর নেতৃত্বের প্রতি বরাবরই একটু দুর্বলতা ছিল। যা *যুগ যুগ জিয়ে* উপন্যাসে ত্রিদিবেশ চরিত্রের মধ্যে দেখিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও ছিলেন রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের গভীর পর্যবেক্ষক। সমকালীন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন তাঁকে নানাভাবে পীড়া দিয়েছে। তাই রাজনীতি থেকে শুধু তিক্ত অভিজ্ঞতা নয়, অম্ল–মধুর, বাস্তব–অবাস্তব সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাকেই তিনি উপন্যাস-গল্পের বিষয় করে তুলেছেন।[৪] যে কারণে তাঁর চরিত্রেরা অনেক সময় হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনীতির মুখপাত্র।

মধ্যবিত্তজীবনের রূপায়ণে তিনি অভিজ্ঞতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সময় স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, শ্রমিক অসন্তোষ, বেকারত্ব, শাসকশ্রেণির নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচার, উচ্চবিত্তের সামাজিক ব্যভিচার, কালোবাজারি, সরকারবিরোধী বামপন্থী গণআন্দোলনে মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গ, মধবিত্তের আদর্শচ্যুতি, নাগরিক নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি বিষয় তিনি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। এই পর্বে নাগরিক মধ্যবিত্তের রূপাঙ্কণে নেতিবাচক সমাজকাঠামোর প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। যে কারণে এই পর্বের নায়কেরা সবাই সত্তাবিচ্ছিন্ন। বিরূপ সমাজ, প্রতিবেশ ও বিনাশী যুগচৈতন্য তাঁর নায়কদের ঠেলে দিয়েছে ব্যক্তিবোধের বেদনাবিধুর তমসালোকে। তবে সমরেশ বসুর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির সত্যকে প্রকাশ করে তাকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মধ্যবিত্তের আশ্রয়হীনতা, অস্থিরতা, ক্রোধ, পাপবোধ এই পর্বের মূল বক্তব্য।[৫]

বিবর

বাংলা উপন্যাসের সফল অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী*র মধ্য দিয়ে। তার ঠিক একশ বছর পরে ১৯৬৫ সালে *বিবর* প্রকাশিত হয়। ততদিনে বাংলা উপন্যাস তার সুস্থির পথ নিশ্চিত করেছে। সমষ্টি থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে তাঁর অন্তর্জগতের অন্তর্বয়ান বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। আধুনিক মানুষের সংগ্রাম-দ্রোহ-প্রতিবাদ, আস্তি ও নাস্তিবোধ, শুভচেতনা, মনোদৈহিক বিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে উপন্যাসের নিজস্ব ভূমি নির্মিত হয়েছে। *বিবর* প্রকাশিত হওয়ার পর একে ঘিরে নীতি, রুচি, শালীনতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা, সামাজিক অনুশাসন সব ধরনের প্রশ্নই উঠেছে।[৬]

সংক্ষুব্ধ সমকাল এবং তার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত লেখক সমরেশ বসুকে পীড়িত করতো। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বধর্মচ্যুতি তাঁকে বিচলিত করেছে। সামাজিক-রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের সুযোগে এই শ্রেণির একাংশ চারিত্রিক স্খলন ঘটিয়ে খুব সহজেই সফলতা পেয়েছিল। *বিবর* উপন্যাসে এই শ্রেণির চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত এক অনামা যুবকের বিবর ভাঙার আয়োজনে। যুবকটি পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। আর এই সচেতনতার কারণে সে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। আত্মবিশ্লেষক, সমাজ-সমালোচক, ব্যক্তিগত জীবনে লম্পট এবং পেশাগত জীবনে অসৎ। 'চরিত্রটি মধ্যবিত্ত হয়েও উচ্চকিত কেতাদুরস্ত জগতের সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।'[৭] নায়কের আত্মকথন থেকে জানা যায়, 'আমি ওই রক থেকেই চা সিগারেট আর শস্তা কফি হাউস পেরিয়ে, অন্য রকে এসেছি, বার বার হোটেল ক্যাবারে-এর রকে শুঁড়িখানা নাচঘর যাকে বলে আর কী

?'[৮] এই অনামা নায়ক লক্ষ করে চারদিকে দুর্নীতি আর মূল্যবোধহীনতার মহোৎসব চলছে। সে নিজেও এর সারথী হয়। কিন্তু বিবরবাসে সে বেশি দিন স্থিত হতে পারেনি। ভোগাকাঙ্ক্ষার মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে সে সমাজ ভাঙার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলো। তার একক প্রচেষ্টা অনেকের গাত্রদাহের কারণ হলো। শ্রেণিসচেতন এই অনামা নায়ক ব্যক্তিগত জীবনে লম্পট, তাই তার উক্তিও লাম্পট্যপূর্ণ, কদর্য এবং অশ্লীল। অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে জীবনের শ্লীলতার সন্ধানী। চারপাশকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তাকে ব্যতিক্রম করেছে। নায়ক প্রেমের নামে অপ্রেম, পারিবারিক বন্ধনের নামে দাসত্ব, পেশাগত জীবনে সততার ভান, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, মধ্যবিত্তের ইত্যকার সমস্ত ভণ্ডামি-ভদ্রতার লেবাস খুলে দিয়েছে। অবচেতনার স্বাধীনতাবোধই তাকে এই সমস্ত কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে।

উপন্যাসের নামহীন নায়ক পোষমানা মধ্যবিত্ত জীবনের সুবোধ বালক হয়ে থাকতে চায়নি। সব কিছুর মধ্যেই আসক্তি এবং অনাসক্তির মাঝামাঝি একটা ঘৃণার অগ্নিবলয় দেখতে পায়। তার আত্মকথনের ধারাতেই জানা যায় নারী ও পুরুষের প্রেম, সন্তান এবং পিতামাতার অন্তর্গত স্নেহ, প্রীতি– সবকিছুর মধ্যেই সে দেখতে পায় এক চূড়ান্ত ভণ্ডামি, যা তার ঘৃণাকে জাগিয়ে তোলে এবং এই সম্পর্কগুলির বিষয়ে করে তোলে আস্থাহীন।[৯] এই অনামী নায়কের জীবনে দুটি পর্ব, যা মধ্যবিত্তের বলয়যুক্ত। প্রথমটি বিবরযুক্ত, দ্বিতীয়টি বিবরমুক্ত পর্ব। মধ্যবিত্তের বলয় ভাঙার প্রথম পর্বে নায়কের প্রেম, যৌনতা, চাকরি, রাজনীতির ভণ্ডামি যুক্ত। দ্বিতীয় পর্বে এসব থেকে মুক্ত হয়ে অনেকটা মুক্ত স্বাধীন জীবন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বাঙালি মধ্যবিত্তের অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু স্বপ্নভঙ্গেও যন্ত্রণায় তারা আশাহত হয়েছে। সংশয়, অবিশ্বাস আর হতাশার সুর বেজেছে এ সময়ের সাহিত্যে। ব্যক্তি সমরেশ বসু সংগ্রামমুখর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা আর যুদ্ধপরবর্তী মূল্যবোধের অবক্ষয়িত সমাজের বীভৎসতা। মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ডহীন দেউলিয়াপনা, অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি লেখককে আশাহত করেছিল। আহত হয়েছিলেন বুর্জোয়া সমাজের নীতিতে। যেখানে একজন সুস্থ-সচেতন মানুষ স্বাধীন থাকতে পারে না। তাঁর মনে হতে থাকে, ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা যেটা বলা হয়, তা আসলে কুৎসিত পরাধীনতা যে পরাধীনতা না থাকলে যে কোনো শ্রেণির মানুষের একালে বেঁচে থাকা অসম্ভব।[১০] প্রথম দিকে *বিবরের* নায়কও পরাধীন । তার আত্মকথন থেকে জানা যায় :

> মানুষ স্বাধীনতাকে কী ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথাই নেই। আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, এই আমিই যেমন। আমি যখন আমার চাকরিস্থলে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেজে থাকি, তখন সব স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে কথা বলি, অন্তরের ভাষাটা যে কী কদর্য, নিজের কানেই শোনা যায় না প্রায়।[১১]

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি অংশ নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তের পর্যায়ে উঠে এসেছিল। আপসকামী এই শ্রেণিটি তথাকথিত সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে মেট্রোপলিটনের সংস্কৃতিকে ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বীজ রোপিত হয়েছিল। চেতন-অবচেতনে তারা ভোগবাদের দিকে ঝুঁকেছে। 'ভোগবাদ মানুষকে লোভী তৈরি করে, অনৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে।'[১২] এরকমই একটি পরিবারে অনামা নায়কের জন্ম। তার ঘরবাড়ি, পারিবারিক অবস্থা, চাকরি, জামাকাপড়, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের অভ্যাস সবই সেই উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের চেহারাটি স্পষ্ট করে। [১৩]

এই নায়কের নিজের মায়ের প্রতি কোনো ভালোবাসা কিংবা শ্রদ্ধাবোধ নেই। ঠিক কী কারণে তার মা তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নায়কের কাছে নেই। মা সম্পর্কে তার বক্তব্য: 'যার একমাত্র দাবী তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে মাইরি কীসের দাবী এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল, আমি তামা তুলসী নিয়ে হলফ করে বলতে পারি, আমি এর কিছুই জানতাম না।[১৪] ঠিক এরকম একটি উক্তি পাওয়া যায় আলব্যেয়র কামুর *The Outsider* উপন্যাসের নায়ক ম্যারসের কাছ থেকেও। তার কাছে পিতা-পুত্রের মধ্যকার কর্তব্যের বিষয়টি অর্থহীন। কোনো সন্দেহ নেই, মা যখন বলেছে যে শত হলেও উনি আমার বাপ, এবং এটা কখনো বুঝতে পারি না, উনি জন্মদাতা হয়েছেন বলেই আমার কাছে এই সব দাবীওয়ালা কেন ?[১৫] আবার মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানার পর সে বলে মা আজ মারা গেলেন। অথবা কাল, আমি জানি না।[১৬] *বিবরের* নায়কও পিতাকে কেবল জন্মদাতা ভাবে। অফিস থেকে ফেরার সময় বাবার ঔষধ বদলাতে ভুলে যায়। এবং এই ভুলে যাওয়ার অপরাধ ঢাকতে সে অবলীলায় মিথ্যা বলে। মনে মনে স্বগতোক্তি করে, 'তোমার স্বামী শাহেনশা ঘরে বসে বসে দশ রকম ব্যাধিতে ভুগবেন, আর আমাকে রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কর্তব্য করতে যেতে হবে সে গুড়ে বালি।[১৭] দুজন মানুষের একান্ত মুহূর্তের ফসল যে সন্তান, পৃথিবীতে আসা নিয়ে যার কোনো দায়ই নেই, জন্মদানের পরপরই একজন তার বাবা হবে এবং প্রতিনিয়ত দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে পিতা-পুত্রের এই প্রথাগত সম্পর্কের বিরোধী নায়ক। অথচ নায়কের বাবা তার চাকরির জন্য পেছনের দরজা খোলার ব্যবস্থা করেছেন। প্রয়োজনে উৎকোচ গ্রহণ, চাটুকারিতা, তাঁবেদারি এবং যত নীচে নামতে হয় তার সবই দেখিয়েছেন। কিন্তু এর সবই 'পিতার কর্তব্য', সেজন্য 'পুত্রের প্রতিদান' তারা আশা করেন। না পেয়ে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধও হন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না, কারণ উপার্জনক্ষম ছেলেকে কোনো বাবাই চটাতে চান না।[১৮] এই নায়কের কিছু নিজস্ব দর্শন আছে। যেমন সে যেহেতু নিজের অনিচ্ছায় পৃথিবীতে এসেছে, সেহেতু সে স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে চলবে। তবে সে স্বাধীনতাবোধের

ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে ভয় পায়। তাই সে মধ্যবিত্তের বলয়াবৃত্ত গর্তে আশ্রয় নেয় এবং পরাধীনতার সুখবোধ নিয়ে ভালো থাকার ভান করে। প্রয়োজনে মিথ্যা বলে, ঘুষ খায়, আর যৌনতায় আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু তার অবচেতনের স্বাধীনতাবোধ তাকে প্রায়ই তাড়া করে। মধ্যবিত্তের নিশ্চিত আশ্রয়স্থল তার বাড়ি। শত শঠতা, প্রতারণা সত্ত্বেও সেখানে সে শান্তি অনুভব করে। যদিও *বিবরের* নায়ক নিজের বাড়িকে নরকের সাথে তুলনা করে। বাড়িতে ঢোকার বারান্দায় লালচে মিটমিটে আলো দেখে নায়ক অপ্রসন্ন হয়। তার পিতার এই কৃচ্ছ্রতা সাধনের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। বাবা-মা ভাই-বোন কারো সম্পর্কে তার কোনো শুভবোধ নেই। সবাইকে সে স্বার্থপর ভাবে। পুঁজিবাদী সমাজে অবক্ষয়ের সার্বিক কর্কটরোগে মানুষের এই পারিবারিক বন্ধন বিনষ্ট হয়েছে, ছিন্ন হয়ে গেছে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সনাতন সম্পর্ক।[১৯] বাড়িতে প্রবেশ-মুহূর্তে বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ দেখে অনামা নায়কের বুঝতে বাকি থাকে না বাবা-মায়ের সামান্য চোখের আড়ালে তার বোন বিদিশার প্রেম প্রেম খেলা। এমন প্রেমিক বিদিশার পূর্বেও ছিল। নায়কের বাবা-মা দেখেও দেখেন না। কারণ এই সুযোগে বিবাহযোগ্য কন্যা যদি পাত্র জুটিয়ে নেয় তো ভবিষ্যতে তাদেরই লাভ। বিনা পরিশ্রমে তারা কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে পারবেন। এই ধরনের ভণ্ডামি নায়কের মানতে কষ্ট হয়। যদিও বাবা-মার বৈধ পাহারাদারের মূর্তি এবং বিদিশার তার প্রতি ভয় ও ঘৃণাযুক্ত মনোভাব সে উপভোগ করে। মদ খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে পরিবারের কেউই তার প্রতি অনুসন্ধিৎসু হওয়ার সাহস পায় না। ক্রমেই নায়কের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাব জেগে ওঠে। প্রেম-পরিবার-কর্ম এবং আপন সত্তা থেকে সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। নৈঃসঙ্গ্য-চেতনা, নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা (যে বোধ থেকে সে নীতাকে হত্যা করে) এবং উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা তিনটি বোধই তার মধ্যে পুঞ্জিভূত হতে থাকে।

প্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আদিকাল থেকে প্রেম মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রেম বা ভালোবাসা ক্রিয়াশীল সেই আদিশক্তি, যা মানুষে মানুষে গড়ে তোলে মৈত্রীবন্ধন।[২০] পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় হৃদয়গত সম্পর্কে ঢুকে পড়েছে ছলনা, ফাঁকি। অতিমাত্রায় শ্রেণিসচেতন মানুষ প্রেম সম্পর্কে সনাতন মূল্যবোধ হারিয়ে কামজ প্রেমে (erotic love) আসক্ত হয়েছে। অনামা নায়কের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। উপন্যাসের শুরুটা হয় নায়ক এবং নীতার কামজ প্রেমের মধ্য দিয়ে, যার একমাত্র সাক্ষী নীতার শোবার ঘরে অবস্থিত ড্রেসিং টেবিলের আয়না। আয়নাটাকে নায়কের মনে হয় নীতার সখী। যে কিনা নীতাকে বলে ‘এই নীতা দ্যাখ-দ্যাখ’।[২১] নীতা স্বৈরিণী কিংবা বারবনিতা নয়। তবে নায়ক ছাড়াও তার আরো কয়েকজন প্রেমিক আছে। লেখকের ভাষায় প্রেমের ক্ষেত্রে নীতা অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মতো, যার সার্কাস দেখানোর নেপথ্যে বেদনা লুকিয়ে থাকে। নীতা এবং নায়কের

একান্ত প্রণয়ের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই, আছে শুধু অভ্যস্ততা। এই প্রেমিকযুগল উভয়ে উভয়ের ভণ্ডামি সম্পর্কে জানে। যেমন নীতা সম্পর্কে নায়কের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : 'নীতা ওর ভাললাগাটাকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়ে থাকে। যেমন আমি। আমিও ওর ভাল লাগা স্বাধীনতার কাজে লেগে থাকি। আমি নিজেও তাই নয় কি? কে নয়, তা জানি না। এ ক্ষেত্রে ভাললাগার স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে পারলে কেউ কি ছেড়ে দেয়? কে স্বেচ্ছাচারী নয়? আমার তো মনে হয়, গোটা পৃথিবীটা বন্দী-স্বেচ্ছাচারীতে ভারাক্রান্ত।'[২২] এই জায়গায় চরিত্রটি আত্মবিশ্লেষক এবং সুবিধাবাদী। সে নিজেকে বিশ্লে-ষণ করে বলে 'তুমি সাধুপুরুষ! আর নীতা অসচ্চরিত্রা, বিশ্বাসঘাতিনী! মাথায় গাট্টা! তুমোও যা, আমও তা।'[২৩] প্রেমসম্পর্কিত মধ্যবিত্তের ভাবনাকে নায়ক অস্ত্রোপচার করেছে। নীতাকে হত্যার আগে নায়ক নীতার প্রতি কোনো প্রেম অনুভব করে না। জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে নীতার আত্মঘাতিনী হওয়ার অভিপ্রায়কে নায়কের অবিশ্বাস্য মনে হয়। সত্তাবিচ্ছিন্ন দুজন মানুষের একাত্ম হবার প্রচেষ্টায় ছিল মিথ্যাচার। নায়কের বিশেষ মুহূর্তের সঙ্গী নীতা। আশাতীত উৎকোচ পেলে, কাজের চাপ বৃদ্ধি পেলে সে যৌনতার আশ্রয় নেয়। প্রকৃতপক্ষে তার এই ভাবনা বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন। বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের এ যাবৎ শিখিয়েছে, প্রেম ও যৌনতা জীবনের প্রধান সত্য।[২৪] নীতার প্রতি অভ্যস্ততা থেকে তার কখনো কখনো মনে হয় সে নীতার দাস। নায়কের অপকট স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় 'আমাকে এত বেশি চেনে ও, যেন আমি ওর একটা কুকুর'।[২৫] এরকম ভাবনা থেকেই নায়ক উপলব্ধি করে নীতার প্রতি একাধারে আসক্তি এবং অনাসক্তি। তবে নীতা তার কাছে অন্য নারীর থেকে বিশিষ্ট। সতীত্বের ধারণা তার কাছে অমূলক। শরীর বা মনের পবিত্রতা অর্থহীন। তারপরও নীতাকে হত্যার পূর্বমুহূর্তে নায়ক গেয়েছিল এ পীসফুল পোর্ট আনডেমেজড বাই দি স্টর্ম...[২৬] গানটা। ঝড়ে অক্ষত এক শান্ত বন্দরে নাবিক হওয়ার সাধ জেগেছিল নায়কের। পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল বন্দরের আবার পবিত্রতা, বেশ্যার আবার আঘাতে ভেঙে পড়ার ভয়।[২৭] প্রকৃতপক্ষে গানের সুরে নায়ক তাল দিতে চেয়েছিল, প্রেমের ক্ষেত্রে পবিত্রতার সন্ধান সে করেনি।

নীতা এবং নায়ক কেউ কাউকে ভালোবাসেনি। নীতা যখন নায়ককে প্রশ্ন করে ভালোবাসা কী? নায়ক ব্যঙ্গ করে জবাব দেয়, 'যে বাসায় ভাল ল্যাভেটরি আছে'।[২৮] *The Outsider* উপন্যাসে কাম্যুর নায়িকা নায়ককে প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি আমায় ভালবাসো? উত্তরে নায়ক বলেছিল— যেহেতু আমি একবার ভালোবেসে ফেলেছি, হয়তো ফেলতেও চাইনি, তাই এসবের কোনও মানে হয় না।[২৯] তবে তার মনে হয়েছিল সে মনে হয় মেরীকে ভালোবাসে না। গভীর অবিশ্বাস আর সন্দেহ থেকে নীতা এবং নায়ক

উভয়ে উভয়ের মুখে থুতু দিতে চেয়েছে। পারস্পরিক বিরুদ্ধ-আচরণ এবং কথোপকথনের মধ্যে পরাধীনতার বোধটা হঠাৎই নায়কের কনুইয়ে চেপে বসে। আকস্মিকভাবে নায়ক নীতাকে হত্যা করে। অনেকটা কাম্যুর ম্যারসোর সূর্যের আলোর কারণে আরবটাকে খুন করার মতো। সূর্যালোক তাকে Mislead করে, আর স্বাধীনতাবোধ *বিবর*-নায়ককে উৎসাহিত করে। তার স্বগত ভাষণে জানা যায় 'আপোষহীন স্বাধীনতা, যাকে বলে একেবারে আচমকা কনুয়ে ভর করে বসল, নীতার গলায় চেপে বসল, যার মানে আমি আমার গর্তের বাইরে চলে এসেছিলাম।'[৩০]

জীবনে প্রথম গর্তের বাইরে আসার স্বাধীনতাবোধ থেকে নায়ক প্রশান্তি অনুভব করে। পরাধীনতা ও সুখের বিবর থেকে বেরিয়ে তার আত্মমুক্তি ঘটে। নীতাকে হত্যার ইচ্ছা কিংবা হত্যা মধ্যবিত্তের ভণ্ডামির বলয় থেকে বেরিয়ে আসা। এই বলয় ভেঙে বেরিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি তার মধ্যে আগেও অনেকবার জেগেছে, কিন্তু বিবরবাসে সুখের অভ্যস্ততা তা হতে দেয়নি।

নীতাকে হত্যার পরই মধ্যবিত্তের আরেক বন্ধন চাকরিটাকে সে সচেতনভাবে হত্যা করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে চাকরি সোনার হরিণ। বিশেষত ষাটের দশকে নীতিবর্জিত জীবনব্যবস্থায় নায়কের এই সিদ্ধান্ত অনেকটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মতো। নায়কের চাকরি এবং জীবনধারণ দুইই কর্পোরেট সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। যেখানে ভোগবাদই মুখ্য।[৩১] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্তের একটা অংশ দ্রুত উন্নতির আশায় নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কর্পোরেট সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। এই নায়কও বিবরপর্বে চাকরিক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ, পদলেহন, নারী ও মদে আসক্ত ছিল। আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে তার মানসভুবনে স্বার্থপরতা, নির্বিকারত্বসহ নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল। 'চাকরি'কে হত্যার পরই নায়কের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সংকট থেকে উত্তরণ ঘটে। সৎ আর মহৎ হবার বাসনা, পবিত্র দায়িত্ব পালনের মনোবৃত্তি থেকেই নায়ক চাকরিতে প্রবেশ করে।

কিন্তু অল্পদিনেই সে মহৎ হবার ভণ্ডামি ধরে ফেলে। সে বুঝে যায় সবাই এক। মিথ্যা বলা, ঘুষ গ্রহণ এবং ঠগ-প্রবঞ্চক না হলে চাকরিক্ষেত্রে টিকে থাকা অসম্ভব। মধ্যবিত্ত মানুষ চাকরিসূত্রেই সমাজের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে।[৩২] চাকরি জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে সব অন্যায় নির্বিকারভাবে মেনে নেয়। প্রথম দিকে অনামা নায়কের ভাবনা এরকমই ছিল। কদর্য ভাষায় চাকরিপ্রীতি সে এভাবেই প্রকাশ করেছে— 'চাকরিটা তার কাছে অনেকটা ছেনালের মতো যে প্রথম দর্শনে খাঁটি প্রেমিকের মতো ডাক দিয়েছিল।'[৩৩] কিন্তু একটা সময় এই প্রীতিই ঘৃণায় পরিণত হয়— 'এত ঘেন্না করে আর রাগ হয়,

মনে হয় গলা টিপে খতম করে দিই।’[৩৪] অবসেশন থেকে সে চাকরিটাকে কদর্যভাবে দেখে। তার মনে হয় ‘প্রতিদিন প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে হয়, কতগুলো শুয়োরের বাচ্চাজাতীয় প্রাণীর কাছে হাতজোড় করে দাঁত বের করে হাসতে হয়।’[৩৫] আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নায়কের অসহনীয়। নীতার মতোই নিজেকে তার চাকরির দাস মনে হয়।

> এই চাকরির মধ্যে এমন সব, যাকে বলে মহৎ পরিণতির বিষয়বস্তু রয়েছে। তাই এর জন্যে আমার গর্ব করার আছে, আছে ভেবে সুখী হই, অথচ পরমুহূর্তেই দারুণ ঘৃণায় প্রস্রাব করে দিতে ইচ্ছে করে, কারণ মহৎ পরিণতিগুলো ঠিক যেন বেশ্যার মতো আমাকে কাজ সেরে বিদায় নিতে বলে, যার মানে দাঁড়ায়, তার পরিণতি তা-ই; তুমি তো আসলে বড় বড় কথার মারপ্যাঁচে, কাজের ফিরিস্তি দিয়ে টাকা লুটতে এসেছ, লুটে নিয়ে চলে যাও। তার মানে, সে তুমোও যা, আমিও ... ।[৩৬]

চাকরি নামক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে সে নিজে চাকরির সব দুয়ার বন্ধ করে দেয়। চাকরিরত নায়ককে মাঝে মাঝে অডিটের কাজ করতে হতো। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের প্রতিবেদন জমা দিতো হতো। নায়ক হরলালের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন জমা দেয়। নীতাকে হত্যার পরদিনই নায়ককে সেই প্রতিবেদন তুলে নিতে বলা হলো। নায়কের অফিসের বড়কর্তা হরলালকে টেলেন্টেড জিনিয়াস প্যাট্রিয়ট বলে। নায়ক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে মনে মনে বলে ‘কত রামগাড়লই ওসব কী বলে বিসেশনে ভূসিত হয়।’[৩৭] নায়কের অফিসের ‘খোদকর্তা’ থেকে বড়, মেজ, ছোট নানা মাপের অফিসাররা কেউ ‘ডিভাইল খচ্চর’ কেউবা ‘সাবলাইম খচ্চর’। সকলেই ঘুষ খান এবং অপরকে খেতে সুযোগ করে দেন। এই অন্যোন্যনির্ভরতা প্রায় ecological balance-এর মতো ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার কাঠামোটিকে বাঁচিয়ে রাখে।’[৩৮] এই ঘুষ খাওয়াকে তারা ‘বিজনেস’ (বিজনেস এখানে ঘুষ খাওয়ার কোড ল্যাঙ্গুয়েজ) বলে। নীতাকে হত্যার পরই নায়কের মধ্যে ‘স্বাধীনতা’ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হরলালের বিরুদ্ধে নায়ক কোনোভাবেই মিথ্যা প্রতিবেদন দিতে রাজি হয় না। যে বোধ থেকে সে নীতাকে হত্যা করেছিল সেই একই বোধ থেকে সে রিপোর্ট প্রত্যাহার করতে রাজি হয় না। অনামা নায়ক জানে রিপোর্ট প্রত্যাহার না করলে চাকরি করা অসম্ভব। চাকরির দাসত্ব থেকে মুক্ত হতেই নায়ক নিজেকে বদলে ফেলে। মধ্যবিত্ত মননের আপাতসুখী মনোভাব থেকে বেরিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি হয়। ক্রমেই চরিত্রটি স্পষ্টবাদী হয়ে ওঠে। আত্মসচেতন হয়। নিজের ব্যক্তিত্বকে শোধনের জন্য এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার সাধনায় লিপ্ত হয়।

এই প্রচেষ্টার কারণে খুব অল্প সময়ে অফিসের হিরো বনে যায়। সে লক্ষ করে সবাই তাকে চায়, তাকে খাতির করতে চায়। আসলে সবাই সুযোগসন্ধানী। অনামা নায়ক বোঝে এই সুযোগসন্ধানীরা আরো বেশি মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর। ‘আমার ঘরে ঢুকেই দেখলাম, টেবিলের ওপর একটা কাগজ, তাতে লেখা ‘হে

সাহসী বীর, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'[৩৯] এমনকি সে অফিসের কেলেঙ্কারি খবরের কাগজে প্রকাশ করে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ারও পক্ষপাতী নয়। কারণ সে জানে এতে পত্রিকা বিক্রি হবে তেলেভাজার মতো। কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ হবে না। নায়কের মধ্যে ধর্ম কিংবা ঈশ্বরপ্রীতি নেই। কারণ সে জানে মানুষ প্রতিনিয়ত বহু অপকর্ম করে আর সেগুলো বৈধ করতে ঈশ্বরভক্তিতে মনোযোগ দেয়। এই জাতীয় প্রতারণা তার কাছে অর্থহীন। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অজস্র মানুষের ছুটে যাওয়া দেখে তার মনে হয় :

> 'যেন কী পাপ করে সবাই ছুটেছে, অনেকটা গায়ে ঘায়ের জ্বালার মত, 'ওমা জুড়িয়ে দাও মা' মায়ের আর খেয়ে কাজ নেই, বদমাইসি করবে, আর সন্দেশ বাতাসা এনে দিয়ে যাবে। আর কালীমূর্তি তোমার ঘায়ের মলম হয়ে যাবে। এই ভাব নিয়ে তাড়া খেয়ে চলেছে। আমি জানি না, লোকেদের কি লজ্জা করে না, যখন তারা এভাবে ছোটে, আর ভাবে (যা তারা কখনই বিশ্বাস করে না) মাকে ডাকলে, নির্ঘাত ফল ফলবে, কারণ এ সবই আসলে সব কিছু পাবার একটা, কী বলব, অবসেশন। সব রকম আকাঙ্ক্ষারই এক অবসেশন।"[৪০]

কিন্তু নায়ক ওপরওয়ালার নরম-গরম আদেশ-উপদেশ সবই উপেক্ষা করে। এমনকি 'কলকাতাশ্বরী' রুবি দত্তর একান্ত অনুরোধ সে নির্বিকার ঔদাসীন্যে ফিরিয়ে দেয়। সে অবলীলায় বলে 'আমি মিথ্যে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি।'[৪১]

নীতাকে হত্যার পর প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রকৃতির সান্নিধ্যে নায়ক স্বস্তিবোধ করে। কেননা নগর কলকাতা নায়কের কাছে শুঁড়িখানার নামান্তর। সেখানে নায়ক নিঃসঙ্গ।

এই নায়ক ষাটের দশকের নগর কলকাতার পচন, বিপর্যয় ও বিকৃতির প্রত্যয়গ্রাহ্য প্রতিনিধি। যেখান থেকে তার আত্মবোধের জাগরণ ঘটে। সমাজমানসের চাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আধুনিক মানুষকে পদে পদেই আপস করে চলতে হয়।[৪২] এই ঘটনার সাত দিন পর নায়কের চাকরি চলে যায়। চাকরি নামক সোনার হরিণ মধ্যবিত্তের বহুকাঙ্ক্ষিত। সামাজিক মান-মর্যাদা এর ওপর নির্ভর করে। সেই অর্থে নায়কের এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠানবিরোধী। নায়কের অফিসের কর্তারা এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে পুনরায় চাকরির বিবরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নায়ক চাকরিতে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে। মানুষ কখনো পরিসমাপ্ত পদার্থ বা নয়, সে সততই বিকাশমান। এই বিকাশ সক্রিয়তার অবিরাম 'প্রচেষ্টা'র দ্বারা সম্ভব হয়, যে 'প্রচেষ্টা' তার অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত।[৪৩] নায়কও তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত শুভবোধকে নষ্ট করতে চায়নি। তাই সে আর চাকরির বিবরে ফিরে যায়নি।

চাকরি নামক বিবরবৃত্তের বাইরে আসার পরমুহূর্তে তার পারিবারিক বৃত্ত ভেঙে যায়। তার বাবা তাকে জানিয়ে দেয়, বেকার মাতাল হাতি পোষা তার পক্ষে সম্ভব নয়। চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর তার পুরনো

রাজনৈতিক বন্ধুরা তার সাথে যোগাযোগ করে। কারণ তারা জানে নায়কের মধ্যে সংগ্রামী মন আছে। নায়ক রাজনীতির বিবরে ফিরে যেতে রাজি হয়নি। নায়ক জানত তার চাকরি ছাড়ার ইতিবৃত্ত শুনে জনসাধারণ তাকে লুফে নেবে। চাকরির চক্রের মতো পার্টিরও চক্র আছে। সেখানে কোনো পাপ পাপই নয়, যদি পার্টি মনে করে। যেমন ভোটের চুরি, ঘরের বউকে বেশ্যা, বেশ্যাকে ঘরের বউ সাজিয়ে সবাই কাজ সারে, কিংবা, যাকে কুকুরের মতো ঘৃণা করি, হয়তো ও বেলাই ঠেঙিয়ে মারব, অথচ এ বেলা তার গালে চুমু খেয়ে কথা বলছি, পলিটিক্স যে![৪৪] রাজনৈতিক বিবরে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। সেখানে সবাই পার্টিম্যান। নেতার ভুল কিংবা অন্যায়ের সমালোচনা করা যাবে না। নায়কের স্বগতোক্তি থেকে জানা যায়ঃ

> ''তোমার পরিচয় 'মানুষ' নয়, 'পার্টিম্যান', তখন যদি তোমার মনে হয়, নেতা ভুল করছে বা অন্যায় করছে, বা ধর তোমার প্রেমিকাকে লুটছে, কিংবা একটা আন্দোলনই বানচাল হয়ে যেতে পারে, তবু খবরদার, একটি কথা নয়, যন্ত্রের মত এগিয়ে চল, পোষা কুকুরের মত 'লয়াল' হও, কারণ কি না, যত পাপই করি, আখেরে ভালর জন্যই তো। স্বাধীনতাকে ভয় পায় না এমন পার্টি আমি কোথাও দেখিনি ... ।''[৪৫]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে নায়কের রাজনীতি নিয়ে মনোভাবের স্বরূপ উন্মোচিত। তার স্বাধীনসত্তা রাজনীতির বিবরে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি।

নীতাকে হারিয়ে নায়ক নীতাকে ভালোবাসতে শেখে। মিথ্যাচার, লাম্পট্য, মেকি ভদ্রতা, ভণ্ডামির খোলস থেকে বেরিয়ে সে নিঃশঙ্কচিত্তে নীতাকে পেতে চায়। যেখানে ভয়, লজ্জা, ঘৃণার ঊর্ধ্বে উঠে দুজন দুজনার কাছাকাছি আসবে। নায়কের ভেতরের জাগ্রত সত্তা অবচেতনে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নীতার শূন্য ফ্লাটে, যেখানে সে নীতাকে হত্যা করেছিল। গোয়েন্দা কর্মকর্তাটি তাকে পথ দেখায়। নীতার শূন্য ঘর নায়ককে আরো বেশি নিঃসঙ্গ করে। নায়ক তার অতলান্ত শূন্যতা আর দুর্মর বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে অনুভব করে বিদেহী নীতাকে। অস্তিত্ব সংকটই নায়ককে নীতা হত্যায় প্ররোচিত করে। নীতাকে হত্যার পরমূর্তে নায়ক নীতার প্রিয় গান গেয়েছে 'ক্যাকটাসের বুকে ইতিমধ্যে রোদ পড়েছে'। নায়কের এই ভাবনা বিশুদ্ধ সত্য জীবনের, প্রেমের ব্যক্তিক অস্তিত্বের সংকটমুক্ত অবস্থার জন্য আর্তি।[৪৬] এই আর্তিই তাকে নীতার প্রতি আসক্তি-অনাসক্তির মধ্যবর্তী অনুভাবনাকে জয় করে পৌঁছে দেয় শুদ্ধতর ভালোবাসায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ *বিবর-এ* দেখা যায়। যেখানে নায়ক পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে ওঠে ইতিবাচকতার সন্ধানরত। আলব্যেয়র কামুর *The outsider*-এর ম্যারসোর সাথে এখানেই তার পার্থক্য। ম্যারসোর দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য

দিয়ে কোনো কিছু হয়ে ওঠা নাই। সমাজের মানুষের সাথে তার মানসিক আদান-প্রদান বা সেতুবন্ধন তৈরি হয়নি। কিন্তু *বিবরের* নায়ক জীবনকে ভালোবাসে বলেই ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে, আপসকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রেমে সে আস্থাহীন নয় বলেই নীতাকে হত্যা করে এবং সেই সঙ্গে সৎ ও শুদ্ধ আত্মায় নীতার কাছেই ফিরে যেতে চায়। এভাবে নায়কের যে উত্তরণ তা সহজ-স্বাভাবিক জীবনের কাছেই আত্মসমর্পণ।

বিবর-এ অনামা নায়ক ছাড়াও একাধিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন নায়কের বাবা জগন্দ্রীনাথ সুবিধাবাদী এবং স্বার্থপর। তিনি তার ছেলেকে শিখিয়েছেন অবৈধ পন্থায় কীভাবে চাকরিতে উন্নতি করা যায়। নায়ক তাকে শ্রদ্ধা করে না। অথচ তিনি আশা করেন তার সন্তানরা তাকে ভক্তি করবে। অবসর-জীবনে তিনি কৃচ্ছ্রতাসাধনে ব্যস্ত। বাড়ির প্রবেশমুখে সবচেয়ে কম পাওয়ারের বাতি দেন, যাতে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। পুত্র যেখানে মদ এবং নারীর পেছনে যথেচ্ছ অপচয় করে, সেখানে পিতার এই কঞ্জুসপনা হাস্য-পরিহাসের বিষয় হয়। তিনি সব সময় প্রমাণ করতে চান তিনি বাড়ির কর্তা। নায়কের চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি নায়ককে আবার চাকরিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সবশেষে নায়ক যখন রাজি হয় না তখন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

নায়কের বোন বিদিশার সামান্য উপস্থিতি পুঁজিবাদী সমাজে প্রেমের গভীরতর সংকটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থশাসিত আধুনিক যুগে মানুষের জীবন থেকে অপহৃত হয়েছে প্রেমের আবেগ-অনুভূতি।[৪৭] বিদিশা প্রতি রাতে বাড়ির বাইরের ঘরে বসে প্রেম করে। তার প্রেমের বৈধ পাহারাদার তার বাবা-মা। কোনো একক ব্যক্তিতে তার প্রেম স্থিত থাকে না। এক্ষেত্রে নায়ক চমৎকার মন্তব্য করেন— 'বর্তমানে যে বিদিশার প্রেমিক, কত নম্বর, আমি সেটা ঠিক বলতে পারব না, কারণ বিদিশার সঙ্গে বেশি রাত অবধি গল্প করার অধিকার খালি এ লোকটাই পায়নি, অরো কয়েকজন পেয়েছে।'[৪৮] বিদিশার বর্তমান প্রেমিকটি ভদ্রলোক। তার বেশভূষা, বাচনভঙ্গি দেখে নায়ক শ্লেষের ভঙ্গিতে ভদ্রলোকের সংজ্ঞা দেন এভাবে— 'ভদ্রলোকদের কথাতো সব সময়েই সেই তেতো ক্যাপসুলের ওপর একটি মিঠে কোটিং দেবার মতো।[৪৯]

নায়কের বন্ধুরা সবাই সুবিধাবাদী অথচ মহত্ত্বসন্ধানী। তাদের কেউ কেউ আবার বউকে লুকিয়ে অফিসের স্টেনো টাইপিস্টের সঙ্গে অভিসার চালায়। যেমন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিরেন ভণ্ড এবং আপাতভাবে ভদ্র। শিল্পের প্রয়োজনে সে ইতিকে ব্যবহার করে। ইতির নিষ্পাপ মুখ দেখে সে তার মধ্যে একটি করুণ নিষ্পাপ পবিত্রতার সন্ধান করে। কিন্তু এই ইতি সন্তানসম্ভবা হলে সে সামাজিকতার ভয়ে অনাগত শিশুটিকে হত্যায়

ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের সন্তানকে যারা জন্ম দেয় তাদের সঙ্গে হীরেনের বিশ্বাসঘাতকতায় নায়ক বেদনাহত হয়। বন্ধুর বিপদে সাহায্যের জন্য নায়ক টাকা জোগাড় করেছিল কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সে অন্য নারীর জন্য খরচ করে ফেলে। মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয় এখানে স্পষ্ট। এরপরও নায়কের মনোভাব টাকাটা যদি সত্যি ওকে দিতে হত, তবে রাগে আর ঘৃণায় কোনদিন ওর পাছায় লাথি কষিয়ে বসতাম। অন্তত মনে মনে তো বটেই।[৫০] চরিত্রের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করার অসাধারণ দক্ষতা সমরেশ বসুর ছিল। মধ্যবিত্ত মানসিকতার যে অবনমন তা লেখক স্পষ্ট করেছেন। হীরেনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর ইতির সাথে নায়কের সখ্য তৈরি হয়, যা নায়কের অপচয়িত যৌবনধর্মের যথেচ্ছারকে নির্দেশ করে।

সমরেশ বসু উপন্যাসে সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের চালচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে এমন সব বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন যা পাঠকের কাছে অপ্রত্যাশিত। যেমন হীরেনের প্রেমিকা ইতি প্রেমের ক্ষেত্রে নীতিবর্জিত এবং সাময়িক সুখপ্রত্যাশী। ইতির প্রেমিকের সংখ্যা উপন্যাসে উল্লেখ নেই, তবে হীরেনের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর বহুবার নায়কের সাথে একান্তে সময় কাটিয়েছে। নায়ক অবশ্য হীরেনের মতো নিষ্পাপ পবিত্রতার সন্ধান করেনি। ইতির যতবারই অ্যাবরশন হয়েছে ততবারই মুখটি রুগ্‌ণ হয়ে নিষ্পাপ করুণ পবিত্র দেখিয়েছে। তাই নায়ক বা ইতি কেউই প্রেমের ক্ষেত্রে সনাতন মূল্যবোধের সন্ধান করেনি। শরীর বা মনের পবিত্রতা উভয়ের কাছে নিরর্থক।

উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্র মদ-নারী এবং যৌনতায় আশ্রয় খুঁজেছে। যেমন নায়কের অফিসের মি. চ্যাটার্জি ব্যক্তিগত জীবনে ঘুষখোর। নিজের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহ করেন। নিজের অসহায়ত্ব ঢাকতে মদ খান। নায়কের সঙ্গে একই গাড়িতে অফিসে যান। নায়ককে নিজের আচরণ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি অফিসের উর্ধ্বতন।

‘নটোরিয়াস’ হাবলু দত্তের স্ত্রী রুবি দত্ত। নায়ক তাকে ‘জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ’ বলে। নারীচরিত্রের নিষ্ঠা, সততা কোনোটাই তার মধ্যে নেই। দৈহিক শুচিতার মতো বিষয়ে সে বিশ্বাসী নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ হয়েও নিজের যৌবন, বিদ্যা আর বুদ্ধি দিয়ে কলকাতাশ্বরী হয়। অনেক উঁচুমহলের চাবি তার আঁচলে বাঁধা। নায়ক ভাবে :

> রুবি দত্ত-এর নিশ্চয়ই একটা কোনও প্রতিভা আছে। প্রতিভা; কে জানে, ক্ষমতাবান লোকদের আয়ত্ত করার জন্যে স্ত্রীলোকদের কোনও প্রতিভার দরকার হয় কি না। না হলে, অন্যরাও রুবি দত্ত হয়ে উঠতে পারে না কেন ?[৫১]

আইনজীবী হারান নিয়োগী পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। জীবনসায়াহ্নে এসে এক নারীর বন্ধনে বাঁধা পড়েন কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে প্রেমের কথা স্বীকার করেন না। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়ত

দাম্পত্যবহির্ভূত সম্পর্কে অভ্যস্ত। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘জীবনসায়াহ্নে ভালবাসা! পিররিতে হালুয়া! বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণি, পুরূরবা আর উর্বসী (উর্বশী নয়)।’[৫২]

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র হচ্ছে গোয়েন্দা কর্মকর্তা, যে তার পেশাগত কারণে নায়কের গতিবিধি অনুসরণ করে। নায়ককে বারবার জিজ্ঞাসা করে নীতা হত্যার দিন সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত সে কোথায় ছিল। তার ছোট ছোট প্রশ্নগুলি নায়কের বোধকে জাগরিত করে। নায়ক কর্মকর্তাটির প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলে, ‘আচ্ছা বলতে পারেন, আমি আপনি, আমরা কেন জেলের বাইরে? ...আপনার চাকরিটা তো যাকে বলে, সমাজের অপরাধীদের ধরা, কিন্তু সত্যি কি আপনি তা ধরছেন ?[৫৩] গোয়েন্দা কর্মকর্তাটি যেন তারই অন্য এক সত্তা, তার বিভক্ত চৈতন্যে যার জন্ম।[৫৪]

‘নীতা’ *বিবর* উপন্যাসের নায়িকা। নীতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি গতি পেয়েছে। যদিও উপন্যাসে নীতার সরব উপস্থিতি সামান্য। নীতাকে কেন্দ্র করে নায়কের দেহনির্ভর প্রেম থেকে দেহোত্তর প্রেমে উত্তরণ ঘটেছে। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী, তাই কৃতকর্মের অপরাধবোধ তাকে মুহূর্তের জন্য হলেও বিচলিত করে। নীতার আহ্বান নায়ক সজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। নায়ক জীবিত নীতার কাছে বাঁধা ছিল। কিন্তু নীতার প্রতি আসক্তি-অনাসক্তির মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া ঘৃণাবোধ নায়ককে বাধ্য করে নীতাকে হত্যা করতে। নীতাকে হত্যার পর নায়ক অবচেতনভাবে নীতার শরীরের শীতলতা অনুভব করে। এই অনুভবে নান্দনিকতা ছিল। অথচ হত্যার পূর্বমুহূর্তে উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল। একে অপরের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। অর্থাৎ কেউই একে অপরের কাছে শৃঙ্খলিত থাকতে চায়নি। সমালোচকের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য: ‘‘... এ উপন্যাসে অনুভূত হয় মানব অস্তিত্বের বিপ্রতীপে দাঁড়ানো স্বাধীনতাবোধের সংকট।’’[৫৫] পরস্পরের প্রতি প্রেমহীনতায় শেষ পর্যন্ত নিবিড় সান্নিধ্যে তারা অসুখী হয়েছে। অথচ নীতাকে হত্যার পরই নায়ক অশরীরী নীতাকে ভালোবাসতে শুরু করে। একান্তভাবে নীতার সান্নিধ্য কামনা করে :

> যাকে নিজের হাতেই মেরে ফেলেছি, তার সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারছি না, সে নেই, এবং আর কখনওই তাকে দেখতে পাব না, ছুঁতে পাওয়াতো দূরের কথা, এটাকে একটা ভাবনা বলেই মনে করতে পারছি না, কারণ এ অর্থহীন কথা ভেবে কোনও লাভ নেই, তবু (মাইরি) আমার ভিতরটা যেন একটা জেদবশতই মানতে রাজি নয় যে, নীতাকে (সে যাই হোক) আর কখনওই (যেভাবে হোক) পাব না।[৫৬]

নীতার মৃত্যুর পর নায়ক মিথ্যার আবরণের জাল ছিন্ন করে নীতার কাছে যেতে চেয়েছে। নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল নীতা। একদিন ঘৃণায়, ক্রোধে যে নীতাকে সে হত্যা করেছিল, আর একদিন গভীর ও শুদ্ধতর ভালোবাসায় ফিরে যায় নীতারই কাছে।[৫৭]

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের ভালোবাসা মনোদৈহিক সুস্থতার সীমায় উপনীত হতে পারে না। যাপিত জীবনের সামূহিক যন্ত্রণা, স্নায়বিক বিপর্যয়, মানসিক বিকৃতি, এক কথায় বাজারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে মূল উদ্দেশ্য 'উপরে ওঠা' সেখানে 'ভালোবাসা' নামক যে সম্পর্ক গড়ে তা কোনো অর্থেই ভালোবাসা নয়। সমরেশ বসুর সফলতা এই যে সমস্ত বিকার আর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি শুদ্ধতর জীবনের প্রত্যাশী।

লেখক সমরেশ বসু অত্যন্ত সমাজঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতার পূর্ণভাণ্ডারকে শিল্পে রূপ দেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাটতিকে কখনই ভাষিক কাঠিন্যের জগতে নিমজ্জিত করেননি।[৫৮] সমরেশ বসুর *বিবরে* ভাষার স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুমেয়। এই উপন্যাসে তিনি আঙ্গিক নিয়ে করেছেন নতুন নিরীক্ষা। উপন্যাসের প্রচলিত গঠন এখানে অনুপস্থিত। নায়কের আত্মকথনে উপন্যাসের ভাষা গতি পেয়েছে। অস্তিত্ববাদী রচনা বা প্রতীকধর্মী নাটকের নিয়মানুযায়ী *বিবর*-এ নায়কের কোনো নাম নেই। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র তথা প্রচলিত সমাজের সকল অনুষঙ্গে সে সঙ্গতিহীন। আত্মকথনে নিজের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের চরমতম রূপের প্রকাশক সে নিজেই।[৫৯] স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তের আকস্মিক উত্থানের ফলে সৃষ্ট জঞ্জাল সরানোর আকাঙ্ক্ষায় নায়ক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পচে যাওয়া সমাজের বর্ণনায় তাই লেখককে আশ্রয় নিতে হয় ব্যঙ্গ, পরিহাস আর খিস্তি-খেউড়ের। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বীরেন্দ্র দত্তর মতামত স্মরণীয় :

> বিবর-এর ভাষা একটি অসম্ভব যন্ত্রণাকাতর মানুষের আত্মশক্তির ভাষা। কিন্তু এই আত্মোক্তি শুধু নিজেকে চেনায় না, নিজেকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করায়। সে স্বীকারোক্তি এক স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল সময়ের মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার নির্লজ্জ উদ্‌ঘাটন।[৬০]

চরিত্রের মানসলোকের আত্মখননের প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক কখনো কখনো অপভাষা ব্যবহার করেছেন। অপভাষার ব্যবহারে সমরেশ বসুর সাথে মাহমুদুল হক তুলনীয়। মাহমুদুল হকের *নিরাপদ তন্দ্রায়* এ জাতীয় অপভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

১. সত্যি বলতে কি চাকরিটা যেন অনেকটা ছেনালের মতো যে প্রথম দর্শনে খাঁটি প্রেমিকার মতো ডাক দিয়েছিল।[৬১]

২. চ্যাটার্জির চোখ সেই সামনের দিকে, যেন আমার ভাদ্রবউ, তাকালেই চিত্তির। লিফট থামল।...শালা এল ঘণ্টাকুমার রূপ দেখাতে এল,' মারব একদিন লেংগি শালাকে।[৬২]

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা মধ্যবিত্তের প্রচলিত মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়েছে। আপন পরিবৃত্তির বাইরে প্রযুক্ত এই ভাষার মধ্যে কোনো আড়াল বা আবরণ নেই।[৬৩] যেমন নীতার নগ্ন দেহ সম্পর্কে নায়কের সরল অভিব্যক্তি :

> ওর সমস্ত দেহটা দেখা যাচ্ছে। ওর মেদহীন সুগঠিত খোলা পিঠ, এত সুন্দর আর স্বাস্থ্যপূর্ণ, শিরদাঁড়ার মাঝখানটা যেন দু পাশ থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসে তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় আঁকা পড়েছে।[৬৪]

মাত্র আড়াই দিনের পরিসরে নামহীন নায়ক তার স্বগতভাষণে পরিপার্শ্ব, পরিবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কর্মক্ষেত্র, প্রেম ও বিবাহভাবনা, যৌনতা ইত্যাদি বিষয়ের অস্বাভাবিকতাকে প্রকাশ করেছে। মধ্যবিত্তের অসঙ্গতি কখনো কখনো অনামা নায়কের চেতনার ভাবনাস্রোতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তার স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে নগর কলকাতার অসামাঞ্জস্য ধরা পড়ে:

> আমি প্রত্যেকটা জায়গাই চিনতে পারছি, যদিচ সবাই জলের তলায়, আর আমি যেন একটা মাছের মতো জলের তলা দিয়ে চলেছি। ঠিক যে ভয়ে ভয়ে চলেছি, তা নয়, বরং একটা গা শিউরানো, ঘিনঘিনে ভাব নিয়ে, পচা হলদে জলের তলা দিয়ে, যেমন ডুবসাঁতার দিয়ে চলে, তেমনি ভাবে, কখনও কাত হয়ে, কখনও উপুড় হয়ে, গা বাঁচিয়ে চলেছি, কারণ ডুবে যাওয়া কলকাতার এইসব এঁদো রাস্তায়, হলদে রং-এর শুকনো পাতা, গাছের ডাল পড়ে রয়েছে, এবং এখানে কেঁচো, বা বিষহীন সাপ দলা পাকিয়ে রয়েছে। মঝে মাঝে সাদা কৃমির দলও কিলবিল করছে, সেগুলো যেন এই রাস্তার ধারের নর্দমায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পেট থেকেই এককালে বেরিয়েছিল, কারণ নর্দমাগুলো আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এবং সেই মস্ত বড় গাছের গুঁড়িটা, যার ধার ঘেঁষেই এই একটা মন্দিরের রক, যে রকের পলেস্তরা, এক এক জায়গায় খসে গিয়েছে, লাল ইট দেখা যাচ্ছে।...সুতো থেকে ঘুড়ি কেটে যাওয়ার মতো আমি কোথায় যেন ছিঁড়ে গেলাম, অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম, কিছুই আর আমি দেখতে পেলাম না, আমি নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেললাম।...[৬৫]

বিবরে নাগরিক মধ্যবিত্তের রূপাঙ্কনে সমাজ-সংস্কৃতির নেতিবাচক দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন লেখক। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত হওয়ার বাসনায় স্বভূমিচ্যুত হয়েছে। যেমন নায়কের ভাইবোনেরা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বলয় ভেঙে উচ্চবিত্তের অপসংস্কৃতির ধারক হতে চেয়েছে। তারা সবাই ফ্যাশন-সচেতন। ড্রেন পাইপ প্যান্ট, ঠোঁটে সিগারেট, আঁটোখাটো ফ্রক, টুইস্ট এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যস্ত। নায়কের সাথে তাদের সখ্য নেই। নায়ক তার ভাইবোনদের ভালো করে চেনে না। আত্মকেন্দ্রিক নায়কের ভাইবোনদের নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। একই পরিবারভুক্ত হয়েও সবাই বিচ্ছিন্ন। যৌনতা এই সংস্কৃতির একটা অংশ। উপন্যাসে যৌনতার ব্যাপারে পুরুষ-নারী উভয়ই স্বেচ্চাচারী। নীতা, রুবি দত্ত, ইতি, বারে কাজ করা কোনো এক গৃহবধূ সাবিত্রী, বিদিশা, সবাই অবাধ স্বাধীনতার জোয়ারে গা ভাসানো চরিত্র। মূলত ঔপন্যাসিক ব্যক্তির মূল্যবোধহীনতার রূপকে সামগ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অবনতি দেখিয়েছেন।

ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসলিলে প্রবেশের স্বার্থে লেখক প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ নির্বাচন এবং বাগ্‌ভঙ্গি নির্বাচন করেছেন। উপন্যাসের সমাজ-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যয় প্রমূল্যহীন অপচয়িত সমাজের অন্তর্বাস্তবতা নির্মাণে ঔপন্যাসিক চরিত্রের দিকে অধিক মনোযোগী। সমকালীন ঘুণেধরা সমাজচিত্রণে লেখক ব্যক্তিসত্তার অন্তর্মুখী উন্মোচনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন।

স্বর্ণপিঞ্জর

স্বর্ণপিঞ্জর বৈরাগ্যের আবরণে অনুরাগের কথকতা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পীযূষ সন্ন্যাসী। সাধারণ মানুষের কোনো অনুভূতি তাকে স্পর্শ করে না। মহাকারুনিকাশ্রমের ধ্রুবানন্দ তিনি। অসহায় আর্তের সেবাই

তার ধর্ম। জীবনের স্বাভাবিকতার পথ রুদ্ধ করে সেবাকে পরম ধর্ম হিসেবে মেনেছে। কিন্তু বন্যাকবলিত একজন অর্ধ-অচেতন নারীর স্পর্শে সে প্রথম অনুভব করে তার মধ্যে পুরুষের সত্তা বেঁচে আছে। বহিরাবরণে সে সন্ন্যাসী, কিন্তু অন্তরে গৃহী। ধ্রুবানন্দের অসহায় যন্ত্রণাকাতর স্বগতোক্তি থেকে জানা যায় :

> সেই মুহূর্তে আমার সংবিৎ হল না, স্বধর্মের বিপরীত রীতি করলাম আমি। প্রথমেই আমি তাকে মাতৃ সম্বোধন করতে ভুলে গেছি। আর আমি, মহাকারুণকাশ্রমের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, ঈশ্বর ধর্মসেবায় উৎসর্গীকৃত আমার প্রাণ, আমি ধ্রুবানন্দ ধর্মপ্রবক্তা, স্পষ্টই অনুভব করলাম, আমি মানুষ এবং পুরুষ। আমি পুরুষ আর আমার দেহাশ্রিত দেহ একটি নারীর।[৬৬]

পীযূষ একুশ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনায় সংসারধর্ম ত্যাগ করে। সাধনার প্রতিটি ধাপ কঠোর সাধনায় অতিক্রম করে ব্রহ্মচারী থেকে সন্ন্যাসী হয়। মহাকারুণিশ্রমের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ভ্রাম্যমান অধ্যাপক হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বেদান্ত, দর্শনসহ নানান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছে। স্বামীজি হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের স্বাভাবিকতাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু অবচেতনে নারীর স্পর্শ তাকে জীবনবাদী করেছে। পীযূষের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী, ভোগী, লোভী যে আত্মার বাস তা জেগে ওঠে। আশ্রমে ফিরে এসে সে আর আধ্যাত্ম সাধনা করতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* উপন্যাসের নায়ক যেমন মাধবীলতাকে দেখে সর্বদা মাধবীলতাকে কামনা করেছে এবং নৈতিকভাবে স্খলিত হয়ে মাধবীকে নিয়ে আশ্রম থেকে পালিয়েছে পীযূষও লুকিয়ে লুকিয়ে ছটাকে দেখেছে এবং একসময় ছটাকে নিয়ে পালিয়েছে।

পীযূষের অন্ধকারময় অতীত তার জীবনের স্বাভাবিকতাকে রুদ্ধ করেছে। পীযূষের বাবা তারানাথ চটকলের কেরানি। অসৎপথে অর্থ উপার্জন করে প্রতিদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত এবং পীযূষের মা ও ভাইবোনদের পেটাত। শৈশব থেকে পিতা-মাতার দাম্পত্যকলহ দেখে সুস্থ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে তার কোনো ধারণা তৈরি হয়নি। তাই ছটার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ছিল প্রীতি এবং ভালোবাসাহীন। ছটার প্রতি মুগ্ধতা থেকে কামকীটের মতো তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। মানসিক বিকারগ্রস্ততা থেকে যৌনতায় মুক্তি চেয়েছে— 'আমার নির্বিচার ভোগের মধ্যে যে অনুযোগ এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল দাম্পত্য জীবনের স্নেহ-প্রীতি, না ছিল কোনও সম্মান। ভোগ, ভোগ আর ভোগ আর একজনকে কী পরিমাণ তিলে তিলে নিঃশেষ করেছিল, সে খবর আমি রাখিনি।'[৬৭] মানবিক সংবেদনাহীন মধ্যবিত্তের চারিত্রিক অসংগতি পীযুষের মধ্যে প্রকাশিত।

আশ্রম ছেড়ে এসে পীযূষ এন্‌সিয়েন্ট হিস্ট্রির শিক্ষক হিসেবে কলেজে যোগদান করে। পেশাগত জীবনে শৈশব কৈশোরের একাকিত্ববোধ এবং নিঃসঙ্গতা থেকে সহকর্মীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি।

আমার চরিত্র এবং ব্যবহারে এল আশ্চর্য পরিবর্তন। আমি কারুর দিকেই ভাল করে চোখ তুলে আর কথা বলতে পারলাম না। তাই ক্লাসে আমার ছাত্ররা জানল আমি লাজুক। আমার অধ্যাপক বন্ধুরা প্রথম থেকেই ধরে নিল, আমি যেন সদ্য পাশ করা যুবক, তাই লাজুক, কুণ্ঠিত এবং এক বছর যেতে না যেতেই তারা আবিষ্কার করল, আমি ভিতর-গোঁজা অসামাজিক, আর ক্রূর প্রকৃতিরও বটে।[৬৮]

দাম্পত্য জীবনে সে আরো বেশি নিঃসঙ্গ একাকী। ছটার প্রতি ক্ষণিকের মোহ ভাঙতেই তার দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠে উত্তাপহীন। ব্রহ্মচর্যের জীবনে যা ছিল অনাহুত, তার যথেচ্ছ ব্যবহারে পীযূষ হয়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল। ছটার অস্তিত্বকে সে কখনোই সম্মান করে নি। খুব অল্পদিনেই পীযূষ মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি আর সুবিধাবাদী চরিত্র আয়ত্ত করে। কলেজের অধ্যক্ষকে হাত করে বস্তুস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। 'আমার মধ্যে আস্তে আস্তে লোভ ফুটে ওঠল। এ কথাও মনে করতে লাগলাম, জীবনকে পূর্ণ- ভোগের আয়োজনে ভরিয়ে তুলতে, এই যুগের উপযুক্ত হবার জন্যে পাপ-পূণ্য জ্ঞান এক করতে হবে।[৬৯] পীযূষের বক্তব্যে মধ্যবিত্তের আদর্শগত অসঙ্গতি ধরা পড়ে। আত্মপরতা আর আত্মমগ্নতার মধ্যে সে হঠাৎ অনুভব করে তার অতীত :

কেবলি মনে হতে লাগল, আমি যেন কোনও গোপন হত্যাপরাধে অপরাধী। এবং এখন কয়েদি। আমার অন্য কোথাও পালানো দরকার। অন্য কোথাও, যেখানে একটা পরম ভরসা, নির্ভয় এবং শান্তি আছে।[৭০]

আশ্রম ছেড়ে আসার পর নৈঃসঙ্গিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে যৌনতায় আশ্রয় খুঁজেছে। কিন্তু ঈশ্বরানুসন্ধানের সুপ্ত ইচ্ছা তাকে আবার বস্তুজগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়। স্বপ্নের মধ্যেও সে পরমারাধ্যের সান্নিধ্য কামনা করে। পুনরায় সন্ন্যাস জীবনে ফিরে যাবার বাসনায় তাদের মধ্যে দাম্পত্যসংকট তৈরি হয়েছে। পীযূষের মনে হয়েছে সমাজ তাদের সম্পর্ক নিয়ে বিদ্রূপ করছে। মন্দির দেখে ভয় পেয়েছে। নির্জনতা দেখে আতঙ্কিত হয়েছে। এই শঙ্কা এবং ভীতি থেকে তার চিত্তলোকে প্রবিষ্ট হয়েছে প্রেমবিচ্ছিন্নতার বীজ। ছটাকে সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়— 'আমি তোমাকে ভালবাসি নে।'[৭১] পীযূষ বুঝেছিল ভোগবাদী জীবন তাকে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করেছে। সত্তাবিচ্ছিন্ন পীযূষের নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি মনে হতো। তার এই আত্মদ্বন্দ্বের একদিকে ছিলো অরূপরতনের সন্ধান, অন্যদিকে ছটার আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত ছটাই তাকে মুক্তি দেয়। মন্দির থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছটা রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। ছটার মৃত্যুর পর পীযূষ বুঝেছিল ছটাই তার জীবনীশক্তি। ছটাকে হারানোর বেদনা ভুলতে সে আবার আশ্রমে ফিরে যায় এবং সবাইকে প্রেমের মন্ত্রে মানবতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে।

সমরেশ বসুর অন্য নায়কদের মতো পীযূষও নিঃসঙ্গ। প্রাক-যৌবনে মায়ের দর্শন তাঁর মধ্যে বপন করেছিল নিঃসঙ্গতার বীজ, যে কারণে বন্ধু রমেশের সাথে থেকে সে রমেশের মতো হতে পারেনি। এছাড়া শৈশবে পিতা-মাতার সংঘাতময় দাম্পত্যজীবন তার মানসভুবনে সৃষ্টি করে আত্মগত সংকট।

তাইতো যখন সে সন্ন্যাসী হয়েছে তখন গৃহী হবার বাসনা জেগেছে। আবার যখন সংসারী হয়েছে তখন তার মধ্যে প্রবলভাবে প্রোথিত হয়েছে সংসারবিযুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতা। শেষ পর্যন্ত এই ভাবনাকে জয় করে আধ্যাত্ম সাধনায় মুক্তি খুঁজেছে।

মধ্যবিত্ত মানুষের ঘর বাঁধার স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে ছটা চরিত্রে। পীযূষকে বিয়ের পূর্বে অতি সন্তর্পণে ব্যাচারাম গোস্বামীর কামবহ্নি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। পিতৃমাতৃহীন ছটাও ছিল নিঃসঙ্গ। পীযূষ তাকে কখনোই বোঝেনি। অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যজীবনে সে পীযুষকে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু পীযুষ তাকে দেখেছে কামজ দৃষ্টিতে। পীযূষের সান্নিধ্যে সে স্বস্তি এবং শান্তি চেয়েছিল। পীযূষ ছিল তার স্বামী এবং স্বামীজী। স্বকীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে সে পীযূষকে সুখী দেখতে চেয়েছে। কিন্তু পীযুষের মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা তাকে নির্মম নিয়তির দিকে ঠেলে দেয়। বাঁচার দৃঢ় সংসক্তিটুকু হারিয়ে আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়।

পীযূষের মা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ। সামান্য লেখাপড়া জানলেও ঈশ্বরানুভব নিয়ে তার নিজস্বতা ছিল। ঈশ্বরকে তিনি সংসারের একটা অংশ মনে করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, যারা দুঃখী তারা অস্থির হলে শয়তানে পায়। স্থির হলে ভগবানে পায়। পীযুষের ওপর তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যে কারণে সংসার, সংঘ, বস্তুবাদী রাজনীতি কোনো কিছুই পীযূষকে আকর্ষণ করেনি। পীযূষ চরিত্রের উদারতা, নির্লোভ আর নির্মোহ অংশটুকু তার মায়ের মানবতাবাদী দর্শন থেকে পাওয়া।

সমরেশ বসু সন্ন্যাসী এবং অপাপবিদ্ধা কুমারীর আপাত অসঙ্গত সম্পর্কের বৈধতা দিয়ে দেখতে চেয়েছেন সমাজে তারা কতখানি স্বচ্ছন্দ। পীযূষের মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা এবং স্বভূমে ফেরার মনোবৃত্তি তাদের সম্পর্কে জটিলতা তৈরি করেছে। মধ্যবিত্তের চারিত্রিক অসংগতি পাই পীযুষ চরিত্রে। কিন্তু ছটার মৃত্যু তাকে কাঙ্ক্ষিত মানবপ্রেমে নিয়ে যায়।

সমরেশ বসু সমাজঘনিষ্ঠ কথাকোবিদ। মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে যখন তিনি লিখেছেন মধ্যবিত্তের স্বরূপকে ভাষিক সৌকর্যে উপস্থাপন করেছেন :

> ধ্রুবানন্দর মৃত্যুকে যেন এক ভয়ংকর আগুন ত্বরান্বিত করে নিয়ে এল। কই, আমি তো পারলাম না হাত সরিয়ে নিতে। গম্ভীর নীরস কথায় ছটাকে স্তব্ধ করাতে পারলাম না তো। ওর মতোই সম পরিমাণ অসহায়তার মধ্যেও, আমি যে করুণ আবেগের মুখোশ পরে বারে বারে বললাম, 'শান্ত হও ছটা, শান্ত হল।'[৭২]

তিন ভুবনের পারে

তিন ভুবনের পারে বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস নয়। সামাজিক কোনও অভিপ্রায়ী উপন্যাসও নয়।[৭৩] ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দুজন নরনারীর প্রেম, বিয়ে এবং দাম্পত্যজীবন নিয়ে রচিত। প্রেম ব্যক্তিকে কী দেয়, বিনিময়ে তার কাছে কী চায়, সমস্ত প্রাত্যহিকতার বাইরে সে নিয়ে যেতে চায় বটে। কিন্তু দামও কিছু সে ধরে। ব্যক্তিস্বরূপের পরীক্ষা হয় সেখানে।[৭৪] অর্থাৎ প্রচলিত কাহিনির অন্তরালে দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তর্জটিল রূপটি লেখক নির্মাণ করেছেন।

সুবীর ওরফে মন্টুর মতো প্রায় বখে যাওয়া যুবক সরসীর সাহচর্যে এসে কীভাবে নিজেকে বদলে ফেলে তারই বর্ণনা উপন্যাস জুড়ে। লেখকের ব্যক্তিজীবনের কিছুটা প্রচ্ছায়া উপন্যাসে আছে। সরসী যদিও গৌরী নয়, তবু তারও কিছু আবছা টান সরসী চরিত্রে রয়েছে। গৌরী সম্পর্কে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন— 'তাঁর বেড়ে ওঠার বয়সে আমি তাঁকে দেখিনি, দেখেছি যৌবনের এপারে পৌঁছানো বয়স থেকে, তাই জানি না কিশোরী গৌরী কেমন ছিলেন। ... শুধু জানি মেয়ে হিসেবে আমাদের সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে অকল্পনীয় একটা বড়ো ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড হতে বাধ্য হয়েওছিল।[৭৫] সমরেশ-গৌরীর দাম্পত্যজীবনে গৌরী আপন ব্যক্তিত্বে পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত চাপ মোকাবিলা করেছেন। সমরেশ বসুর সৃষ্টিশীল সত্তাকে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। *তিন ভুবনের পারে* উপন্যাসে সরসী সুবীরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বোহেমিয়ান, ভবিষ্যৎহারা সুবীরের জীবনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। কাহিনিতে কোনো জটিলতা নেই। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব থাকলেও তা প্রগাঢ় নয়। সামাজিকতার দায় থেকে এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সরসী ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সুবীরের মতো রকবাজ ছেলেকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা এবং তাদের দাম্পত্যজীবনে অযাচিত তরুণীর আগমনকে কেন্দ্র করে তার মানসিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই যুগল সম্পর্কের টানাপোড়েনকে অতিক্রম করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে।

সমরেশ বসু এই উপন্যাসে মধ্যবিত্তের প্রেমভাবনা, দাম্পত্য টানাপোড়েন এবং সেখান থেকে উত্তরণ দেখিয়েছেন।

নর-নারীর অস্তিত্ব, নিঃসঙ্গতামুক্তি, যৌনসান্নিধ্য, সন্তানোৎপাদন, মালিকানাবোধ ও ক্ষমতাবলয়ের কেন্দ্র-সন্ধানের প্রেক্ষাপটে সমাজবিকাশের বিশেষ প্রাগ্রসরতায় বিবাহনির্ভর দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্ভব।[৭৬] সমরেশ বসু *তিন ভুবনের পারে* উপন্যাসে এই দাম্পত্যসম্পর্ককে সম্মান জানিয়েছেন। তবে পুরুষের

আধিপত্যকেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবনের বিপরীত স্রোতে *তিন ভুবনের পারে* কাহিনি স্থাপিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজি বিপর্যয়, মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের অতিসচেনতা ও প্রেমানুভূতির প্রাধান্যের ত্রয়ী প্রবণতায় দাম্পত্যসম্পর্ক নতুন জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়।[৭৭] নারী স্বাবলম্বী হওয়ায় দাম্পত্যজীবনে পুরুষের একাধিপত্য অনেকাংশে খর্বিত হয়েছে। *তিন ভুবনের পারের* নায়িকা সরসী স্বাধীনচেতা এবং স্বাবলম্বী। নিজের ভালোবাসাকে মূল্য দিতে পরিবারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঘর ছাড়ে। সুবীরের মতো কারখানার সামান্য কেরানিকে বিয়ে করে। সুবীর শিক্ষা-দীক্ষায় কোনো অংশেই সরসীর সমকক্ষ নয়।

সরসী-সুবীরের জীবনে তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে সরসী-সুবীরের প্রেম এবং তাদের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারের দোলাচল। দ্বিতীয় পর্বে তাদের দাম্পত্যজীবন এবং সরসীর সাহচর্যে সুবীরের ডক্টর সুবীররঞ্জন মিত্র হওয়া, তৃতীয় পর্বে দাম্পত্যসম্পর্কের টানাপোড়েন এবং সেখান থেকে উত্তরণ। উপন্যাসের কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে বর্ণিত হয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা, মূল্যবোধহীনতা, দোলাচলতা এবং স্বাধীনতাত্তোর কলকাতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট।

সরসী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। দাদাদের সংসারে আশ্রিতা। একটু স্বচ্ছন্দে থাকার আশায় প্রায়ই তার দাদারা বাসা বদল করে। তাই ভাড়াবাড়িতে সরসী কখনোই অস্বস্তিবোধ করেনি। পাড়ার গলিতে বখাটের উৎপাতকে সে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে। কিন্তু নতুন পাড়ায় উঠে এসে রকবাজ মন্টুকে সংশোধন করবার একটা জেদ চেপে বসে সরসীর মধ্যে এবং সেটা ভালোবাসার মাধ্যমে। তাই রকবাজ মণ্টুকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তে সে তার পরিবারের কাছে প্রায় ব্রাত্য হয়ে পড়ে। একটি মাত্র চাকরিকে অবলম্বন করে সরসী প্রায় দুঃসাধ্য লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পরে। [৭৮]

সুবীর কারখানার সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী। মাসে একশত পঁচিশ টাকা বেতনের একশত টাকা সে তার পরিবারকে দেয়। তারপরও সে তার পরিবার থেকে প্রত্যাশিত সম্মান পায় না। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে অধিকাংশ সময় পাড়ার গলিতে আড্ডা দেয়। তবে তার মধ্যে সুস্থভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সে সরসীকে প্রেম নিবেদন করে। সরসীও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে সুবীরের প্রেমে আস্থা রাখে। সুবীরকে বিয়ে করার অপরাধে সে তার দাদাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিবেশী, সহকর্মী সবাই তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।

দাম্পত্যজীবনে সুবীরের অশ্লীল কদর্যতা, অস্বাভাবিক আচরণ সরসীর মনোবেদনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। সরসী জেদের বশে এবং মধ্যবিত্তের আত্মমর্যাদাবোধ থেকে সুবীরকে তার সমকক্ষ করতে চায়। সুবীর সানন্দে সরসীর প্রস্তাব গ্রহণ করে পড়ালেখা শুরু করে। সুবীর আইএ পাস করার পরও সরসীর

পিত্রালয়ের নির্বিকারত্বে কোনো ফাটল ধরেনি। সুবীর সরসীকে সহযোগিতা করলেও মধ্যবিত্তের সামাজিক পদমর্যাদা জনিত ভাবনা থেকে তাদের মধ্যে সংকট তৈরি হয়েছে। বিবাদে-অবিবাদে সুবীর সরসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে 'তুমি কখনও ভুলতে পার না, তুমি এম এ পাস, ইস্কুল টিচার, সুন্দরী' (আর আমি একটা আকাট মুক্‌খ)।'[৭৯] এখান থেকেই জটিলতা তৈরি হয়েছে। সুবীরের বোহেমিয়ান মন নাটকের দলের সাথে দূর-দূরান্তে যেতে চেয়েছে। সরসীর বাধাদানে তাদের মধ্যে সাময়িক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অব্যক্ত দহন যন্ত্রণায় উভয়ে দগ্ধ হয়েছে। সংসারের প্রতি ঘৃণায় সুবীর সরসীকে ব্যঙ্গ করে বলেছে— 'নেহাত আমার মতো ছেলের সঙ্গে ফেঁসে গেছ, এখন পস্তাচ্ছ। মনে মনে চাও, বিদ্বান গুণবান রূপবান স্বামী, আমাকে তাই মানতে পারনা।[৮০] সুবীরের এই কূটভাষণ সরসী মেনে নেয় না। সরসীও এর প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সুবীরকে বিদ্ধ করে। এতে তাদের দাম্পত্যের তিক্ত-বিরক্ত স্বরূপটি চিহ্নিত হয়। সরসীর শিক্ষা এবং রুচির কাছে দাঁড়াতে হলে সুবীরকে যে নিজেকে ভেঙে নতুনভাবে তৈরি করতে হবে তা সুবীর জানত। সে কারণেই সুবীর চাকরি এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেছিল। তারপরও তার স্বাধীনচেতা মন কখনো কখনো বিদ্রোহ করেছে। বন্ধুদের সাথে অধিক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে। যা সরসী কখনই মেনে নিতে পারেনি :

> সে সরসী মিত্র, পূর্বের সরসী রায় এম. এ ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তার মধ্যরাত্রের প্রতিক্ষিত দরজায় দাঁড়িয়েছিল একটা অর্ধশিক্ষিত, মাতাল, তার আজীবন পরিবেশ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাওয়া স্বামী।[৮১]

সরসী হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। সুবীরকে বাধ্য করেছে তার অযাচিত আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে। সরসী সুবীরকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে, এবং তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে।। সরসীর প্রেমাধিক্য এবং হারানোর শঙ্কা সুবীরের কাছে সীমা লঙ্ঘনের শামিল। 'সরসী আমাকে রেখেছে অচ্ছেদ্য বন্ধনের সীমায়, যে বন্ধন আমার গতিকে করেছে সংহত।'[৮২] তারপরও সরসী তাকে সাহস জুগিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। সুবীরকে তার ফেলে আসা অতীতের সাথে লড়াই করতে শিখিয়েছে। সুবীর একাগ্রতা আর নিষ্ঠায় ডক্টর সুবীররঞ্জন মিত্র হয়। প্রতিষ্ঠা পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সম্মানীয় অধ্যাপক হিসেবে।

সুবীর ডক্টর সুবীররঞ্জন মিত্র হয়ে নিজের শ্রেণিটাকে অতিক্রম করতে চায়। সুবীরের পাণ্ডিত্য, তার চাকরি তাকে উচ্চবিত্তের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সেখানে প্রেমকে সে তত্ত্বের বেড়াজালে আটকে ফেলে। তাদের দাম্পত্যজীবনে অনাহূতের মতো ডক্টর হেনা ব্যানার্জি এবং ধীরানন্দ ব্যানার্জীর অনুপ্রবেশ ঘটে। তারা সুবীরের প্রতিভাকে বিকশিত করতে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠেন, যা কোনোভাবেই সরসী মেনে নেয় না। ডক্টর সুবীররঞ্জন মিত্রের সাথে তার দূরত্ব তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠিত সুবীরের পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব যেমন সে উপভোগ করে, তেমনি সুবীরের পাশে তার তুচ্ছতা সে অনুভব করে :

হায় ডক্টর মিত্র, আপনার এত শুভার্থী, যাঁদের মুগ্ধতা বিস্ময় স্নেহ শ্রদ্ধা আপনাকে প্রতি মুহূর্তে আরতি করেছে, তাঁরা কেউ কি আপনার সেই অতীত প্রত্যহগুলোর সংবাদ রাখেন? সেই দিনের আপনি, আপনার চেহারা আচরণ কোনও কিছুরই সংবাদ কি এঁরা জানেন? এঁরা জানেন আপনি বেশি বয়সে, কত কষ্ট করে বিদ্যার্জন করেছেন। তা জানুন, তাতে কোনও আপত্তি নেই, তাদের জানাটাই সব নয়। কিন্তু আপনি ? আপনিও কি সেই দিনগুলোর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন?[৮৩]

সমাজে প্রতিষ্ঠিত সুবীর সরসীর কাছে অপরিচিত। এরই মধ্যে সুবীর সামরিক সিক্রেট সার্ভিসের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করার প্রস্তাব পায়। সরসী ভাবে সুবীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে সরসীর কোনো স্থান নেই। সে মনে মনে ডক্টর সুবীররঞ্জন মিত্রকে ঈর্ষা করে। চরিত্রের এই দ্বৈততা থেকে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। হেনা ব্যানার্জির উপস্থিতি এই জটিলতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সুবীর নিজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে, এমনকি দাম্পত্য চাহিদার সঙ্গে লড়াই করে আমূল পরিবর্তন এনেছে, সে জানে তার লড়াইয়ের ভিতর, জীবনে প্রতিষ্ঠার ভিতর সরসীর স্থান কোথায়।[৮৪] সুবীরের কাছে ভালোবাসার নাম আত্মানুসন্ধান। যেখানে পুরুষ আকাঙ্ক্ষা করতে চায়, নারী আকাঙ্ক্ষিত হতে চায় এর মাঝেই মানুষ তার অস্তিত্ব খোঁজে। সুবীর জানে পৃথিবীতে মানুষের এর চেয়েও বড় কর্তব্য করার আছে। সেই বড় কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়েই সরসী সুবীরকে বেঁধেছে অচ্ছেদ্য বন্ধনের সীমায়। যে বন্ধন ইচ্ছা করলেও ভাঙ্গা যায় না।[৮৫]

সরসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্ত্বসম্পন্ন নারী হয়েও সুস্থ দাম্পত্যের প্রত্যাশায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ সুখী দাম্পত্যই তার কাঙ্ক্ষিত, সেখানে চাকরিটা আকাঙ্ক্ষা পূরণের সোপান মাত্র।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বেকারত্বজনিত হতাশার বর্ণনা আছে ম্যাকের আত্মকথনে। তাদের মধ্যে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু প্রচেষ্টা নেই। শূন্যতাবোধ থেকে সৃষ্ট হতাশায় তারা নিমজ্জিত। জন, ম্যাক চাকরি পায়নি বলে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়। বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তারা বখাটে রকবাজ তরুণে পরিণত হয়। সুবীরের সফলতাকে তারা ঈর্ষা করে।

উপন্যাসটি যেহেতু মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক তাই মধ্যবিত্তের স্বতন্ত্র শব্দচয়ন, ভাষাভঙ্গি এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। যেমন :

ক. নিশ্চয় আমাকে খাইয়ে পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে তুমি মানুষ করছ, সবাইকে তো এ কথাই বলে বেড়াও। কিন্তু ও সব আমি থোড়াই কেয়ার করি, আমার কাঁচকলা।[৮৬]

খ. মন্টু অত্যন্ত ব্যাকুলভাবেই প্রতিবাদ করে উঠেছিল, মাইরি বলছি, আমি কোনওদিন আপনাকে ফলো করিনি।[৮৭]

গ. তা জানি না। আমার মনে হয় তুমি যেন আর সেরকমটি নেই। অ্যামবিশনের শেকলে তুমি বাঁধা পড়েছ। অর্থ, বিত্ত, ভিন্ন পরিবেশ, সরকারি প্রাসাদ, আপস্টার্ট সমাজের দিকে তোমার লক্ষ্য।[৮৮]

প্রজাপতি

এজরা পাউন্ড বলেছেন শিল্পীরা হলেন সমাজের অ্যান্টেনা। গড়পরতা থেকে অনেক বেশি সংবেদনা নিয়ে তাঁরা আগেভাগেই খুব নির্দিষ্ট করে বুঝে যান তাদের সমকালে সমাজে কী সব ঘটে চলেছে।[৮৯] সমরেশ বসু সমকালসংলগ্ন সমাজমনস্ক কথাকার। *প্রজাপতি*তে আমরা ষাটের দশকের সমকাল এবং সমকাল সংলগ্ন মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র পাই। স্বাধীনতাপরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্তের একাংশের জীবন ছিল কণ্টকাকীর্ণ, অবিন্যস্ত, বাধাগ্রস্ত, সংকটময় এবং বন্ধুর। অন্য অংশ নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দ্রুত বিকাশমান। নৈতিকতা বিবর্জিত অংশটি দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা ও উপেক্ষার বিপরীতে দাঁড়িয়ে জীবনের সুখভোগে ব্যস্ত। *প্রজাপতি* উপন্যাসে সুখেনের আত্মকথনে নৈতিকতাবিবর্জিত মধ্যবিত্তের বিকৃত জীবনচর্চার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

বিকৃতভাবে বিকশিত মধ্যবিত্তের মানসভুবন নির্মাণে লেখক অনেক ক্ষেত্রেই যৌনতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে উপন্যাসটি ১৯৬৮ সালে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। সরকারও রচনাটিকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করেন। লেখকের পক্ষ সমর্থন করেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং কবি নরেশ গুহ। দীর্ঘ সতের বছর মামলা চলার পর উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত হয়।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখেন। উপন্যাসটির সময় মাত্র দেড়দিন। এই স্বল্প সময়ে সুখেনের আত্মকথনে অন্তহীন নেতির আবর্তে আচ্ছাদিত সমাজের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। একটি প্রজাপতি মারাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি শুরু। প্রজাপতি হিন্দুদের বিয়ের দেবতা। স্বভাবতই প্রজাপতি হত্যার বিষয়টি সুখেনের প্রেমিকা শিখা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। শিখার নিষেধ সত্ত্বেও সুখেন প্রজাপতিটা ধরে এবং তারই হাতে আহত প্রজাপতিটি মারা যায়। সুখেনের কথাতেই জানা যায়— ‘আমি ওটাকে সত্যি মারতে চাইনি। ধরতে চেয়েছিলাম! ধরতে গিয়ে মারলাম, মারলাম মানে, নিজেই মরল। এত ফরফর করবার কী ছিল, ছেউটি ছুড়ির মতো।’[৯০]

সুখেন বাস্তববাদী। রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রবণ মনকে সে প্রশ্রয় দেয় না। সুখেনের বাবা সরকারি আমলা। তার বড় দাদা কেশব রাজনীতিবিদ, মেজ দাদা পুর্ণেন্দু চাকুরীজীবী এবং রাজনীতি করে। তার বাবা এবং দাদারা ব্যক্তিগত জীবনে অসৎ। সুখেনের মা পচে যাওয়া সমাজেরই অংশ। নিজের ব্যক্তিত্ব এবং সাজসজ্জা দিয়ে স্বামীর বন্ধুদের আকর্ষণ করায় ব্যস্ত থাকত। ফলে শৈশব থেকেই সুখেন স্নেহবঞ্চিত। সুখেনের তার বাবার বন্ধুদের দেখে ‘স্রেফ শুয়োরের বাচ্চা মনে হতো। মায়ে আজথি ঢংঢাং দেখে এমন

রাগ হত, মাকে একেবারে কামড়ে খামচে ছরকুটে দিই মাইরি !’[৯১] সুখেনের বাবা-মা আলাদা ঘরে ঘুমাত। বাবা-মায়ের দাম্পত্য টানাপোড়েনে শৈশব থেকেই সুখেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সুখেন তার দাদাদের সাথে ঘুমাত। সুখেনের বাবা সন্তানদের স্নেহের চেয়ে শাসনের দৃষ্টিতে দেখতেন। উঁচু পদের অহংকারে বাড়ির সবাইকে কেরানি ভাবতেন। ‘বড় চাকরি, প্রচুর ঘুষ, মেলাই তেল দেবার লোক, সব মিলিয়ে লোকটাকে স্‌সাহ্‌ দারুণ ক্রুয়েল মনে হত ।[৯২] মায়ের অশ্লীল অভীপ্সা এবং বাবার ক্রোধানলের কাছে সুখেন ছিল অসহায়। ফলে শৈশব থেকে তার জীবনে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ হয় নি। তার দাদারা তাকে বার বারই রাজনীতির বলির পাঠা বানাতে চেয়েছে। কিন্তু সুখেন কখনোই তাদের ফাঁদে পা দেয়নি।

সুখেন পর্যবেক্ষকের মতো সমাজের অপচয়িত অংশ পর্যবেক্ষণ করেছে। লেখক নিজেই যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন :

> আমি মধ্যবিত্ত জীবনের মেকি ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতা – আসলে আমি নিজেও এই মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কাজেই মধ্যবিত্ত জীবনের যে নোংরামি তা আমি একটা মস্তানের চরিত্রে ফুটিয়ে দেখাতে চেয়েছি, যে ছেলেটা আমার চোখের সামনে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ভদ্র পরিবারের ছেলেরা সব মস্তান হয়ে যাচ্ছে। মস্তান বলতে আনসোস্যাল এলিমেন্টস্‌, সমাজবিরোধী বলতে যাদের বুঝি, তারা কেন এই দিকে যাচ্ছে ? এইটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার *প্রজাপতি* লেখা।[৯৩]

সুখেন আপাত ভদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও গুণ্ডা। সুখেনের আত্মঅভিব্যক্তিতে জানা যায় ‘আমার নাম সুখেন, সুখেন্দু— সুখ যুক্ত ইন্দু, স্‌সুখেন্দু— বাপের নাম ভুলে যাবে সব, এমন নাম শুনলে। এর পরে কেউ বলবে না, আমি ব্যাকরণ জানি না। আমি সুখচাঁদ। অবিশ্যি সবাই বলে সুখেন গুণ্ডা। সামনে না, আড়ালে।[৯৪] সুখেনকে সবাই ভয়মিশ্রিত ভক্তি করে। সমাজের ওপরতলার মানুষেরা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। যেমন কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা চোপরা, মিত্তির সুখেনকে সমীহ করে। সুখেনের দৃষ্টিতে অনেকটা পোষা কুকুরের মতো খাতির করে। তাদের স্ত্রীরা সুখেনের সঙ্গ চায়। চোপরার বউ তাকে হ্যান্ডসাম বলে, মিত্তিরের বউ গায়ে আঙুল টিপে দেখে। হ্যালো সুখেন, ও সুখেন এই জাতীয় শব্দে তারা বুঝিয়ে দেয় সুখেনকে তাদের কত প্রয়োজন। তাদের অফিসের পিকনিকে সুখেনকে নিয়ে যায়। সমাজের এসব মুখোশপরা ভদ্রলোকদের সুখেন সহ্য করতে পারে না। তাই ভদ্রলোক সম্পর্কে তার মন্তব্য নেতিবাচক— সুখেন জানে ভয়মিশ্রিত ভক্তি এবং সমীহতে কোনো ভালবাসা নেই। তাই মিত্তিরের মেয়ে জিনার সাথে সে অশালীন আচরণ করে। অবশ্য জিনাই এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ‘মেয়েগুলোর মধ্যে কে যে চৌদ্দ, আর কে যে চব্বিশ, কারুর বাপের বলবার ক্ষমতা ছিল না। সাজগোজ আর পোশাকের বাহার কী ? যেমন ওদের খাই-খাই ভাব, তেমনি যারা দেখবে, তাদেরও খাই খাই

ভাব। তার সঙ্গে মায়েদের রেস তো ছিলই। ... উহ্‌রে বাবা, মিত্তিরের মেয়েটাকে নিয়ে ফ্যাক্টরি ওভারসিয়ার আইবুড়ো চ্যাটার্জী কী কাণ্ডটাই না করছিল। ওদিকে তো সালোয়ার কামিজের বুক পাছা ফেটে যাবার যোগাড়, কিন্তু খুকীটির কাকু কাকু বলে আদর কাড়বার কী ঘটা ! ... আর কাকুটিও তেমনি, যা তুলে নেবার তা তুলে নিচ্ছে। কখনো গাল টিপে দেয়, ঠোঁটে একটু টোকা মেরে দেয়, ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাঁকানি দেয়। ... কিন্তু বলতে যাও সুখেন নোংরা ইতর।[৯৫] জিনার আহবানে সুখেনের নিজের মনে হয়েছিল, 'আমিও তখন চ্যাটার্জি কাকু।[৯৬] আত্মবিম্বে নিজেকে দেখে তার মনে হয়েছে কুকুরগুলোর যেমন অবস্থা, সেই রকম অবস্থা হয়েছে তার। সে অনুভব করে তার মধ্যে পশু সত্তা আছে অর্থাৎ একটা কুকুর তার মধ্যে সংগোপনে বসবাস করে। সেই পশুসত্তার স্পর্শে জিনার মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছিল, মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, যেন নিশ্বাস নিতে পারছিল না।...কী বিচ্ছিরি হয়েছিল মেয়েটির গোটা চেহারা, মুখটা মনে হয়েছিল, একটা বয়স্কা মেয়েছেলের মুখ।[৯৭] এখানে জিনার প্রতি তার সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। জিনার কষ্টতে সেও কষ্ট পেয়েছে। জিনাকে ভ্রাতৃস্নেহে আখ খাইয়েছে। চ্যাটার্জির প্রতি ক্ষোভে, এবং সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণায় সুখেন জিনার সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

সুখেনের মাস্তান হয়ে ওঠা পার্টির প্রয়োজনে। কলেজে পড়ার সময় রাজনীতি করেছে। দেখেছে শিক্ষকদের অপরাজনীতি আর আত্মকেন্দ্রিকতা। শিক্ষকরা নিজেদের প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহার করেছে। পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করেও দলের ছেলে বলে সুখেন প্রথমে পার পেয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষকদের দলাদলির শিকার হয়ে বহিষ্কৃত হয়। সুখেন বহিষ্কৃত হয়ে শিক্ষকের সাথে অশালীন আচরণ করে, যা সমাজের নৈতিক স্খলনের পরিচয় বহন করে।

সুখেন শিখাকে ভালোবাসে। তার অপচয়িত জীবনে শিখাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। যদিও শিখার সুখেন ছাড়াও আরো অনেক কথিত প্রেমিক আছে। সুখেনের রাজনীতির সূত্রেই শিখার সাথে পরিচয়, প্রেম। শিখা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পঞ্চাশের দাঙ্গায় দখলকৃত মুসলমানের বাড়িতে তারা বাস করে। শিখা বারবনিতা নয়, কিন্তু তার বাবা নিজ প্রয়োজনে শিখা এবং তার দিদি বেলাকে ব্যবহার করে। শিখার দুই দাদা কেরানি। সুখেনের বিশ্বাস তারা অফিসের বেয়ারা, পিয়ন। শিখাদের বাড়িতে সমাজের ওপরতলার যেমন ডাক্তার, ব্যবসাদার অনেকেরই আড্ডা বসে। এদের অধিকাংশই আসে বেলার সাথে আড্ডা দিতে। এই তথাকথিত ভদ্রলোকেরা বাইরে সবাইকে বলে বেলার বাবা অর্থাৎ মি. মজুমদারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। এদের দেখে সুখেন মন্তব্য করে 'এই মাঝবয়সী বুড়োখচ্চরগুলো

কেউই বেলাদিকে বিয়ে করবে না, আমি জানি। ওদিকে তো সব ধাড়িগুলোরই ঘরে একটি করে ইস্ত্রি আর এক পাল বাচ্চা রয়েছে।[৯৮] এই তথাকথিত ভদ্রলোক সম্পর্কে সুখেনের মন্তব্য 'পতিতা পল্লিতে যেতে পারে না, তাই বেলার কাছে আসে। লোকে চরিত্রের দোষ দেবে না ? রোগের ভয় নেই ?[৯৯] সুখেনের সমাজ সচেতন মন এই বুড়োদের কারো সাথে বেলার বিয়ে দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চায়।

সুখেন নিঃসঙ্গ নায়ক। কিন্তু সে নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়। এক একদিন মাইরি, কী রকম ভয় করত। ... হয়তো দুপুরবেলা একলা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ আমার গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠত। বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠত। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। যেখানে বসে থাকতাম, সেখান থেকে উঠতে পারতাম না। মনে হত উঠলেই কেউ আমাকে ঘাড় মুচড়ে দেবে, চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।[১০০] মায়ের মৃত্যু, বাবার সংসার সম্পর্কে উদাসীনতা, দাদাদের ব্যক্তিগত ব্যস্ততা তাকে অসহিষ্ণু করেছে। বাড়ি সম্পর্কে তার মনোভাব 'বাড়িতে আসছি যাচ্ছি খাচ্ছি দাচ্ছি আবার বেরোচ্ছি।'[১০১] পরিবারবৃত্তের বন্ধনহীনতা তাকে পরিবার বিচ্ছিন্ন করেছে। পরিবারের প্রতি অনাস্থা থেকেই সে বাবার টেবিলের নিচে প্রসাব করেছে, দাদাদের ঘর এলোমেলো করেছে, বাড়িতে এসে মাতলামি করেছে। কলেজে গিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে দলবাজি করেছে। প্রেমের অভিনয় করেছে। এসব তার একাকীত্ব থেকে মুক্তির অপচেষ্টা মাত্র। সুখেনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে অবক্ষয়িত যুবসমাজের সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে।

সুখেনকে মানুষ করার জন্য তার বাবার চেষ্টার কমতি ছিল না। কিন্তু সমাজের প্রতি ঘৃণায় সে তথাকথিত ভদ্রলোক হতে চায়নি। সে তার বাবা এবং দাদাদের ঘৃণা করত। তাই তাদের দেখিয়ে দেওয়া পথে যায়নি। তার স্বেচ্ছাচারী মন বলেছে যেখানে আমার পোট খাবে, মাস্তানি চলবে, আমি সেই দলেই যাব।[১০২]

সুখেনের দুই দাদা দুই দল করে। বড় দাদা কংগ্রেস, মেজদাদা কমিউনিস্ট। রাজনীতি তাদের ভূষণমাত্র। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে তারা ব্যস্ত। নেতা হওয়ার নামে স্বেচ্ছাচারী আর নারীতে মগ্ন। সুখেনের আত্মকথনে জানা যায়, 'বড়দাতো তখন বেশ তুখোড় খচ্চর হয়েছে। মেজদাটা ভিন্নজাতের, হ্যাংলা কুকুরের মতন, যা পায় তাই খায়। না হলে ঝিয়ের সেই মেয়েটাকে খামচে আদর করে। ... বড়দার সবই বড় বড়, ও সব বাজে মেয়েটেয়ের ব্যাপারে নেই। শহরের বেশ ভাল ভাল ঘরের মেয়েদের সঙ্গেই ওর আঁশনাই, সেখানেই ওর যাতায়াত। সে সবই ওর রাজনীতির দলের ব্যাপার, ওদের দলে আছে।'[১০৩]

সুখেনের পড়ুয়া মন ছিল, জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবনা ছিল। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের স্ববৃত্তায়ন, শিক্ষকদের অপরাজনীতি তাকে পড়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে। পড়ার টেবিলে বসে সে অন্যমনস্ক হয়। ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্নতায় তার সদর্থক চিন্তাগুলি সংগঠিত হয়নি। ভয়, নিঃসঙ্গতা, অনিশ্চয়তা ক্রমশ মানসিক সক্রিয়তাকে অসাড় করে দেয়। তার সামনে দুটো পথ খোলা থাকে। পলায়ন না হয় সদর্থক দিকটির সংগঠন। শেষের পন্থা গ্রহণ এই সমাজে ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।[১০৪] সুখেন তাই নিঃসঙ্গতার পরিপূরক হিসেবে যৌনসঙ্গী কামনা করে। অথবা মাস্টারবেশনে আত্মতৃপ্তি খোঁজে। সমরেশ বসু অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে সুখেনের অবক্ষয়ী চেতনার আঁধারে এ বিষয়গুলো মিলিয়ে দিয়েছেন। সুখেনের শ্রেণির অবক্ষয় এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অনুধাবন করতে যা সহায়ক হয়েছে।

সুখেন তার ভঙ্গুর সমাজে সম্পূর্ণ বেমানান। তাই অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা দেখলে তার নিজেকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে। কোনো ব্যক্তি যখন ভোগীর স্তরের ইন্দ্রিয়শক্তির নিস্ফলতা, সন্দেহ, হতাশা ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়, তখনই সে নিজেকে নির্বাচন করে। তখনই সে নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়।[১০৫] সুখেন চারিদিকের নিস্ফলতা দেখে আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি এ জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ক্রমেই তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। সার্ত্রে বলেছেন, মানুষ প্রথমে অস্তিত্ব পায়, তারপর ঠিক করে সে কী হবে, তার হয়ে ওঠা তারপর শুরু হয়। এবং সেখানে পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে যেমন মুক্তির ইচ্ছা তেমনি বাঁধা পড়বার দশা।[১০৬] সুখেন বহুবার তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন তাকে পৃথিবীতে এনেছে। সুখেনের বাবা এ প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর থেকেছে। মানুষ যেহেতু 'স্বহেতু সত্তা' তাই ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে নিজেকে তৈরি করে।[১০৭] যে কারণে সুখেন ঠিক করে সে তার বাবা কিংবা দাদার মতো হবে না। শৈশবে জ্ঞানী-গুণী বিদ্বান হওয়ার ইচ্ছা তার কাছে শেখানো বুলি মনে হয়। সে যেহেতু নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি তাই তার যা ইচ্ছা তাই করবে। কিন্তু সেখানেও সে অসহায় :

> আমার যা করতে ইচ্ছা হয় তা-ই আমি করে করব, আমি যদি মনে করি কারখানার ম্যানেজার চোপরার মাইনে মজুরদের মতোই করে দেব, আর মজুরদের মাইনে চোপরার মতো, তাহলে কেউ শুনবে না; একমাত্র ঠ্যাঙানি খাব, তাহলে আলাদা কথা। সেই রকম ইচ্ছার কথাই বলছি, আমি নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি।[১০৮]

সুখেনের আত্মজিজ্ঞাসা তাকে সবার থেকে আলাদা করে। শিখাকে কেন্দ্র করে চিন্তাগুলোকে একীভূত করার চেষ্টা করে। জীবনকে ভালোবাসতে শেখে। সে কখনোই শিখাকে ছেড়ে দিতে চায় না। কলেজে অনশনের সময় শিখাকে দেখে তার মনে হয়েছিল এমন একটা সুন্দর মুখ আমি জীবনে কোনও দিন দেখিনি মাইরি ।[১০৯] শিখার সান্নিধ্য কামনা করে। 'একটা কুকুরের মত প্রায়ই ওর পেছনে লেগে আছি,

তা বলে কি আর এদিক ওদিক টাক মারিনি, না শিখাই মারছে না, তবু শিখাকে আমি ছাড়তে পারছি না।'[১১০] শিখার প্রতি প্রেম সুখেনের মনে সাময়িকভাবে পরিবর্তন আনে। অবচেতনে সে শিখাদের বাড়িতে চলে যায়। সুখেন কারখানার ম্যানেজার চোপরার কাছে চাকরি চায় শিখাকে বিয়ে সুখী দাম্পত্যজীবনের প্রত্যাশায়। চোপরা নিজেদের স্বার্থে তাকে ফিরিয়ে দেয়। সুখেনের ইতিবাচক ভাবানারতো কোনো মূল্য তার কাছে নেই। সদর্থক ভাবনা থেকে সুখেন স্কুলশিক্ষক নিরাপদ বাবুর মত সাধারণ মানুষ হবার স্বপ্নে বিভোর থাকে :

> লোকেরা কী না বলে, বলুক গে, আমি তো জানি, লোকেদের বলার থেকে শিখা অনেক বেশি, অনেক বড়, কারণ ও যদি আমাকে মাস্টারমশায়ের বউয়ের মতন ভালবাসে সেখানে কোনও লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই, আর আমি চাকরি করি— আমাদের কয়েকটা ছেলেমেয়ে— আমি একটা সাধারণ মানুষ— কী রকম সেই অনশনের দিনের মতো মনে হচ্ছে, খবরদার আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না— কাজ করি, খাই বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি ... ।[১১১]

শিখার বাড়ির অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা সুখেনের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। শিখার প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহ থেকে মুক্তি পেতে শিখাকে পীড়ন করে। শৈশবে মায়ের চরিত্রের নঞর্থক দিক তার মধ্যে নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করে। শিখার একাধিক বন্ধুর অস্তিত্ব থেকে তার মধ্যে বিকৃত ভাবনার জন্ম নেয় :

> কোথায় সুখ, স্সাহ, কে জানে, সুখের আমি কিছু জানি না, বুঝি না, অনেকটা তো মনে হচ্ছে, বাবার টেবিলের তলায় নোংরা করে দেবার মতোই যেন কিছু করছি ... অথচ আমি তো ওকে আদর করতেই চেয়েছিলাম। কী যে করছি, কিছুই যেন জানি না, বুঝতে পারছি না, কেবল একটা ভীষণ রাগ, ভীষণ আক্রোশ, অথচ একটা কী বলব অদ্ভুত যন্ত্রণা, যেন চোখে জল এসে পড়বে খুব জোরে কোথাও লাগলে, যেমন দাঁতে দাঁত চেপে রাখতে গিয়ে জল এসে পড়ে।[১১২]

শিখাকে সে বিয়ে করতে চেয়েছে আর তখনই তার মনে হয়েছে শিখা এঁটো, তার দাদারা শিখাকে ব্যবহার করেছে। বিয়ে এমন একটা বিষয় যেখানে একজনকে নির্বাচন করতে হয় চিরতরের জন্য। বিয়ের ভিত্তিমূলে থাকে ভালোবাসা এবং একটা স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। বিয়ের গুরুত্ব নির্ভর করে মনের ভাবের উপর, নিজ দায়িত্ব পালনের সচেতনতার উপর, যে সচেতনতা বা মনের ভাব দুজনকে একটা স্থায়ী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে।[১১৩] সুখেন তার সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে শিখাকে বিয়ে করে সাধারণ মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু সুখেন তো গুণ্ডা। ইচ্ছা করলেই সাধারণ মানুষ হয়ে সে বাঁচতে পারে না। কারখানার বড়দা, মেজদা, চোপরা, মিত্তির সবারই তাকে প্রয়োজন। সুখেনের নৈতিক মন যখন সমাজের বিশৃঙ্খখলার সাথে তাল মেলাতে পারে না, তখন সুখেন ভয় পায়। সব কিছু হারানোর ভয়। তাই শিখাকে বলে 'জান

শিখা, ছেলেবেলা থেকে— না, আমার— না, আমার কীরকম একটা ভয় ভয় ভাব আছে, আমি কোনদিন কাউকেই বলিনি, কী রকম একলা একলা থাকলে— মানে একা একা লাগলে, বুক গুরগুরিয়ে ওঠা একটা ভয় হয়, তখন আমি চেচামেচি করি, যা-তা ... ।[১১৪]

চোপরার প্রত্যাখ্যানে সুখেন অপমানিত হয়। হতাশা, শূন্যতা তাকে পেয়ে বসে। নিজেকে সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবে। এই বোধ থেকে সে বমি করে দেয়। অসুস্থ সুখেনকে শিখা সেবা করে। সুখেন এই শিখাকে চায়। যার প্রতি তার আর কোনো সন্দেহ, অবিশ্বাস থাকবে না। সুখেন তিনজন মানুষকে শ্রদ্ধা করে। শিক্ষক নিরাপদ বাবু, পুরাতন ভৃত্য গুলাদা যে তাকে মাতৃস্নেহে আগলে রাখে, আর পূর্ণেন্দুর দলের লোক বচন ক্যাওরা। যার দর্শনে সুখেন বিমোহিত হয়। সে সুখেনকে বলেছিল— অনেক দিন তো দেখলাম, দিন একরকম যায় না। গায়ে ঘা থাকলে একদিন সে ধরা পড়েই।[১১৫]

সুখেন বুঝেছিল চোপরার কারখানায় তার চাকরি হবে না। তাই সে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হতে চেয়েছে। সৌম্য, শান্ত, আদর্শবান জীবন বেছে নিতে চেয়েছে। সুখেনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সমাজের সার্বিক অবক্ষয়ে যেহেতু সে আপোসকামী নয় তাই সে বাঁচতে পারেনি। রাজনৈতিক দলের মিছিলের মাঝে পড়ে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে অবচেতনায় সে ফিরে গিয়েছে ডানা ভাঙা প্রজাপতিটার কাছে— 'আমি ঠিক আমার মতোই বাঁচব, খাবার খুঁজে খাব— মানে, প্রজাপতির দুবার জন্ম হয়, আমারও সেই রকম হবে— আমি— অন্য মানুষ হব— এই ছেলেটা আর না, শিখা যেমন চেয়েছিল, সেইরকম।...কিন্তু শিখা, এত করে, তোমাকে ডাকছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না নাকি। দেখছ আর পারছি না ডাকতে, আর ডাকতে পারছি না। আমি শুধু ওর চুড়ির শব্দ পাচ্ছি, ঠিন ঠিন ঠিন। ... শিখা হাতটা সরিয়ে নিও না, কোথাও যদি হাত রাখবার জায়গা না থাকে, তবে রক্তেই রাখ, রক্তেই রাখ— না না হয়।[১১৬] সুখেনের মৃত্যু তার শূন্যতাবোধের অবধারিত অভিশাপ ।[১১৭] নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি। সুখেন তার আত্মকথনে মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা, দুর্নীতি, প্রতারণা, প্রবঞ্চণা, কালোবাজারি, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মুখোশ খুলেছে। তাই চরিত্রটি সবদিক থেকেই সমাজ সত্যের দাবীতে, নিজস্ব শ্রেণিবিচারে সার্থক।[১১৮]

সুখেনের বড়দাদা কেশব শহরের নবীন নেতা। প্রকাশ্যে শহরে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেয়। গোপনে চোলাই মদের ব্যবসা করে, রেলের ওয়াগন চুরির ভাগ নেয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে, সুদর্শন, বাইরে ভদ্রলোক। সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষায় সর্বদা সচেতন। কিন্তু ভেতরের চেহারা কুৎসিত কদর্য। সুখেনের কথায় জানা যায় :

...শুধু মেয়েরা না, অনেক বউ, যুবতী বিবাহিতারাও ওর কাছে আসে, আড্ডা দেয়। এত মেয়ের ধকল ও সামলায় কী করে, কে জানে। এদিকে তো ছোটখাটো নরম নরম মানুষটি দেখলে মনে হয়, ভাজার মাছটি উলটে খেতে জানে না। জানে না আবার ! আমি নিজের চোখে দেখেছি নন্দ ডাক্তারের মেয়ে কৃষ্ণাকে ওর ঘরের মধ্যে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমো খাচ্ছে। কেন, শুধু তাই কেন, কলেজের লেকচারার রামকেষ্ট বাবুর নতুন বিয়ে করা বউকে–বেশ সুন্দর বউটা, লেখাপড়া ভালই শিখেছে, তার ওপরে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের দাগ, সিঁথেয় আর কপালে, তাকে নিয়ে বেল্লেল্লাপনার আর বাকি রেখেছে কী।[১১৯]

কেশবের কাছে ব্যক্তিস্বার্থটাই বড়, দেশ কিংবা আদর্শ বলে কিছু নেই। নিজের স্বার্থে সে সুখেনকে দলে টানতে চেয়েছে। সুখেনের নীরবতায় সুখেনকে শাসিয়েছে।

সুখেনের মেজদাদা পুর্ণেন্দু থার্ড ডিভিশনে পাস করে কারখানায় একটা বিভাগের প্রধান হয়েছে। পেশাগত জীবনে অসৎ দুর্নীতিগ্রস্ত। মার্কসবাদের ধ্বজাধারণ করে পার্টির ওপর অন্ধ আনুগত্য দেখিয়ে ভণ্ডামি করে। তার হাত দিয়ে কোম্পানি গরিব চাষিদের কাছ থেকে আটাশ বিঘা জমি কেনে। প্রত্যেকের কাছ থেকে আট হাজার টাকা আত্মসাৎ করে। রাজনীতি তার কাছে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। তাইতো সুখেন ব্যঙ্গ করে বলে— 'ঘরের আলমারিতে গিয়ে দেখ, স্কচ হুইস্কির বোতল লুকানো রয়েছে। এখন আবার বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাকি পুরো রাজনীতিই করবে, ইলেকশনে দাঁড়াবে, উহরে সসাহ, আরও মারাত্মক।'[১২০] পূর্ণেন্দু সুবিধাবাদী। ভদ্রতার ভান করে সমাজের নীতি নির্ধারক হয়েছে। সে জৈব জীবনে বিকারগ্রস্ত। মানুষের জৈব অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত আছে বিকারের বিচিত্র বিন্যাস।[১২১] সুখেনের ভাষ্যে : 'মেজদাটা ভিন্ন জাতের, হ্যাংলা কুকুরের মতন; যা পায় তাই খায়। না হলে ঝিয়ের সেই মেয়েটাকে কেউ খামচে আদর করে।[১২২] আমাদের সমাজ বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক সমর্থন করে না। বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্কে মিশে থাকে পাপের অনুভূতি ও অনিবার্যভাবেই অপরাধ ভাবনা।[১২৩] কিন্তু যৌনতার স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে পুর্ণেন্দু কিংবা কেশবের মনে কোনো পাপবোধ নেই। কেশব আর পূর্ণেন্দু সমাজের গভীরে প্রোথিত অন্তর্লীন বিকার আর বীভৎসতার প্রতিরূপ। এই দুই ভাইয়ের অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যানধারনা এবং সামাজিক মর্যাদা পরস্পরের অনুরূপ। তাদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশী সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যই প্রতিভাত হয়।

সুখেনের সমাজে সবাই অসৎ। ফিলিং স্টেশনের মালিক চোরাই তেল বিক্রি করে, জুয়েলারির দোকানে চোরাই সোনা বিক্রি হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চুরি করে, একদল অসৎ লোক স্কুল ফাইনালের প্রশ্ন ফাঁস করে বিক্রি করে। ডাক্তার সেবার চেয়ে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত :

একটু-আধটু শরীর খারাপ হলে ওকেই দেখাই, ওষুধও দেয় বিনা পয়সাতেই। সেই একই ব্যাপার, গুণ্ডাটাকে হাতে রাখার জন্যে। সবাইকে হাতে রাখার জন্যে যা যা দরকার, সবই করতে হয়, ওটাও বোধহয় বিজনেস ট্যাকটিস, কিন্তু এদিকে হাতে রাখতে গিয়ে কাদের ঘাড়ে যে কাঁঠাল ভাঙা হচ্ছে, তাও তারাই জানে, যারা কোমরের কষি থেকে ঘামের গন্ধ লাগা চটচটে টাকাগুলো তুলে নিচ্ছে। পাঁচের জায়গায় দশ, দশের জায়গায় কুড়ি নিচ্ছে, নেবেই, ওদিকে দাতব্য করতে গেলে, এদিকে টান না মারলে চলবে কী করে। [১২৪]

শিখার দুই দাদা কেরানি। নগরের নির্মোহ বাতাবরণে তারা সুখেনের দুই দাদার দলের অনুসারী। ‘তারা আসলে বুলি আর তেল দেওয়া, নচ্ছারিপনা জানে।’[১২৫] এদের দিয়েই কেশব, পুর্নেন্দুর দল চলে। গরিবরা যা পারে না, এরা তাই পারে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিবাহ উপযুক্ত বোনেদের বিয়ে দেয় না।

শিক্ষা বিভাগের আরেক কেরানি রমেশ। যার চরিত্র সম্পর্কে সুখেন বলে ‘সব সময় কাঠি দিয়ে দাঁত খোটে, আর শকুনের মতন এদিক ওদিক তাকায়।’[১২৬] শিক্ষকদের বেতনের টাকা থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে। প্রয়োজনে ঘুষ খায়। রাজনীতির আশ্রয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। রাজনীতির মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা দেয়— ‘ভাই, বন্ধুগণ, মহকুমা শাসকের এই জুলুমের জবাবে আমরা আগামীকাল আমাদের সমস্ত মহকুমাব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছি।’[১২৭] সুখেনকে ব্যঙ্গ করে। রমেশের চরিত্রে মধ্যবিত্তের আদর্শগত অসঙ্গতি প্রকাশিত।

শিক্ষক যশোদাবাদী সিপিআই-এর সমর্থক। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ছাত্রদের ব্যবহার করে। সুখেনের মতো গুণ্ডাদের লালন করে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর আড়ালে তিনি ভণ্ড প্রতারক। উপন্যাসে আরো একটি চরিত্র শুটকা। যার প্রকৃত নাম মৃন্ময় গুপ্ত। সুখেনের মতই মস্তান। বেশি সুবিধার আশায় পুর্ণেন্দুর দলে যোগ দেয়। যুব সমাজের অবক্ষয়ের শিল্পরূপ শুটকা চরিত্র।

সুখেন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চরিত্র। শৈশবে মাকে হারিয়েছে, পিতা আপন ব্যক্তিত্বে হয়েছে দূরবর্তী ভুবনের মানুষ। দাদাদের স্নেহ বঞ্চিত শৈশব, কৈশোর কেটেছে নিঃসঙ্গ পরিমণ্ডলে। ফলে সমাজের সামষ্টিক অস্তিত্ব তার কাছে অর্থহীন। তাই সে আপোষকামী না। তার ব্যক্তিত্বে তার কথোপকথনে ফুটে উঠেছে সমাজ অসংগতির ছাপ। শৈশবে দেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, এক স্বৈরিণীকে মাতাল আমেরিকান সৈনিকের ধর্ষণের দৃশ্য তাকে পীড়িত করে। উত্তর জীবনে সমাজ অসংগতি তাকে দ্রোহী করে। তাই তার ভাষা কদর্য, ভঙ্গি অশ্লীল :

> এই এই যে দ্যাখ, এই দ্যাখ বলে প্যান্টের বোতাম খুলে দেখিয়েছিলাম। মাইরি, লোকটা ভাবতেই পারেনি, ওরকম একটা কাণ্ড কেউ করতে পারে, প্রথমটা থতমত খেয়ে দিয়েছিল, আর পাগলের মতো ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, ‘আই উইল সি ইউ রাসকেল।’ আমি বলেছিলাম, ‘আরে যা যা, পেদিয়ে খাল খিচে দেব।’ স্যারটি দৌড়ুতে দৌড়ুতে প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে গিয়েছিল, আমিও বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাওয়া।[১২৮]

ভাষার এই নেতিবাচকতা ইতিবাচকতায় উত্তীর্ণ হয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার ভাবনার টুকরো টুকরো স্রোতে:

> কী? কী? কীরকম বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, কিছু দেখতে পাচ্ছিনা, মনে হচ্ছে চোখ কিছু বাঁধা, আর একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ পাচ্ছি, আর গোটা শরীরটা যেন একটা টনটনে ফোঁড়ার মতন। বাবার গলা শুনতে পাচ্ছি, ‘তুমি বলতে চাও তোমার দল মারেনি? না। আপনি নিকুকে জিজ্ঞেস করুন, ওরাই টুকুকে বোমা ছুড়ে মেরেছে। তা নইলে আমি হাসপাতালে আসতাম না।’

মেজদার গলা শোনা গেল, 'হাসপাতালে তো আমিও এসেছি। টুকুকে তোরাই তো মেরেছিস।'

ওরা আমাতে এখনও টুকু বলছে— মানে আমি তো সত্যি ওদের ভাই।...আমি শিখার গলা শুনতে পেলাম...আমি শিখাকে ডাকছি, শব্দ করতে পারছি না। তারপরেই হঠাৎ শিখা বলে উঠল 'ডাক্তারকে ডাকা দরকার, মনে হচ্ছে জ্ঞান হয়েছে, কী রকম শব্দ হচ্ছে গলায়।...ছাই হচ্ছে আমি তো তোমাকেই ডাকছি, তোমাকেই শিখা শিখা শিখা।...আরে এটা কার মুখ মায়ের নাকি— হ্যাঁ, তাই তো— আরে মায়ের পাশে একটা জ্যান্ত লোক, সেই বচন ক্যাওরার মুখটা দেখতে পাচ্ছি যেন, কী রে বাবা।...শিখার গলা আবার শুনতে পেলাম, ... কিন্তু শিখা, এত করে, তোমাকে ডাকছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ নাকি। দেখছ, আর পারছি না ডাকতে, আর ডাকতে পারছি না। আমি শুধু ওর চুড়ির শব্দ পাচ্ছি, ঠিন ঠিন ঠিন। শিখা হাতটা সরিয়ে নিও না, কোথাও যদি হাত রাখবার জায়গা না থাকে, তবে রক্তেই রাখ।[১২৯]

এই উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে সমরেশ বসু বলেছেন— এই রকবাজ ছেলেরা যে ভাষায় কথা বলে এখানে সেই ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। তার মুখে যদি মার্জিত ভাষা বসিয়ে দেওয়া হতো, তাহলেই উপন্যাসটি ব্যর্থ হতো। উপন্যাসটি এতে বাস্তবধর্মী হয়েছে।[১৩০] লেখক সমাজ-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৃহত্তর বিষয়গুলো বোঝাতে জগাখিচুড়ি ধরনের সাধু-চলিতের মিশ্রণ করেছেন। প্রচলিত ভাষিক ফর্মের বাইরে এ উপস্থাপনা কাহিনির গতি ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।[১৩১] সমাজ গভীরে অবস্থিত ক্ষতস্থান চিহ্নিত করতে এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে লেখক সফল হয়েছেন। যেমন :

দেবতা মানেই স্‌লা গজুরাম হরেরাম পূজারি। সে-ই সব। এইসব পূর্ণেন্দু কেশবরাও তা-ই যেন। যেমন পূজারিই মন্দিরের মালিক, সে-ই সব পাইয়ে দেয়, এ খচ্চরগুলোও সেই রকম, ওরাই যেন দলের সব। পূজারির মন্দিরের মতো দলটাও ওদের দখলে, ওরা যেমন মন্দির চালাবে, তেমনি চলবে। স্‌সাহ, গোপালঠাকুর।[১৩২]

যুবসমাজের অন্তর্লীন অবক্ষয় ধরা পড়েছে উপন্যাসে ব্যবহৃত অপভাষায়। সুখেন গুপ্ত তাই তার ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায় :

ক বেলাদিরই বা এত চুলবুলোনি কেন যে, আমাদের সঙ্গেও তাল দিতে হবে।[১৩৩]

খ. বোকচন্দর হই আর যা-ই হই, ওর মধ্যে কী যেন একটা আছে।[১৩৪]

সমরেশ বসু সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুর্বলতা এবং প্রকৃত আশ্রয় কোথায় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।[১৩৫] তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই স্বাধীনতাপরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্তের নীতি বিবর্জিত জীবনকে তুলে ধরলেন *প্রজাপতিতে*। সমস্ত উপন্যাসটি সুখেনের আত্মোপলব্ধির স্বরূপ। সুখেন তার পারিপার্শ্বিকতা বোঝাতে কদর্য ভাষা এবং যৌনতার আশ্রয় নিয়েছে। সর্বোপরি রাজনীতিবিদরা কীভাবে সন্ত্রাসের জাল ছড়িয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চেয়েছে, মদ-হুইস্কির কালচারে নাগরিক মধ্যবিত্ত কীভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে, ব্যক্তির Sense of value কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেছে তারই অন্তর্বয়ন *প্রজাপতি*।

স্বীকারোক্তি

স্বীকারোক্তি উপন্যাসে দুটো অংশ। প্রথম অংশটি নায়কের স্বগতভাষণ। যেখানে সে পরিপার্শ্বের অস্বাভাবিকতাকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় অংশের নাম 'অস্বীকার'। এই অংশটি নায়কের নিঃশঙ্কচিত্ত স্বীকারোক্তি। *স্বীকারোক্তি* উপন্যাস সম্পর্কে লেখক স্বীকার করেছেন :

> 'যার কণ্ঠস্বর ছিল না উচ্চ, দৃষ্টি আকর্ষণকারী তীক্ষ্ণ ঝলক, কারণ উত্তম পুরুষে লিখিত, উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের সকল স্বীকারোক্তি ছিল এক যন্ত্রণাকাতর নৈঃশব্দ্যে ভরা। যে আবিষ্কার করেছে, তার দু–হাত কত শক্ত, যে হত্যা করেছে তার স্ত্রীকে। অফিসের বসকে নিজের পলিটিকাল পার্টির নেতাকে গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে সুখে বেহিসাবী গাড়ির চালককে, পথের বাধা অক্ষম পথচারীকে এবং তার শেষ লক্ষ্য ছিল, হৃদয়ের একমাত্র আশ্রয় প্রেমিকের প্রতি, যা সে পারেনি। জীবনের যা কিছু সে অতি প্রার্থিত রূপে পেয়েছিল, তার সব কিছুই সে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, কারণ বিশ্বাস ও জাগতিক জীবনের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো হত্যাই সে করেনি।'[১৩৬]

নায়ক তার তিরিশ বছরের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে আগ্রহী। নায়কের একান্ত ভাষণে জানা যায় তার প্রাণটি অন্য পথে যাত্রা করেছে। সে যাত্রাকে কেউ শুভযাত্রা বলবে না নিশ্চয়ই এবং সে কথা বলবার জন্যেই আমার লিখতে চাওয়া।[১৩৭] নায়কের স্বগত ভাষণে তার পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবন, প্রেম, রাজনীতি এবং বিপর্যস্ত সমাজের মূল্যবোধের ভাঙন সম্পর্কে জানা যাবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এগুলোর আধিক্য সমাজকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দেয়। সমরেশ বসু যখন মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যবচ্ছেদ করেছেন সেখানে ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, অস্থিরতা সহজেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী প্রভাবশালীর আধিপত্যের কাছে ব্যক্তি কখনো কখনো নিঃসহায় বোধ করেছে। নিঃসঙ্গ অস্তিত্বহীন ব্যক্তি তখন পরিপার্শ্বকে গলা টিপে হত্যা করে অস্তিত্ববাদী হতে চেয়েছে। *স্বীকারোক্তি*র নায়ক এরকমই একজন। *বিবর, পাতকের* মতো নামহীন নায়ক। তবে উপন্যাসে দু-এক জায়গায় তার ডাকনাম ভাকু বলে জানা যায়। ভাকু সম্পর্কে নায়কের অভিব্যক্তি— ভাকু আমার ডাকনাম, কেন যে এরকম একটা ডাকনাম আমার রাখা হয়েছিল জানি না। আপনার কি মনে হয় না, নামটা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো শোনায়।[১৩৮]

নায়ক তার আত্মগত সংলাপ বাবা-মা বোন কাউকেই বলতে পারে না। কারণ সে পরিবারের বন্ধনে থেকেও পরিবারবিচ্ছিন্ন, তার প্রয়াত বাবা তার স্বগত সংলাপ শুনে কষ্টই পেত। বৃদ্ধা মায়ের কাছে সে অনেকটাই অপরিচিত। জন্মদাত্রী মা তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত। অসৎ আর শঠতাপূর্ণ জীবনের ইতিবৃত্ত তার মাকে বেদনাহত করবে। তাই সে মাকে বলতে পারে না। তার বোনেরা তার মর্মলোকের সন্ধান জানে না। তাই বোনেরা তার একোক্তি শুনলে শঙ্কিত হতে পারে। স্ত্রী দীপার সাথে প্রথাগত

স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক। নারী পুরুষের স্বাভাবিক জৈবজীবন সম্পর্কে নায়কের কোনো জিজ্ঞাসা নেই। কিন্তু তার কিছু নিজস্বতা আছে। স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কবিষয়ক ভাবনা থেকে জানা যায়— 'আচ্ছা আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর সম্পর্ক কী? না, সবাই জানে, আপনিও জানেন, সম্পর্কের দিক থেকে আপনারা স্বামী–স্ত্রী। কিন্তু সেই সম্পর্কের সঙ্গে এবার আপনি আপনাকে মেলান, আপনার মনকে জিজ্ঞেস করুন, সেখানে আপনার যোগাযোগটার স্বরূপ কী? আসলে তিনি এবং আপনি, আপনারা নিজেদের মতো চলতে চাইছেন, কিন্তু রিলেশনের কথা ভেবে, আপনারা একজন আর একজনকে তা করতে দিতে চাইছেন না, অতএব সংঘর্ষ যাকে বলে অনিবার্য, তাই হয়ে উঠছে।'[১৩৯] নায়ক দীপাকে কিছু বলতে পারে না। কারণ তার হত্যার তালিকায় দীপা আছে। আত্মীয়, পরিজন-বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে আত্মন্মোচন করতে পারে না। নায়কের যে সমস্যা তা তার একান্ত ব্যক্তিগত। বন্ধু সেখানে সহায় হতে পারে না।

নায়ক একজন খুনি। চারপাশের অসামঞ্জস্যকে সে হত্যা করে। স্ত্রী, অফিসের বস, আদর্শিক নেতা, পথচারী, বেহিসেবি গাড়ির ড্রাইভার এবং প্রেমিকাকে সে খুন করে। এই খুন সম্পর্কে তার কোনো অপরাধবোধ নেই। অপরাধ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যাটি এরকম— যে অপরাধ করে তার যদি অপরাধ বোধ থাকে, তাহলে তার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু যার বোধই নেই সে বুক ফুলিয়ে বলবে 'আজ পর্যন্ত কোন অপরাধ করিনি।'[১৪০] এই খুন সম্পর্কে সে নিজের মতো করে অনেকগুলো ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। যেমন 'পেশাদার খুনি খুন করে, কারণ এটি তার কাজ, রাষ্ট্রনায়কেরা খুন করে নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য।'[১৪১] আর নায়ক খুন করেছে বিবর থেকে মুক্তির জন্য। নায়ক কখনোই আত্মপ্রবঞ্চক জ্ঞানপাপী হতে চায়নি। এই প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আত্মপ্রতারণার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অনেক ভদ্রলোক মদ খান, কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েকে লুকিয়ে। নায়ক সেরকম নয়। মদ খাওয়া সমাজের চোখে অপরাধ। নায়কের ভাষ্য মতে, 'মদ্যপানের থেকে খুনটা নিশ্চয় আরও বড় অপরাধ,'।[১৪২] এই অপরাধ জেনেও সে খুন করে। 'আমি স্রেফ কলকাতার একটা দেশি কোম্পানির কাগজকাটা হাতলসুদ্ধ এক ফুট ছুরিটা, মোড়া ঘাড়ের পিছনে শিরদাঁড়াটা যেখানে মিট করেছে, সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।[১৪৩]

টোটা চাটুর্যে নায়কের রাজনৈতিক আদর্শের নেতা। নায়কের জাগতিক জীবনের পরিত্রাতা। নায়ক কলেজ থেকেই রাজনীতি করে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে শিক্ষাজীবনে রাজনীতি করবে এটাই স্বাভাবিক। পড়ার মতো রাজনীতিও তার কাছে আবশ্যিক বিষয়। তারুণ্যধর্ম থেকেই নায়ক রাজনীতিতে আসে। মাত্র আঠারো উনিশ বছর বয়সে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়। স্কুলে মিছিলে যাওয়া, ধর্মঘট করার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। টোটা চাটুর্য্যের বাগ্মীতা, আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে। রাজনীতিতে সক্রিয়ার

পেছনে তার রোম্যান্টিকতা এবং আদর্শবোধ কাজ করেছিল। কর্তৃত্ববাদী টোটা চাটুর্য্যে নায়ককে ব্যবহার করত। নায়ক টোটার পিকআপ শব্দটাই এখানে চলে। সে নিজেও তাই বলত তোকে আমি পিকআপ করেছি।[১৪৪] এর বিনিময়ে নায়ককে শাহ্-এর কোম্পানিতে ম্যানেজারের চাকরি দিয়েছিল। নায়ক জানে যারা কেবল দুর্বলতাই খুঁজে বেড়ায় এবং সেই সুযোগে তাকে কবজা করে, তার মানে ওটাই তার ক্ষমতার মূলধন।[১৪৫] সেই মুহূর্তে নায়কের চাকরির ভীষণ দরকার ছিল। চাকরি এবং টোটা চাটুর্য্যের দাস হয়ে নায়কের কখনো কখনো নিজেকে বংশবদ কুকুর[১৪৬] মনে হতো। টোটা চাটুর্য্যে ক্ষমতার বলয়ে সবাইকে আবদ্ধ রাখত। অন্তর্দলীয় কোন্দলে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। প্রত্যেক বড় নেতার নিজস্ব চক্রব্যূহ ছিল। তার মধ্যে 'একটা আর একটাকে এলিমিনেট করে। নয়তো নিজেরা তাকে এনে, ওই যে সেই চাবির কথা বলছিলাম, সেইভাবে আটকে রেখে নিজের কাজ করিয়ে নেয়।[১৪৭] টোটার চক্রটি ছিল শক্তিশালী। নায়ককে শেখানো হয়েছিল পার্টির অভ্যন্তরে সবাইকে বিশ্বাস না করতে।[১৪৮] একই আদর্শের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তিতে নায়ক অসহায় বোধ করেছিল। কিন্তু তাকে বোঝানো হয়েছিল দলের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত তাদেরই ভিতরের কাজে নেওয়া হয়।[১৪৯] নায়ককে গুপ্তচরের কাজ দেওয়া হয়েছিল। নায়ক অনেকটা বাধ্য হয়ে এই জাতীয় আলগা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

পার্টির অভ্যন্তরে নায়ক দেখেছিল রাজনীতির অসারতা। সেখানে রাজনীতি আর রাজনৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। দুটো বিষয় এক করতে যাওয়া বোকামি। নায়ককে তিনি বুঝিয়েছিলেন— 'দেশের কাজ মানে, সকলেই যে বাইরে ঘুরে বেড়াবে, বক্তৃতা দেবে, তা নয়, ভিতরেও অনেক কাজ আছে, এবং আসল রাজনীতি বোধ হয় সেটাই। ভিতরে ভিতরে যেগুলো ঘটছে সত্যি বলতে কি, বাইরে আমরা যা দেখি বা শুনি বা পড়ি, সেগুলো কিছুই না, সেগুলো হচ্ছে অনেকটা ম্যানুফ্যাকচার, আসলে মেশিনটাই সব, মেশিনারি যাকে বলে আর সেটা যাদের হাতে থাকে, তারাই আসল লোক [১৫০] নায়ক টোটা চাটুর্য্যের চক্রের লোক ছিল। টোটার চক্রটি সব থেকে শক্তিশালী ছিল। নায়ক জেনেছিল দলের সবাই শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। অধিকাংশই সুবিধাবাদী। নায়কের কর্মক্ষেত্রের বস টোটার অনুগত। টোটাকে তিনি ভয় পেতেন। টোটাদার কারণে তিনি পার্টির লেবাস লাগিয়ে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে পার্টি ল্যাসের কাছ থেকে সুবিধা নিত। নায়কের সাথে তার বস ল্যাসের সুসম্পর্ক ছিল না। নায়ককে দিয়ে অনৈতিক কাজ করানো হতো। নায়কের জবানিতে জানা যায় :

> কিন্তু ভাববেন না, আমি তাতে খুব লাভবান হয়েছিলাম। আমার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছিল নিশ্চয়ই, কাজ বেড়ে গিয়েছিল অনেক, কারণ টোটাদার যে কোনও দরকারেই আমার বস আমাকে ছেড়ে দিতেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর অফিসের কাজ ষোলো আনাই পুষিয়ে নিতেন, আর সত্যি বলতে কী, সে সব কাজগুলোকে যাকে আমরা ফেয়ার বলি, তা ছিল না। অবিশ্যি, এ কথা ঠিক, এখন তো বুঝতে পারছি, আমার কোন বিষয়টাই বা ফেয়ার ছিল। আনফেয়ার, সবখানে, সবকিছুতে, আনফেয়ার এবং এখন বুঝতে পারি, সমস্ত জীবনটাই তাই।[১৫১]

নায়ক তার বস ল্যাসকে কখনোই সম্মান করত না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ চাকরি অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। নায়কও তাই বাধ্য ছিল অফিসের সব অসৎ কাজের সারথি হতে। ল্যাসের কাছে নায়ক ক্রীতদাসের মতো ছিল। কারখানার যত বিপজ্জনক কাজ নায়ককে দিয়ে করানো হতো। মূল কাজ ছিল মানুষ ঠকানো। কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হলে নায়ককে সামলাতে হতো। ল্যাস শব্দের অর্থ 'বাজখাই মাগী', যা নায়ক উদ্‌ঘাটন করেছিল। ল্যাস তার মাথায় তেল না দিয়ে তার বয়স লুকানোর চেষ্টা করত। ল্যাসের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু ছিল না। মদ্যাসক্তি, নারী আসক্তি তো আছেই, পাশাপাশি অর্থগৃধ্নু বটে।[১৫২] ল্যাস একটি জুয়াচুরির কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গেলে নায়কের মাধ্যমে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। টোটাদা ল্যাসের দুর্নীতির দায়ভার নিতে অপারগতা জানায়। 'তুমি ভাবছ দলে এসে তুমি খুব উদ্ধার করেছ, আর তোমার সব পাপের বোঝা আমরা বইব।[১৫৩] টোটাদা নিজেকে নিরাপদ রাখতে নায়কের শরণাপন্ন হয়। 'একজন বিশিষ্ট সভ্য বলেই সবাই জানে তোমাকে। অন্তত দলের মধ্যে তোমার একটা বিশেষ প্লেস। এরকম একটা সম্ভাবনা আছে, শাহকে আমার গ্রুপের লোক বলে চার্জ করা হবে। অর্থাৎ আমাকেই চার্জ করবে, যার ফলে দলের মধ্যে আমার পজিশনটা যাচ্ছেতাই হয়ে যাবে। তুমিও নিশ্চয় সেটা চাও না। অতএব, দলের সঙ্গে শাহ-এর যোগাযোগ, তার একমাত্র সূত্র তুমি, পার্টিকে এটা তোমার জানাতে হবে।'[১৫৪] নায়ককে টোটাদা বাধ্য করেছিল স্টেটমেন্ট দিতে যে তার মাধ্যমে ল্যাস পার্টির মেশিনারিটা ব্যবহার করেছে। মূল বিশ্বাসঘাতক সে। নায়ক টোটাকে বোঝাতে চেয়েছিল শাহ টোটাদার রিক্রুট, তবে পার্টির লোক কেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে? টোটা প্রত্যুত্তরে বলেছিল কারণ আমি টোটা, তুমি ভাকু।[১৫৫] নিঃসহায় নায়ক বুঝেছিল টোটা মানে বুলেট আর ভাকু মানে কুকুর। দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য টোটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। অসহায়ভাবে নায়ক জানতে চেয়েছিল— 'আমি যে আদর্শের জন্য এতদিন পার্টির কাজ করে এসেছি, সে আদর্শগুলো তাহলে কী? তার কি কোনও দামই নেই।[১৫৬] নায়ক আক্রোশে কাগজ কাটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে টোটাদাকে হত্যা করে। ল্যাসকেও নায়ক সুযোগ বুঝে নিমগাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছিল।

এছাড়া নায়ক তার স্ত্রী দীপাকে হত্যা করেছিল। বিয়ের পূর্বের দীপা আর বিবাহিতা দীপার চেতনাগত পার্থক্য নায়ককে হতাশ করেছিল। নায়ক দীপাকে লুকিয়ে বিয়ে করার অপরাধে জেলে গিয়েছিল। দীপার দৃঢ় মনোবল এবং আত্মবিশ্বাসের কারণে নায়কের জেলমুক্তি ঘটেছিল। দীপা তার দাদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রেমের জয়গান গেয়েছিল। সেই দীপা বিয়ের পর তার ভাইয়ের প্রেম এবং বিয়েকে মেনে নেয় না। প্রতিবেশী নারীর প্রেমের কারণে গৃহত্যাগের স্বেচ্ছাচারিতারর সমালোচনা করে। প্রতিবেশী নারীটি স্বামীর

প্রতি ভালোবাসার অভাববোধ করায় সংসার ত্যাগ করেছিল যা দীপার কাছে ন্যাক্কারজনক মনে হয়েছিল। অথচ এই দীপাই নায়কের সাথে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীকে সাবেক প্রেমিকের কথা বলেছিল। সাবেক প্রেমিক নবনীর সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। দীপার স্বভাবের দ্বিচারিতার জন্য নায়ক তাকে হত্যা করেছিল। অথচ নায়ক দীপার সঙ্গে সুখী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিল।

নায়কের অফিসের এক কর্মচারির মেয়ে কুঁড়ি। এই কুঁড়ির সঙ্গে তার কামজ প্রেমের সম্পর্ক ছিল, যা দীপা জানত না। কুঁড়ি জানত নায়ক বিবাহিত। তারপরও তাদের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল। নিঃসঙ্গতাজনিত হতাশা থেকে নায়ক কুঁড়ির সান্নিধ্য কামনা করত। কুঁড়িকে প্রথম দেখে তার মনে হয়েছিল একটি আঠারো–কুড়ি বয়সের মেয়ে, দিন চলে যাওয়া আর দশটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে যেমন হয়।[১৫৭] কুঁড়ির সৌন্দর্যে কিংবা শিক্ষায় কোনোভাবেই দীপার সমকক্ষ নয়। তারপর কুঁড়ি সাথে তার সম্পর্ক হয়েছিল। কুঁড়ির সঙ্গে প্রেম হওয়ার মুহূর্তে নায়কের মনে হয়েছিল সে বিবাহিত। অর্থাৎ দীপার সাথে বিয়ের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ। এবং দীপার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে। তার বিবেকের এই আত্মজিজ্ঞাসা সত্ত্বেও সে কামজ সম্পর্কে জড়ায়। প্রথাবদ্ধ দাম্পত্যসম্পর্ক দু'জন অতৃপ্ত নর–নারীকে কখনোই মুক্তি দিতে পারে না। তীব্র সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রাত্যহিক ব্যবহারে স্থবির ও অবসাদগ্রস্ত হয় এবং পুরনো মূর্ছনা পুনর্জাগরণের আশায় অন্যত্র দৃষ্টি পড়ে। ফলে নৈতিকতা দিয়ে অবদমন সম্ভব, কিন্তু সম্পর্কের অনিশ্চয়তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব। নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা যৌনসম্পর্ককে অস্বাভাবিক, পাশবিক ও কর্কশ করে।[১৫৮]। তাই নায়ক কুঁড়ির সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু একান্ত সান্নিধ্যে নায়ক বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয়। 'অনেক সময় ওর ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে আমার বুকের কাছে একটা কষ্ট যেন ছুরির ফলার মতোই বিঁধে যেত, এমনকী, চোখে জল এসে যেত, মনে হত, তবুও কী যেন রয়ে যায়, কী যেন পাইনা, যেন কোথায় একটা একতারা মিঠে সুরে বাজতে থাকে।[১৫৯] কুঁড়িকে হত্যার মুহূর্তে একতারার সুরটিতে আগুন জ্বলেছিল। 'হ্যাঁ, চোখে জলও এসে পড়েছিল, কিন্তু বৈরাগ্যেও থেকে রুদ্র কাপালিকই যেন আমার হাতে ভর করেছিল, ওর সেই নরম গলাটি আমি— ।'[১৬০] অভিগমনের সর্ব প্রসারী সক্ষমতা তাদের প্রেমকে সজীব রেখেছিল, কিন্তু অন্তরের শূন্যতাবোধ সেই সম্পর্কে ছেদ আনে :

> 'আমি স্বাভাবিক নই? সেটা ঠিক, সাংঘাতিক কিনা জানি না, কিন্তু যে সব স্বাভাবিকতা আমার চারপাশে স্বাভাবিকতা বলে চলছে, সেই তুলনায় আমি নিতান্তই অস্বাভাবিক।[১৬১]

উপর্যুক্ত উচ্চারণের মাধ্যমে নায়কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশিত। নায়কের আত্মকথনে জানা যায় সে আরো দুটি খুন করেছে। কলকাতার রাস্তার এক বৃদ্ধ পথচারী, অন্য একজন ড্রাইভার। বৃদ্ধ পথচারী 'ছাতাটি এমনভাবে বগলে রেখেছেন বা মাথায় মেলে ধরেছেন, হয় আপনাকে পেটে বুকে খোঁচা খেতে

হবে নয়তো মাথা নিচু করে পাশ দিয়ে যেতে হবে।'[১৬২] নায়ক যখন একটু প্রশান্তির আশায় প্রেমিকা কুঁড়ির কাছে যাচ্ছিল পথে বাধা হয়েছিল বৃদ্ধ পথচারী ভদ্রলোক। যাকে সহ্য করতে না পেরে বাঁ হাতের কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে শেষ করে দেয়। এছাড়াও তার চলার পথে প্রতিবন্ধক মনে হওয়ায় একজন ড্রাইভারকে সে হত্যা করেছিল।

উপন্যাসে অস্বীকার পর্বে জানা যায় নায়ক কাউকে খুন করেনি, দীপার সাথে তার সুখী দাম্পত্য জীবন। টোটাদার কথামতো কাগজে সই করে ল্যাসকে বিপদে ফেলে। নায়ক নিজেও বিপদে পড়েছে। মানসিক অবসাদ কাটাতে পুনরায় কুঁড়ির সাথে সংবেশনে মেতেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'দুটো অভিশপ্ত আর অসহায় প্রাণী যেন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে।'[১৬৩] নায়ক জানে সে যেমন সুখী না, পৃথিবীতে তারই মতো অনেকেই সুখী না। পাপের বিবর থেকে মুক্ত হতে সবাইকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কাউকে কাউকে হত্যা করলেই বিবরমুক্ত হওয়া যায় না। কারণ নায়ক নিজেও পাপের অংশীদার। তার অকপট স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় 'আমি কখনও হাত চালিয়ে, ডাণ্ডা মেরে বা ছুরি মেরে বা ধাক্কা মেরে সেই সব পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছি।[১৬৪] কিন্তু জীবন যখন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত, তখন ব্যক্তি একা দায়মুক্ত হতে পারে না। পাপ সাম্যবাদী। সবাই পাপকে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। মানুষ পাপীকে ঘৃণা করে। সমাজ ধ্বংসের জন্য পাপীকে দোষী সাব্যস্ত করে, কিন্তু কখনো ভেবে দেখে না, ঐ পাপে সেও সমান অংশীদার। কারণ পাপ দূর করার জন্য সে কোনো দায়িত্ব পালন করে না। নায়ক তার ব্যক্তিবোধের পরাধীনতা থেকে বের হতে পারেনি। আপাত সুখের পেছনে ছুটেছে। 'পরাধীনতার জন্য যে লড়াই, যার উলটো দিকেই মাথা ঢুকিয়ে এই জীবনটা যাপন করছি, অতএব আমি কেমন করেই বা আপনাকে সেই দায়িত্ববোধের ওষুধটা বলে দেব।'[১৬৫]

দেশাত্মবোধ আর রোম্যান্টিক ভাবনা থেকে নায়ক রাজনীতিতে এসেছিল, জনতার জন্য জীবন বিসর্জন, দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপাত এইসব মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নায়ক রাজনীতিকে এসেছিল। নিজের কথা, অস্তিত্বের কথা ভাবেনি, কিন্তু যখন নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল তখন দেখল জনসাধারণ থেকে সে অনেক দূরে। রাজনীতি এখন বুলিসর্বস্ব এর মূল উদ্দেশ্য মানুষ ঠকানো। নায়ক দেখেছে সমাজের সবাই প্রবঞ্চক। যা বিশ্বাস করে না তাই বলে, অকারণে উপদেশ দেয়, সুযোগ বুঝে যুবকদের দোষারোপ করে। সমাজের সাদা মানুষ নামে যারা পরিচিত— শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, তারা আরো ভয়ঙ্কর। আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে। অথচ সাধারণ সাধারণ মানুষের কাছে তারা অতিমানব।

বিয়ে নায়কের কাছে চুক্তিপত্র মাত্র। ভালোবাসার সংজ্ঞা তার কাছে অনেকটাই এরকম চুক্তি। বৈবাহিক সম্পর্কে ভালোবাসা অর্থহীন। কারণ চুক্তির কাছে কোনো মন একনিষ্ঠতার খত দিতে পারে না।[১৬৬] এ সম্পর্কে তার মনোবৃত্তি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে। সে সম্পর্কের মধ্যে কোনো ভান রাখেনি।

নায়ক আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের ভুল এবং সমাজের ভুলগুলোকে খণ্ডিত করেছে। আত্মকথনের মধ্য দিয়ে সমাজের সমস্ত বীভৎসতা, বিবমিষা থেকে মুক্তি চেয়েছে। বিবর থেকে বের হলে গায়ে রক্তের দাগ কিংবা ময়লা লাগবে। কিন্তু বিবর মুক্তির আনন্দের কাছে সবই ম্লান। মুক্তিস্নান আসন্ন। তাই নায়ক শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে চেয়েছে শুভবোধের জন্য। মাটির কাছাকাছি গিয়ে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে।

*স্বীকারোক্তি*র নায়ক সমাজ-সমালোচক। তাই তার ভাষা তীক্ষ্ণ এবং শাণিত। তার ভাষায় রয়েছে জীবনঘনিষ্ঠতার ছাপ। সমগ্র উপন্যাসটি নায়কের স্বগতভাষণ। সবার কথা বলার দায়িত্ব সে একাই নিয়েছে :

> এরপর যারা থাকেন তারা আমার অফিসের বস, আমার রাজনৈতিক নেতা, যাকে মাই ফিলজফার অ্যান্ড গাইড বলা যায়, কিংবা আমার প্রেমিকা— হ্যাঁ প্রেমিকাই বলতে হবে, কিন্তু এঁদের আর কখনওই কিছুই বলা যাবে না, কারণ— কারণ এঁদের কথা বলবার জন্য তো আমাকে লিখতে হবে।[১৬৭]

অনামা নায়কের একান্ত কথনে ধরা পড়েছে তার জীবনবাস্তবতা এবং জীবনানুভূতির অন্তরালবর্তী নিবিড় নিঃসঙ্গতার সপ্রাণ প্রতিচ্ছবি :

> আমার কী মনে হয় জানেন— অবিশ্য জানি না, সভ্যতার শুরুটা একদিকে যেতে গিয়ে, আরেকদিকে দৌড়ুতে আরম্ভ করেছিল কি না, কিংবা আরেকবার যাত্রা করতে হবে কি না, তবে এটা ঠিক, আমরা কোথাও একটা কিছুর খোঁজে বেরিয়েছিলাম, সেই আদিকাল থেকেই, সেটাকে কী জানি, সত্য বলবেন কিনা, তর্কাতীত সত্য, 'আপাতবিরোধ' ইত্যাদি কথাগুলো একবারে বাদ দিন, কারণ সেটা আমাদেরই সৃষ্ট, সত্যের কোন তর্ক থাকতে পারে না, এটা জেনে তর্কও হয়, তবু সেই সত্যের–যার কোনও পরিচয় আমার জানা নেই, হয়তো তাই রয়ে যায়, ত–ই পাইনা, কারণ পেতেই জানিনা, দুজনের কেউই না, কারণ আমরা দুজনেই যা পেতে চাই, তার থেকে আমরা অনেক দুরে। তবু যন্ত্রণাটা যায় না। এই অন্ধত্বের পাপ আমাকে ঘিরে রয়েছে, ...[১৬৮]

আত্মকথনের কারণে দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

এছাড়া উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক ভাষা প্রয়োগে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায় :

প্রবাদ

> ক. ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে।[১৬৯]
>
> খ. গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হয়ে উঠতে পারে।[১৭০]

গান

ঠাকুর এই করে যদি স্বর্গে জল পাঠাতে পার, তবে ওই যে চাষা জলের অভাবে মাঠে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, তাকেও পাঠিয়ে দাওনা।[১৭১]

নামকরণের দিক থেকে উপন্যাসটি সার্থক। নায়কের স্বগতকথনের কারণেই 'স্বীকারোক্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া আত্মকথনধর্মী উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য সেখানে একটিমাত্র চরিত্রই নিজের কথা বলে এবং তার দৃষ্টির আলোকেই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাগুলি উপস্থাপিত হয়।[১৭২] উপন্যাসে সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হয়েছে।

পাতক

বিবর, প্রজাপতি, পাতক, বিশ্বাস একই গোত্রভুক্ত উপন্যাস। আধুনিক যুবমানসের নিঃসঙ্গতা, আত্মযন্ত্রণা এবং সেখান থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসসমূহের মূল প্রতিপাদ্য। *বিবর* এর নায়ক সচ্ছল কর্মচারী, *প্রজাপতি*র নায়ক ভদ্রসমাজ থেকে বহিষ্কৃত মস্তান, *পাতক* এর নায়ক ছাত্র এবং *বিশ্বাস*- এর নায়ক নিম্নবিত্ত কর্মচারী।[১৭৩]

একদিকে নকশাল আন্দোলন, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি। সর্বব্যাপী ভাঙনের প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসু তাকিয়ে ছিলেন যুবচৈতন্যের দিকে। সমাজের বৃহত্তর পটভূমির দিকে না গিয়ে ব্যক্তিবৃত্তেই উপস্থাপন করেছেন যুবমানসের অন্তর্দাহের কথা। ফলে *পাতকে*র নামহীন নায়কের স্বগত কথনে উঠে এসেছে আমরা যে সমাজে বাস করি সেই সমাজের অন্তর্গত সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্রোধ, এবং পাপের কথা। নায়ক প্রতিবাদ করেছে প্রচলিত রাজনীতিবোধ, প্রেম, সামাজিক মূল্যবোধ এবং যৌনতার বিরুদ্ধে।

এই বিরুদ্ধাচারণ তার মধ্যে একদিনে তৈরি হয়নি। সমাজের সার্বিক অবক্ষয় তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করেছে। শৈশব থেকে সে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। শৈশবে মায়ের অসুস্থ যৌন জীবন দেখে ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রোথিত হয়েছে মায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব। মা হচ্ছে সন্তানের নির্ভরতার স্থান। পরম মমতা আর ভালোবাসার জায়গা। কিন্তু সেই স্থানটি যখন অন্য পুরুষ দখল করে নেয়, তখন নায়কের কাছে মা হয়ে ওঠে 'যেন আমারই পরিচিতা বান্ধবীদের আর এক মূর্তি।'[১৭৪] নায়ক হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। একদিন নির্জন দুপুরে হঠাৎ বাড়ি গিয়ে দেখে :

> এক নারী শুয়ে আছে বিস্রস্ত, এলোমেলো, অডিকলন, অন্য কোনও সেন্ট-এর গন্ধ আর তার সঙ্গে সিগারেটের হালকা গন্ধ। দেখলাম, নারী আমার মা। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল; নিজেকে গোছাবার জন্য, জামাকাপড় ঠিক করল, বড় সুখী মুখ, বড় সুন্দর, এখন কেমন অলস, ঘুম ঘুম ভাব, লিপস্টিক উঠে যাওয়া ঠোঁটে হাসি ছোঁয়ানো।'[১৭৫] মায়ের এই অন্যরূপ দেখে মায়ের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা হারিয়ে মাকে খুন করে আমি এগিয়ে গেলাম, মা তাকাল। আমি দুহাতে মাথাটা ঘাড়ের কাছে চেপে ধরলাম 'ও কী রে' ... চুলগুলো রেলিং- এর বাইরে এলিয়ে পড়ল, 'ওহ খোকা— খোকা কেন আমাকে মারছিস'[১৭৬]

নায়ক জন্মসূত্রেই জন্মদাত্রীর কাছে ঋণী। মা তাকে পৃথিবীতে এনেছে। পৃথিবীর রঙ-রূপ আস্বাদের সুযোগ করে দিয়েছে, 'মাতৃবক্ষের ঋণ শুধবার নহে, সহস্র অমৃতধারায় বহিতেছে, কিন্তু আমি কোথায়

অবগাহন করিলাম, জানি না, আমার অবগাহন হয় নাই, ঋণ লইয়া আমি ফিরিব, যাহারা মিটাইতেছে, মিটাইয়া যাউক, আমি ফিরিয়া চাহিব না।'[১৭৭] মায়ের ঋণ শোধের জন্য এই মাতৃহত্যা।

এখান থেকেই উপন্যাসের শুরু, এখানেই শেষ। *প্রজাপতির* সুখেন শৈশবে মায়ের দ্বিচারিতায় উত্তরকালে প্রেমের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে। শিখার কাছে স্থিত হয়ে প্রকৃত প্রেমভিখারী হতে চেয়েছে। *পাতক*- এর নায়কও স্বসমাজ এবং সমকাল নিয়ে ব্যথিত। প্রকৃত প্রেম সুখেনের মতো তারও কাম্য। অথচ তার চারপাশে অবস্থিত নারী চরিত্রগুলির দ্বিচারিতায় সে বিকারগ্রস্ত হয়েছে। সামূহিক অসামঞ্জস্যর মাঝে নায়ক অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে প্রেমের প্রতি এবং জীবনের প্রতি।

অনামা নায়কটি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। হোস্টেলের নিঃসঙ্গ জীবনে সমাজ রাজনীতির পর্যবেক্ষক। তার মতো তারই বন্ধু বিপ্লব, রুদ্র, ভোলানাথ, রঞ্জু সবাই আত্মবিলাসী। কেউ রাজনীতি কেউবা যৌনতায় মুক্তি খোঁজে।

পিতাকে তার মনে হয় 'বুলডক মার্কা ভদ্রলোক'। যিনি তাকে খাওয়ান পরান। কিন্তু পিতার সাথে তার আত্মিক যোগ নেই। জঘন্য রকমের টাকা করেছেন ভদ্রলোক, আর কী– কী বীভৎস রকমের ব্যস্ত, ভয়ংকর রকমের উদ্বিগ্ন, নার্ভাস টেনশন— সবই টাকার জন্য। ... তিনি আমার প্রতি কর্তব্যে কোথাও একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই, যতটা ভালভাবে সম্ভব হোস্টেলে রেখে খাইয়ে পরিয়ে, অনেক খরচ-খরচা করে, যাকে বলে মানুষ করবার চেষ্টা করেছে।[১৭৮] নৈতিকতাবর্জিত পিতার উৎকণ্ঠিত মনোভাব দেখে নায়ক অনুধাবন করে তিনি কী হারিয়েছেন। তার বাবার চাকরিটাই এরকম। সেখানে সততা হারিয়ে তিনি যা পাচ্ছিলেন তা অনেক বড়। তাই তার বাবা চাকরিসর্বস্ব। মধ্যবিত্ত মানুষের চাকরিটাই সব। চাকরিকে কেন্দ্র করে স্বপ্নভূবন নির্মাণ করে। নায়কের বাবা প্রচুর অবৈধ অর্থোপার্জন করে সমাজের উঁচুতলায় উঠেছিলেন। এরং তার এই অবস্থান তিনি উপভোগ করতেন। তিনি সব সময় চাইতেন তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা নিজের মতো চলুক। ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। ভালোবাসাহীন নিঃসম্পর্কীয় পিতা-পুত্র সম্পর্ক নায়কের মানসভুবনে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। তাই নায়ক ব্যঙ্গ করে বলে 'আমি খেয়ে পরে ন্যাকা-পড়া যা করছি সে তো আমি জানিই, মানুষও কেমন হচ্ছি, তাও— কী বলে ওটাকে— হ্যাঁ আমার অন্তর্যামীই জানেন।'[১৭৯] পিতার সাথে তার শুধু কর্তব্যের সম্পর্ক— 'উনি একজন ভদ্রলোক, নিজের ব্যাপার নিয়ে জড়িয়ে আছেন, ঘটনাচক্রে আমি ওঁর ছেলে।[১৮০]

তার পিতা কেন তাকে পৃথিবীতে এনেছে সে জানে না। 'কত সহজ', যেন টপ করে একটি ফুচকা মুখে ফেলে দিলেন, অথবা একটি ঢেঁকুর তুললেন, বমন বা উদ্গার জাতীয় ব্যাপারটাই তো সেটা। হে মহারাজ, অপরাধী জানিল না, কী বা তার অপরাধ, কী কারণে-ধরাধামে আর্বিভাব তার, পিতা আনয়ন করিলেন, এখন কেহ কাহারও নহি, কর্তব্যের একটি সেতু ব্যতিরেকে।[১৮১] তীব্র শ্লেষ আর বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যের মধ্য দিয়ে নায়ক তার বিবমিষা প্রকাশ করেছে।

যে সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধা পড়েনি তার কাছে সম্পর্কের মূল্য নেই। বাবার মতো মায়ের কাছে সে অনাত্মীয়। তার মায়ের কাছে লিপস্টিক এবং শাড়ি প্রধান বিষয়। লিপস্টিক এবং শাড়ির যেটুকু কদর নায়কের সেটুকু নেই। এ প্রসঙ্গে নায়কের অভিমত— 'কেননা আমি মাকে সাজাই না, সুন্দর করি না।'[১৮২] তার মায়ের কাছে সন্তানের চেয়ে মিস্টার লাহিড়ী কিংবা নিরঞ্জন গুরুত্বপূর্ণ। মা চরিত্রটির এই অংশের সাথে অদ্বৈত মল্লবর্মণের *রাঙামাটি* উপন্যাসের মনোরমা চরিত্রের সাদৃশ্য বিদ্যমান। মনোরমা অসুস্থ সন্তানকে পাশের ঘরে ঘুমাতে দিত নিজের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য— 'তুমি রঙিন খেলনা খেলছ, আর দিনের বেলায় শিশুর মুখের হাসি দেখছ, কিন্তু গভীর রাত্রে শিশুর বিশ্রী কান্না তো শোন নি। গভীর রাতে শিশুর কান্নায় অস্থির হয়ে সুখে নিদ্রা ছেড়ে যখন মাকে ফিডিং বোতল খুঁজতে হয় তখনকার অবস্থা কল্পনা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।'[১৮৩] মনোরমার শিশুকন্যা মনোরমার অনাদর সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে। অনামা নায়ক অনাদরে বড় হয়ে জীবনকে এবং নিজেকে তীর্যকভাবে দেখতে শেখে।

সমাজের প্রতি ঘৃণা থেকে কাউকে জব্দ করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। সমাজের নোংরামি দেখে সে অস্থিরতায় ভোগে। পারিপার্শ্বিক ভণ্ডামি দেখে ব্যঙ্গ করে। যেমন নায়কের বন্ধু বিপ্লব যার নাম নিয়ে পরিহাস করাতে নায়ক বিকৃত আনন্দ খুঁজে পায়। বিপ্লব শব্দটির ইংরেজি রেভ্যুলিউশন। শব্দটি কারো নাম হতে পারে নায়কের বোধগম্য নয়। তার চেয়ে নায়কের মনে হয় 'মনের মধ্যে এত বিপ্লব ঠাসা যে, করতে পারি না পারি, ছেলের নামই রেখে দেব। মানে একটা ইচ্ছা; একটা সাধ, একটা দেশাত্মবোধ, একটা-একটা ভয়ংকর ব্যাপার বিপ্লব, কী দারুণ শোনায়।'[১৮৪] বিপ্লবের বাবা একটি অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্কই। অতৃপ্ত বাসনা থেকে সন্তানের নাম রাখেন বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লবকে যখন বিকৃতভাবে বিপলা বলা হয় তা হয় হাস্যপরিহাসের বিষয়। আবার কারো নাম গান্ধীকুমার হলেই সে গান্ধী হয়ে যায় না। উপন্যাসে গান্ধীকুমার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি হয়তো জানেন না একজনের পদবিকে তার বাবা-মা নাম হিসেবে ব্যবহার করেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সন্তানের নাম রাখার বিষয়ে ভীষণ সচেতন।

উত্তরপ্রজন্মের জন্য কিছু না রেখে যেতে পারলেও সুন্দর নাম এবং কিছু উপদেশ রেখে যান, যার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা বিপ্লবের বাবা। নায়ককে দেখেই বলে 'তুমি বুঝি বিপ্লবের সঙ্গে রাজনীতি কর? বেশ বেশ এতো করতেই হবে। তোমরাই তো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে।'[১৮৫] এই বাবাই বেকার বিপ্লবকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান। বেকার সন্তানের জন্য স্ত্রীকে মানসিক নির্যাতন করেন। যুব সমাজ দেখলেই উপদেশ দেন। পৃথিবীর সমস্ত যুবসমাজকে নিজ সন্তানতুল্য ভাবেন। বয়জ্যেষ্ঠর এহেন আচরণকে নায়ক ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। আবার উপদেশের মাঝখানে যখন 'জয় মা তারা' বলে পেটে দুবার হাত বুলিয়ে বলেছিলেন 'বেশ বেশ, তোমরা বসো, পেটটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, একবার পায়খানায় যেতে হবে।'[১৮৬] এই জাতীয় বাক্যে নায়কের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বিপ্লবের বাবা ভেবেও দেখেন না। যেন বয়স হয়েছে বলেই লজ্জা শরমের আব্রু নেই।

নায়ক শুধু নিম্নমধ্যবিত্তের চরিত্রের সমালোচক তাই নয় উচ্চবিত্তেরও সমালোচক। উচ্চবিত্ত যৌনতাকে নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ ভাবে। নায়কের মা এবং তার বন্ধুর মায়ের ব্যাভিচার নায়ককে আহত করে। মা সম্পর্কে তার সকল বোধ লোপ পায়। বন্ধুর মায়েদের দ্বিচারিতা দেখে সে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। তার বন্ধু রঞ্জনের মা চুলে বয়েজ কাট দিয়ে স্লিভলেস ব্লাউজ পরে ছেলের বন্ধুদের আকর্ষণ করে। যেন সমাজটাই নষ্ট, পচা। প্রত্যয়, প্রমূল্যহীন। তার বন্ধু মিহির, নীতিশ অর্থের জন্য রঞ্জনের মায়ের বিশেষ বন্ধু হয়। সমকালীন সমাজে বেকারত্বের জ্বালায় যুবসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিকতা বিসর্জন দেয়। কিন্তু নায়ক তা পারেনি। তাই তার ভাষায় খিস্তিখেউড়ের আধিক্য। অশ্রাব্য ভাষায় সে সমাজটাকে শোধন করতে চায়। আর তাই মায়ের সম্পর্কে রঞ্জনের কী ভাবনা নায়কের সেদিকে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। বারবারই রঞ্জনের সাথে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়িয়েছে। অসহায় রঞ্জন মায়ের এই বাল্যখিল্যতাকে যেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি, তেমনি নায়কের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিও সহ্য করতে পারেনি। পাঞ্জা লড়াই তাই বহুদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

বন্ধুদের সাথে নায়ক বুর্জোয়া এন্টারটেনমেন্টের নামে বিয়ার খায়। তার বন্ধুরা সবাই অসুস্থ জীবনযাপন করে। অনাথের আদর্শবাদী চেহারা এবং পবিত্র মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই শৈশবে সে সমকামীদের শিকার হয়েছে। এখন শিকার হওয়াতেই তার আনন্দ। রঞ্জু স্কুল ফাইনালের পূর্বেই মাদকাসক্ত হয়। রুদ্র রাজনীতির ছদ্মবেশ পুলিশের চর হয়। নায়ক তার পরিচিত একজনের কথা জানে যে তার মাসিমার যৌনবিকারের শিকার। মানসিক সংগতি হারিয়ে সারাজীবন মাসিমার খাট আঁকড়ে ধরে পড়ে থেকেছে। অথচ এক সুশিক্ষিত সুন্দরী মহিলার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। 'অপিচ সেই ব্যায়রাম সুবিচার নহে,

তাই সেই শিক্ষিতা সুন্দরীকে অন্যত্র নিজের ব্যবস্থা দেখতে হয়েছে।[১৮৭] সামজিক অপবাস্তবতায় সবাই বিকারগ্রস্ত। নায়ক এই অবক্ষয়িত সমাজের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। ভোগলিপ্সা আর স্বার্থবাদিতার জীবন অতিক্রম করে সে শুদ্ধতায় স্নাত হতে চেয়েছে। তাইতো আত্মশ্লাঘায় নিজেকে নিজে আঘাত করতে চেয়েছে— 'পা টা তুলতে পারলে নিজের মুখেই একটা লাথি মারতাম।'[১৮৮]

নায়কের বন্ধুরা রাজনীতির বৃত্তে আবদ্ধ, কিন্তু অধিকাংশই জানে না কেন রাজনীতি করে। মিছিলে যায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। নায়ক নিজেও জানে না সে কেন ১৪৪ ধারা ভেঙেছে। বিপ্লব রাজনীতি করে নেতা হওয়ার আশায়। আবার এই বিপ্লবই আন্দোলনের দিন পুলিশ সার্জেন্টের চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়। এই স্ববিরোধী আচরণে নায়ক হতবাক হয়ে যায়।

আরেক বন্ধু রুদ্র বিপ্লবের চেয়ে বড় নেতা হতে চায়। অন্তঃসারশূন্য রুদ্র বাগ্মীতায়, বেশভূষায় প্রমাণ করতে চায় সে রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন, গুণী মানুষ। নায়ক তার ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান— 'আমি কে, কীসেই বা আছি, আমাকে দিয়ে কার কী-ই বা প্রয়োজন, আমাকে না হলে সব চলে যাবে, চলে যাচ্ছে এবং হয়েও যাচ্ছে। আমাকে কোনও কিছুতেই কারুর দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু চলছে, চলেও যাবে।'[১৮৯] নায়ক আত্মসমালোচক। রুদ্রকে তার হিংসুটে মনে হয়, রুদ্র সবাইকে বিদ্রূপের চোখে দেখে। নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখতে কাকে রাখবে কাকে এলিমেনেটেড করবে এই চিন্তা সব সময় তার মাথায় ঘোরে। এই ছাত্রনেতা আসলে পুলিশের চর। রাজনৈতিক মিছিলের লোকেরা বোম্বাই ফিলমের পোস্টার দেখে বলাবলি করে বোম্বাই বাঁচিয়ে রেখেছে।[১৯০] রুদ্র লেখাপড়া কওে না। তারপরও ছাত্রনেতা, নায়ক বলে 'ও শালা লেখাপড়া করে না বটে, বোধ হয়, পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রজীবনই কাটিয়ে দেবে।'[১৯১] রুদ্রর চালাকি নায়ক ধরতে পেরেছিল। কিন্তু তার বন্ধুরা বিশ্বাস করেনি। রুদ্র প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাই তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। দলের মেয়ে সরস্বতীর সাথে প্রেমের নামে প্রতারণা করে। নায়ক বলে, সরস্বতীর মুখে আমি শুনেছিলাম তাহার জরায়ুর মধ্যস্থিত ভ্রূণটি রুদ্রর দান ছিল।[১৯২] রুদ্রর মতো নেতার কারণে রাজনীতি তার কাছে অর্থহীন। উপন্যাসের শেষে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের সময় রুদ্র অসাধারণ দক্ষতায় নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়। কিন্তু নায়ক আর তার শঠতা মেনে নেয়নি। তাই ধাক্কা মেরে ট্রেনের তলায় ফেলে দেয়। আর কানাই, বিজন, অলকরা জেলে যায় সময়ের ঋণ শোধ করতে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে হতাশ হয়ে নায়ক যৌনতার আশ্রয়ে মুক্তি খোঁজে। বেবি, রত্না, রিনা, অদিতি, ললিতা কিংবা ললিতার দিদি মল্লিকা সবার সাথে তার দেহজ সম্পর্ক। শুধু এরাই নয় মাঝে মাঝে বন্ধু ভোলানাথের সারথি হয়ে পতিতালয়ে যায়। প্রেমিকা রত্নাকে চুমু খেতে গিয়ে পায়োরিয়ার গন্ধ পায়। 'সপ্রেম চুম্বনের পবিত্রতা পায়োরিয়ার গন্ধে দূষিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।'[১৯৩] কিন্তু সে সুস্থ প্রেমের প্রত্যাশী। 'আমার বড় ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা করে কেহ যদি আমাকে প্রকৃতই ভালবাসিত, যাহার জন্য সবকিছু তুচ্ছ ভাবিতে পারিতাম, জীবনে মরণে যাহাকে লইয়া বিশ্বসংসারের সবকিছুকে জয় করিয়া লইয়াছি ভাবিতে পারিতাম, গলদঘর্ম হইয়া তাহার জন্য জগৎসংসারের এপার ওপার করিতে পারিতাম।[১৯৪] পবিত্র প্রেমের যেমন আকুলতা আছে, তেমনি সংশয়ও আছে। অবাধ যৌনতায় কখনই প্রকৃত প্রেম মেলে না। অথচ সে একের পর এক নারীর একান্ত সান্নিধ্যে যায়। সমস্ত মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত ক্রোধে, পরিবেশের বিরূদ্ধে আক্রোশ জানাতে সে তার মাকে খুন করে। এই খুনের পর বেবির নিকট যায়, প্রকৃত ভলোবাসা খোঁজে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। সামূহিক বিপর্যয়, ক্লান্তি আর তিক্ততায় তার শরীর সাড়া দেয় না। 'আমি যেন শব, আমার শরীরে যেন রক্ত নেই, রক্তবাহী শিরা নেই, সবই চুপচাপ, নিথর যাকে বলে, মৃত্যুপুরীর মতো হয়ে আছে।[১৯৫] প্রেমের নামে শরীরী খেলায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

নায়ক আমিময়তায় নিমগ্ন হয়। আধুনিক সভ্যতায় বিচ্ছিন্নতাবোধের সংক্রাম এতই তীব্র যে মানুষ যতই নিজেকে অখণ্ড রাখতে চায় ভিতরে ভিতরে সে দগ্ধ হয় বিখণ্ড বিচূর্ণতায়।[১৯৬] ফলে তার চিত্ততলে দেখা দেয় নিঃসঙ্গতা। নায়ক লক্ষ করে বেবির গায়ের রঙ চোখের রঙ বদলে গিয়েছে— 'ও যেন বরফের মতো গলছে'।[১৯৭] নায়কের নিস্পৃহতা তাকে আমিত্ব থেকে বিছিন্ন করে। সবশেষে মাতৃহত্যার দায় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে।

সমরেশ বসু নায়কের আত্মকথনে ষাটের দশকের যুবসমাজের স্খলনকে দেখালেন। যে যুবসমাজ নিষ্পেষিত অগ্নিদগ্ধ জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছে। এ কারণে নায়কের ভাষা এত স্পষ্ট এবং বাস্তববাদী সেই সাথে কদর্য। তার আচরণের অসঙ্গতি তার সমকালের অস্থিরতাকেই প্রকাশ করে :

ক. এক এক সময়, যে কোনও বড় ভাবের কথা হলেই, আমার মনে সাধু ভাষা জেগে ওঠে, এমনকি যার নাম রাষ্ট্রভাষা, তাও।[১৯৮]

খ. আমার পাশে, শোয়ানো অবস্থাতেই কাকে যেন পুলিশ মারছিল, কিন্তু আমার মতো কাতর অবস্থা তার ছিল না, সে থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছিল, কার এত সাহস, 'ফিন স্‌সলা থুকতা, তেরি'- একেবারে নির্যাস আর মোক্ষম একটি রাষ্ট্রভাষা শুনেছিলাম।[১৯৯]

প্রেমের ক্ষেত্রে নায়কের বোন অর্পিতা বহুচারিণী। তার প্রথম প্রেমিক সুশীল অর্পিতার বাবার অফিসের কেরানি। প্রেমের অপরাধে চাকরিচ্যুত হয়, এমনকি কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়। স্বাধীনতাত্তোর নব্য ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি অপির্তার বাবা এই অসম প্রেম মেনে নেয় না। দ্বিতীয় প্রেমিক নীলকান্ত কলেজের অধ্যাপক। আভিজাত্যবোধ থেকে অর্পিতার বাবা মধ্যবিত্ত সমাজের এই বুদ্ধিজীবীকে মেনে নেয়নি। এরপরও অর্পিতা আরও দুটো প্রেম করেছিল। শেষ পর্যন্ত একটি গেজেটেড অফিসারের সাথে অর্পিতার বিয়ে হয়েছিল। নায়ক ব্যঙ্গ্যচ্ছলে বলেছিল— 'একটি সুন্দরী কুমারী কন্যাকে বিবাহ করিয়া বর চলিল বীরদর্পে।'[২০০]

এই নায়ক ভোলানাথের সাথে নর্থে গিয়েছিল। সেখানে রূপোজীবিনীদের স্বভাববৈশিষ্ট সে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিল। নগরের শুচিতা রক্ষার জন্য অশুচি অপবিত্র স্থান সে পর্যবেক্ষণ করেছিল। চারিদিকে গোলমাল ভিড়, মৃদ আলোর ঝলকানি, নারীরদের বেশভূষায় নায়ক কৌতূহলী হয়েছিল। সমকালীন যুব মানসের অবক্ষয়ের চিত্র এখানে ধরা পড়েছে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কানাই-এর ব্যক্তিত্বে নায়ক মুগ্ধ হয়। সংগোপনে কানাইয়ের মতো হওয়ার ইচ্ছা লালন করে। স্বশ্রেণি, স্বসমাজ থেকে বের হতে পারে না। কানাইয়ের পারিবারিক বন্ধন, পিতা-পুত্রের সম্পর্কে নায়ক অভিভূত হয়। তার অবচেতনে প্রকাশিত হয় 'কানাই, কত প্রয়োজনীয় কত ভালবাসার ছেলে।'[২০১] এরকম বোধ থেকে নায়ক অনুভব করে তার বাবা সমাজের নেতৃত্বস্থানীয়। টাকার বিনিময়ে তিনি সমাজটা কিনে রেখেছেন। একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের অপরাধে নায়ক যখন জেলে যায় তখন তার বাবা পুলিশের ওপর হুকুম জারি করে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনে। অথচ নায়ক তা চায়নি। কানাইয়ের বাবা সামান্য কম্পোজিটর। কিন্তু তিনি জানেন ছেলের ভালো কাজের প্রশংসা করতে। এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুখটি নায়ককে আকর্ষণ করে।

উপন্যাসে নায়ক ভীষণ আবেগী। আত্মিক দ্বন্দ্ব এবং পারিপার্শ্বিক অস্থিরতায় সে অসহায় বোধ করেছে। যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছে সেই সমাজটি নিয়ে তার শুভবোধ নেই। তার সংবেদনশীল মন ফেটে পড়া বদ্ধ আক্রোশে কাতরিয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, প্রেম, বন্ধুত্ব সমস্ত কিছুর প্রতি তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। অবাধ যৌনাচার আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আড়ালে সে ভণ্ড মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছে। *পাতক* প্রকাশের পর অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের মেকি ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতা বোঝাতে *পাতকের* অনামা নায়ককে বিরুদ্ধ পরিবেশে উপস্থাপন ছাড়া কোনো পথ খোলা ছিল না, যে কারণে

উপন্যাসের গঠনরীতিতে প্রথাবদ্ধতা ভাঙা হয়েছে। চরিত্রের স্বচ্ছন্দ গতির জন্য লেখক ভদ্ররীতির ভাষা ব্যবহার করেননি। জটিল এবং ক্ষয়িত জীবন প্রকাশক গদ্যরীতিই লেখক অবলম্বন করেছেন। প্রখ্যাত সমালোচক যে কারণে বলেন :

> চরিত্রটির চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমরেশ এই উপন্যাসে ভাষাকে স্বেচ্ছায় ভেঙেচুরে এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে শীলতার গতানুগতিক প্রথাসিদ্ধ প্যাটার্নের প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া এক গদ্যরীতি চালু করেছেন। অভিনব চিন্তা এবং বৈয়াকরণিকের দৃষ্টিতে ভাষার জগাখিচুড়ি ও বাক্যের গুরুচণ্ডালী টিয়ে চরিত্রটির মানসিকতা অভিনব উপায়ে উপস্থাপিত করছেন সমরেশ।[২০২]

পাতক রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, কিন্তু রাজনীতির উত্তাপ আছে। ষাটের ঘদশকের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এসেছে অনামা নায়কের স্বগতোক্তিতে। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতীয় অর্থনীতির করুণ অবস্থা শহর ও গ্রামের মানুষকে দারিদ্রসীমার নীচে দাঁড় করিয়ে দেয়। শিল্পায়নের মন্থর গতি, কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থা, বিনিয়োগ সম্ভাবনা সীমিত প্রভৃতি কারণে মানুষ দারুণ অর্থকষ্টে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় যা হাতের কাছে পেয়েছে সে কাজই মানুষকে করতে হয়েছে। ব্যাংকে বা যে কোনও অফিসে কেরানির চাকরির জন্য জমা পড়েছে বহু উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীর আবেদন।[২০৩] একদিকে ভারতীয় দক্ষিণপন্থী শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, অন্যদিকে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের আপোষকামী মনোভাব, এরই মধ্যে ছাত্রদের আন্দোলন ছিল অনেকটাই নকশালপন্থী।[২০৪] ছাত্র আন্দোলনের এই অন্ধকার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই *পাতক*- এর কাহিনি গতি পেয়েছে।

নায়ক বহুবার মিছিলে গিয়েছে, পুলিশের মার খেয়েছে। একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙেছে। কিন্তু সে জানে একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে বুক চিতিয়ে পুলিশের মার খাওয়া যায়। কিন্তু তারপর সব ফাঁকা। কারণ রাজনীতির বুলির মধ্যে থাকে ফাঁকা আওয়াজ।[২০৫] রাজনীতিতে যেমন যুবসমাজকে ব্যবহার করা হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে তেমনি ছাত্রদের সুযোগ বুঝে ব্যবহার করা হয়। ছাত্ররাও অবুঝের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকে। নায়কও ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সবকিছু তছনছ করে দিতে চায় :

> ... যেভাবে হোক, আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি, ভেঙে তছনছ করে দিতে চাই। শাসক–তারা যে কোনও বিষয়ের হোক আমি সবসময়ে তাদের সঙ্গে লড়ে যেতে রাজি আছি, কেবল নিষেধের বিজ্ঞাপন লটকানো, এগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাই, আমার চারপাশে যা কিছু আছে, যা কিছু চলছে, তার কোনওটাই আমার সহ্য হয় না, আর এসবের যারা অভিভাবকত্ব করে তাদের চোখ মেরে একটা সিগারেট অফার করতে পারি, কিন্তু তখন যেন কোনও গার্লফ্রেন্ড বগলদাবায় থাকে।[২০৬]

এই আগ্রাসী মনোভাবই যুবসমাজকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সেদিকে ঠেলে দেয়। তবে যুবমানস সত্যিই বিচিত্র। মিছিলে একদিকে চলে স্লোগান, অন্যদিকে চলে খণ্ড খণ্ড কথোপকথন— 'মাইরি বলছি, দু পিস পাউরুটি ছাড়া কিছু খাইনি।... দে না একটা সিগারেট এটা

দিয়ে তোর তিনটা পাওনা হবে।[২০৭] অথবা আজ ইভিনিং শো-টা মারতে হবে, বোম্বাই বাঁচিয়ে রেখেছে, ইত্যাদি।[২০৮]এরই মাঝে চলে স্বৈরাচার নিপাত যাক, স্লোগান পুলিশের গুলি, বোমাবাজি-একটা ট্রাম ছুটেছে, ওর সারা গায়ে আগুন— আগুন জ্বলছিল দাউ দাউ করে। কী আশ্চর্য, সে আগুন দেখতে আমার এত ভাল লেগেছিল।[২০৯] নায়কের ইচ্ছা হয়েছিল আগুনের সেই লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দিতে। সত্তা বিচ্ছিন্নতা আর ব্যক্তিবোধের শূন্যতা থেকে তার এই মনোভাব জেগেছিল।

এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে ১৯৬৬– এর খাদ্য আন্দোলন এবং এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির কারণে প্রতিবাদ। এছাড়া নকশাল অভ্যুত্থানে কলকাতার ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া এবং নানারকম আন্দোলন প্রতিবাদ চলছিল।[২১০] এসব আন্দোলন সংগ্রামের মাঝে থেকেও নায়ক নিঃসঙ্গ। মিছিল স্লোগানের কোনো অর্থই তার কাছে নেই। যাপিত জীবনের আর দশটি ঘটনার মতো এটিও তার কাছে স্বাভাবিক।

ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ঔপন্যাসিকের সুক্ষ্মতর ভাবনার প্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। লেখকের সমাজ ও জীবনভাবনা ভাষার মাধ্যমে রূপলাভ করে। ভাষারীতি ও আঙ্গিকের ওপর নির্ভর করেই ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়। *পাতক* উপন্যাসে অবক্ষয়িত জীবনের রূপায়ণে ঔপন্যাসিক এক ধরনের জটিল ও ক্ষয়িত জীবন প্রকাশক গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন।[২১১]

উপন্যাসে নায়কের মুখে সমাজ-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৃহত্তর ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলার সময় জগা-খিচুড়ি ধরনের সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন।[২১২] নীতিবর্জিত সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় জগা-খিচুড়ি ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে। কথাসাহিত্যে ব্যঙ্গার্থে সাধুভাষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম করেন তাঁর *তোতাকাহিনী*তে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করতে তিনি এই ভাষার প্রয়োগ করেন।[২১৩]

পাতকে ব্যবহৃত সাধু ভাষা :

সাধু ভাষা:

> আমরা ভারতবাসীরা হইতে পারি বয়স্ক, কিন্তু শিষ্ট। পোকা পড়িলেও জানিবে, সংস্কৃতি ওকৃষ্টি লইয়া আমরা বিশেষভাবে গর্বিত।...দু-একটা বিদ্রোহ হয়ত করিয়াছি, তাহা ঠাণ্ডা হইতে বেশি সময় লাগে নাই এবং ফলও যা হইয়াছে, তাহাই বর্তমান ভারতবর্ষেও রূপ বলিয়া দিতেছে, আর বিপ্লব। বিপ্লব আমরা কোনওদিনই করি নাই, ইচ্ছা আছে করিব, তবে সন্তান গণের নামতো রাখিতেছি।[২১৪]

সাধু-চলিতের মিশ্রণ:

> কিছুই বুঝিতে পারেনি সরস্বতী, যখন গর্ভধারণ কারণ ক্রিয়া করিয়াছিল, তৎকালে বুঝিতে পারে নাই, কী গ্রহণ করিতেছে...ই বিটিকে কী বইলব বলো দিকিনি, এবং চারিদিকে তাকাতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম, প্রায় মনুমেন্ট বরাবর, লাইনের ওপর জ্বলন্ত ট্রামটা দাঁড়িয়ে পুড়ছে...[২১৫]

অপভাষা :

সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশের অন্তঃস্থিত বিরোধিতাকে প্রকাশ করতে অনামা নায়ক অপভাষার আশ্রয় নিয়েছেঃ

ক. স্‌সালা চুত্তিয়া কামিনা কাঁহিকা[২১৬]

খ. ভাগ শালা বানচোত[২১৭]

বাক্যগঠন :

ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত বাক্য:

ক. না না, হোয়াট ইজ দিস্। দেখা হলেই কথা হলেই এক কথা। এটা সিম্পলি পেছনে লাগা। আই ওন্ট টলারেট দিসজ থিংস।[২১৮]

ইংরেজি বাক্য:

ক. দিস ইজ সিম্পলি বুর্জোয়া এন্টাটারমেন্ট[২১৯]

একই বাক্যে একটি শব্দের একাধিকবার ব্যবহার :

হুররা হুররা —— হুইস্ হুইস্—— ইহা হিড়িক নহে, আপনাদিগকে সাধুবাদ জানাইতেছি, চালাইয়া যান,...[২২০]

দীর্ঘ বাক্যর ব্যবহার :

সে কথা আসে কোথা হইতে, বলিয়া যাইতে হইবে, অতএব চালাইয়া যান, রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে বলুন, ঔর সিনেমা থিয়েটার ছোড়কে, গার্লফ্রেন্ডকে সাথ মিলনা ঘুমনা ছোড়কে, ঘর যাকে, মাকে পাস খানা খাকে, বহিনেক সাথ আঁখমিচোলি খেলকে, টাট্টিপিসাব বাগেরা ফিরকে হুঁশিয়ার, ঔর কুছু নহি, খাবার হো যায়েগা, কিতাব লেকে পড়নে বৈঠে যাও,অ্যায়সা নির্দেশ দিজিয়ে![২২১]

সময় :

*পাতকের*র ঘটনাকাল একদিন। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নায়ক একোক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ জীবন এবং সময়ের অসামঞ্জস্য প্রকাশ করেছে।

গান : উপন্যাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অনামা নায়ক বেবির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের গানের আশ্রয় নেয় কিন্তু ঐশ্বরিক প্রেম এবং জাগতিক প্রেম সে এক করে ফেলে :

রবীন্দ্রনাথের যাহা ঈশ্বরে অর্পিত আমি তাহা বেবিকে অর্পণ করতাম, তাহার উদ্দেশ্যে আমার মনের মধ্যে নিঃশব্দে গুনগুন করিত ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।.. কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।[২২২]

নায়ক গান গাইতে পারে না কিন্তু তার ভেতরে এক শিল্পী সদা জাগ্রত। সেই শিল্পীমন মাঝে মাঝে গেয়ে ওঠে :

> 'ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে হারাই হারাই সদা ভয় হয় হারাইয়া ফিরি চকিতে।[২২৩]

সংস্কৃতি :

মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয় তার সংস্কৃতি।[২২৪] উপন্যাসে অনামা নায়কের সমাজবোধ রাজনীতি ভাবনায় শ্রেণি হিসেবে তাৎপর্য হারানো মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের অপসংস্কৃতির ধারাটিই প্রকাশিত। পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবন— চেতনাই সংস্কৃতি।[২২৫] কিন্তু অধিকাংশ চরিত্রই নীতিহীন। উপন্যাসে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহের জীবনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত তা অপসংস্কৃতির নামান্তর। নায়কের গর্ভধারিণী মা নিজের সন্তানের কথা বিস্মৃত হয়ে অবক্ষয়ের অংশীদার হয়, বন্ধু রঞ্জনের বাবা শেতাঙ্গ নারীতে আসক্ত, রঞ্জনের মা ছেলের বন্ধুর কাছে প্রত্যাশিত সুখ কামনা করে। নায়ক এবং তার বন্ধুরা মদ ও নারীতে আসক্ত। উপন্যাসে উপস্থাপিত যৌনতা যৌবনের বিশুদ্ধ বলয় হয়ে আসেনি, এসেছে নায়কের প্রেম ও যৌনভাবনার ও সম্পর্কের অবক্ষয়ের প্রতিরূপ হিসেবে।[২২৬]

পদক্ষেপ

পদক্ষেপ উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্তের রাজনীতি দেখালেন। উপন্যাসের নায়ক শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি। কিন্তু মহিমের বন্ধু অনিল এবং অলোক মধ্যবিত্ত শ্রেণিপ্রতিনিধি। ১৯৪৫ সালের আজাদ হিন্দ ফৌজের রসিদ আলীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতালের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে মহিম আহত হয়। আহত মহিমকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে অনিল। অনিল এম.এ পাশ শিক্ষিত যুবক। পরে টিলার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মকাণ্ড চালাতে মহিমদের এলাকায় যায়। মহিমের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। রাজনীতি করতে গিয়ে মহিম খুব কাছ থেকে অনিল এবং অলোককে দেখে। রাজনীতিতে অলোক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর অনিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে কাজ আদায় করতে চায়। অলোক জোর করেই কর্মীদের মধ্যে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়। সে কখনোই বুঝতে চায় না মহিমের মতো কর্মীরা কারখানার কাজে ফাঁকি দেয় কিন্তু পার্টির কাজে ফাঁকি দেয় না। অলোক সুবিধাবাদী। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনিলকে আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটি থেকে কৌশলে বাদ দেয়। অনিলের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করায়, অনিল দক্ষিণপন্থী চালে দলকে চালাতে চায়। অনিলের বোন নীলিমাও অলোককে বিশ্বাস করে অনিলের বিরোধিতা করে। মহিমের মত একজন সাধারণ কর্মী যেটা বুঝতে পেরেছে অলোক নেতা হয়ে সেটা বুঝতে পারেনি।

যেমন দলের মধ্যে মিলিট্যান্ট টাইপ কিছু ছেলের আগমন ঘটে যারা ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়। মহিম পার্টির বিপ্লবী মনোভাবের অসারতা ধরতে পারে। যেমন পার্টির বিপ্লবী ভাবনাকে ফরাসি–বিপ্লব কিংবা রুশ বিপ্লবের সাথে মেলাতে পারেনি। আবার চীনের পার্টি যেভাবে চিয়াং কাইশেকের সাথে লড়ছে সেরকম কিছু দেখেনি। মহিমের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্র মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মনোভাব বুঝতে পারে। পার্টির নেতারা কারখানায় ধর্মঘটের নির্দেশ দেয় কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা সাড়া দেয় না। অলোকের মতো নেতাদের অগ্নিবর্ষীয় বক্তৃতা সেখানে কোনো কাজে আসে না। ঠিক এই সময় সরকারী নির্দেশে টিলার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি নিষিদ্ধ হয়। অনিল, অলোকরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। অনিলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আসে। অলোকের মতো নেতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। মহিম একদিন ধর্মঘট করতে গিয়ে ভোরের অন্ধকারে অলোককে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল— 'কাকে মারবেন গেটে। সবাই তো মজুর, কাজে যাচ্ছে।[২২৭] অলোক বলেছিল 'ওদের টেরোরাইজ করে দিতে হবে।'[২২৮] মহিম মানতে পারেনি। অলোক বাদে সবাই গ্রেফতার হয়েছিল। দুই বছর পর জেল থেকে বের হয়ে জেনেছিল অলোক বর্ধমানে প্রেসের ব্যবসা করে প্রভূত প্রতিপত্তির মালিক হয়েছে। অনিল বাংলাদেশের বাইরে কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে। সাহসী নীলিমার বিয়ে হয় বড় কারখানার লেবার অফিসারের সাথে। মহিমের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মধ্যবিত্তে ফাঁকি :

> ওরকম ওপর ওপর এসে কয়েকটা বুলি আওড়ানো, বেশিদিন চলে না, ঠিক সময়ে ওরা পালিয়ে যাবে। কারণ ওরা জানে, এটা ওদের জায়গা নয়। ওদেও চিন্তা-ভাবনা সবই আলাদা। অথচ একটা মোহ আছে। ক্ষমতার স্বাদও পায়, তাই আসে, ঠ্যালা লাগলেই বাবা বলে।[২২৯]

মহিম তার কাজে আর কোনো সুবিধাবাদীকে স্থান দিতে চায় না। কারণ সে জানে 'ঠাটে বসে, বাম দক্ষিণের ফতোয়া জারি করলে, আর কেউ মানবে না।[২৩০]

অলিন্দ

অলিন্দ উপন্যাসে আর্থিক সংকটতাড়িত মধ্যবিত্তের চারিত্রিক অসঙ্গতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শুভাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গতি পেয়েছে। স্কুলশিক্ষক বাবার সাত সন্তানের মধ্যে শুভা বড়। শুভার বিয়ের সমস্যা তার পরিবারের বড় সমস্যা। শুভারও স্বপ্ন একটি সচ্ছল গৃহের। সেই স্বপ্ন থেকে পাড়ার দাদা তারকের হাত ধরে ঘর ছাড়ে। অপরিণামদর্শী প্রেমের টানে কলকাতায় এসে শুভা প্রথম ধাক্কা খায়। শুভা জানতে পারে তারক ঠগ, প্রবঞ্চক। 'নানান জনের নানান ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে তার বৃত্তি একমাত্র উঞ্ছবৃত্তি । বন্ধুদের করুণা আর দয়া তার সম্বল।[২৩১] নাগরিক জীবনের প্রলোভন আর মিথ্যা

ভালোবাসায় শুভা দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজের অজান্তেই তার হাতবদল হয়। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তার বন্ধু নরেশের কাছে শুভাকে রেখে পালিয়ে যায়। নরেশও তারকের মতো অসৎ। শুভা বুঝেছিল 'ন্যায়ের পথে পরিষ্কার কিছু নেই ওদের। ওরা সবাই কলকাতা শহরের এক ভিন্ন জগতের লোক।' [২৩২] শুভার চরম নিয়তি নরেশ। ভদ্রলোকের মুখোশধারী নরেশ প্রতি রাতে মদ খেয়ে এসে শুভাকে কামনা করত। শুভার অসহায় আর্তির মধ্যে নরেশ কোনো ভালোবাসার স্পর্শ পায়নি। শুভার প্রেম প্রত্যাশায় সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা রাতের গভীরতার সাথে সাথে আগ্রাসী হতে থাকে। নরেশ ব্যক্তিগত জীবনে মাতাল, পেশাগত জীবনে অসৎ। প্রতিদিন মাতাল হয়ে বাড়ির ফিরে কাঙ্ক্ষিত জনকে দেখে অথচ তাকে পায় না, 'এতখানি সহ্যশক্তি তার নেই।'[২৩৩] তাই শুভাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে নির্যাতন করে।

শুভা সেখান থেকে এক চোরের সাথে পালিয়ে আসে। চোরের প্রকৃত নাম হীরা। হীরা চৌর্যবৃত্তি করে এবং তার পরিবারের চরম দারিদ্র্য তাকে আবার বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। শুভা জানে ভুল ঠিকানায় দৌড়ানোর উপযুক্ত শাস্তি সে পেয়েছে। তাই হীরাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছনার মুখে সে বাড়িতে ঢুকতে পারে না। বাড়িতে ঢোকার মুহূর্তে তার বাবা বলে 'আর এদিকে না, ওখান থেকেই বিদেয় হও। বিষের হাওয়া আর ঘরে ঢুকতে দেব না।'[২৩৪] জীবনের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে সে সিদ্ধান্ত নেয় পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। স্টেশনে এসে রেললাইনে দাঁড়াতে হীরা এসে হাত ধরে। নতুন জীবনের প্রত্যাশায় সেই হাত পথ দেখায়। এই উপন্যাসের কাহিনি। উপন্যাসে নরেশ বাদে প্রায় সবাই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য।

আঙ্গিকের বিচারে অলিন্দ ছোটগল্পও নয়, আবার বড়গল্পও না। অলিন্দ ক্ষুদ্র উপন্যাস। নরেশ ছাড়া উপন্যাসের সব চরিত্র চরম দারিদ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে সামলাতে ব্যস্ত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। বেকারত্ব, জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতিতে ভারত বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত চরম দারিদ্র্যে নিপতিত। উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র হীরা। তার বাবা ছিল কেরানি। কোনোরকম গ্রাসাচ্ছদনের মাধ্যমে তাদের সংসার চলত। কিন্তু বাবার মৃত্যু সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনের মুখের দিকে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরির সন্ধানে বের হয়। সেখানে ব্যর্থ হয়ে চৌর্যবৃত্তিতে নাম লেখায়। শুভার সাথে সম্পর্কের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চুরিটাকে সে কোনো অপরাধ বলে মনে করত না। নিজেকে সে ঠগবাজ ফেরেববাজ থেকে উন্নত ভাবে। সে বলে— 'মেরে নিয়ে আসি যদ্দিন চলে, চলে যায় তারপর আবার বেরিয়ে পড়ি।'[২৩৫] হীরার দারিদ্র্যের কাছে তার প্রেম হার মানে। তার প্রাক্তন প্রেমিকা তাকে ছেড়ে

অন্ধকারে নাম লেখায়। হীরা জানায় স্বৈরিনী পেশায় সে ভালোই আছে — 'টাকা করেছে মেলাই।'[২৩৬] হীরার ভাইবোনেরা চরম দারিদ্র্যের মুখে মধ্যবিত্তের আত্মসম্মান বিকিয়ে অন্ধকারের সারথি। শুভার একক প্রচেষ্টা তাদের থামাতে পারেনি।

শুভা চরিত্রটি ব্যতিক্রম। প্রেমের টানে ঘর ছেড়েও নৈতিকতা বিসর্জন দেয়নি। হীরার সাথে চলে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারকের অপেক্ষা করেছে। নরেশের কদর্য আকাঙ্ক্ষার বলি হয়নি। এখানেই উপন্যাসে জটিলতা তৈরি হয়েছে। শুভার নীতিবোধ এবং নরেশের অশ্লীল অভীপ্সার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে প্রকট।

নরেশ মধ্যবিত্ত সমাজের মুখোশধারী ভদ্রলোক। অনৈতিক কাজের সুবিধার্থে এবং মধ্যবিত্তের উচ্চবিত্তের মানসপ্রবণতায় উচ্চবিত্ত পাড়ায় বাসা ভাড়া করে থাকে। দিনের আলোয় শুভার সাথে ব্যবহারে তাকে সুস্থ সুন্দর মানুষ মনে হয়। শুভাকে সে বলে :

> দেখ শুভা আমাদের কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। আমার না তারকেরও না। তারকের হয়তো পয়সাকড়ি নেই। আমার তো তা বলা চলবে না। ... গাড়ি আছে আমার। এ পাড়াতে ভাল ভাড়া দিয়েই থাকি। তবু বউ থাকল না। থাকবে কেন বলো ? সৎভাবে ব্যবসা করি না, সব সময়ই একটা লুকোচুরি খেলা। কখন কীভাবে ধরা পড়ে যাই।[২৩৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে নরেশের নৈতিকতার সংকট এবং মূল্যবোধের অবনমন প্রকাশিত। এই নরেশ রাত্রে মদ খেয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। শুভার প্রতি কুৎসিতভাবে আক্রমণ তার মূল লক্ষ্য থাকে। যেখানে তার মনোজগতের অসঙ্গতি প্রকাশিত হয়। তার মননের বিকার, জৈবিক চাহিদা তাকে হিংস্র করে তোলে— 'পেটে মদ পড়ে, সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে মত্ত হাতির মতো দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।'[২৩৮]

সমরেশ বসু মূল্যবোধহীন ও আদর্শবিচ্যুত সামাজিক পটভূমিতে নরেশকে উপস্থাপন করেছেন। সে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বিবেচনাবিবর্জিত মানসিক বিকারগ্রস্ত চরিত্র।

অলিন্দ উপন্যাসে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন একদিকে যৌনতাঘটিত মনোবিকার, অন্যদিকে সুস্থ সুন্দর প্রেম। বিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙে গেছে। একদিকে সমাজের বাইরে ভাঙন, যা নরেশের বাড়ির জানালা দিয়ে শুভা দেখে। যে অংশটা শুধুই অন্ধকার। কতগুলো নগ্ন নারী-পুরুষ যেখানে আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'পান ভোজন আদিম রিপুর নানা লীলা, হঠাৎ হঠাৎ এ জানালায় ও জানালায় ভেসে ওঠে।' [২৩৯]অন্যদিকে নরেশের মনোবিকার। শুভা জীবনের এই অপচয়িত অংশটিকে ভয়

পায়। কিন্তু সবশেষে হীরার সুস্থ প্রেমের আহ্বানের নিকট আত্মসমর্পণ উপন্যাসে শুভবোধেরই জয়গান।

অচিনপুর

স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতা ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, দুর্নীতি ইত্যাদির পটভূমিকায় রচিত *অচিনপুর* উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের ছোট্ট একটা গ্রাম অচিনপুর। গ্রামের মানুষের কাছে যা আঁচনা নামে পরিচিত। এই গ্রামে এক আগন্তুক যুবক বিভাসের দৃষ্টিতে গ্রামের আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তন সেই সাথে বিভাসের পরিবর্তন যুগপৎভাবে এসেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে বেকারের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সঙ্গে দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুসমস্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এবং রাজনীতিরর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। সমরেশ বসুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছিল। 'জায়গা ও জীবনধারণ, কোথাও কুলিয়ে উঠছে না। সরকারি পরিকল্পনাগুলি এই স্ফীতির তুলনায় প্রায় নগণ্য। তাই ব্যর্থতা ধরা পড়েছে।'[২৪০] এই সময় শিক্ষিত বেকার যুবকরা নানাভাবে মুক্তির পথ খুঁজেছে। বিভাস আইএ পাস করে চার বছর ধরে কাজের খোঁজ করছে। বড় ভাইয়েরা তাকে গলগ্রহ ভেবে একদিন বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। বিভাস কলকাতায় এসে বন্ধুর আশ্রয়ে কাজ খুঁজেছিল। সেখানে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর কছে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিল। মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত বিভাসের স্বভাবতই সবার সামনে মরতে লজ্জা হয়েছিল। অর্ধ-অচেতন অবস্থায় ডাক্তার তারকেশ্বরের সহায়তায় পুনর্জীবন লাভ করেছিল। এখান থেকেই শুরু হয়েছে বিভাসের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই পর্বে বিভাস তারকেশ্বরের বেতনভুক্ত কর্মচারী। এই পর্বে অসৎ তারকেশ্বরের সাহচর্যে থেকেও সে ভেতরকার সততাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। তৃতীয় পর্বে এসে বিভাস সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে।

সৎ বিভাস তারকেশ্বরের কাজের সহযোগী হওয়াকে পাপ মনে করেছে। ক্রমেই সে অনুভব করেছে মানুষকে চেনা কঠিন কাজ। তার থেকে বেশি কঠিন নিজেকে চেনা। বিভাস নিজেকে চিনতে চেয়েছে। সেই সাথে লক্ষ্য করেছে পরিপার্শ্বের সামূহিক বিপর্যয়। মন্বন্তরের সময় সে দেখেছে আঁচনা গ্রামের সাধারণ মানুষ কীভাবে তারকেশ্বরদের কাছে ঠকছে। হাহাকার গ্রামের ঘরে ঘরে এই সুযোগে গ্রামের উন্নয়নের নামে গ্রামীণ নেতাদের নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচার সে লক্ষ্য করেছে। কৃষি বিভাগের এস. ডি. ও, বি.ডি.ও সবাই ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতের পুতুল। প্রেসিডেন্ট যা বলে সরকারি কর্মকর্তারা তা-ই

করে। বাস্তবে এবং খাতায় হিসেবের গরমিল। বিভাস এসবের প্রত্যক্ষদর্শী। মধ্যবিত্ত চেতনাজাত অসহায় আক্রোশে নিজেকে তার 'পাখা ভাঙা চটচটি মাছির মত মনে হয়েছে।[২৪১] আত্মিক দ্বন্দ্বে বিভাস হাসতে ভুলে যায়। বিভাস লক্ষ করে শহর এবং গ্রামে মানুষের দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা একই রকম। পার্থক্য শুধু দৃশ্যপটের। নেদোর খাল নিয়ে তারকেশ্বরের কূটনীতিতে বিভাস হতাশ হয়। যেগেশের মতো নিরীহ ভদ্রলোককে কৌশলে পাকিস্তানের চর অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। বিভাস ঘুরে দাঁড়াতে চায়। তাকে যোগেশ্বর এবং জনক সাহস দেয়। এই পর্বে দুই নারী পদ্ম এবং বিদ্যুৎ বিভাসকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধে। পদ্ম তারকেশ্বরের মেয়ে, বিদ্যুৎ পুত্রবধূ। বাকপটু কর্মনিপুণা বিদ্যুৎকে তার ভালো লাগে। অন্যদিকে পদ্মর ভেংচি কাটা, দুষ্টুমির অপেক্ষা করে। এদের যে কাউকে দেখলে তার অস্থির লাগে। পদ্মকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায় কিন্তু বিদ্যুৎ তার মনের আলো। বিদ্যুৎ-এর সাহসের জোরে সে তারকেশ্বরের সাথে কেউটের বিলে শিকারে যায়। তারকেশ্বরের কূটকৌশলে কেউটের বিলের জঙ্গলে বন্য দাঁতাল বরাহের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবারও সে ভাগ্যের জোরে বেঁচে যায়। এখান থেকেই তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু।

তৃতীয় পর্বে সুস্থ হয়ে সে স্কুলমাস্টার দিবানাথ এবং যোগেশ্বরের সহায়তায় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ায়। জয়ী হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়ায়। এখানেও জয়ী হয়। নতুন প্রত্যয়ে গ্রামের মানুষের জন্য কাজ শুরু করে। কিন্তু তারকেশ্বরের মেয়ে বলেই পদ্মকে গ্রহণ করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তারকেশ্বরের স্ত্রী পদ্মকে বিভাসের হাতে তুলে দেয়। আত্মসচেতন বিদ্যুৎও পদ্মকে বিভাসের কাছে রেখে দূরে সরে যায়।

উপন্যাসে আরেকটি সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত চরিত্র ডাক্তার তারকেশ্বর। আপাতচতুর, সাবধানী, স্বার্থপর তারকেশ্বর রোগীর সেবা অপেক্ষা অর্থ আত্মসাতই মূল উদ্দেশ্য। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ঠকায়। সবাই তাকে ভয় পায়। সে আঁচনা, পয়ারপুর, নেদো, কেষ্টপুরের অর্ন্তযামী ভগবান। টেস্ট রিলিফের সময় অভুক্ত মানুষদের দিয়ে পুকুর কাটিয়ে নিজে ব্যবহার করে। রিলিফের সময় রাস্তার উন্নয়নের নামে কাঁকর মাটি ফেলে টাকা আত্মসাৎ করে। কৃষকদের নিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি খোলার নামে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করার চিন্তা করে। তবে শেষ পর্যন্ত বিভাসের কাছে নির্বাচনে হেরে তার উদ্দেশ্য সফল হয় না। যোগেশ্বর গ্রাজুয়েট হয়েও গ্রামের উন্নয়নের জন্য শহরমুখী হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুই বছর জেল খাটে। নিজের অসমাপ্ত কাজ বিভাসকে দিয়ে সম্পন্ন করে।

দিবানাথ কেষ্টপুর স্কুলের শিক্ষক। আদর্শের কারণে সবাই তাকে গৃহত্যাগী রাজপুত্র বলে। বাবার সাথে মতভেদের কারণে গৃহত্যাগী হয়ে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করে। দিবানাথ সরাসরি কোনো রাজনীতির সাথে না থাকলেও প্রগতি ভাবনায় বিশ্বাসী।

স্বাধীন ভারত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনেক স্বপ্ন এবং প্রতাশা ছিল। যেমন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রেণি শোষণের অবসান, সকলের জীবিকার্জনের সুযোগ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা। সংবিধানে নীতিগতভাবে এ ধরণের অনেকগুলি অধিকার স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। ফলে সমাজে নানারূপ সংঘাত দেখা দেয়। এ সংঘাত শোষক আর শোষিতের সংঘাত, স্বপ্ন পূরণ আর স্বপ্ন ভাঙার সংঘাত, প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির সংঘাত।[২৪২] অচিনপুর উপন্যাসে এক মধ্যবিত্ত যুবকের দৃষ্টিতে লেখক প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির সমীকরণ মেলালেন।

অলকা সংবাদ

সমরেশ বসু তাঁর মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সদর্থক-নঞর্থক সমস্ত ভাবনাকে রূপায়িত করেছেন। *অলকা সংবাদ* উপন্যাসে আয়কর বিভাগের তরুণ কর্মকর্তা অরুণের দৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত সমাজের অসৎ চাকুরিজীবীদের উৎকোচ গ্রহণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অফিসের ভ্রমণভাতা এবং জব্দকৃত সম্পদের হিসাব গরমিলের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের বেশির ভাগ কর্মকর্তা উৎকোচ গ্রহণ করে। অরুণ মনে করে 'চাকুরে মধ্যবিত্ত, শুধু মধ্যবিত্ত কেন উচ্চবিত্ত, এমনকি অফিস বয়-বেয়ারা পর্যন্ত সবাই এটাকে পবিত্র উপরি পাওনা বলেই জানে এবং সমাজে এটা প্রচলিত আছে।[২৪৩]

অরুণ পেশাগত জীবনে সৎ। আর এই সততার শিক্ষা সে তার মায়ের কাছে পেয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জীবনকে সে কখনোই উপরি পাওনার স্বর্গরাজ্য ভাবেনি। অরুণ তার সময়ে অনেকটা টাইপ চরিত্র। অরুণ অলোকার মত সুন্দরী নারীর বেনামি সম্পত্তির সঠিক হদিশ করতে গিয়ে এমন কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি হয় যা অনভিপ্রেত। রহস্যময়ী অলোকা ব্যনার্জি তার বেনামি সম্পত্তির কথা কোনোভাবেই আয়কর বিভাগের কাছে স্বীকার করে না। আয়কর বিভাগও তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে তাকে সর্বস্বান্ত করে তারপরও সে স্বীকার করে না। অরুণের একটা সময় মনে হয়েছে অলোকা স্বৈরিণী 'যার সরীসৃপ দেহে অনেক আবর্জনার ক্লেদ।[২৪৪] একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অবিবাহিত মেয়ের বিপুল বৈভবের মালিক হওয়াকে শুধু অরুণ নয় সমাজও নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। খবরের কাগজে অলোকাকে নিয়ে নেতিবাচক খবর ছাপে, বিশেষত

তার চরিত্র নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে। তারপরও অলোকার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। অলোকার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর অলোকা মুখ খোলে। তার প্রাক্তন প্রেমিকের অসৎ উপার্জনের সে ছিল রক্ষাকারী। প্রেমিক অপরাধী জেনেও অলোকা তাকে ত্যাগ করতে পারেনি। ব্যবসায়িক কোন্দলে অলোকার প্রেমিক খুন হয়। খুন হওয়ার পূর্বে প্রেমিক সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার অলোকাকে দিয়ে যায়। অলোকাও সম্পত্তির মোহ থেকে বের হতে পারেনি। ক্রমেই ডুবতে বসেছিল। অরুণ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকে মুক্তি দিয়েছে। মুক্ত স্বাধীন অলোকা সব হারিয়ে অরুণের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। এভাবেই ভিন্ন জগতের দুজন মানুষ এক হয়।

পুতুলের খেলা

কবি বিষ্ণু দে কলকাতা শহরকে মুখ্যত ভুঁইফোঁড় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের এক পড়ে পাওয়া শহর বলেছেন।[২৪৫] নিখিলেশ এই কলকাতা শহরের বাংলায় এমএ পাস করা বেকার যুবক। ছাত্রজীবন এবং পাস করে চাকরি সম্পর্কে সে অনেকটাই উন্নাসিক। লেখকের ভাষায় 'বরং কিছুটা আদর্শবাদী, তার চেয়ে বেশি, একটু গোঁড়া ধরনের ছেলে।'[২৪৬] কবিতা লিখত না কিন্তু কবিতার সমঝদার ছিল। বাহ্যিক জীবন নিয়ে কিছুটা হতাশা আর অবিশ্বাসী। ন্যায়পরায়ণতা ছিল তার অন্যতম গুণ। প্রেমের ক্ষেত্রে ছিল নীতিবান আর রাজনীতিতে ছিল ধৈর্যহীন। যুগযন্ত্রণায় তার চোখে-মুখে স্পষ্ট অবিশ্বাস আর হতাশার ছাপ দেখা যেত। সে বলত, এ পিঁপড়ের গতি শেষ পর্যন্ত আমাদের একটা গর্তের মধ্যে নিয়ে ফেলবে। যেখানে আমরা গোটা মধ্যবিত্ত সমাজটা চাপা পড়ে মরব।[২৪৭] অর্থাৎ তার স্বশ্রেণি মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। নিখিলেশ অনেকটা চাপা স্বভাবের। এ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'আমি একদিন বেশি ভদ্রলোক ছিলাম। যাকে বলে ফর্মাল। সেটা বৈষয়িক বটে, কিন্তু শ্রেণিচরিত্র নয়। ফর্মালিটিটুকু পরের বাড়ি পা টিপে মানুষ হওয়ার সংকোচ।'[২৪৮] এই নিখিলেশ কলেজে সুপ্রীতির প্রেমে পড়ে। প্রেম থেকে পরিণয়। দাম্পত্যজীবনে সুপ্রীতির প্রতি এক ধরনের আচ্ছন্নতায় কলকাতার বাইরে চাকরি খুঁজতে যায়নি। সুপ্রীতি আত্মসচেতন। নিজের চেষ্টার গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়েছে। যুগের দ্বান্দ্বিকতা কিংবা আত্ম-অহংকার তাকে স্পর্শ করেনি। বেকার স্বামী নিয়ে সুখেই থেকেছে। চাকরি করেছে কিন্তু চাকরির দাস হয়নি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করায় তার চাকরি চলে যায়। এখান থেকেই উপন্যাসে জটিলতা শুরু। নগর জীবনের তিক্ততা, বিরূপতা, জটিলতা এই বেকার যুগল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। নিখিলেশের আচরণে অসংগতি প্রকাশিত হয়। সারা দিন দুজন চাকরির চেষ্টা করে সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে। কিন্তু হতাশ হয় না, বেঁচে থাকার সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রত্যয়ে পরদিন আবার

বের হয়। নিখিলেশ ধার করে মিথ্যা বলে, তারপরও তাদের দাম্পত্যজীবনে তেমন সংকট তৈরি হয়নি। কিন্তু সুপ্রীতির অসুস্থতা সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। অনায়াসে নিখিলেশ বন্ধু হরিদাসের ফাঁদে ধরা দেয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে করে শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে। তার দ্বিতীয় স্ত্রী মালতি জন্মান্ধ। মালতির ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়। অর্থের লোভে হরিদাস নিখিলেশের বিয়ে দিয়েছিল। এই অর্থের জোগাড়ে যখন টান পড়ে তখন হরিদাস মাতাল হয়ে সবকথা সুপ্রীতিকে বলে দেয়। অসুস্থ সুপ্রীতি মীরগাঁয়ে এসে স্বামীর দ্বিতীয় দ্বারগ্রহণ দেখে নিখিলেশের জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। সুপ্রীতির মৃত্যুর পর তাদের সন্তানকে মালতি বুকে টেনে নেয় এবং সেই সাথে নিখিলেশের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। সিনেমাটিক কাহিনির ঢঙে লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মদহন এবং স্খলন দেখিয়েছেন।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে দাম্পত্যসংকটের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং যৌন জীবনের অস্বচ্ছতা। *পুতুলের খেলা* উপন্যাসে দাম্পত্য সংকটের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিলেশ সুপ্রীতিকে পেয়ে পিতৃমাতৃহীন গত জীবনের ব্যথা ভুলতে চেয়েছিল। বিয়ের রাত্রে সুপ্রীতিকে বলেছিল, 'দুগগি আমার মা-বাপহীন অনাত্মীয়র জীবনে সব আত্মীয়কে পাব তোমার মধ্যে।'[২৪৯] নিখিলেশ চেষ্টাও করেছিল কিন্তু নিয়তি তার সহায় হয়নি। চাকরির চেষ্টা করে বারবার বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর প্রাক্তন সহকর্মীর প্রচেষ্টায় একটা টিউশনি পায়। সুপ্রীতির মুখে এই সংবাদ নিখিলেশের বুকে কাটার মতো বিঁধেছে। সে জানে সুপ্রীতি 'জীবনকে লোভের চোখে দেখেনি, লাভের মন দিয়ে কষেনি। সংসারকে সে দেখেছে বড় অনাড়ম্বর বেশে।'[২৫০] সমকালীন অর্থনীতির বিপর্যয়ে একটি শিক্ষিত দম্পতি এরকম একটি ভাঙনের মুখে পড়ে। নিখিলেশের জীবনবোধ সুপ্রীতির মতো নয়। দুঃখ ও ভয়ের মহাসমারোহে সে জীবনকে দেখেছে :

> ঐ অনাড়ম্বর, তা-ই অসীম দিগন্তহীন। আড়ম্বরের সজ্জা আছে। তাকে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেঁধে সাজাতে হয়। আমি সেই সাজানো জীবনের ছোট্ট পরিধি চেয়েছিলাম। সার্কাসের ঘেরাওয়ের ঠুলি আঁটা টাট্টু ঘোড়াটার মতো। কেমনতর? হা, কালচারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখব আমার ঘর। আমাদের উভয়ের থাকবে কিছু মোটামুটি আয়। অভাব কখনও ফুঁসবেনা ঘরের দরজায় এসে। ঘর সাজাব নবীন-প্রবীণ কলাবস্তু দিয়ে, আসর বসবে কাব্যসাহিত্যে ও ইতিহাসের।[২৫১]

তার এই স্বপ্নের সংসার যখন চারপাশের কারো মধ্যে দেখেছে তখন মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়েছে, ব্যঙ্গ করেছে। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে যতই ধরতে চেয়েছে ততই তা নাগালছাড়া হয়েছে। সবশেষে এই ঘোড়দৌড়ে পরাজিত হয়ে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পঞ্চাশ টাকার টিউশনি তাকে ব্যঙ্গ করেছে।

নিঃসম্বল হয়ে সে আবার সুপ্রীতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। নিখিলেশ সুপ্রীতির বন্ধনে বাধা পড়লেও অন্তরে সে নিঃসঙ্গ। এক ধরনের ভয় আর আড়ষ্ঠতা তাকে পেয়ে বসেছে। এজন্যই স্ত্রীর সহকর্মী কনক তাকে বলেছে— আপনি একটু বেশি ভয় পেয়েছেন। সেজন্যে সহজভাবে কোনও কিছু নিতে পারেননি। নইলে, আজকে বোধহয় এ অবস্থায় এসে পড়তে হত না।[২৫২] তার নির্বিকারত্বে সবাই তাকে পরামর্শ দিয়েছে। হরিদাসের মতো প্রবঞ্চকও তাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি। জীবনযুদ্ধে ছলবল আর কলাকৌশলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। তাকে শিখিয়েছে একজনের কাছে যেটা পাপ, অন্যের কাছে সেটি কর্তব্য। তাকে মাধব বাড়ুজ্যের জন্মান্ধ মেয়েকে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছে। সুপ্রীতির অসুস্থতা, আর্থিক সংকট তাকে বৃত্তচ্যুত করে। সে বিয়েতে রাজি হয়। হরিদাসের সাথে বর সেজে মীরগাঁয়ে যায়। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়। মাধব বাড়ুজ্জের ঘরজামাই হয়ে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দেয়। তার দ্বিখণ্ডিত মন মালতিকে ঠকাতে চায়নি। সুস্থ-স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক মালতির সাথে তৈরি হয়নি। তাই মালতিকে বলে— 'লেখাপড়াটাকে বড় ভালোবসেছি, আমার একটি পরীক্ষার এখনও বছরখানেক বাকি আছে। ভেবেছিলাম এ বছর স্ত্রীকে স্পর্শ করব না। তাই...'[২৫৩] কলকাতায় ফিরে নগর কলকাতাকে তার শ্রীহীন আর কুৎসিত মনে হয়েছে। 'সমস্ত কলকাতাটা যেন আমাকে চিনে নিয়েছে আর ধিক্কার দিচ্ছে। সুপ্রীতির কাছে আর আগের মতো সহজ হতে পারেনি।'[২৫৪] শুধু সুপ্রীতি নয় মালতির কাছে তার নিজেকে মার খাওয়া জানোয়ারের মতো মনে হয়েছে। 'কোন এককালে একজনের মুখে শুনেছিলাম বিবেক বস্তুটি নাকি দুর্বল কাপুরুষের ছলনার হাতিয়ার। আজ মনে হচ্ছে ওটি পোষমানা জীবেরই নামান্তর। আমার দুর্বল মনের বিবেক মালতির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল।[২৫৫] মালতি-নিখিলেশ-সুপ্রীতির জীবনে আবিলতা এসেছে। সুপ্রীতির সাথে সম্পর্কে শীতলতা এসেছে। সুপ্রীতিকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে, বাড়িতে অতিথি এলে ভয় পেয়েছে। আস্তে আস্তে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। যে সুপ্রীতিকে সে সব কথা না বলে থাকতে পারতনা তার সাথে দৃষ্টি বিনিময়ের ভাষা জটিল হয়েছে। সুপ্রীতির সাথে সুখের দাম্পত্য হারানোর ভয়ে সে আতঙ্কিত হয়েছে। অথচ অসচ্ছল বেকার জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ককে আঁকড়ে বেঁচেছে। সবকিছু হারানোর ভয় প্রত্যক্ষভাবে তার ব্যক্তিত্ব এবং বোধের পারম্পর্যকে ভেঙে দিয়ে যে মনোজটিলতা সৃষ্টি করেছে সেখান থেকে বাঁচতে নীরবে হরিদাসের সকল চাহিদা পূরন করেছে। তার অন্তস্থ গ্লানি যখন তাকে বিতৃষ্ণার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তখন হরিদাসের কূটকৌশলে তার সমস্ত মিথ্যার বুনন ফাঁস হয়ে যায়। সে চিরদিনের জন্য সুপ্রীতিকে হারায়। সমরেশ বসু জীবনবাদী লেখক। নিখিলেশের মতো বেকার যুবকদের বহুমাত্রিক যন্ত্রণাকে তিনি শিল্পিত করেছেন।

মধ্যবিত্ত বলয়াবৃত মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নিচে নামতে পারে না। আবার উপরে ওঠার স্বপ্নে বিভোর থাকে। চাকরিসর্বস্ব হয়ে বেঁচে থাকায় যেন একমাত্র অবলম্বন।

নিখিলেশের আদর্শবাদী হওয়ার যে প্রচেষ্টা ছিল সেটাও এক ধরনের ছলনা, অন্তরের অন্তঃকরণের অতৃপ্তি আর ঈর্ষা। অনেকটা 'জল না পাওয়া, স্বাভাবিকভাবে না বাড়া চারা গাছের দুর্বলতা'র মতো।[২৫৬] রাজনীতি-অধৈর্যতার মূলে সেখানে সঠিক জায়গাটি না পাওয়া। সুপ্রীতিকে আশ্রয়ের কেন্দ্রে আছে সুপ্রীতির অন্ধ ভালবাসা। সুপ্রীতি ইচ্ছে করলে বন্ধু অতনুর সাথে সুখে সংসার করতে পারত কিন্তু তা না করে নিখিলেশের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। এই পরিণয়ে নিখিলেশ গর্ববোধ করে কারণ সুপ্রীতি সুন্দরী। নিখিলেশের অভাব যা তার কাছে একসময় বীভৎস মনে হতো, সেই অভাবকে সুপ্রীতি ভাব দিয়ে জয় করেছে। নর-নারীর দাম্পত্যসম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সূত্রবন্ধনে আবদ্ধ করে সমরেশ বসু তাকে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন এই উপন্যাসে। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দাম্পত্যসম্পর্কের সাবলীল বিকাশে অন্যতম বাধা।[২৫৭] কিন্তু এখানে নিখিলেশ-সুপ্রীতি যুগল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে।

নিখিলেশের ভালোবাসার কোনো ঘাটতি ছিল না কিন্তু একদিকে অর্থনৈতিক অক্ষমতা, অন্যদিকে ভালো থাকার অভিনয়— এই দুইয়ের সম্মিলনে যে পুতুল খেলা তা একসময় অন্তঃসারশূণ্যতায় পর্যবসিত হয়। নিখিলেশের মধ্যে স্ববিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। তাদের সম্পর্ক তখনই বিশুষ্ক হয়েছে যখন তাদের মধ্যে দ্বিতীয় নারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

উপন্যাসে হরিদাস-বীণা দম্পতি অমিত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে ব্যর্থ হয়। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় এই দম্পতি কোনো কাজ পায় না। হরিদাস স্খলিত জীবনযাপন কওে, বীণা তারই সঙ্গী হয়। অর্থ উপার্জন, পরিবারের দায়িত্ব নিতে সে ব্যর্থ হয়। তাই সারাদিন মদে মত্ত থাকে। বীণাকে নিখিলেশের কাকিমা সাজতে বাধ্য করে।

আর্থিক-সংকটতাড়িত মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিক জীবনের শিল্পভাষ্য *পুতুলের খেলা* উপন্যাস। লেখক এই উপন্যাসে মধ্যশ্রেণির পুরুষ চরিত্র সমূহকে পারিপার্শ্বিক এবং সামূহিক জটিল পরিস্থিতিতে অনেক দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। সেই তুলনায় নারীচরিত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত সাহসী। সুপ্রীতি, বীণা, কনক সকলেই বিরুদ্ধ পরিবেশে সংগ্রাম করেছে ।

বিষের স্বাদ

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তপতীর একটি বিশেষ অভিজ্ঞতাকে লেখক বিষের স্বাদ নাম দিয়ে *বিষের স্বাদ* উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। উপন্যাসটির নামকরণ একটি বিশেষ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে হলেও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ের প্রেম এবং দ্রোহকে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যুগপৎভাবে এসেছে উচ্চবিত্ত সমাজের বাস্তবতা, সাংস্কৃতিক দুরবস্থা, নারীর মনস্তত্ব এবং বিকার। উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিকের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তপতী। একটি বিপণি বিতানের বিক্রয়কর্মী। জয়তী তরফদারের বিপণি বিতানটি শুধু মেয়েদের জন্য। ফলে নানা ধরণের নারী কাস্টমার দোকানে আসে। পুরুষ কাষ্টমারের তার দোকানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। যে কারণে দোকানে কাজের ঝামেলা নেই, তবে ঝকমারি আছে। নারী মনস্তত্ব একটি জটিল বিষয়। তপতীর মতো বিক্রয়কর্মীদের নারী কাষ্টমারদের মন জয় করতে হয়। অনেক নারী তপতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সান্নিধ্য কামনা করে। তপতী বাধ্য হয়ে বলে 'আমি বিবাহিত।'[২৫৮]

তপতীর পরিবারটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার। তার বাবার ব্যবসায়িক সহকর্মী চ্যাটার্জির প্রতারণায় তপতীর বাবা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাবার শোকে মা মারা যায়। তপতীর দিদি, জামাইবাবু আকস্মিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। দিদির দুই সন্তান নিয়ে তার সংসার। ঐশ্বর্য থেকে দারিদ্রে নিপতিত হয়ে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় চাকরির পাশাপাশি পাশ্চাত্য ঢং-এ গড়ে ওঠা নাচের স্কুলে নাচের পার্টনার হিসেবে কাজ করে। তপতীর নিঃসঙ্গতার সঙ্গী নাচ। ট্যাংগো, স্প্যানিশ, ওয়ালজ প্রভৃতি নাচে সে পারদর্শী। এই নাচের সুত্র ধরে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়।

নাচই তপতীর প্রাণ। এই নাচের কারণে কৈশোরে পিতার বন্ধুপুত্র বিমানের সাথে কামজ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিমান তার সাথে প্রতারণা করে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার জন্ম নেয়। পরবর্তীতে রূপমুগ্ধ দীপকের প্রেমে কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি। তার পরিবর্তে দীপকের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য সহানুভূতি তৈরি হয়। অভিজিৎ-এর ব্যক্তিত্ব, সম্মোহনী ক্ষমতা তপতী প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। অভিজিৎ তার স্ব-সমাজে 'ডিসকোয়ালিফাইড, র‍্যাদার আনকালচারড'[২৫৯]বলে পরিচিত। কেননা অভিজিৎ উচ্চবিত্ত পরিবারের হলেও তার মনন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি অনুসারী। এ কারণেই সে হয়ে ওঠে তপতীর প্রেমিক পুরুষ, হৃদয়ের নিবিড়তম আত্মীয়। তারপরও তপতীর মধ্যে শূন্যতা কাজ

করেছে। অভিজিৎ- এর স্ত্রীকে ডির্ভোস দিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে তার মনে হয়েছে 'নিজের জিনিস বুকে নিয়ে চিরদিন যদি তা খচখচ করে তাহলে বাঁচব কেমন করে ?'[২৬০] এতকিছুর পরও তপতী যখন জানতে পারে অভিজিৎ তার পিতৃহন্তাকারকের পুত্র তখন অভিজিৎকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে।

অসম মানসিকতার কারণে অভিজিৎ-জয়ার দাম্পত্যসম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি। জয়ার উচ্চাভিলাষ ও অভিজিতের আত্মময়তা তাদের দাম্পত্যসম্পর্কে ভাঙন আনে। অভিজিৎ বিদেশে পড়াশোনা করেছে কিন্তু স্ত্রী হিসেবে শিক্ষিতা বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়ের কথা ভেবেছে। পরিবারের পছন্দে জয়াকে বিয়ে করে। বিয়ের পরই জানতে পারে জয়া ড্রিঙ্ক করে, স্মোক করে, পার্টিতে নাচানাচি করে। অভিজিৎ– এর রক্ষণশীল মন জয়ার প্রেমে স্থিত হতে পারেনি :

> জয়াকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, নিজেকেও। শেষ পর্যন্ত পারিনি। তবে আমার ধারণা ভালবাসা ব্যাপারটা বোধহয় আলাদা। কোনও কিছুর ভাগাভাগি দিয়ে সেটা পাওয়া যায় না। ভালবাসার কাছে মানুষের যুক্তিতর্ক সব শেষ হয়ে যায়। যদিও আমি জানি না সেই ভালবাসা কেমন।

জয়া তীব্র শ্লেষে অভিজিৎকে বলেছে, 'আচার্য প্রফুল চন্দ রায়'।[২৬১] জয়ার কটূক্তির কারণে অভিজিৎ নাচ শিখতে আসে। ওয়েস্টার্ন স্টাইল আর জীবনযাপনে এ অভ্যস্থ হতে চায়। দু সপ্তাহের মধ্যে নাচটা রপ্তও করে। নাচের স্কুলে তপতীর প্রতি মুগ্ধতা তার সংকটকে আরো গভীর করে। জয়ার কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভঙ্গি আর বিলাসী জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে অভিজিৎ তপতীর কাছাকাছি আসে। স্ত্রীর গ্লামারের চেয়ে তপতীর শান্ত স্নিগ্ধতা তাকে বেশি মুগ্ধ করে। ভেতরকার অসঙ্গতিতে অভিজিৎ উন্মুলিত :

> আমার চারপাশের পরিবেশে অনেক মানুষ আছে সত্যি, কিন্তু আমি দেখতে পাইনা। আমাকে বন্ধু খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়।[২৬২]

মানসিক যোগসূত্রহীন দাম্পত্যসম্পর্ক হয়ে ওঠে বিষাদময়। ভালোবাসার ব্যাখ্যা সে অনেকভাবে খোঁজে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় পরস্পরকে বোঝার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা আসে। এই ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছিল তপতীর মধ্যে। আত্মপরিচয় গোপন করে তপতীকে ভালবেসেছিল। অভিজিৎ তপতীর কাছে জীবনটা সঁপে দিয়ে শান্তি চেয়েছে। সে কারণে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে তপতীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। তপতী তার পরিচয় জানার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করে। তপতীর প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে হেরে গিয়ে অভিজিৎ বলে 'মনে রেখো, তোমাদের জন্যে সব সময়েই আছি। বিশেষ করে আমার এই ছেলে মেয়ে দুটির জন্য।'[২৬৩]

উপন্যাসের আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র দীপক। তপতীর নাচের পার্টনার। তপতীর গুণমুগ্ধ এবং রূপমুগ্ধ। তপতীর প্রত্যাখ্যানে সে বলেছে— কেন আমি দেখতে খারাপ আর কম মাইনের চাকরি করি বলে প্রেম করার চেষ্টাও করা যাবে না।[২৬৪] দীপক স্বপ্নচারী। সে স্বপ্ন দেখে হলিউডের সিনেমার নায়ক হবে, যা বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের চিরকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আর সভ্যতার কর্কটরোগে শুধু পুরুষ বিকারগ্রস্ত নয়, নারীও মনোবিকারের শিকার। তপতীর সহকর্মী মীরা এবং ললনার প্রেম, বিকৃত সুখানুভব এরই প্রমাণ। এছাড়া আরেক সহকর্মী পূরবীর বন্ধুদের সাথে বেড়ানোটা সোর্স অব বিজনেসের নামান্তর।

উপন্যাসটি উচ্চবিত্তের জীবনভাবনায় নির্মিত। তারপর তপতীর মতো মধ্যবিত্ত নারীর টিকে থাকার সংগ্রামকে ঔপন্যাসিক সম্মান জানিয়েছেন।

এই পর্বের উপন্যাসে সমরেশ বসুর শিল্পীসত্তার উত্তরণে কিছু মৌল বিষয়ের দিকে আমরা আলোকপাত করতে পারি। যেমন অনেক সমালোচক সমরেশে বসুর উপন্যাসে যৌনতা ব্যবহারের সমালোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে যৌনতার ব্যবহার সমরেশ বসু প্রথম করেননি। ১৯৩০-এ বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনধারণের সার্বিক গ্লানির প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে যৌনতার অনুপ্রবেশ ঘটে। কল্লোলের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যে যৌনতার ব্যবহার দেখা যায়। সমরেশ বসুকেও দ্বিধাদীর্ণ সমস্যাজর্জরিত আধুনিক জীবনের কথা লিখতে গিয়ে কখনো কখনো যৌনতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সমালোচক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> যৌনতাঘটিত বিষয়ের প্রতি লেখক হিসেবে সমরেশের আকর্ষণ প্রবল, এদিক থেকে তিনি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় বা সতীনাথ ভাদুড়ীর বিপরীত প্রান্তে, অনেকটা পরিপূরকের মতো। কিন্তু এই আকর্ষণের পাশাপাশি যৌনতার সঙ্গে জড়িত একটা সূক্ষ্ম পাপবোধ, একটা অশুভ— আশঙ্কা তাঁর যৌনতা কল্পনার সঙ্গে সব সময় জড়িয়ে আছে। মনে হয় এ দৃষ্টি নিরাবেগ নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নয়, এর মধ্যে অবদমিত মধ্যবিত্ত মনের প্রভাব ক্রিয়াশীল। এই বাবদে মানিকের থেকে কল্লোলীয়দের সঙ্গেই তার মিল সমধিক।[২৬৫]

বিবর, প্রজাপতি, পাতক এই তিনটি উপন্যাসই উত্তমপুরুষে রচিত। তিনটি উপন্যাসই যেন একটি গল্পের সম্প্রসারিত রূপ। এই তিনটি উপন্যাসে যৌনতার যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষণীয়। মধ্যবিত্ত তার পারিবারিক সংস্কারের বশেই যৌনতার প্রসঙ্গে আলাপে নিরুৎসাহী। ‘সে- হিসাবে সমরেশ বসু একটা সংস্কারে ঘা মেরেছিলেন, বলা যায়। *প্রজাপতি* নিয়ে উত্তেজিত হয়নি এমন কিশোর বা যুবক তখন প্রায় পাওয়ায় যেত না। রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে, এমনকি রাজনৈতিক আলোচনাচক্রে তখন উড়ে বেড়াচ্ছে।

‘প্রজাপতি’, তবে তার পাখায় একটা রঙঃ যৌনলালসা।[২৬৬] *স্বর্ণপিঞ্জর* উপন্যাসে পীযুষ অবদমনের কারণে মানসিক সংকটে পড়ে। *তিন ভুবনের পার*-এর দাম্পত্য সংকটের মূল দ্বিতীয় নারীর উপস্থিতি। শৈশবে- কৈশোরে দেখা যৌন বিকৃতির অভিজ্ঞতা *প্রজাপতি* ও *পাতকের* নায়কের জীবনে কী ভূমিকা রেখেছে তা ঔপন্যাসিক বিবৃত করেছেন। বুর্জোয়া সমাজ ও অর্থনীতি আমাদের এ যাবৎ শিখিয়েছে, প্রেম ও যৌনতা জীবনের প্রধান সত্য। সমরেশ সেই মধ্যবিত্ত ইলিউশনকে কুঠারাঘাতে নির্মূল করতে চেয়েছেন।[২৬৭] এ কারণেই কিন্তু *বিবরের* অনামা নায়ক নীতাকে হারিয়ে আবার নীতার ফ্লাটে ফিরে গেছে। *প্রজাপতি*-এর সখেন্দু তার দাদাদের অমিতচারের নিন্দা করেছে শিখার শুদ্ধ ভালোবাসায় স্নাত হয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চেয়েছে। *পাতক*-এর নায়ক যে অনৈতিক কাজে লিপ্ত মাকে হত্যা করে নিজে আর সে কাজে তৃপ্তি পায় না। *তিন ভুবনের পার*-এর সুবীর সরসী দাম্পত্যজীবনের সমস্ত জঞ্জাল ছাড়িয়ে শুদ্ধ প্রেমে স্থিত হয়েছে। *স্বর্ণপিঞ্জর*-এ পীযূষ ছটার মৃত্যুর পর যৌন বিকৃতি ও যৌনভাবনা থেকে বেরিয়ে মানবিক প্রেমে মুক্তি পেয়েছে।

এই পর্বের উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বাস্তবতা প্রকাশে বিভৎস রসের প্রয়োগ করেছেন। *বিবর প্রজাপতি পাতক* তিনটি উপন্যাসে বীভৎস রসের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ভারতীয় রসতত্ত্ব অনুসারে বীভৎস রস মনের ঘৃণাকে ব্যঞ্জিত করে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বিষ্ঠা, কৃমি প্রভৃতি থেকে উদ্গাত উদ্বেগী নামে বীভৎস রসের একটি ভেদ নির্ণয় করেছিলেন।[২৬৮] মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদ বধ* কাব্যে নরকের বর্ণনায় এই রসের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সমরেশ বসু ধ্রুপদী ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে মধ্যবিত্তের অসংগত জীবন প্রকাশে এই রসের ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন *বিবরের* অনামা নায়কের নীতার বাথরুম ব্যবহারের বর্ণনায়, কিংবা *পাতকের* নায়কের ভালোবাসার চুম্বনে পায়োরিয়ার গন্ধে অথবা *প্রজাপতির* সুখেনের মাস্টারবেশনে কুকুরের গু খেতে শেখার বিবরণে। সুখেনের এই কামপ্রবৃত্তির উন্মীলন psycho sexual disorder থেকে উদ্গত। আদতে প্রত্যেকটি চরিত্রই তপ্ত নির্মম জগতের বাসিন্দা। এসবই আমাদের ভেতকার বিবমিষাকে জাগিয়ে দেয়। বিকারগ্রস্ত সমাজের চেহারা স্পষ্ট করে।

এই পর্বের উপন্যাসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তির অনন্বয়বোধের প্রকাশ। ‘মূল্যবোধের যখন সমূল বিনষ্টি দেখা দেয় মানুষের মনে তখন এক অদ্ভুত অনন্বয়বোধ শামুক স্বভাবের মত মানুষকে গ্রাস করে।[২৬৯] *বিবর প্রজাপতি পাতক, স্বীকারোক্তি, পুতুলের খেলা* উপন্যাসের নায়কেরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। বিনাশী যুগধর্মের প্রভাবে এদের কেউই নৈঃসঙ্গ্যের সংক্রাম থেকে মুক্তি পায়নি। অনন্বয়ের বেদনায় প্রত্যেকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

এই পর্বের উপন্যাস *বিবর, প্রজাপতি, পাতক*-এর সাথে অনেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাদৃশ্য খোঁজেন। সমরেশে বসুর চিন্তাধারা পাশ্চাত্যনুসারী নয়, তিনি ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। তারপরও বিচ্ছিন্নভাবে পাশ্চাত্যভাবের কিছু বিষয় তাঁর মধ্যে চলে এসেছে যদিও *বিবর, প্রজাপতি, পাতক* উপন্যাস রচনার সময় তাঁর জেমস জয়েস, সার্ত্রে, ক্যামু কিংবা কাফকা-এর লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাঁর সাহিত্যে জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে গোর্কি, লু-সুন, জ্যাক লণ্ডন বা হেমিংওয়ের দূরাগত প্রভাব লক্ষ করা গেছে।[২৭০] অনেক সমালোচক হেনরিক ইবসেন-এর *ওয়াইল্ড ডাক*-এর সাথে অনেকেই বিবরের সাদৃশ্য খোঁজেন। *ওয়াইল্ড ডাক*-এর নায়ক সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বন্ধু ইয়ালমারের সুখী সংসারে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটায়। গ্রেগার্স ইয়ালমার একদালকে এবং তার পরিবারকে এমন এক পরিস্থিতে দাঁড় করিয়ে দেয় যা তাদের অনভিপ্রেত। ইয়ালমারের পরিবারের এক-একটি সদস্যকে গ্রেগার্স সুখের বিবর থেকে টেনে বের করে এনে সত্যেও মুখোমুখী করে। এই সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ইয়ালমারের চৌদ্দ বছরের কিশোরী কন্যা হেডভিগকে হত্যা করে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতা ইয়ালমারের পরিবারের ছিলনা। *বিবর*-এ হত্যা দৃশ্য আছে এবং নায়ক সেই হত্যা করে সুখের বিবর থেকে পতিত হয়। তবে গ্রেগার্স-এর থেকে বিবরের নায়কের পার্থক্য হচ্ছে এই নায়ক নীতাকে হত্যার পর স্বস্তি অনুভব করে। *The Fall (La Chute)* (1956) উপন্যাসে ক্যামু স্বেচ্ছানির্বসিত একজন চৌকস আইনজীবীর জবানীতে উত্তমপুরুষে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, শঠতা, নীচতা, ভণ্ডামি, যৌনতা এবং লোভ লালসার চিত্র তুলে ধরেছেন। 'কিছুটা রোমান্টিক শব্দভাষ্যে অথচ পূর্বাপর তির্যক বাকভঙ্গিতে দূষিত নাগরিক সমাজচিত্র বর্ণনার পাশাপাশি স্বকৃত পাপের সরস বিবরণ পেশ করেছেন কল্পিত শ্রোতার সামনে।'[২৭১] *বিবর, প্রজাপতি, পাতক, স্বীকারোক্তি*-এর নায়ক তাদের স্বগতোক্তির মাধ্যমে সমাজজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের অসামঞ্জস্যতার বিবরণ দিয়েছে। *The Fall*-এ স্বাধীনতার কথা থাকলেও তা আত্মবিদ্রুপে শেষ হয়েছে। কিন্তু *বিবর, প্রজাপতি, পাতকে*-এর শেষে জীবনের সদর্থক ভাবনায় এবং অন্ধকার থেকে উত্তরণের আর্তিতে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া অনেক সমালোচক সার্ত্রের *বিবমিষা*-এর সাথে *বিবর*-এর নায়কের তুলনা করে। উভয়ের নায়কের মধ্যে আত্মদহন লক্ষ করা যায়। *বিবমিষা*র নায়কের উদ্‌গীরনের মতো *বিবর*-এর নায়ক নীতাকে হত্যার পর বাড়ি ফিরে বেসিনে বমি কওে এবং স্বস্তি অনুভব করে। এই উদ্‌গীরনের পরই তার মধ্যে যথার্থ পরিবর্তন আসে। সে একে-একে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, হরলালের রিপোর্ট, চাকরি সমস্ত কিছুর বলয় থেকে বেরিয়ে আসে। সমাজের পাপকে গলধঃকরন করে সে আর সুখের বিবরে থাকতে চায়নি। অর্থ্যাৎ মধ্যবিত্তের প্রথাবদ্ধ আয়েশী জীবন সে পরিত্যাগ করে। *বিবর* উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেকেই

অনুসন্ধান করেছেন, যেমন *বিবর*-এর সাথে জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*-এর অনেকেই তুলনা করেছেন। *ইউলিসিস*-এর মতো *বিবরে* মনোসমীক্ষণ রীতির ব্যপক প্রয়োগ নেই। নায়কের মনস্তত্ব অনুধাবনে সীমিত আকারে চেতনাপ্রবাহের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে জেমস জয়েসের সাথে সমরেশ বসুর সাদৃশ্য এইখানে যে, উভয়েই সমাজ-সমালোচক। *ইউলিসিসে* লিওপোল্ড ব্লুম আইরিশ হওয়ার অর্থ কী? কে আইরিশ হতে পারে? আয়ারল্যান্ড কাকে বলে! জাতি কী?-এসব প্রশ্ন ব্লুমকে কুরে কুরে খেয়েছে।[২৭২] সকালে ঘুম থেকে উঠে লিওপোল্ড ব্লুম তার স্ত্রী মলি ব্লুমের জন্য নাস্তা তৈরি করতে করতে নানা স্মৃতি, গল্প দৃশ্যের সন্নিবেশে যন্ত্রণার দহনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়র চরম এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়।[২৭৩] *বিবর*-এর নায়কও বহুচারিনী নীতার প্রতি ঘৃণায় অনুভূতির এমন এক স্তরে পোঁছায় যেখান থেকে সে নীতাকে হত্যা করে।

পরিশেষে বলতে হয় সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত জীবন নির্মাণে মধ্যবিত্তের বিপন্নতাবোধকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন বলেই ক্ষুরধার বিদ্রূপের কষাঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজকে বারবার আঘাত করেছেন। জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। এই পর্বের মধ্যবিত্ত চরিত্ররা স্বসমাজের বিরূপতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। রাজনীতির স্বার্থপর সুবিধাবাদী চরিত্রকে সামনে এনেছেন। তিনি মুখোশধারী ভদ্রলোকের লেবাস খুলে দিয়েছেন। আত্মিক সঙ্কটাদীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের চারিত্রবৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে এই পর্বে। পলায়নপর মধ্যবিত্তের অন্তর্লোককের সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা খুব কম লেখকই রূপায়িত করেছেন। সমরেশ বসু এসব চরিত্র নির্মাণে কোনোক্ষেত্রেই আপোশ করেননি।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. গুণময় মান্না, 'বিবর–প্রজাপতির উত্তরাধিকার' সম্পাদক. স্বপন দাস অধিকারী, ২য় ভাগ, *এবং জলার্ক* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ২০০০), পৃ. ১
২. রমেন্দ্র বর্মণ, *রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : বাণী প্রকাশ ১৯৮৯) পৃ. ৩
৩. প্রমথ সেনগুপ্ত, সমরেশ বসু : একের ভিতর দুই, সম্পাদক. স্বপন দাস অধিকারী, দ্বিতীয় ভাগ, *এবং জলার্ক* পৃ. ২৩
৪. ঝুমা রায়চৌধুরী, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন, প্রথম খ* (কলকাতা : পূর্বাশা, ২০০৭), পৃ. ৩৮০
৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *হৃদয়ের একূল-ওকূল* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০
৬. সমরেশ বসু, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, সম্পাদক, সরোজ *বন্দ্যোপাধ্যায়*, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বি. মু,২০০০), ভূমিকাংশ, পৃ. ৬
৭. ঝুমা রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪
৮. *বিবর*, সমরেশ বসু, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, পৃ. ৪৮২
৯. সুমনা দাস সুর, "নির্বাসিতের বিদ্রোহ : আলবেয়ার কামুর 'দি আউটসাইডার' এবং সমরেশ বসু'র 'বিবর'", আলবেয্যর কামু বিশেষ সংখ্যা, *এবং মুশায়েরা*, শারদীয় ১৪১৫, সম্পাদক, সুবল সামন্ত, পৃ. ১৫৩
১০. অরুণ সান্যাল, *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৭১৬
১১. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খ, পৃ. ৪৭১
১২. সিদ্ধার্থ রঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক, *বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস* (কলকাতা : উবুদশ, ২০১১), পৃ. ২০৮
১৩. সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩) পৃ. ১৯৮
১৪. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০১
১৫. সুমনা দাস সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩
১৬. আলবেয়ার কামু, *আউটসাইডার*, অনুবাদ, রতন কুমার দাস, (কলকাতা : কবিতীর্থ ২০১৪), পৃ. ০৯
১৭. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০১
১৮. সুমনা দাস সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩
১৯. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭) পৃ. ৩০
২০. *তদেব*, পৃ. ৩১
২১. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, পৃ. ৪৬৬
২২. *তদেব*, পৃ. ৪৬৬
২৩. *তদেব*, পৃ. ৪৬৯
২৪. অরুণ সান্যাল *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২৭
২৫. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৪
২৬. *তদেব*, পৃ. ৪৮৯
২৭. *তদেব*
২৮. *তদেব* পৃ. ৪৯০
২৯. আলবেয়ার কামু, *আউটসাইডার*, অনুবাদ, রতন কুমার দাস, পৃ. ৩১
৩০. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৩
৩১. সম্পাদক, সিদ্ধার্থ রঞ্জন চৌধুরী, *বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস*, পৃ. ২০৮
৩২. ঝুমা রায় চৌধুরী , *পূর্বোক্ত*-পৃ. ৩২১
৩৩. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৫
৩৪. *তদেব*, পৃ. ৫১৫
৩৫. *তদেব*
৩৬. *তদেব*
৩৭. *তদেব*, পৃ. ৫২২
৩৮. সুমনা দাস সুর, "নির্বাসিতের বিদ্রোহ : আলবেয়ার কামু'র 'দি আউটসাইডার' এবং সমরেশ বসু'র 'বিবর'", *এবং মুশায়েরা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩
৩৯. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪০
৪০. *তদেব*, পৃ. ৫৪১
৪১. সমরেশ বসু, *বিবর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৩, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৫

৪২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫
৪৩. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় 'অস্তিত্ববাদ', সম্পাদক, হাবিব রহমান, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ধ্রুপদী ও আধুনিক (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ২৭৪
৪৪. সমরেশ বসু, *বিবর, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪৬
৪৫. *তদেব*
৪৬. বীরেন্দ্র দত্ত, *সাহিত্যে অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, প্র-প্র ১৯৯০) পৃ. ৬০
৪৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১
৪৮. সমরেশ বসু, *বিবর, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯৭
৪৯. *তদেব*, পৃ. ৪৯৮
৫০. *তদেব* পৃ. ৪৭৪
৫১. *তদেব* পৃ. ৪৬৭
৫২. *তদেব*, পৃ. ৪৬৮
৫৩. *তদেব*, পৃ. ৫৩৭
৫৪. সুমনা দাস সুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭
৫৫. সুমিতা চক্রবর্তী, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
৫৬. *তদেব*, পৃ. ৫৪২
৫৭. সুমনা দাস সুর, "নির্বাসিতের বিদ্রোহ : আলবেয়ার কামু'র 'দি আউটসাইডার' এবং সমরেশ বসু'র 'বিবর" *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭
৫৮. মোঃ খোরশেদ আলম, 'সমরেশ বসুর উপন্যাসঃ ভাষা নির্মিতির বৈচিত্র্য', *সাহিত্যিকী*, (সম্পাদক : প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ), ত্রিচতুারিংশ সংখ্যা, জুন ২০১৩, পৃ. ৮০
৫৯. *তদেব*, পৃ. ৮৭
৬০. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতাঃ প্রজ্ঞা বিকাশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০), পৃ. ১০৭১
৬১. সমরেশ বসু, *বিবর, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪
৬২. *তদেব*, পৃ. ৫১২
৬৩. মোঃ খোরশেদ আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯
৬৪. সমরেশ বসু, *বিবর, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬৫
৬৫. *তদেব*, পৃ. ৫১০-৫১১
৬৬. সমরেশ বসু, *স্বর্ণপিঞ্জর, সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০০১), পৃ. ৪১৫
৬৭. *তদেব*, পৃ. ৪৫৬
৬৮. *তদেব*
৬৯. *তদেব*
৭০. *তদেব, পৃ. ৪৫৭*
৭১. *তদেব* পৃ. ৪৫৮
৭২. *তদেব* পৃ. ৪৪১
৭৩. *তদেব*, পৃ. ৬
৭৪. *তদেব*
৭৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, *সমরেশ বসু আমাদের বাস্তব* (কলকাতা : একুশ শতক, ২০১৩), পৃ. ১৫০
৭৬. লুইস হেনরি, *আদিম সমাজ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা বুলবন ওসমান (ঢাকা : অবসর ২০০০), উদ্ধৃত, সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার* (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৬), পৃ. ২০৮
৭৭. *তদেব*, পৃ. ২১০
৭৮. মধুমিতা আচার্য, *স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা* (কলকাতা : কমলিনী, ২০১৩), পৃ. ৩৭
৭৯. সমরেশ বসু, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৩*, ভূমিকাংশ সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ৬

৮০. সমরেশ বসু, *তিন ভুবনের পারে*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ৩২০
৮১. *তদেব*, পৃ. ৩৩০
৮২. *তদেব*, পৃ. ৩৫৫
৮৩. *তদেব*, পৃ. ৩২৩
৮৪. ঝুমা রায় চৌধুরী *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন*, *প্রথম খণ্ড* (কলকাতা : পূর্বাশা ২০০৭) পৃ. ৫৯৩
৮৫. *তদেব*
৮৬. সমরেশ বসু *তিন ভুবনের পারে*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, , পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩
৮৭. *তদেব* পৃ. পৃ. ৩৪৮
৮৮. *তদেব*, *পৃ*. ৩৫৫
৮৯. শিবনারায়ণ রায়, আলবেয়্যর কামু, *এবং মুশায়েরা-২০০৮*, (সম্পাদক : সুবল সামন্ত), পৃ. ৩১
৯০. সমরেশ বসু, *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ৩৬১
৯১. *তদেব*. পৃ. ৩৬৭
৯২. *তদেব*
৯৩. সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাতকার, অনুলেখক : নিতাই বসু (কলকাতা : মৌসুমী প্রকাশনী ১৯৮৯), পৃ. ৩৭
৯৪. সমরেশ বসু, *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্তি, পৃ. ৩৬১
৯৫. *তদেব*, পৃ. ৩৬৩
৯৬. *তদেব*, পৃ. ৩৬৪
৯৭. *তদেব*, পৃ. ৩৬৮
৯৮. *তদেব* , পৃ. ৩৭০
৯৯. *তদেব*
১০০. *তদেব* , পৃ. ৩৭৭
১০১. *তদেব*, পৃ. ৩৭৪
১০২. *তদেব* , পৃ. ৩৭৬
১০৩. *তদেব* , পৃ. ৩৭৯
১০৪. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যত* (কলকাতা : পাভলভ ইনস্টিটিউট, ৩য় মুদ্রণ ২০১০) পৃ. ৫৭
১০৫. Soren Kierkegaard Either/or voll. 11. tram woder Lower, Newyork, p. 141)
নীরুকুমার চাকমা, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৩৬
১০৬. জ্যাঁ পল সার্ত্র, বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত সম্পাদিত, *এবং মুশায়েরা*, পৃ. ৩১৫
১০৭. জ্যাঁ পল সার্ত্র, 'জীবনকথা', শ্রাবন্তী ভৌমিক, *এবং মুশায়েরা*, পৃ. ৯৮
১০৮. সমরেশ বসু *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০
১০৯. *তদেব* পৃ. ৩৯২
১১০. *তদেব* পৃ. ৩৯৩
১১১. *তদেব* পৃ. ৪১৯
১১২. *তদেব* পৃ. ৩৯৮
১১৩. নীরুকুমার চাকমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১১৪. *তদেব* পৃ. ৪৩০
১১৫. *তদেব* পৃ. ৪৩৪
১১৬. *তদেব* পৃ. ৪৩৭
১১৭. প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস, সম্পাদক, অরুণ সান্যাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৬
১১৮. ঝুমা রায় চৌধুরী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৮
১১৯. সমরেশ বসু *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯
১২০. *তদেব* পৃ. ৪১০
১২১. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন* (বাংলা একাডেমি ২০০৩), পৃ. ৩
১২২. সমরেশ বসু *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮

১২৩. সরকার আবদুল মান্নান, উপন্যাসে তমসাবৃত্ত জীবন, পৃ. ৩
১২৪. সমরেশ বসু *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, , পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৮
১২৫. *তদেব*, পৃ. ৪১০
১২৬. *তদেব* পৃ. ৪১৩
১২৭. *তদেব*, পৃ. ৪১৭
১২৮. *তদেব* পৃ. ৪০৭
১২৯. *তদেব*, পৃ. ৪৩৭
১৩০. *প্রজাপতির বিচার-প্রজাপতি*, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৯), পৃ. ১৪৩
১৩১. মোঃ খোরশেদ আলম, 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে ভাষা নির্মিতির বৈচিত্র্য', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১
১৩২. সমরেশ বসু *প্রজাপতি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫
১৩৩. *তদেব*, পৃ. ৩৭০
১৩৪. *তদেব* , পৃ. ৩৭২
১৩৫. দিপালী নাগ, *এবং মানুষ সমরেশ বসুর গল্প* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ১৪১২), পৃ. ৫১
১৩৬. সমরেশ বসু, নিজেকে জানার জন্য, *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২ থেকে পুনমুদ্রিত, দেশ ১৪ মে, ১৯৮৮ সংখ্যায়, পৃ. ২৯
১৩৭. সমরেশ বসু, *স্বীকারোক্তি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৩য় মুদ্রণ ২০০৮), পৃ. ৪৮৯
১৩৮. *তদেব*, পৃ. ৫১২
১৩৯. *তদেব* পৃ. ৩৩৫
১৪০. *তদেব* পৃ. ৪৯২
১৪১. *তদেব*
১৪২. *তদেব*
১৪৩. *তদেব* পৃ. ৪৯৪
১৪৪. *তদেব*
১৪৫. *তদেব*, পৃ. ৪৯৫
১৪৬. *তদেব*
১৪৭. *তদেব* পৃ. ৪৯৬
১৪৮. *তদেব*
১৪৯. *তদেব*
১৫০. *তদেব*
১৫১. *তদেব* পৃ. ৪৯৭
১৫২. ঝুমা রায় চৌধুরী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৯
১৫৩. সমরেশ বসু, *স্বীকারোক্তি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২
১৫৪. *তদেব* পৃ. ৫১৩
১৫৫. *তদেব*
১৫৬. *তদেব* পৃ. ৫১৪
১৫৭. *তদেব* পৃ. ৫২২
১৫৮. বার্ট্রান্ড রাসেল, *বিবাহ ও নৈতিকতা*, (অনুবাদ : নূরুল আনোয়ার খান), ঢাকা প্রকাশন, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৯৮
১৫৯. সমরেশ বসু, *স্বীকারোক্তি*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পৃ. ৫২৪
১৬০. *তদেব*
১৬১. *তদেব*
১৬২. *তদেব*, পৃ. ৫১৫
১৬৩. *তদেব*, পৃ. ৫৩৭
১৬৪. *তদেব*, পৃ. ৫৩৮
১৬৫. *তদেব*
১৬৬. *তদেব*, পৃ. ৫৪০

১৬৭. *তদেব*, পৃ. ৪৯০
১৬৮. *তদেব*, পৃ. ৫৪০
১৬৯. *তদেব*, পৃ. ৪৯০
১৭০. *তদেব*, পৃ. ৫০০
১৭১. *তদেব*, পৃ. ৫৪০
১৭২. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬), পৃ .১৯৫
১৭৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য এপার বাংলা ওপার বাংলা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং২০০৯) পৃ. ১৩০
১৭৪. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩
১৭৫. *তদেব*
১৭৬. *তদেব*
১৭৭. *তদেব*
১৭৮. *তদেব*, পৃ. ৪৫৩
১৭৯. *তদেব*
১৮০. *তদেব*
১৮১. *তদেব*, পৃ. ৪৫৪
১৮২. *তদেব*, পৃ. ৪৫৫
১৮৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ২০০০), পৃ. ৬৩০
১৮৪. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩
১৮৫. *তদেব*, পৃ. ৪৪৩
১৮৬. *তদেব*
১৮৭. *তদেব*, পৃ. ৪৪৭
১৮৮. *তদেব*, পৃ. ৪৪৮
১৮৯. *তদেব*, পৃ. ৪৫১
১৯০. অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮), পৃ. ২৮৯
১৯১. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৫
১৯২. *তদেব* পৃ. ৪৬৬
১৯৩. অশ্রুকুমার শিকদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯০
১৯৪. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬
১৯৫. *তদেব* পৃ. ৪৭৯
১৯৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৫
১৯৭. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৯
১৯৮. *তদেব*, পৃ. ৪৫২
১৯৯. *তদেব*, পৃ. ৪৫৯
২০০. *তদেব*, পৃ. ৪৫৪
২০১. *তদেব*, পৃ. ৪৬০
২০২. নিতাই বসু, *কালকূট* (কলকাতা : জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স ১৩৯৪), পৃ. ২৪৪
২০৩. ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ, শৈবাল মিত্র, *অনুষ্টুপ*, শীত সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ১৬, দ্রষ্টব্য : ঝুমা রায় চৌধুরী, পৃ. ৩৬১
২০৪. *তদেব*
২০৫. *তদেব*, পৃ. ৩৫৮
২০৬. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬
২০৭. *তদেব* পৃ. ৪৫০
২০৮. *তদেব* পৃ. ৪৫৭
২০৯. *তদেব*
২১০. ঝুমা রায় চৌধুরী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৯
২১১. মোঃ খোরশেদ আলম, 'সমরেশ বসুর উপন্যাস : ভাষা নির্মিতির বৈচিত্র', *সাহিত্যিকী*, পৃ. ৯০

২১২. *তদেব*, পৃ.৯১
২১৩. বিশ্বজিৎ রায়, 'আচ্ছা আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম' সম্পাদক, স্বপন দাস অধিকারী, *এবং জলার্ক* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি ২০০০), পৃ. ৬৪
২১৪. সমরেশ বসু, *পাতক*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১
২১৫. *তদেব*, পৃ. ৪৫৯
২১৬. *তদেব*
২১৭. *তদেব*, পৃ. ৪৪৮
২১৮. *তদেব*, পৃ. ৪৪২
২১৯. *তদেব*, পৃ. ৪৪৮
২২০. *তদেব*, পৃ. ৪৫২
২২১. *তদেব*
২২২. *তদেব*, পৃ. ৪৭৩
২২৩. *তদেব*
২২৪. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকা : মুক্তধারা, ২০০৮) পৃ. ৩৪
২২৫. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১৯
২২৬. অরুণ সান্যাল *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১৭
২২৭. সমরেশ বসু, *পদক্ষেপ*, সমরেশ বসু রচনাবলী-৮, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১১), পৃ. ১৩৫
২২৮. *তদেব*
২২৯. *তদেব*, পৃ ১৩৭
২৩০. *তদেব*, পৃ ১৩৬
২৩১. সমরেশ বসু, *অলিন্দ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ৫৬২
২৩২. *তদেব*
২৩৩. *তদেব* , পৃ. ৫৬৪
২৩৪. *তদেব*, পৃ. ৫৯৫
২৩৫. *তদেব*, পৃ. ৫৯২
২৩৬. *তদেব*
২৩৭. *তদেব*, পৃ. ৫৬৩
২৩৮. *তদেব*, পৃ. ৫৬৪
২৩৯. *তদেব*, পৃ. ৫৮১
২৪০. সমরেশ বসু, *অচিনপুর*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৮, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩
২৪১. *তদেব*, পৃ. ৫১০
২৪২. মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ.৬৩
২৪৩. সমরেশ বসু, *অলকা সংবাদ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৮, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৯৭
২৪৪. *তদেব*, পৃ ২২৬
২৪৫. বিষ্ণু দে, এই আমাদের কলকাতা, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৮, পৃ. ২৩০
২৪৬. সমরেশ বসু, *পুতুলের খেলা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-১৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০৩
২৪৭. *তদেব*, পৃ. ২০৪
২৪৮. *তদেব*, পৃ. ২০৮
২৪৯. *তদেব*, পৃ. ২৪৮
২৫০. *তদেব*, পৃ. ২২৯
২৫১. *তদেব*, পৃ. ২৩০
২৫২. *তদেব*, পৃ. ২৩১
২৫৩. *তদেব*, পৃ. ২৪৮

২৫৪. *তদেব*, পৃ. ২৫২
২৫৫. *তদেব*, পৃ. ২৪৫
২৫৬. *তদেব*, পৃ. ২১১
২৫৭. সিরাজ সালেকীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭
২৫৮. সমরেশ বসু, *বিষের স্বাদ, সমরেশ বসু রচনাবলী*-১১, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. প্রথম সংস্করণ), ২০০৬, পৃ. ৬৯
২৫৯. *তদেব*, পৃ. ১০৫
২৬০. *তদেব*, পৃ. ১১৩
২৬১. *তদেব*,,. ৯২
২৬২. *তদেব*, পৃ. ১০৫
২৬৩. *তদেব*, পৃ. ১১৭
২৬৪. *তদেব*, পৃ. ৭৩
২৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ ২০০৯) পৃ. ২৫৩
২৬৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রজাপতি-চক্র', *এবং জলার্ক*, পূর্বোর্ক্ত পৃ. ৮৪
২৬৭. অরুণ সান্যাল, *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২৭
২৬৮. বিশ্বজিৎ রায় 'আচ্ছা আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম', *এবং জলার্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪*
২৬৯. অরুণ সান্যাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১৪
২৭০. ঝুমা রায় চৌধুরী , *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৬
২৭১. আহমদ রফিক, 'ক্যামুর সাহিত্য ও সমাজ-রাজনীতি', *কালি ও কলম*, (সম্পাদক : আবুল হাসনাত), দ্বাদশ বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পৃ. ২০
২৭২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'জেমস জয়েষের ইউলিসিস', (সম্পাদক : ওবায়েদ আকাশ), *শালুক* বর্ষ ১২, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২
২৭৩. সাদ কামালী, জৈনক নৈশপ্রহরীর ইউলিসিস অথবা জয়েসীর ঘোর, *শালুক*, (সম্পাদক : ওবায়েদ আকাশ), *পূর্বোক্ত* পৃ. ৫০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন : অন্ত্য পর্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন : অন্ত্য পর্ব

সমরেশ বসুর অন্ত্য পর্বের[১] (১৯৭১-১৯৮৮) উপন্যাসের সময়কাল সত্তর এবং আশির দশক।[২] এই পর্বের উপন্যাসে প্রতিভাসিত হয়েছে, নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা, মনোযন্ত্রণা, হতাশা, প্রেম–অপ্রেমের দ্বন্দ্ব, প্রতারণা এবং রাজনীতির ভণ্ডামির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সত্তর দশক এবং আশির দশক পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সত্তর দশকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রায় বিলুপ্তির পথে। '৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ, '৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন, '৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলন, সিপিআই (এম-এল) গঠন, নকশালবাদী আন্দোলনের বিস্তার, '৭০-এ রাষ্ট্রপতি শাসন, '৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধচলাকালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যাবৃদ্ধি; '৭২ সালের নির্বাচন এবং কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসা, বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থা, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ; '৭৭-এ জরুরী অবস্থার অবসান এবং বামপন্থীদের ক্ষমতা লাভ সহ নানাবিধ ঘটনা পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা-সংকট, ধর্মঘট-লকআউট, বেকারত্ব অন্যদিকে আত্মঘাতি অতিবাম হটকারী রজিনীতি বাঙালি মধ্যবিত্ত যুব সমাজকে সংশয় আর বিভ্রান্তির দোলায় অস্থির করে তুলেছিল। সুবিধাবাদী রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই দুই দশকে লক্ষ করা যায়। যুক্তিবাদী বাঙালি মধ্যবিত্ত এক সময় জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, মুক্তির দিশা হিসেবে সাম্যবাদে মুক্তি খুঁজেছে। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই পর্বে রাজনীতিতে সংঘটিত অর্ন্তঘাত এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই দেখে রাজনীতিবিমুখ হয়েছে। সমকালের ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতায় সমরেশ বসুর লেখক সত্তা উদ্বিগ্ন ছিল যা তাঁর এই পর্বের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এই পর্বের উপন্যাসে তিনি পার্টির অর্ন্তদ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং সঙ্কীর্ণতার চেহারা স্পষ্ট করলেন। তিনি দেখালেন মানুষের মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, পার্টিতন্ত্রের ভণ্ডামিতে মানুষ আর আস্থা রাখছে না, সুবিধাবাদী রাজনীতি আর দুর্নীতি এই শব্দ দুটি সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে ধরেছে। যেখান থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি চেয়েছে। এই পর্বে আলোচিত উপন্যাসসমূহ- *বিশ্বাস* (১৯৭১), *ছায়া ঢাকা মন* (১৯৭২), *অন্ধকার গভীরতর* (১৯৭২), *অশ্লীল* (১৯৭৩), *ত্রিধারা* (১৯৭৩), *গন্তব্য* (১৯৭৭), *আয়নায় আমার মুখ* (১৯৭৪), *বারোবিলাসিনী* (১৯৭৬), *অপদার্থ* (১৯৭৯), *বিপর্যস্ত* (১৯৮০), *মানুষ শক্তির উৎস* (১৯৮২), *যুগ যুগ জিয়ে* (১৯৮১), *পুনর্যাত্রা* (১৯৮২), *দশ দিন*

পরে (১৯৮৬), *বিকেলে ভোরের ফুল* (১৯৭২), *রূপায়ণ* (১৯৭২), *হৃদয়ের মুখ (১৯৭৪), হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা* (১৯৭৫), *আনন্দধারা* (১৯৭৮), *মরীচিকা* (১৯৭৮), *আকাঙ্ক্ষা* (১৯৮৩), *অভিজ্ঞান (১৯৮৪)*, *জবাব* (১৯৮৬), *ওদের বলতে দাও* (১৯৭২), *যাত্রিক* (১৯৭০), *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৭)।

বিশ্বাস

সমরেশ বসু বাস্তববাদী রাজনীতি সচেতন ঔপন্যাসিক ফলে দেখা যায় সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত তাঁর উপন্যাসে অনায়সে স্থান করে নিয়েছে। *বিশ্বাস* উপন্যাসে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত যুব মানসের বিচ্ছিন্নতার গতিপ্রকৃতির শিল্পরূপ নির্মাণ করলেন। সত্তর দশকের শুরুতেই দেখা যায় বামপন্থী যুব সমাজ নিজেদের মধ্যে অসীম স্বপ্নবীজ লালন করেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র নীরেন হালদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি দপ্তরের অস্থায়ী কেরানি। এমএ তৃতীয় শ্রেণি পেয়ে অন্য চল্লিশ প্রতিযোগিকে পেছনে ফেলে চাকরিটি পেয়েছে। চাকরি পাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক পরিচয় মুখ্য ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। রাজনীতির পরিচয়ে ভবিষ্যতে সে আরো ভালো চাকরির স্বপ্ন দেখে। পাড়ার মেয়ে লিপিকে সে ভালোবাসে। এই ভালোবাসকে কেন্দ্র করে সে ভবিষ্যতে একটি সুখের সংসার নির্মাণে আশাবাদী। যদিও তার প্রেমিকা লিপি তাকে কখনোই ভালোবাসেনি, তবে ভালোবাসার ভান করেছে যা তার অজ্ঞাত।

লিপির অতি উৎসাহে নীরেন লিপিকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও পালিয়ে বিয়ে করা তার মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা থেকে অনেকটা আত্মসম্মানেরর প্রশ্ন। তারপরও ভালোবাসার প্রশ্নে আপোষহীন নীরেন এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়। এবং সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতেই সে কেষ্টকলি লেনে লিপির জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু লিপি শেষ পর্যন্ত তার মায়ের কথিত প্রেমিক সুদীপ্তর সাথে পালিয়ে যায় আর চিঠিতে সে নীরেনের সাথে পালিয়ে যাচ্ছি এ কথা লিখে যায়। প্রবঞ্চক লিপির এহেন প্রতারণায় নীরেনের বিরুদ্ধে নাবালিকা হরণের চার্জ গঠন করা হয়। সামাজিক অপবাদ এবং পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদ নীরেন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তার স্বভাবসুলভ মিনমিনে বক্তব্য কেউ আমলে নেয়না। পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধব কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। একদিকে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা, অন্যদিকে লিপির জন্য উৎকণ্ঠায় নীরেন দগ্ধ হতে থাকে।

নীরেনের জীবনের আরেকটি পর্ব ধৃতির ভলোবাসা। যে ভলোবাসা ভদ্রঘরের মুখচোরা নীরেন বুঝতে পারে না। ধৃতির বাকপটুতা এবং সাহসিকতার কাছে নীরেন একবারেই বেমানান। ধৃতির সহযোগিতায় নীরেন

জেল থেকে ছাড়া পায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নীরেনের যথার্থ পরিবর্তন আসে। অবৈধভাবে পাওয়া চাকরিটি সে ছেড়ে দেয়। পার্টি থেকে ইস্তফা দেয়। উপন্যাসে নীরেনের জবানিতে নাগরিক জীবনের নগ্ন বাস্তবরূপ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের অন্তরালে সমাজের এক কদর্য চেহারা নীরেন পর্যবেক্ষণ করেছে, যা সভ্যতার নামে চরম অসভ্যতা। এই নির্মম বাস্তবতা *বিশ্বাস* উপন্যাসে প্রকাশিত।

মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের দুটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে— একটিতে আছে ভীরুতা, নিরাপত্তার প্রত্যাশা, আরাম বা স্বচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি, যেটি তার সনাতন রূপ; অপরটিতে দেখি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার মতো একটা চেতনা। বলা বাহুল্য প্রায় ক্ষেত্রেই অবধারিতভাবে প্রথমটিরই জয় হয়।[৩] দৃশ্যায়মান সমাজ-ক্ষত এবং নীতিহীন বিরুদ্ধ পরিবেশে *বিশ্বাসের* নায়ক নীরেন ভীতসন্ত্রস্ত। নিজের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার অভিমত— 'আমার বড় বেশি বুক ধকধক করে, হার্টটা একবার পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে, আমি কেন কথায় কথায় খারাপ আশঙ্কা করি। আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে।'[৪] এভাবে আত্মকথন-রীতিতে তার মানসক্রিয়া প্রকাশিত। নিজের শিক্ষা-চাকরি-প্রেম নিয়ে সে বেশ চিন্তিত সেই সঙ্গে সমাজের অন্তশ্চাপ-বহিশ্চাপে সে বিপন্ন। লেখক দেখালেন, *বিবরের* নায়ক বিদ্রোহ করেছে তার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যা বিকৃত পরিপার্শ্বের কূপমণ্ডূকতা মিশ্রিত। *প্রজাপতির* সুখেনের প্রতিবাদ মধ্যবিত্ত সমাজ এবং পার্টিতন্ত্রের প্রতি। কিন্তু *বিশ্বাস*-এ এসে সমরেশ বলতে চাইলেন বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের উৎসটা কোথায়।[৫]

নীরেন ভদ্রঘরের ভদ্র ছেলে। নীরেন তার সমাজপ্রতিবেশে একেবারে বেমানান। সে তার স্বশ্রেণির মতো বিশ্বাসঘাতক, চতুর বা স্বার্থান্ধ নয়। নিজ পেশায় যদিও সন্তুষ্ট না, তারপরও আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চায়। পাড়ার রকবাজ তরুণদের সাথে তার মানসিকতায় মেলেনা আবার তার প্রেমিকা লিপির সাথেও তার মানসিক দূরত্ব ফলে যথার্থ অর্থেই সে বিচ্ছিন্ন এবং বিযুক্ত। ঔপন্যাসিক স্ব-সমাজ এবং সমকালের বিশৃঙ্খলা বোঝাতে নীরেনের মতো যুবককে বেছে নিয়েছেন। বিরূপ পরিবেশের চাপে বিপন্ন নীরেন অনেকটাই একা, নওল কিশোরী ধৃতির ভালোবাসা তার হৃদয়ের একাকিত্ব, অসহায়তা, শূন্যতা ঘোচাতে পারেনা।

সমরেশ বসুর উপন্যাসে প্রেমের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় নায়কের আত্মকেন্দ্রিকতা। নীরেনও ব্যতিক্রম নয়। চলমান সমাজের নীতিহীনতা তার মধ্যে বিবমিষার জন্ম দেয়। স্বতন্ত্র জীবনবোধের সঙ্গে রূঢ়তম বহির্বস্তবাতায় সে বিপর্যস্ত। সে যাকে ভালোবাসে সমাজ তাকে বাজে মেয়ে বলে। নীরেন ছাড়াও তার অনেক ছেলেবন্ধু আছে। পরিমল লিপির অন্য পুরুষাসক্তি এবং তদ্‌জনিত অ্যাবরশনের কথা নীরেনকে

জানায়। নীরেন এসব জেনেও লাভ-ক্ষতির হিসেবে যায়নি। প্রেম মধ্যবিত্তের কাছে প্রকৃত ভাববিলাসের উপাদান। প্রেমের অনতিস্পষ্ট চেহারাকে ঘিরে মধ্যবিত্তের কল্পনার পরিমাণ সর্বাধিক। শ্রেণিজাত এই বৈশিষ্ট্য থেকে নীরেন পরিমলের কথা বিশ্বাস করে না। নীরেন একপাক্ষিকভাবে এসবের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দাঁড় করায় এবং পরিমলকে রিয়্যাল কনসেপশন অব ম্যারেজ লাইফ বোঝানোর চেষ্টা করে, যা তার চরিত্রের সরলতাকেও নির্দেশ করে।

প্রেম সম্পর্কিত অমীমাংসিত কিছু বিষয়ের সমাধান নীরেন নিজেই করেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে ঈর্ষা একটি অতি সংবেদনশীল বিষয়। লিপির একাধিক ছেলেবন্ধু সম্পর্কে তার অভিমত— 'একবার কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে ঘরে তুলতে পারলে হয় ও সব ছেলের ন্যাকরামি ছাড়িয়ে দেব।'[৬] কিন্তু এসবই তার আত্মকথন যার বিন্দুবিসর্গ লিপি জানে না। ঈর্ষা প্রেমের মধুরতম অনুভব এবং এটি আনন্দ-লগ্ন বেদনার অন্যতম উৎস। ভ্রাতৃপ্রেম কিংবা মাতৃস্নেহ হতে পারে বহুমুখী কিন্তু প্রেম একজনমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ণ মিলনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেমের প্রকৃতি হলো একমুখীনতা।[৭] ফলে নীরেনের মধ্যে আশংকা এবং যন্ত্রণা যুগপৎভাবে কাজ করেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সে আদর্শবাদী। প্রেমের অনিবার্য পরিণাম হিসেবে শরীরী সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। শরীর কেবল কাম-নিবৃত্তির ব্যবহারিক বস্তু নয়, এতে থাকে সংবেদ্য হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা ও তীব্র অনুভব।[৮] প্রেমের ক্ষেত্রে কামজ সম্পর্কে লিপির নিষেধাজ্ঞাকে সে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। তারপরও লিপিকে চুমো দেওয়ার দৃশ্য লিপির মা দেখে ফেলায় সে লিপিদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। লিপির মায়ের অপমানে নীরেনের প্রেম থেমে যায়নি, লুকিয়ে লিপির সঙ্গে দেখা করেছে এবং লিপির উত্তেজনাকর প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। যদিও এটি তার ডিগনিটির প্রশ্ন। লোকে বলবে 'লিপিকে নিয়ে নীরেন শালা পালিয়েছে।'[৯] কিন্তু এখানে লিপির ইচ্ছাই সব। তার স্বগতোক্তি থেকে জানা যায়— 'আমি নিজেকে কুকুর ভাবতে চাই না ভাবি না, অথচ করি, করে ফেলি, আর তা-ই নিজেকে, মানুষ হিসেবে, কুকুরের থেকে খারাপ কিছু বলতে ইচ্ছা করছে।'[১০] লিপির সাহসে সাহসী হয়ে সুখী দাম্পত্যের স্বপ্ন দেখেছে। লিপিকে দেওয়া কথা রাখতে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছে। লিপির ভালোবাসার কাছে তার সত্তা পরাধীন। লিপির নিখোঁজ হওয়ার কার্যকরণজনিত অপবাদ সে মাথায় নেয়। এরপরই সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। এই নিখোঁজ সংবাদ তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সে কখনোই চরিত্রহীন মধ্যবিত্ত হতে চায়নি। কিন্তু পঁচা মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের বাইরে যাওয়া তার সম্ভব নয়। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ স্পৃহা তার মধ্যে কখনোই জাগেনি। নাবালিকা হরণের অপবাদ মাথায় নিয়ে চরিত্রটি আত্মবিশ্লেষক হয়েছে। এরপরই তার মধ্যকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং দ্রোহ প্রতিবাদের ভাষা

খুঁজেছে। নির্বিবাদী এই চরিত্রটির ভেতরকার সততার বোধটি জেগে ওঠে। চরিত্রটি ক্রমেই অস্তিত্ববাদী হয়। সে বুঝতে পারে সে লিপির ভালোবাসার কাছে পরাধীন নয় আপন কর্মের মধ্য দিয়ে তার সারধর্ম গড়ে তুলতে হবে। নীরেনের এই প্রচেষ্টা তার অর্ন্তনিহিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত।

নীরেনের নিজের সম্পর্কে যেমন নঞর্থক ভাবনা, তেমনি তার শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব। 'যে কথা ভাবলেই গায়ের মধ্যে কেমন গুলিয়ে ওঠে, একটা বমি বমি ভাব লাগে। একে বাংলায় তায় আবার থার্ড ক্লাস, নিজেকে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা করে। শরীরে একটু মাংস আছে, রূপ নেই এরকম অশিক্ষিত মেয়েরও আমার থেকে বাজার-দর বেশি।'[১১] নীরেন পার্টির কল্যাণে এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি অস্থায়ী বিভাগে চাকরিও পায়, আবার ফার্স্ট ক্লাসকে টপকে অধ্যাপনার চাকরির প্রত্যাশা করে।

ব্যক্তিমানুষের দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব আধুনিক শিক্ষিত মানুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।[১২] নীরেন সমাজ সমালোচক। সামাজিক নিয়মকানুনের বৈসাদৃশ্য তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন লিপির মায়ের অসম প্রেম, নির্লজ্জতার সে সমালোচনা করে। লিপির প্রেমিক হিসেবে নীরেনকে তিনি মেনে নিতে পারেন না, আবার লিপির জন্মদিনে নীরেনের কাছে উপহার হিসেবে টেপ রেকর্ডার প্রত্যাশা করেন। লিপি প্রেমের টানে ঘর ছাড়লে তিনি তাকে নাবালিকা সাজিয়ে নীরেনের নামে থানায় অভিযোগ করেন। পারিবারিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এই নারী আত্মজাকে পতিতা বানিয়ে অর্থোপার্জনের স্বপ্ন দেখে। তার চরিত্র সম্পর্কে নীরেনের জবানিতে জানা যায় 'অমন রোগা-চোখা খাণ্ডার মেয়েমানুষ আমি কমই দেখেছি। শরীরের বাঁধুনি এখনও শক্ত, শুধু পুরুষ না ছেলে ভোলানো বলা যায়, সাজগোজও সেই রকম।'[১৩]

বিশ্বাসের ভূমি থেকে নির্বাসিত হলেও মধ্যবিত্ত কেবলি তার পুরনো আশ্রয় আঁকড়ে ধরতে চায়।[১৪] নীরেন নিরীশ্বরবাদী। তবু ভয় পেলে অবচেতনে শৈশবে মায়ের কাছ থেকে শেখা বুলি 'হায় ভগবান বলে' ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়। অথবা ভগবানের নামে দিব্যি দেয়।

মূল্যবোধবিবর্জিত আরো এক নারী চরিত্র খুকু। খুকু পরিমলের প্রেমিকা। ব্যাগে সব সময় জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী রাখে। যেন লেখক বোঝাতে চেয়েছেন সমাজটা নষ্ট পচা গলা। প্রেম সেখানে স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। খুকু ভদ্র লেবাসের জন্য গলায় গুরুদেবের ছবি আটকানো লকেট পরে। এসবই তার বহিরাবরণের ছদ্মবেশ মাত্র। প্রেমের ক্ষেত্রে সেও স্বেচ্ছাচারে বিশ্বাসী। খুকুকে পরিমলের পরিবার পছন্দ করে না, তারপরও পরিমলের বাড়িতে বসে তারা প্রেম করে। এই সামান্য সুযোগটির কারণে নীরেন

পরিমলকে ঈর্ষা করে। খুকুই তাকে পরামর্শ দেয় লিপির এডাল্ট বার্থ সার্টিফিকেট নিতে। নীরেন যেখানে অপহরণই করেনি, সেখানে এ জাতীয় প্রস্তাবের সে প্রতিবাদ করে। খুকুকে নীরেনের অল রাউন্ডার মনে হয় আর নিজেকে নেড়ি কুত্তা থেকেও খারাপ কিছু মনে হয়।[১৫]

নীরেনের দৃষ্টিতে বন্ধুদের চারিত্রিক অবনমন ধরা পড়েছে। নাগরিক জীবনের সুবিধাবাদী চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে পরিমল চরিত্রে। সুদীপ্তর সাথে লিপির প্রকৃত প্রেমের খবর জেনেও সে নীরেনকে বিপদে ফেলে। রাজনৈতিক মতাদর্শে সে নীরেনের বিপরীত মতাদর্শের। ব্যবসায়ীর পুত্র, সমস্ত কিছুতে লাভ- লোকসানের অঙ্ক কষে। খুকুর সাথে তার কামজ প্রেমের সম্পর্ক। ষাটের দশক থেকে মধ্যবিত্তের প্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে দেহসর্বস্বতা। লেখক সেই চিত্রই উপস্থাপন করলেন পরিমল-খুকুর প্রেমে। যৌবনধর্ম উপভোগের স্বার্থে পরিমল-খুকু তাদের সম্পর্ককে প্রাণবন্ত রাখে। যার প্রত্যক্ষদর্শী নীরেন। নীরেন তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বিব্রত হয়। এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লে তার 'বুক ধকধকানি, গলা শুকিয়ে যাওয়া, অথচ রক্তের মধ্যে একটা ছলাৎ ছলাৎ ধাক্কা অনুভব করে।[১৬] এই যুগলের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের প্রেমের ফাঁকি ধরা পড়েছে।

নীরেনের আরেক বন্ধু দিগন্ত। মাস্তান হওয়ার পর দিগন্ত থেকে দিগা হয়েছে। দিগন্তের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ছিল কিন্তু রাজনীতির নামে অপরাজনীতির শিকার হয় সে। দিগন্তের মাস্তানি অনেকটা ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিকতার মতো। কোনো দলের সাথে নেই, আবার সব দলের সাথে আছে। 'দরকার হলে যাকে ওরা মালকড়ি বলে, পেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়েও কাজ করে।'[১৭] নীরেনকে পুলিশের জিপে তোলার সময় সে নীরেনকে বোঝানোর চেষ্টা করে নীরেন তার দল করলে পুলিশ কখনই নীরেনকে অ্যারেস্ট করত না। কারণ মাস্তানরা সবসময়ই নেতাদের অনুকম্পায় ভালো থাকে। দলের প্রয়োজনে তারাই মাস্তান লালন করে। এই সমস্ত নেতারা অধিকাংশই ব্যাবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ। এরা কেন পার্টিতে মাস্তান পোষে এবং পার্টিতে কেনই বা এদের এত কদর নীরেন এসবের কিছুই বোঝে না। নীরেন মনে করে এতে পার্টির ইমেজ নষ্ট হয়। সে জানে এমন অনেক ছেলে পার্টিতে আসে যারা পার্টি তত্ত্ব বোঝেনা এমনকি বুলেটিন পর্যন্ত পড়ে না। আত্ম অহমিকা আর জাতের লড়াই নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে। তারাই রাজনীতির অঙ্গনকে সবচেয়ে বেশি কলুষিত করে।

নীরেনের আরেক বন্ধু বিভাস নীরেনের বিরুদ্ধ মতাদর্শে বিশ্বাসী। তবে সেও বামপন্থী । একটা সময় এমন ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল মানেই বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত। তবে এই বামপন্থী প্রগতিশীল ভাবনা অনেকেরেই বাহ্যিক ছদ্মবেশ মাত্র। ভেতরে তারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সুবিধাবাদী।

পার্টির সমালোচনা পার্টি অভ্যন্তরে মেনে নিতে পারে না। যেমন নীরেনের সাথে রাজনৈতিক তর্কে হেরে গিয়ে বিভাস নীরেনকে চড় মারে।

ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশির রাজনৈতিক জীবনের সামূহিক সঙ্কট নীরেন লক্ষ করে। সর্বপ্রকার কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে আপষহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা।[১৮] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই পার্টি পরিচালিত হয়েছে সুবিধাবাদী সংশোধনবাদীদের দ্বারা। ফলে পার্টি অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে নানা রকমের বিভাজন। উপন্যাসে অখণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতিকে কাহিনির প্রেক্ষাপট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। নীরেন আত্মসমালোচকের সাথে সাথে পার্টির সমালোচক। নীরেনের পূর্বের দলের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীতা দেখে সে অন্য একটি পার্টিতে যোগদান করে। এখানেও সে লক্ষ করে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ কাজ করছে। তার এই সমালোচনা পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক নিখিল মেনে নিতে পারে না। নিখিল তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া কবিদের মতো মনে করে। নিখিলকে যখন সে মার্কসবাদ[১৯]– এর নাম করে সংশোধনবাদ[২০] বোঝাতে যায় নিখিল তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খিস্তি করে বলেছিল 'তুই মার্কসের ইয়ে (কেশ বা রোবলী জাতীয়) বুঝিস। শালা পার্টির কুচ্ছো করেছিস, তোর থেকে বোঝদার লোক আর পার্টিতে নেই, না?'[২১] নীরেন জানে পূর্বের পার্টিতে থাকলে সে আরো বেশি সুবিধা পেত কিন্তু পার্টির নীতি এবং আদর্শের সাথে সে একাত্ম হতে পারেনি। বর্তমান দলের সাথেও তার আত্মিক যোগ হয় না। তার সন্দেহ এই দলও সুবিধাবাদের রাস্তায় চলছে। সে আর নিজেকে পার্টির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না— 'যেন চোরের মতোই কেউ আমার ভিতরে খুব সাবধানে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, আর অবিশ্বাসের সুখ, যে-সুখ বেশ সোনা ফলিয়ে রাখছে, সোনার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইছে, অথবা সেটাকে একটা লোহার ডাণ্ডা বলা যায়। চোরটাকে পিটিয়ে মারতে চাইছে। তার বিশ্বাসটা চোর আর অবিশ্বাসটা দারোগা, চোগাচাপকান পরে গলাবাজি আর ডাণ্ডাবাজি করছে। আমি তা চাই না, চোর কে-ই বা চায়। এ চোর আমার দরকার নেই,..[২২] অথচ এই পার্টির আনুগত্য তাকে বর্তমান চাকরিটা দিয়েছে। ভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণিকে টেক্কা দিয়ে কলেজের অধ্যাপনার চাকরির সুযোগ আছে। নীরেনের আত্মিক দ্বন্দ্ব তাকে উপলব্ধি করায় অবিশ্বাসের মধ্যে একটা দুঃখ ও কষ্ট আছে।

নীরেন নিয়তিবাদী না, তারপরও তার মনে হয় আড়ালে তাকে নিয়ে কে খেলা করে যাচ্ছে। আর সে পাগলের মতো খেলছে। রাজনীতি নিয়ে তার স্বতন্ত্র মতামত আছে। সে ইচ্ছা করলেই রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে না। যারা রাজনীতিতে নিরপেক্ষ তাদের ছাগলাদ্য ঘৃত খাওয়া উচিত বলে মনে

করে। আর যে সমস্ত ছেলেরা কোনো কাজের চেষ্টা না করে রাস্তার মোড়ে বসে ইভটিজিং করে তারা কীভাবে পার্টির ছেলে হয় সে বোঝে না। এরা অনেকেই সম্ভাবনাময় তরুণ কিন্তু লেখাপড়া করে না অথবা করতে ভালো লাগে না। এরা অধিকাংশই বেকার আবার কেউ কেউ কাজ করে। এরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারলেও নীরেনের মত কেরানি হতে পারত। সবাই মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারের সন্তান। অথচ এরা কিন্তু কেউই লুমপেন প্রলেতারিয়েত নয়। শৈশব থেকে এই সব যুবক তারই মতো মিথ্যা আশ্বাসের মধ্যে বড় হয়েছে। তাই বাবা-মা-মাস্টারমশাই-প্রফেসরদের তার খচ্চর মনে হয়। সমাজের ভিত্তিমূলটাই নড়বড়ে তাই প্রাপ্তিটাও শূন্য। নীরেন আক্ষেপের সুরে খিস্তি করে বলে 'হ্যান হোগা, ত্যান হোগা, জটি বুড়ি কা উকুন মারে গা, কার্যকালে ভো ভো বেঁচে থাক রক।[২৩] তারপরও নীরেন আশাবাদী, এদের মধ্য থেকে ভালো কিছু বের হবে। সুন্দর ও মহৎ হওয়ার সাধনা সে বাবা-মা কিংবা শিক্ষকের কাছে পায়নি, পেয়েছে মানুষকে দেখে, ভালো কিছু বই পড়ে।

নীরেনের সমালোচক সত্তা তার শুধু আবরণ নয়, অন্তরের আকুতিও। সে পার্টির সমালোচনা করে। লোক দেখানো ব্যাপারকে সে ঘৃণা করে। এমনকি অরূপের মতো ছেলেরও খাদ্য আন্দোলনের[২৪] সময় 'পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বলা–পুলিশ মারুক, নয়তো বিনা খাদ্যে সে এমনিই মরবে'[২৫]– এই জাতীয় বাক্যের সমালোচনা করে। তার কখনোই মনে হয়নি অরূপের পরিবার দুস্থ এবং খাদ্য সংকটে পড়েছে। অরূপের এই ধরনের আচরণ নীরেনের কাছে অন্তঃসারশূন্য খেয়ালি ভাবনার মতো। পার্টি অরূপের এই অবুঝ রোম্যান্টিক মনটির জন্যই গর্বিত হয়। এ ধরনের মিথ্যাচার সে মেনে নেয়নি। কিন্তু সবাই যখন অরূপের পক্ষে তখন নীরেনই ভ্রান্ত। পার্টি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত, এমনকি তার প্রেমও ভ্রান্ত। নীরেনকে কেউ বিশ্বাস করে না, তার দল,পরিবার-পরিজন বন্ধুবান্ধব কেউই না।

নীরেনের অনেক ধরনের বিশ্বাস আছে। যেমন সে বিশ্বাস করে লিপি অপহরণের দায় থেকে তার পার্টির নেতা প্রিয়তোষদা তাকে অব্যহতি দেবে। পরিমল ফিরে এলে একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু সবই তার ভ্রান্ত বিশ্বাস। এরা কেউই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে না। নওল কিশোরী ধৃতি তাকে আশ্বাস দেয়, আইনি সহায়তা দেয় এবং জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে। ধৃতির ছেলেমানুষীতে নীরেন আকৃষ্ট হলেও তার বাকপটুতায় বিরক্ত। নীরেন খাঁটি প্রেমিকের মন দিয়ে কখনই ধৃতিকে বুঝতে চায়নি। প্রকৃত ভালোবাসার বোধ ছিল না বলেই প্রেমের শক্তিতে দেদীপ্যমান ধৃতিকে তার রহস্যময়ী মনে হয়েছে। 'ধৃতির এটা উচিৎ না, ও আমার কাছে কী চায় বুঝি না। ও হয়ত আমাকে আরও অস্থির আর বিভ্রান্ত করে তুলবে।[২৬] নীরেন যে ভালোবাসায় বিশ্বাসী তা প্রতারণার নামান্তর। লিপি তাকে কখনই

ভালোবাসেনি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এই দোলাচলতায় নীরেন শেষ পযর্ন্ত মুক্ত হয়েও কিছুটা বিভ্রান্ত থেকে যায়।[২৭]

নীরেনের বন্ধু নিখিল সংশোধনবাদী। নিখিল ট্রেড ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী। একটা কারখানায় অ্যাপেনট্রিসার হিসেবে ঢুকেছিল। সেখান থেকে মজুর নেতা হয়েছে। চাকরি চলে যাওয়ার পর পার্টিই করে। অন্য কোনো কাজের চেষ্টা করেনি। ফলে পার্টি তার ধ্যানজ্ঞান পার্টির্র অভ্যন্তরে পাটির সমালোচনা সে মেনে নিতে পারে না। নিখিলের মতো অন্ধ ভক্ত নীরেন হতে পারেনি। নিখিলের বাবা উকিল, তাই পার্টির লোয়ার কোর্টের কেসগুলো তিনিই দেখেন। অবশ্য এর জন্য টাকাও নেন। সুবিধাবাদী নিখিলকে নীরেন মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

নীরেনের আরেক বন্ধু পরিমল ধুরন্ধর। স্বতন্ত্র জীবনবোধের কারণে সে স্বার্থপর। লিপির বিষয়ে সত্যিটা জেনেও নির্বিকার থেকেছে। বন্ধু হয়েও নীরেনের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। মধ্যবিত্তজীবনের হীনম্মন্যতা তার মধ্যে প্রকাশিত।

নীরেনের বাবা সমাজ সমালোচক। রাজনীতিতে জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী থেকে অতুল্য ঘোষরা কী কী ক্ষতি করেছে, এমনকি সাম্প্রতিককালে অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসুরা কী ধরনের ক্ষতি করে চলেছে তার অঙ্ক কষে। যুবসমাজের অবক্ষয়, নীতিভ্রষ্টতা, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির চর্চা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ নানা বিষয়ের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা গৃহ অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। মাঝে মাঝে অশ্লীল রঙ্গরসিকতা করে বিকৃত আনন্দ অনুভব করেন। নীরেনের বাবার গোছানো জীবনে কখনই ছন্দপতন ঘটেনি। নীরেনের কৃতকর্মে তিনি সামাজিকভাবে হেয় হন তাই নীরেনের পার্টি সমর্থন তার কাছে ‘অল ব্লাডি মস্তানজ্ পার্টিজ্’[২৮] মনে হয় আর নীরেনের তার বাবাকে একই সঙ্গে স্মার্ট আর বোকা মনে হয়।

নীরেনের বোন সুতপা সুবিধাবাদী। কলেজে কোনো দলের হয়ে রাজনীতি করে না। কিন্তু ঘেরাওয়ে ধর্মঘটে থাকে। লুকিয়ে সিগারেট খায়, নগ্ন পত্রিকা সংরক্ষণ করে। নীরেনকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় সে মজা দেখে। নীরেন বড় ভাই হয়ে তার পঙ্কিলতায় ভেসে যাওয়া রোধ করতে পারেনি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। নীরেনকে অব্যাহতি দেওয়ার কয়েকটি রাস্তার সে সন্ধান দেয়। যদিও নীরেনের মনে হয় ‘আমি একজন এমএ পাশ যুবক, বামপন্থী রাজনীতি করি,

থানার একটা পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে, আমি আমার চরিত্র বা রাজনৈতিক সংগ্রামের সার্টিফিকেট চাই না, কোনও কথাও শুনতে চাই না।[২৯]

নীরেনের সমাজটা নষ্ট। সেখানে পুলিশ কনস্টেবল নীরেনকে সিগারেট খাইয়ে ঘুষ চায়। বামপন্থী দলের নেতা বাজপেয়ী ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের দলের ছেলেদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নেয়। হারুঘোষ প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে। নীরেন এসবের নীরব সাক্ষী :

> অনেক সময়েই, যাকে বলে ঘোরতর অন্যায়, আমার চোখের সামনে ঘটে গেলেও আমি অর দশজন ভদ্রলোকের মতো চেয়ে দেখি এবং দাঁতে খড়কে খুঁটি, এমনকী কেউ হাসলে হেসেও ফেলি, কিন্তু মনে মনে বাঘের থেকেও ভীষণ ফুলতে থাকি, যে অন্যায় করছে তাকে ছিঁড়ে খেতে থাকি, বাইরের থেকে ল্যাজ গুটানো নিরীহ কুকুরটির মতো শান্ত থাকি।[৩০]

যন্ত্রণাদগ্ধ অসুখী আত্মজিজ্ঞাসু সত্তা তাকে সমাজ সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে। প্রজাপতির সুখেনের মতো সে দুর্দান্ত নয় । অসামাজিক আচরণ এবং পার্টির বিরুদ্ধে সুবিধাবাদের অভিযোগ করায় নীরেন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়।[৩১] রাজনৈতিক দুরাচারে আহত নীরেন পার্টির কল্যাণে পাওয়া চাকরিটিকে পাপ মনে করে। তাই চাকরিটি ছেড়ে দেয়। চাকরিটি ছেড়ে দিতে গিয়ে সে স্বস্তি পায়না। পার্টি কর্মী ধর্মদাসের কাছে সে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়, তাকে ঠাট্টা করে বলে ‘এখন কী করবেন? সি আই এ-র দালালি? নীরেন এর প্রতুত্তরে বলে ‘ভারতবর্ষকে নিয়ে তিনটে দেশ খেলছে, সি আই এ-র টাকা গলতে গলতে কাদের পকেটের রন্ধে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।[৩২] নীরেন বোঝে স্লোগান আদর্শ বা নীতি বা এমনকি তত্ত্ব যা-ই বলা হোক, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলোতে একটা শ্রেণিরই হাতে নেতৃত, তারা হল নৈকষ্য কুলিন মধ্যবিত্ত যাদেরকে পাতি বুর্জোয়া বলা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা সুবিধাবাদী এটি তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্য। সে বিশ্বাস করে পার্টি কখনোই কারো পৈতৃক সম্পত্তি হতে পারে না। বামপন্থী দল সম্পর্কে তার মন্তব্য ‘কোনও হিজড়ে যদি নিজেকে পুরুষ অথবা মেয়ে বলে দাবী করে, কী বলার আছে।’[৩৩] এর জবাব সে পায় পার্টি অফিসে কর্মী দ্বারা প্রহৃত হয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সে বাড়ি ফিরে নিজেকে আবিস্কার করে বিচ্ছিন্নতার গহবরে নিমজ্জিত এক মানুষ হিসেবে।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র লোকেশ্বর চক্রবর্তী। যিনি লিপির মায়ের সাথে ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে নীরেনের কেসটি নেন। অশ্লীল খিস্তিখেউড়ে সমাজটাকে শোধন করতে চান। নীরেনের আহত মুখ দেখে বলেন ‘বিশ্বাসের পরিণতি তো দেখছি তোমার সর্বাঙ্গে ছাপা রয়েছে। গোটা মুখ তাপপি’[৩৪] নীরেনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ সে উন্মোচন করে।

উপন্যাসটি আত্মকথনধর্মী। নীরেনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তাই উপন্যাসের নামকরণও সার্থক। উপন্যাসটিতে চরিত্রকেন্দ্রীক ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্তের নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে ধরা পড়েছে :

> আমি এত বড় একটা ছেলে, লোকে জানে ভদ্রলোকেরই ছেলে, লিপিও ভদ্রলোকের মেয়ে। আমরা প্রেম করেছি, তা বেশ করেছি, বাড়ি থেকে পালাব কেন? আমরা তো জো করেই বিয়ে করতে পারি, আমাদের তো সেই–ইয়ে আছে, অধিকার, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব, অন্য জায়গায় বাসা ভাড়া করে থাকব, তারপরে যে যা খুশি করুক গিয়ে।[৩৫]

বিশ্বাস– এ সমকালীন যুবমানসের মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন লেখক। নায়ক নীরেনের জীবনের বহুবঙ্কিম জটিলতা যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গতা, রাজনৈতিক বিশ্বাসভঙ্গতা, অবদমিত স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা সহ নানাবিধ বিষয় এনে লেখক দেখালেন সমাজটা অসুস্থ। সেখানে নীরেনের মতো মানুষ অনেকটাই অবাঞ্ছিত। আর সে কারণেই নীরেনের পচনশীল সমাজে ধৃতির প্রকৃত ভালোবাসা কোনো আলোর মুখ দেখে না।

ছায়া ঢাকা মন

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে সত্তর দশক এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই দশকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মানুষ সর্বাধিক ভোগান্তির শিকার হয়েছে। সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি ছেয়ে যায়। এর বাতাস এসে শিক্ষাক্ষেত্রে লাগে। না পড়ে পরীক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকির মহোৎসবে নামে কিছু ছাত্র। রাজনীতির নামে অপরাজনীতি করে দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের সহায়তায় তারা সহজেই ছাড় পেয়ে যায়। *ছায়া ঢাকা মন* উপন্যাসে সত্তর দশকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু পড়ুয়া ছাত্রের মধ্যকার হতাশাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। শমীক, নিশীথ এবং তিমির এই তিন বন্ধু পড়ে পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষায় কিছু ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য উপাচার্য পরীক্ষা স্থগিত করে। শমীকের বাবা যিনি একজন সরকারি আমলা তিনি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পক্ষে। তার মতে আমরা যে সমাজ আর শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছি, তার জন্য আমরা সকলেই দায়ী। ভালমন্দ আমাদের নিজেদের।[৩৬] তিনি তার সন্তানকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, যেহেতু শমীকের বন্ধুরা নকল করেছে, অতএব এই পাপের বোঝা তাদের সবাইকে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। কর্তৃপক্ষ যেদিন পরীক্ষা নেবে সেদিনই পরীক্ষা দিতে হবে। শমীক তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে শক্তভাবে এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যায়। তারা উপাচার্যের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। শমীকের বাবা শরৎ ব্যক্তিগত জীবনে রক্ষণশীল। ক্ষমতা আর প্রভুত্বকে উপভোগ করেন। সন্তানের সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে হটকারী মনে হয়। তাছাড়া অন্যান্য

সরকারি আমলার মতোই তিনিও গভীর চিন্তার দিক থেকে দরিদ্র এবং সাধারণ। প্রথম থেকেই শমীক সম্পর্কে ধারণা তার সন্তান অসৎ এবং অবাধ্য। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সমর্থন করেন, যা শমীক মেনে নিতে পারে না। শমীক পরীক্ষায় অসুদপায়কে ঘৃণা করে, সে পড়ে পরীক্ষা দেয়। তার বন্ধু তিমিরের কথায় ধরা পড়ে শিক্ষাব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতির। তিমির কথা প্রসঙ্গে জানায়— 'শুধু তাই না প্রফেসররা আবার যে যার নিজের পার্টির ছেলেকে ঢুকতে দেয়। অন্য পার্টির ছেলে হলেই চোখ গরম করে।'[৩৭] শমীক তার শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্তব্য করে 'লোকগুলো খচ্চর না গাধা, আমি বুঝতে পারি না।[৩৮] শমীকের প্রজন্ম শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি দেখে হতাশ। তারা আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে চায় না। তার মনে করে সিন্ডিকেট, উপাচার্য, অধ্যাপক এবং পলিটিক্স এসবই তাদের পড়াশুনার বারোটা বাজাচ্ছে। তাদের বন্ধু নকল করে দিব্যি পাস করে। তারা এতটাই হতাশ যে তাদের প্রতিক্রিয়াও পত্রিকা তে না জানানোর এবং পুনরায় পরীক্ষা না দিতে চাওয়ার আন্দোলন থেকে অব্যহতি নেয়। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এই তিন বন্ধু বাড়ি থেকে পালিয়ে চাকরি করার এবং জীবনকে স্বাধীনভাবে উপভোগের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তবে বেশি দূরে নয়, কাছেই কলকাতার মধ্যেই এক নামকরা হোটেলে ওঠে। যেখানে মদ এবং অবাধ নারীসঙ্গের অভাব নেই। তাদের বয়সে বড় বান্ধবী দীপা তাদের সহযোগিতা করে। এই তিন বন্ধু সমাজের অনুশাসন এবং সংসারের প্রতি বিরূপ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হোটেলে মদ খেয়ে, নাচানাচি করে জীবনবিলাসী হতে চেয়েছে। সমাজ সম্পর্কে তাদের অভিমত— 'অসম্পূর্ণ বুর্জুয়া বিকাশের দায় আমাদের জীবনকে করেছে খণ্ডিত এবং লাঞ্ছিত।[৩৯] ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই তিন যুবক সমাজের মূল্যবোধহীনতা এবং সমন্বয়হীতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এক অর্থে অবচেতনে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলতে চায়। মধ্যবিত্তের গন্ডি ভাঙাতেই তাদের আনন্দ। এদের নেতৃত্ব দেয় শমীক। কিন্তু শমিকের একক বিদ্রোহ এক সময় পথ হারায়। হোটেলে তার সাথে ডালিয়া নামের এক মেয়ের পরিচয় হয়। যে শমীকের জীবনে নব উপলব্ধি এনে দিয়ে আত্মহত্যা করে। অপাপবিদ্ধ শমীকের জীবনে যৌবনের স্বাদ আনে। চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে শমীককে জানায়— 'আজ রাত্রে যা ঘটে গেল তা একটি ঝলক, তারপরেই জীবন যে অনন্ত দুঃখের, সেই সত্যের আলোয় তুমি যেন সারা জীবন পথ চিনে চলতে পারো।[৪০] ব্যক্তিগত জীবনে দাম্পত্য কলহ এবং নিঃসঙ্গতার কারণেই ডালিয়া আত্মহত্যা করে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ডালিয়ার আত্মহত্যা নিয়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন— 'ডালিয়ার আত্মহত্যা যত না কার্যকারণের ফল তার থেকে অনেক বেশি তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের নিদর্শন। এ আত্মহত্যা প্রতিবাদ না আত্মসমর্পণ?[৪১] মেট্রোপলিটন মধ্যবিত্ত যুবকদের বিদ্রোহ দেখাতে গিয়ে

ঔপন্যাসিক শমিকের সাথে ডালিয়ার যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন তা অনেকটাই আকস্মিক। ডালিয়ার হঠাৎ হোটেলে ফিরে এসে আত্মহত্যা শমিকের নব উপলব্ধি এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্বভাবতই পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের জন্ম নেয়। শমিকের উপলব্ধজাত সত্যতে এর সমাধান আছে 'পৃথিবীতে কেউ স্বাধীন নয়, জীবন যে অনন্ত দুঃখের... ।'[৪২] উপন্যাসের উৎসর্গ পত্রে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন উপন্যাসটি কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যারা দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে লেখা।

পঞ্চাশের দশক থেকে যুবমানসে এক ধরনের শূন্যতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সাথে প্রাপ্তির অমিল, কালোবাজারি, দুর্নীতি, বেকারত্ব ইত্যাদি থেকে এসব শূন্যতার উদ্ভব। এই শুন্যতা প্রকাশে ফ্রয়েড- উত্তরকালে অনেক ঔপন্যাসিক যৌনতার আশ্রয় নিয়েছেন। সত্তর দশকে এসেও দেখা যায় মহানগরের অতলান্ত গহবরে যুবমানসের হতাশা আরো গভীর হয়েছে। সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে তারা হয়েছে বিভ্রান্ত। উপন্যাসে দেখা যায় তিন বন্ধু খুব সহজেই দীপার মতো মেয়ের পাল্লায় পড়ে। যার জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে কোনোভাবে অর্থোপার্জন। শেষ পর্যন্ত শমীকের নব উপলব্ধিতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

অন্ধকার গভীর গভীরতর

নাগরিক মধ্যবিত্তের মনোবিকলনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন *অন্ধকার গভীর গভীরতর* উপন্যাস। উপন্যাসের শুরুতে নায়ক অধীপ মিত্র স্বীকার করে সে পাপ না করেও পাপবোধে আক্রান্ত। তার স্বগতভাষণ থেকে জানা যায়, সে পেশায় একজন ব্যাংক ম্যানেজার। মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। মধ্য-কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসবাস করে। স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার। পেশাগত জীবনে দায়িত্ববান। কেউ কাজে ফাঁকি দিলে বিরক্ত হয়। তাই অফিসে সবার প্রিয়ভাজন নয়। কথক নিজেই বলে— 'আমার আচরণে সকলেই, অন্তত সামনাসামনি খুশি। আমি মুখ গোমড়া করে একটা মুহূর্তও থাকতে পারি না। এমনকী কারওর কাজের গাফিলতির সময়েও, আমি মোটেও মেজাজ গরম করে, চড়া স্বরে কথা বলি না। আমি খুব দুঃখিত ও ম্রিয়মাণভাবে সমালোচনা করি। খুব বিক্ষুব্ধ হলে, খানিকটা অভিমানহতভাবে নীরব থাকি, অথবা বড়জোর বলি, ইমপসিবল, আমি আর এভাবে চাকরি করতে পারছি না।'[৪৩] কথক কর্মক্ষেত্রে যেমন দায়িত্ববান, পরিবারের প্রতিও সমান দায়িত্ববান। তবে নারীর প্রতি তার একটু দুর্বলতা আছে। যে কারণে তার স্ত্রী তাকে ঈর্ষা করে। যদিও তার স্ত্রী তাকে অন্য নারীর সাথে কখনোই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেনি। কথক স্বীকার করে তার মতো তার স্ত্রী যদি যৌনজীবনে স্বেচ্ছাচারী হয় তবে সে স্বাভাবিকভাবেই তা মেনে নেবে। 'আমি বলব, ওর যদি কারওকে ভাল লাগে, তা হলেও তার সঙ্গে মিশতে পারে, অবিশ্যিই এর

দায়-দায়িত্ব তার নিজেরই, ও কীভাবে পরিবার সমাজে সেটাকে রূপদান করবে।'[৪৪] তবে এই স্বেচ্ছাচার তার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। কথক অধীপ মিত্র অধিক মদপান করলে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। বান্ধবী রূপার ফ্লাটে অধিক মদপান করে সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। এই ব্লাক আউটের সময় রূপা খুন হয়। কে বা কারা মাতাল রূপার গলায় কাটা চামচ ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে । পুলিশ শত চেষ্টা করেও হত্যার মোটিভ উদ্ধার করতে পারে না। রূপার মৃত্যু তার মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়। যদিও অধীপ বিশ্বাস করে না রূপা তার দ্বারা খুন হয়েছে। রূপার বীভৎস মৃতদেহ দেখে তার বিষপানে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। অবচেতনে সে বলে 'আই অ্যাম নট রিয়্যালি সেন্টিমেন্টাল বাট দেয়ার ইজ সামথিং ইনসাইড মি যা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না। সামথিং ভেরি পেইনফুল, টেরিবল টরমেটিং। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছা করছে কেন আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'[৪৫] রূপার মৃত্যুর পর অধীপ অনুধাবন করে সে রূপাকে ভালোবাসে। সে কখনোই সুবিধাবাদী হতে চায়নি তাই রূপার মৃত্যুর পর রূপার সাথে তার সম্পর্কের কথা বন্ধু পৃথিশের কাছে স্বীকার করে— রূপা ছিল তার নৈঃসঙ্গ্য মুক্তির আশ্রয় স্থল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে সংলগ্নতার আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা। অধিপের সুখী দাম্পত্যজীবন থাকা সত্ত্বেও রূপার সান্নিধ্য উপভোগ করে। যে কারণে রূপার কলকাতা আসার প্রতীক্ষা করত।

অধীপ আত্মকেন্দ্রিক। সে সব কিছুর মধ্যে নিজের ভালোলাগাটুকু খুঁজে নেয়। সে কারো ক্ষতি করে না তাই আত্মকেন্দ্রিকতা এবং যৌনতায় সুখ খুঁজে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তার অভিমত :

> যে সমাজে আমি বাস করি, তার মধ্যে আমি এ প্যাটার্ন অফ লাইফ বেছে নিয়েছি। তার মধ্যে নিরঙ্কুশ সুখ নেই, বরং একটা অসুখী বিক্ষোভ বোধহয় কোথাও জমা হয়ে থাকে যার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য, একটু পান, প্রেম প্রেম খেলা ইত্যাদি নিয়ে কাটিয়ে দিতে চাই। পণ্ডিত লোক নই যে, কোনও ব্যাপক চিন্তার জগতে ডুবে থাকব। আমি একটা চাকর মানুষ, সেখানে বহুবিধ অন্যায় অবিচার চোখের সামনেই ঘটছে। আমার নিজের হাত দিয়েও ঘটছে, অথচ তার বিরূদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতাও আমার নেই।'[৪৬]

অধীপ নিঃসঙ্গ নায়ক। আত্মময়তার দুর্ভেদ্য দেয়াল থেকে মুক্তি চেয়েছে। ভেতরকার সুপ্ত ভালোবাসার খোঁজ সে পায় না। সে সমাজকে বিচলিত না করে হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে চায়। নারীকে সে তিনটি রূপে ভজনা করতে চায়– শক্তিরূপিণী, আনন্দদায়িনী এবং হ্লাদিনীরূপে।

অধীপের সমাজটা স্বচ্ছ নয়। সে সুযোগ পেলেই ক্লাইন্টদের লোন দিতে গিয়ে ঘুষ খায়। কাজের ক্ষেত্রে এ জাতীয় লেন-দেন যেন স্বাভাবিক নিয়ম। ডাক্তার ক্লিনিক তৈরির জন্য ব্যাংক থেকে লোন নেবে তাই অধীপের কাছে ভিজিট নেয় না। অনেকটা রসিকতা করে বলে 'তখন অনেক ভিজিট আমাকেই দিতে হবে কি না, সেটা একটু কমিয়ে রাখলাম।'[৪৭]

রূপার মৃত্যুতে অধীপ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঝকঝকে কাটা চামচ দেখলেই অবচেতনে কঙ্কালের দংশনোদ্যত শাণিত দাঁতের মতো মনে হয়। কখনো কখনো তা উদ্যত বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর মনে হয়। ফর্ক তার ব্রেইনের ইকিউলিব্রিয়াম নষ্ট করে দেয়। ফলে ফর্কের নাম শুনলে তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ডাক্তার তাকে বলে তার এপিলেপ্‌সি হয়েছে, যে কারণে সে মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। অধীপ অনুধাবন করে এই অসুখ তাকে সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে কখনোই তার নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারবে না কেননা গভীর অন্ধকারের পর্দা ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় মধ্যবিত্তের যে চিত্তবৈকল্য দেখা দেয় তা ব্যক্তি এবং পরিবারকে ছাড়িয়ে সমাজকে প্রভাবিত করে। *অন্ধকার গভীর গভীরতর* উপন্যাসে যে সমাজের কথা পাই তার গভীরে শুধুই শূন্যতা। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে লুকিয়ে অন্য নারীর সাথে মিলিত হয়, অথবা স্বামীর উপস্থিতিতেই স্বামীর সহকর্মীর সাথে স্ত্রী স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হয় সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের আশায়।

অশ্লীল

সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তবে *অশ্লীল* উপন্যাসে তিনি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবককে দাঁড় করান উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মাঝামাঝিতে। তার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করেন। মদনের বাবা মহাদেব মুখোপাধ্যায় একসময় ব্যারিস্টার ছিলেন। বর্তমানে তার পেশা সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না। কিন্তু তার বাড়িতে সান্ধ্য আসরে কবি-সাহিত্যিক-আমলা থেকে ইনস্যুরেন্স অফিসার পর্যন্ত উপস্থিত হয়। তার ছোট ভাই আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে প্রবাসী, তার একমাত্র বোন ছাত্রনেতাকে বিয়ে করে সংসারী। সেই ছাত্রনেতা বর্তমানে এমপি। সে তার পরিবারে সম্পূর্ণ বেমানান। নিজের সম্পর্কে তার আত্মকথনে জানা যায় 'অবিশ্যি আমি বেকার, সারাদিন পড়া আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া বলতে গেলে কিছুই করার নেই।'[৪৮] মদন উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সে অন্যদের মতো সুবিধাবাদী নয়। নিজের সম্পর্কে তার অভিমত '...আমার নিজেকে কখনওই পরাজিত মনে হয়নি, ঈর্ষাকাতরও না এবং নিজেকে আমি কখনওই সুখী বোধ করিনি। অসুখী বোধ করিনি, ঘরকুনো, গোমড়ামুখো বলতে যা বোঝায়, আমি তাও না। আমি পারি না তর্ক করতে। জেদ করতে বাজি ধরতে এবং বাইরের উত্তেজনা আমাকে তেমন ছোঁয় না। যে কারণে রাজনীতির মাঠে বা খেলার মাঠে আমার কোনও টান নেই, কিন্তু আমার দিশেহারা নিশ্চেষ্ট ভাবের জন্য আমি মনে মনে কেমন ছটফট করি।'[৪৯] মদন স্বসমাজে বিচ্ছিন্ন এবং অনন্বয়েরবোধে আক্রান্ত। পরিবারে ভাইবোন কারো সাথে তার যোগাযোগ নেই। স্বসমাজে খাপ খাওয়াতে না পারায় তার বাবা

তাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়। দিল্লীর উচ্চবিত্ত সমাজেও সে বেমানান। উচ্চবিত্ত নারীদের হাতছানিতে সে বিব্রত হয়েছে। দিল্লির কর্নট সার্কাসের জনাকীর্ণ রাস্তায় বেসামাল লাইলী সিং-এর সাথে অশালীন আচরণের অপরাধে তার দুই মাসের কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মদনের নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। মদন এই যন্ত্রণাকাতর জীবন থেকে বাঁচতে চেয়েছে। তাই সে আবার কলকাতায় ফিরে আসে। ফিরে আসার মুহূর্তে ট্রেনে সে যা দেখে তা তার কাছে অবিশ্বাস্য। যে জগৎ বিশ্বাস, লাইলী সিং, সুদীপ্তা চ্যাটার্জিরা তাকে অশ্লীল বলে সমাজে অপাঙক্তেয় করেছে তারাই দোর্দাণ্ড প্রতাপে ব্যভিচার করে যাচ্ছে। জগৎ বিশ্বাসের সাথে ভ্রমণের সময় সে জেনেছে জীবন ও শিল্প এক নয়। জীবনে যা ঘটবে তার সবই গোপনে। এমনকি তাকে সাহিত্যেও আনা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি এবং সাহিত্যবিষয়ক এই উপদেষ্টার মতে গোর্কির মালভা অবসিন। ‘অবকোর্স। যেখানে বাবা আর ছেলে একটা মেয়েমানুষের (মেয়ে মানুষ! মিস্টার জে বিশওয়াস উচ্চারণ করতে পারলেন) জন্য পশুর মতো মারামারি করতে পারে, আর তাই দেখে সেই মেয়েটা লুটিয়ে পড়ে হাসতে পারে, দ্যাট ইজ অবসিন্ড হান্ড্রেট পার্সেন্ট অবসিন।’[৫০] মদন এর প্রতিবাদ করে সে বলেছিল ‘পেটি বুর্জোয়া বাবা আর ছেলের মাঝখানে, আসলে মালভা চরিত্র। আর সেই বেকার আর দু দু দুর্জয়...।’[৫১] এই বলে সে আর কথা শেষ করতে পারেনি। জগৎ বিশ্বাসের ব্যঘ্রভঙ্গি দেখে সে ভয় পেয়ে যায়।

মদন দেখে সমাজে পারভার্সনের চিত্র সর্বত্র। তাকে অশ্লীলতার অভিযোগে যারা কারাদণ্ড দেয় সমাজে তারাই অশ্লীল। এদের মধ্যে কেউ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলা। যারা সমাজকে নেতৃত্ব দেয়, দেশের নীতিনির্ধারক। লেখক উচ্চবিত্ত সমাজের নৈতিক অবনমন দেখালেন। বিশেষত উচ্চবিত্ত সমাজে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তারাই দুরন্ত গতিতে স্বেচ্ছচারে লিপ্ত। সমাজের সমালোচনার তারা ঊর্ধ্বে। মদনের বাড়িতেও মদন একই পরিবেশ দেখে। তার বাবা নিজেকে উচ্চবিত্ত সমাজের অংশ প্রমাণ করতে সমাজের উচ্চপর্যায়ের মানুষদের নিয়ে বাড়িতে মদের আড্ডা বসায়। মদনের আচরণের সবাই সমালোচনা করে। ভোগবাদী তত্ত্ব মদন বুঝতে পারে না। জে বিশওয়াসের ‘দিস ইজ লাইফ’ তত্ত্বটি তার বোধগম্য হয় না। লাইলী সিং-এর মতো মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সে কোনদিনই বুঝতে চায়নি। এমন কি তপন কাকার স্ত্রীর মনোভাবনাও তার অজানা। মদনের বাবা মদনকে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পরামর্শ দেয় এবং ইলেকশনে দাঁড়াতে বলে ‘ছুরিটা বোর্ডে মেরেই দেখ না, লক্ষ্যভেদ হলেও হতে পারে।’[৫২] তখন তার মনে হয়েছে ইলেকশনের রাস্তাগুলো ফেয়ার নয়। মদন এসবের কোনো কিছুতেই আকর্ষণ বোধ করে না। এই চরিত্রটিই উপন্যাসের শেষে এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

বোহেমিয়ান মদন নিজের বিপরীত স্বভাবটি আবিষ্কার করে। সে তাদের বাড়িতে আশ্রিতা তিতিরের প্রেমে পড়ে। 'তিতির আমার কাছে এলে আমি ইয়ে আনিজি ফিল করি, আমি ওর কাছে আর অগের মত থাকতে পারি না, কারণ আমার মনের মধ্যে একটা পজিটিভ কিছু ঘটেছে, আর এটা ঘটার আগে আমি কিছুই জানতে পারিনি।'[৫৩] তবে তার দ্বিধাগ্রস্ত মন তার বাবার সাথে তিতিরের সম্পর্ক নিয়ে সন্দিহান। নিজের প্রতি সচেতনতাই সে নিজের কথা লিখতে চায়। তার অভিজ্ঞতার কথা, ভালোবাসার কথা, বেঁচে থাকার কথা ইত্যাদি। 'আমার জীবনের যা অভিজ্ঞতা ফিলিংস, তা এমনই ক্রুয়েল, শকিং আর এমন নেকেড অ্যান্ড ফিউরিয়াস, যা আমি অসংকোচে লিখতে চাই— ...মানে আমার লেখা- অবসিন হয়ে গেলে?'[৫৪] এখানেই চরিত্রটির উত্তরণ। মধ্যবিত্ত মানসিকতার জয়।

ত্রিধারা

উপন্যাস মধ্যবিত্তের নিজস্ব সাহিত্যিক রূপকল্প।[৫৫] মধ্যবিত্ত শ্রেণির লেখকরা মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক চরিত্রের নির্মাতা। মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে জীবনের বহুকৌণিক জটিলতা প্রাধান্য পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণীয় :

> পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তরে সমরেশের যাত্রা। মধ্যবিত্ত জীবন, প্রান্তীয় জীবন— এভাবে কিন্তু সমরেশের পর্যায়ন্তরকে ব্যাখ্যা না করাই ভাল। নিজে মধ্যবিত্ত পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। হয়তো সে কারণেই মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সীমাবদ্ধতার, নানা গ্লানিতে তিনি আহত ছিলেন, পীড়িত ছিলেন। অনেকবার তিনি আমাকে মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। তাঁর নিজের জীবনের অনেক তিক্ততার ইতিহাস রয়েছে, তাঁর নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক ঘটনায়। তিনি খুব ভাল করে জেনেছিলেন কলকাতার মধ্যবিত্ত ও মফস্বলের মধ্যবিত্তের মুখ ও মুখোশের ঢাকাঢাকি ও উন্মোচনের ও আবরণের রহস্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব কতদিক থেকে খঞ্জ ও পঙ্গু সেই পাংশু জীবনযাত্রায় সমরেশ কোনও সময়ে শান্তি পায়নি।[৫৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তমান সময় এবং সমাজমানসের পরিচয় পরিদৃশ্যমান *ত্রিধারা* উপন্যাসে। সুজাতা, সুগতা, সুমিতার প্রাত্যহিকতার অন্তরালে আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিভাসিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রেমভাবনা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের নবমূল্যায়ন এবং রাজনীতি। স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্ত এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'একটা পরিবারের ভিতরকার উদ্বেগ, সংকটের চোরাস্রোত, সম্পর্কের জট জটিলতাকে লেখক এই উপন্যাসে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছেন।'[৫৭] মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে সমরেশের যে দ্রোহ এবং দাহ তার প্রাথমিক প্রকাশ এই উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্বে নারীর অবস্থান, তার মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। উপন্যাসটি পরিবারকেন্দ্রিক, কিন্তু অনিবার্যভাবে রাজনীতি এসেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য 'আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে ঘুরে ফিরে পার্টির কথাই এসে যাচ্ছে। 'ত্রিধারা'য় ইন ফ্যাক্ট যত যা-ই বলি না কেন রাজনীতিটাই বড় হয়ে উঠেছে।'[৫৮]

ত্রিধারা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন মহীতোষ, যিনি উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। মেধা, মনন, শ্রমের দ্বারা তিনি উত্তর কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উপরে উঠে এসেছেন। চাকরিতে উচ্চমর্যাদায় আসীন হয়ে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকায় নিজস্ব বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। বিপত্নীক মহীতোষ তিন কন্যা সুজাতা, সুগতা ও সুমিতাকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন নিজস্ব ভুবন। চাকরির সূত্রে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, আয়ত্ব করেছেন সেখানকার দর্শন এবং সংস্কৃতি। মুক্তবুদ্ধির ধারক মহীতোষ মেয়েদের স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছেন। নিঃসঙ্গতা কাটাতে মেয়েদের বন্ধু ভেবেছেন। জ্যেষ্ঠ কন্যা সুজাতার বিবাহ বিচ্ছেদে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। পিতৃত্বের দাবি থেকে মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বলেছেন— 'হয়তো বড় দেরি করে ফেলেছি, তবু মনে হচ্ছে, আমি আমার কর্তব্য বোধহয় ঠিক করে উঠতে পারিনি।'[৫৯] সুজাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ব মুহূর্তে তার মনে হয়েছে দুজন একসাথে থাকলে হয়ত মনোমালিন্য কেটে যাবে। সুজাতার আত্মাভিমান এবং তেজস্বিনী মূর্তি দেখে তিনি যেমন গর্বিত হয়েছেন, তেমনি মেয়ের দুঃখে তার মন কেঁদেছে। শেষ মুহূর্তে তিনি আপসের চেষ্টা করেছেন। সুজতার ডিভোর্সে তিনি ভেঙে পড়েছেন— 'তার কি শরীর নেই, মন নেই, তার কি সাধ নেই, আহ্লাদ নেই।'[৬০] ইত্যকার নানাবিধ প্রশ্ন মনে জেগেছে। মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছেন। সমাজ কী ভেবেছে এ জাতীয় প্রশ্নকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেননি। সুজাতার ডিভোর্সের পর তার ভবিষ্যৎ ভেবে কলকাতার অদূরে চাকরি নিয়েছেন। মহীতোষ পাশের বাড়ির ডেপুটি মিত্র সাহেবের মতো পালক পিতা এবং শাসক পিতা হতে পারেননি। মেয়েদের অবাধ বিচরণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেননি। নিজ তনয়াদের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নির্বিঘ্ন জীবন প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে মেয়েদের যে বলিষ্ঠ জীবনের কল্পনা করেছিলেন সেখানে এমন ভয়াবহ গর্তটি যে হা করে আছে, তাকে একবারও দেখতে পাননি।[৬১]

যুদ্ধকালীন পরিবর্তমান সময়কে তিনি দেখেছেন সহজভাবে। তার সময়ে মানুষ সম্পর্কের বন্ধনকে সম্মান জানিয়েছে। নিজেদের মধ্যকার বিবাদ চেপে রেখে আপস করেছে। কিন্তু কালিক বৈনাশিকতায় সমস্ত কিছুতেই ফাটল ধরেছে। তিনি যুগযন্ত্রণার নীরব সাক্ষী। সে যুগ 'এত নিষ্ঠুর, এত কঠোর যে, জীবনের কোথাও সে সামান্যতম গোপনতাকে প্রশ্রয় দেবে না। প্রাণ না মানলে, যুক্তি না পেলে কেবলি ভাঙবে আর গড়বে; আবার ভাঙবে।'[৬২] মহীতোষ এই যুগকে চেনেন না। তিনি বিশ্বাস করেন তার দ্বিতীয় কন্যা সুগতা এই যুগকে চেনেনি। তাইতো সুগতার ডিভোর্সে হতাশ হয়ে আফসোস করেছেন 'তোরা— আমাদের এই সমাজের মেয়েগুলি কী করবি ?[৬৩] 'কন্যাদের জীবনে একের পর এক বিপর্যয় দেখে আশ্রয় নিয়েছেন নিজস্ব জগতে। প্রগতিভাবনায় বিশ্বাসী এই মানুষটি সুজাতা-গিরিন, সুগতা-মৃণালের দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতা,

সুমিতার জন্য দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে বারবনিতায় আশ্রয় খুঁজেছেন। কিন্তু বিপথগামিতা তার জন্য নয়। তাইতো অফিস শেষে নিঃসহায়ের মতো ঘুরে শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

আধুনিক সমাজমানসের সাথে তাল মিলিয়ে চলা এই মানুষটি এক সময় উপলব্ধি করেন মিউনিসিপ্যালিটিতে তার মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তারা নতুন ভাবনার মানুষ চায়। জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি হয়ে পড়েছেন নিঃসঙ্গ, একাকী। দুঃখ করে বলেছেন— 'মানুষ যখন অক্ষম হয়, তখন তার কষ্ট কেউ রোধ করতে পারে না।'[৬৪] তারপরও তিনি জীবন নিয়ে আশাবাদী । মেয়েদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় বেঁচে থাকতে চান। তার উচ্চারণে তা স্পষ্ট :

> জীবনের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছি মা, অবোধ শিশুর মতো মাথা নত করে আছি, নমস্কার করছি। বলছি আমার সন্তান কটিকে শান্তি দাও।

সন্তানদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে তিনি বুদ্ধদেব বসুর *তিথিডোর* উপন্যাসের রাজেন বাবুর সাথে তুলনীয়। উভয়েই স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছন্দপতনের নীরব সাক্ষী।

নাগরিক নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে অর্থকষ্ট প্রবল কিন্তু তা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সহজ ভালোবাসায় পূর্ণ। এরকমই একটি পরিবার মহীতোষের দাদা-বৌদির পরিবার। মহীতোষের বাবা দরিদ্র কেরানি ছিলেন। মহীতোষ চাকরির সূত্রে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে জায়গা করে নিলেও তার বাবার পরিবার তিমিরেই বাস করত। মহীতোষের উত্তরণের নেপথ্যের রক্তক্ষরণ তার সন্তানদের অজানা ছিল। উত্তর কলকাতায় তার বিধবা বউদি ও তাদের সন্তানেরা দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেছে :

> তেতলার ঘর, তবু যেন অন্ধপুরী। তিনটি এমনি ছোট ছোট ঘর। ছোট বড় নিয়ে পনেরোটি মানুষ থাকে। তেলচিটে তোষক গুটানো। ছেলেমেয়েগুলি খালি তক্তপোশে মেঝেয় ছুটোছুটি গড়াগড়ি করে। বিছানা-মাদুরগুলো ময়লা শ্রীহীন। দু-তিনখানা চেয়ার ছড়ানো এদিকে ওদিকে। ছেলেপুলেরাই কখন টানাহেঁচড়া করে রেখে দিয়েছে। আয়না আছে টেবিল আছে সবকিছুই যেন কী রকম।[৬৫]

মহীতোষের বিধবা বউদি সুখদা মমতাময়ী, গৃহকর্মনিপুণা। মহীতোষের সমবয়সী কিন্তু দেখে মহীতোষের চেয়ে বৃদ্ধা মনে হয়। সুজাতার বিবাহ বিচ্ছেদের সংবাদে উৎকণ্ঠিত। তিনি বলেছেন উমনো (সুজাতা) তোমার সন্তান তার ওপরে মেয়েমানুষ। সে কী নিয়ে থাকবে ? তার কি শরীর নেই, মন নেই, তার কি সাধ নেই, আহ্লাদ নেই।[৬৬]

মহীতোষের ভাইপো নবগোপাল জার্ডিন কোম্পানির কেরানি। তার বাড়িতে মহীতোষের উপস্থিতিতে তিনি গর্ববোধ করেন। উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণী শ্রেণিটির প্রতিনিধিত্ব করে সুজতা, সুগতা, সুমিতা এবং তাদের সূত্র ধরে তাদের বন্ধুরা।

সুজাতা কনভেন্টে বড় হওয়ার কারণে কলকাতার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। তারপরও স্বদেশী আন্দোলন করে জেলে গিয়েছে। বন্ধু রবির সঙ্গে জেলও খেটেছে। স্পষ্টভাষী এবং প্রতিবাদী চরিত্র। বন্ধু রবিকে ভালোবাসে। কিন্তু এটা জানতেই তার এক জীবন কেটে যায়। গিরীনকে ভালোবাসে ভেবে বিয়ে করে। গিরীনের অর্থবিত্ত-প্রতিপত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে নির্ভার ভেবেছিল। গিরীনের যৌনজীবনের অমিতাচারে দাম্পত্য সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুজাতা ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেয়। সুমিতা বাবার আপসের চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে— 'ভাববে আমি কেঁদে কাঙালি হয়ে পাঠিয়েছি, আমি ভেঙে পড়তে চেয়েছি তার অন্যায় অহংকারের কাছে।'[৬৭] মধ্যবিত্তের সামাজিক মূল্যবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে আপোষ করেনি। সে restitution of conjugal rights-এর দিকে যায়নি। সেপারেশন চেয়েছে। ডিভোর্সের পরে নিজেকে অনেকটা নির্ভার মনে হয়েছে। গিরীনের দেয়া খরপোষের চেক ঘৃণাভরে সে প্রত্যাখ্যান করে। 'যার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, শুধুমাত্র আইনের সুযোগে তার এ অবহেলার দান আমি নিতে পারব না।'[৬৮] শৈশব থেকে বিত্তের প্রতি আকর্ষণই তাকে গিরীনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

স্বামী হিসেবে গিরীন কিছুটা আধিপত্যবাদী এবং সংবেদনশীল। গিরিন চরিত্রে নাগরিক উচ্চমধ্যবিত্তের মনোবিকলনের চিত্র এসেছে। রবির জেলে থাকার সুবাদে সুজাতার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়। বিয়ের পর সুজাতার কাছে পূর্বপ্রণয়ের কথা স্বীকার করে। যুদ্ধের সময়ে এক অসহায় নারীকে স্ত্রীর পরিচয়ে আশ্রয় দিয়েছে। সুজাতার সাথে দাম্পত্য সংকটের সূত্র এই পূর্ব-প্রণয়। সুজাতার এক চিঠির প্রত্যুত্তরে লেখে— 'সে সুন্দরী এবং বিদুষী কিনা অনর্থক এ প্রশ্ন করে আমাকে খোঁচা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। হ্যা সে আমার রক্ষিতা ছিল।'[৬৯] সে সুজাতাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সুজাতার ফিরে আসার পথ পরিষ্কার এবং সুজাতা ফিরে না এলে বংশের নিয়মানুযায়ী সে সিদ্ধান্ত নেবে। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সুজাতার কর্মস্থলে প্রতিদিন গিয়েছে। দূর থেকে সুজাতাকে দেখেছে, সুজাতাকে একাকী পেয়ে জোর করেছে। এই অনিচ্ছুক শারীরিক সান্নিধ্য তাদের জীবনে ট্রাজেডি বয়ে আনে। সুজাতা ফিরে আসেনি। গিরীনের ঔরসজাত ভ্রূণকে সে নষ্ট করে দেয়। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ, সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি থেকে নামিয়ে এনেছে। এই একই সূত্রে এই উপন্যাসে একাধিক দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ এসেছে।

মৃণাল-সুগতা দম্পতির একই পরিণতি লক্ষণীয়। বিয়ের পরে সুগতাকে রাজনীতি করতে দেবে কি না এ প্রসঙ্গে মৃণাল বলেছে— 'যেখানে দেখে তোমাকে চিনেছি, সঁপেছি নিজেকে, সেখান থেকে টেনে

নামাবার সাধ্য আমার নেই।'[৭০] এই মৃণালই কিছুদিন পর পরিবর্তিত হয়েছে। বিয়ের পর মৃণাল ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে ব্যবসা করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি স্মতর্ব্য— 'মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্র রক্ষণশীল বলে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা এবং চিন্তা চেতনা ও কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়। মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি প্রগতিবাদী হয় না। হতে চাইলেও পুঁজিবাদের অদৃশ্য হাত তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।'[৭১] মৃণাল প্রথম দিকে প্রগতিবাদী হলেও পুঁজিবাদী ভাবনা থেকে বের হতে পারেনি। যে কারণে মৃণালের ব্যবসায় মনোনিবেশ সুগতা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। সুগতা প্রখর রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেত্রী। অবচেতনে সংসারটাকে সে রাজনীতির মঞ্চ বানিয়ে ফেলে। ফলে সংঘাত অনিবার্য। এই যুগল দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিরক্ত, বিবিক্ত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। যে কারণে খুব সহজেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুজাতা রবির মতো লুকোচুরি করে না দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায় 'বিয়ে গড়া আর বিয়ে ভাঙার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। কিন্তু আজকের দিনে এটা বাড়বে বই কমবে না বোধ হয়।'[৭২] সুগতার সর্বস্বজুড়ে রাষ্ট্র আর সমাজের ভাবনা। বিবাহিত জীবনে একই জায়গায় সে মৃণালকে পায়নি। তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় পরস্পরের অহংবোধ। এখানে অবশ্য সুগতার রাজনীতিবোধে একটা ফাঁকি ধরা পড়েছে। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু নিজে বাস করেছে আশি হাজার টাকায় কেনা বিলাসী ফ্লাটে। প্রথম দিকে সুগতার স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি কিছুটা দুর্বল ছিল। তাই খুব সহজেই ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এই ফাঁকি যখন ধরা পড়েছে তখন মৃণালকে সে আর পাশে পায়নি। পুঁজিবাদের অদৃশ্য হাত মৃণালকে গ্রাস করেছে। প্রথম দিকে সুগতা নিজেকে চেনার পরিবর্তে বিত্ত, বৈভব, সুখটাকে চিনতে চেয়েছিল।[৭৩] কিন্তু যখন সে নিজেকে চেনে তখন একদিকে উদ্দেশ্য সচেতন হয়, অন্যদিকে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব। একমাত্র বৃদ্ধ পিতা তার সহায়। যিনি ভাবেন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে কি সেই ফাঁকটা আবিষ্কার করা যেত না? আঙুল চেপ্টে যাওয়া ছেলেমানুষের মতো তাই পর পর দুই মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদে ব্যথাতুর হয়ে ওঠেন।'[৭৪]

সুগতা নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি, যে জানে শারীরিক সম্পর্ক এক প্রকার পরদা যা অন্তর যাচাইয়ের নিমিত্ত মাত্র। ভালোবাসা না থাকলে দেহটা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই সে বন্ধু রাজেনের কাছে ফিরে যায়নি। কারণ রাজেনের ব্যাপ্তিকে সে ভয় পায়। কেননা এখানে রাজেনের সাথে যোজন যোজন মানসিক দূরত্ব। সুগতা ধনাত্মক রাজনীতি চেতনায় উত্তর চব্বিশ পরগনাতে শ্রমিক মেয়েদের জন্য স্কুল চালিয়েছে। কিন্তু তাদের বোধের কোনো উত্তরণ ঘটেনি। অর্থাভাবে স্কুলের উন্নতি হয়নি, সুগতার সামনে প্রান্তিক এসব নারী ফস

ফস করে বিড়ি ধরায়, ... তারপর জিজ্ঞেস করে তার মরদ আছে কিনা।[৭৫] সুগতার সাথে তারা বিভূতিকে দেখে। তারা সুগতার কাছে 'মরদ থাকবে কিন্তু বাচ্চা হবে না',[৭৬] এই জাদুমন্ত্র শিখতে চায়। সুগতার অসহ্য মনে হয়। শ্রেণিগত ভাবনা থেকে পালাতে চায়, কিন্তু পারে না বিভূতির মতো শিল্পীকে দেখে অনুপ্রেরণা পায়। বিভূতির নিরলস কর্ম, তার ক্যানভাস তাকে জীবনযুদ্ধে অনুপ্রেরণা দেয়।

প্রেম এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে রাজেন বাতিক্রমী চরিত্র। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এম এ পাশ। কর্মজীবনে প্রবেশ না করে রাজনীতি করে। একদিকে ছাত্রনেতা, অন্যদিকে গরিবের নেতা। প্রেমের ক্ষেত্রে অনেকটা বোহেমিয়ান। সুগতার প্রতি ভালোলাগা প্রকাশ করে, কিন্তু বিয়ের প্রত্যাশী না। সুমিতাকে তাই মজা করে বলে 'আমি যদি মস্ত বড় মিলওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করি, সে বেঁচারি কেঁদে পালাতে পথ পাবে না।'[৭৭] সেই রাজেনই সুগতার বিয়েতে কিছুটা হতাশ হয়। মৃণালের ভাবনায় বেরিয়ে আসে রাজেনের স্বরূপ। রাজেন রাজনীতি, শক্তি, ইনস্যানিটি নিয়ে কিছুটা হতাশ। তবে রাজেন সৎ। দলের সদস্য বিজলীকে অজয় শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে সে প্রতিবাদ করে। অজয় রাজেনকে মারতে চাইলেও তার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানে। রাজেন আপন ব্যক্তিত্বে পার্টির অন্যান্য সদস্যর কাছে গুরু সম্মানে ভূষিত হয়। নীতি এবং জীবনচর্যার মধ্যে তার কোনো ফাঁকি ছিল না বলেই সে একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট।[৭৮] পার্টির বাইরে ব্যক্তিগত জৈব জীবনকে সে তুচ্ছ ভেবেছে। হাওড়ার শ্রমিক অঞ্চলে শ্রমিকদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি চেয়েছে। তবে শ্রমিকদের সাথে শ্রমিকদের মতো করে মিশতে পারেনি। মজুররা ধূলিমলিন অবস্থায় তার ঘরে ঢুকতে পারে না। রাজেন সুমিতাকে জানায়, জঞ্জাল ছড়িয়ে রাখা ভালো লাগে না আমার। একেবারে কাজ করতে পারিনে, নোংরা থাকলে।[৭৯] এইখানে রাজেনের অসারতা। রাজেনের চরিত্রে মধ্যবিত্তের ফাঁকি ধরা পড়েছে। রাজেন ভালোভাবে বাস করাটা অন্যায় মনে করে। তাই নিজের বাড়ি সংস্কার করে না। আবার বস্তিতে মজুরদের ধূলিমলিন পায়ে নিজের ঘরে ঢুকতে দেয় না। রাজেন আদর্শ আর নীতির বেড়া দিয়ে শৃঙ্খলা রাখতে চেয়েছে, যা তার মা সুধাময়ীর কাছে কাঁটাতার সদৃশ। তাই তার প্রাণের সংযোগহীন নীতি-আদর্শ মুখ থুবড়ে পড়ে। রাজেন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে পারেনি। শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা বেড়েছে তাদের চাকরি গেছে। ধর্মঘট তারা মেনে নেয়নি। সবাই রাজেনকে ছেড়ে গেছে। রাজেনের মা রাজেনকে সত্যটা বলেছে, 'ঘেন্না দিয়ে কোনও বড় কাজ হয়।'[৮০] নীতিঅন্ধ রাজেন তা বোঝেনি। সুমিতা শুধু দূর থেকে দেখেছে 'রাজেনরা শ্রমিকদের শাসন করে বুরোক্র্যাটদের মতো।'[৮১] রাজেনের মা সুমিতাকে বলে রাজেনকে ত্যাগ করতে। সুমিতা রাজেনকে ছেড়ে গেছে কারণ তার প্রাত্যহিক রাজনীতির মধ্যেও সে জীবনের যোগ খুঁজে পায়নি। 'জীবনবোধকে পার হয়েও তুমি যেখানটায় খচখচ করবে সেখানটাকে নিয়ে যে কী করব। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত লেখক জীবনের জয়গান গেয়েছেন। রাজেন ফিরে গেছে সুমিতার কাছে। সুমিতা আত্মহারা হয়ে বলেছে— ''এসে পড়লুম!'' কী বিচিত্র কথা! এসে পড়েছে, এসে পড়েছে ! কী এসেছে। শুধু মানুষটি এসেছে, না জীবন এসেছে?[৮২] সুমিতা রাজেনকে মেনে নিয়ে জীবনকে জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে।

উপন্যাসের নায়িকা সুমিতা। তারই দৃষ্টিতে উপন্যাসের কাহিনি গতি পেয়েছে। সক্রিয় রাজনীতি না করলেও রাজনীতির গতি প্রকৃতি লক্ষ করেছে। তার বড়দি স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গেছে, রবিদা অধ্যাপনা আর রাজনীতিকে জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। সুমিতা সুজাতা-সুগতার জীবনকে কাছে থেকে দেখেছে। সুজাতা-গিরীনের দাম্পত্য প্রেম দেখে 'কী যে ভালবেসেছিল দু'টিকে।'[৮৩] মাতৃহীনা সুমিতার জীবনে তারা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল। তাদের বিচ্ছিন্নতা সুমিতার নতুন দিগন্তকে বিদ্রূপ করেছে। বাবার সাথে কোর্টে গিয়ে উকিল অনিলবাবুদেরকে মনে হয়েছে 'কালো গাউন পরা শকুন'।[৮৪] যারা বিশালকায় খড়গ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে 'বড়দি আর গিরীনদার মাঝখানের সমস্ত তন্ত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।'[৮৫] সুমিতার মনে এক ভাবনার উদয় হয় :

> যদি গিরীনদা গিয়ে বড়দির হাত ধরে টেনে নিয়ে যান। যদি বড়দিটা কেঁদে ফেলে সত্যি সত্যি গিরীনদা সঙ্গে চলে যায়। ওরা সব ঝগড়া ভুলে যদি সেই আগের মতো হয়ে যায়। সেই আগের মতো হাসতে হাসতে, ঠিক আগেরই মতো ওই গাড়িতে চলে যায়।[৮৬]

সুমিতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। গিরীন-সুজাতার বিচ্ছেদ তার চিত্তলোকে নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির জন্ম দেয়। এই বিচ্ছেদ তার আনন্দময় মধ্যবিত্ত পরিবারে ছন্দপতন ঘটায়। আবার সুগতা-মৃণালের বিবাহ বিচ্ছেদে তার অভিজ্ঞতা হয় শাণিত। তার মানস পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃত প্রেম এবং শরীরী আবেদনকে পৃথক করতে শেখে। তাই বিনয়ের স্পর্শে সে পাষাণের মতো শক্ত হয়ে গেছে। বিনয়ের ব্যাকুলতা তার কাছে ছেলেমানুষের পাগলামি মনে হয়েছে। আবার জীবনের প্রতি, স্বদেশের প্রতি বিদ্রূপসর্বস্ব আশীষও তার মনের মানুষ হতে পারেনি। আশীষ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে সুমিতাকে। আশীষের বিদ্রূপবাণ, আর নিজের যৌবনের দাবির সাথে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বুঝেছে আশীষ তার জন্য নয়। সে কারণে যথার্থ জীবনের চাহিদায় রাজেনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। আবার রাজেনের অসারতায় দূরে সরে গেছে। জটিল বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় রাজেনের পুনরাগমনে সে রাজেনকে আপন করে নিয়েছে। জীবনের সাথে সম্পর্কচ্যুত নীতি অন্ধ রাজেনকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নীতিবর্জিত মুক্ত রাজেনের পাণিপ্রার্থী হওয়ায় একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজেনের ছায়াচারী হওয়ায় নারী স্বাধীনতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলে। লেখক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন 'আমার আরো

ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত ছিল এদের জীবন সম্পর্কে আমার ধারণার অস্পষ্টতায় আমার ত্রুটি।'[৮৭] শেষ পর্যন্ত মানতেই হয় রাজেন সুমিতার সান্নিধ্যে পেয়ে যায় জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। দুজনেই একসঙ্গে গড়ে তুলতে চায় জীবনের নতুন ভুবন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আধুনিক মানুষের জীবনে নেমে আসে গভীর সঙ্কট, বহুবঙ্কিম জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তার প্রাত্যহিক জীবন।[৮৮] যুদ্ধোত্তর কালিক বৈনাশিকতায় যুবসমাজ হারায় তার প্রত্যয় আর প্রমূল্য। সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে নিজের সভ্যতা সংস্কৃতিকে করে লাঞ্ছিত। আশীষ এরকমই একটি চরিত্র। সুমিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে তার উপন্যাসে আগমন। দেশের শিল্প-সাহিত্য তার কাছে বিদেশী শিল্প-সাহিত্যের অনুকরণ। রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সে এক ধরনের হীনতা খুঁজে বেড়ায়। সুমিতার প্রথম দিকে মনে হয়েছিল আশীষের নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি থেকে এসবের জন্ম। তাই সে আশীষের সঙ্গী হয়েছিল। আশীষের নিজের চারপাশটাকে শ্রীহীন নিস্প্রাণ মনে হয়। শ্রমিক আন্দোলনে সে কিছু খুঁজে পায় না। তার মনে হয় 'ওদের ট্রেড ইউনিয়ন, অর্গানাইজার সবটাই একটা নিম্নমধ্যবিত্তসুলভ কেরানিগিরি।'[৮৯] বাঙালিকে ছোট করার মানসিকতায় ইউরোপে ইউরিনাল লক সিস্টেমকে কেমন করে বাঙালি যুবকরা বোকা বানায় সেই গল্প শোনায় সুমিতাকে। নিজেকে সে এ দেশের অংশ ভাবতে পারেনি। পাশ্চাত্যভিলাষী আশীষের নিকট 'এদেশে জনমত মানে একটা ক্রুড, ভালগার উল্লাস। এরা ভাল জিনিস নেয় না কখনও, মাতালদের মত পচা চাট এদের উপাদেয়।'[৯০] তার বক্তব্যের মতোই তার ঘর বিদেশী বইপত্র আর বিদ্রূপ ঠাসা, যেখান থেকে সুমিতা পালাতে চেয়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে তার ধারণা 'ওদের ভালবাসার বড়াই, নারী প্রগতি, প্রেমের মুক্তি যা কিছু সবই রাজবাড়ির খিলানগুলোর খোপের পায়রার বক-বকম। উড়ে ওরা অন্য কোথাও যায় না। আকাশের একটি কোণে উঁকি মেরে আবার ফিরে আসে। সবাই মুগ্ধ হয়, হাততালি দেয়। পায়রার মালিক থাকলে সে বেচারা একটু ঘাবড়ে যায় হাততালির ভয়ে। কিন্তু ওতো হারাবার নয়। খোপ ছেড়ে যাবে কোথায়?[৯১] নারীর প্রগতি ভাবনার প্রতি সে অবিশ্বাসী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে তার অন্যনির্ভর এবং প্রত্যাখ্যাত মনে হয়। আর ছেলেদের সম্পর্কে ধারণা 'অক্ষম অহংকারীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে কাফে রেস্তোরাঁয়, কলেজে হোস্টেলে, বারে আর রাস্তায়। গরিব করছে বড়লোকের ভড়ং আর বড়লোক দারিদ্র্যের ভাঁড়ামি। স্থূল বুদ্ধি ছেলে শুধু মুখের দুটি কথাতেই আর পোশাক আশাকেই হতে চায় ইনটেলেকচুয়াল। বাদবাকি যাদের তুমি বাঙালি নওজোয়ান বলবে, তাকিয়ে দ্যাখো তাদের দিকে রকবাজ, সস্তা সিনেমার কিউর পার্মানেন্ট-বাসিন্দা, অসচ্চরিত্র নোংরা।'[৯২] আশীষ মধ্যবিত্ত যুবকের ভণ্ডামির মুখোশ খুলেছে, কিন্তু সে নিজে এর বাইরে না। সুমিতার স্বকীয়তা হরণ করে আর পাঁচটা

বাঙালি মধ্যবিত্তের মতো সংসারী হতে চেয়েছিল। কিন্তু সুমিতার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আশীষ স্থূলদর্শী চল্লিশোর্ধ হিপোপটেমাস টাইপের রমণীর কোমর ধরে ঘুরে বেড়ানোকে জাতে ওঠা ভাবে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ। বিপ্লবী কিংবা বিদ্রোহী সে কখনোই ছিল না। আশীষের প্রেম-ভালোবাসা এসব ভানের মধ্যে ছিল ভণ্ডামি। শেষপর্যন্ত চাকরি পেয়ে ব্যক্তিগত জীবনে থিতু হয়ে এক অষ্টাদশী তরুণীকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছে।

আয়নায় আমার মুখ

সমরেশ বসু মানুষের জীবনের বিচিত্র বিকারকে অনায়াসে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত অসংখ্য মানুষ যাদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, তাদের স্থূলতা, নীচতা এবং বেঁচে থাকার লড়াই আমাদের অলক্ষ্যেই থেকে যায়। আর্থিক দীনতায় যারা প্রতিনিয়ত বৃত্তচ্যুত, স্খলিত সমাজ তাদের খোঁজ কমই রাখে। সমরেশ বসুর *আয়নায় আমার মুখ* উপন্যাসটি একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বৃত্তচ্যুত হওয়ার কাহিনি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সঙ্কটে বহু পরিবারে মূল্যবোধ অবক্ষয় ঘটে। বেঁচে থাকার ন্যূনতম দায় থেকে তারা নৈতিকভাবে স্খলিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।

আয়নায় আমার মুখ উপন্যাসে নুড়ি ওরফে বিজলী এবং তার মা দেহোপজীবিনী হতে বাধ্য হয়। বিজলীর বাবা অমৃতলাল চৌধুরীর মৃত্যুর পর পরিবারটি আর্থিক সংকটে পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিজলীর মা এই পথে আসে। শুরুর দিকে স্বাচ্ছন্দ্য আসলেও অপগত যৌবনা এই নারীর অভ্যাগতের সংখ্যা কমতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে নিজ কন্যাকে এই পথে নামায়। পীতম্বর ভড় বিজলিকে এই পথে অভ্যস্ত করে। বিজলি প্রথম কয়েক বছর পিতম্বরের রক্ষিতা ছিল। নুড়ি থেকে হরিমতি, হরিমতি থেকে বিজলী হয়ে ওঠার গল্প *আয়নায় আমার মুখ* উপন্যাস।

বারবনিতার কথা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। যেমন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জনপদবধূ* (১৩৬৫), রিজিয়া রহমানের *রক্তের অক্ষর* (১৯৭৮), মাহমুদুল হকের *নিরাপদ তন্দ্রা* (১৯৭৪)। এই জাতীয় উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। কেননা বালখিল্য পাঠক বিনোদনের রসদ খুব সহজেই পেয়ে যায়। সেই সাথে বারবনিতার মানসভূগোল নির্মাণে লেখককে সজাগ থাকতে হয়। সমরেশ বসু *আয়নায় আমার মুখ* উপন্যাসে বিজলীর আপাতবিরোধী অপচয়িত জীবন বর্ণনায় সহানুভূতি এবং যুক্তি দু'টোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নুড়ি থেকে

বিজলী হয়ে ওঠার আত্মকাহিনীর মধ্যে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক সংকট এবং বেঁচে থাকার দায় থেকে নৈতিক স্খলন দেখান হয়েছে।

প্রচলিত অর্থে আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় *আয়নায় আমার মুখ* ঠিক সেই জাতীয় রচনা নয়। কাউকে কৌতূহলী কিংবা উৎসাহিত করার বিষয়বস্তু এতে নেই। এটি উপন্যাসের ছকে একজন দেহোপজীবিনীর আত্মন্মোচনের কাহিনি। লেখকের ভাষায় জানা যায় :

> খাতাটি যার লেখা, সে একটি মেয়ে। এখন সে সম্ভবত জীবিত নেই, থাকলেও এখন সে কোথায় আছে, তার পরিচিতদের কেউ জানে না। মেয়েটি দেহোপজীবিনী। এক কথায় এটাই তার পরিচয়।[৯৩]

গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর বহু পুরাতন পেশার মধ্যে একটি। পৃথিবীর সব দেশেই গণিকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের লেখায় পাওয়া যায় ব্যবিলনের প্রত্যেক নারীকেই সাময়িকভাবে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে হতো। 'ঋকবেদে'- এর 'বিশ্য' শব্দ থেকে 'বেশ্যা' শব্দটির উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। এই বেদেই স্বর্গবেশ্যা রম্ভা, মেনকা, উর্বশী ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়।[৯৪] রামায়ণ-মহাভারতে গণিকাবৃত্তির প্রসঙ্গ আছে। এছাড়া মৎসপুরাণের সত্তরতম অধ্যায়ে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা, দশকুমার চরিতর কামমঞ্জরী, কথাসরিৎসাগরের মদনমালা উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনামলে গণিকাবৃত্তি বাণিজ্যিক মর্যাদা পায়। ব্রিটিশ শাসক এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে রূপান্তর ঘটায় তার দ্বারা সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেমন জমিদার, তালুকদার এরাই এই পেশাজীবীদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে এই পেশার রমরমা বৃদ্ধি পায়। পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশভাগ প্রভৃতি কারণে মানুষ হয়ে পড়ে সহায়-সম্বলহীন বাস্তুচ্যুত। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অবনমনে বহু নারী বাধ্য হয় এই পেশায় যুক্ত হতে। অর্থনৈতিক ধসে নারীর গঅবক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। *আয়নায় আমার মুখ* উপন্যাসে নুড়ির মা বিধবা হয়ে এ পেশায় যুক্ত হয়। স্বেচ্ছায় কেউ এ পেশায় আসে না। অনেক সময় এই পেশায় আসতে বাধ্য করা হয়। নুড়ির বক্তব্য থেকে জানা যায় :

> নিজের ইচ্ছায় আর কে আসে। যখন আসে, তখন কি আর মেয়েরা কেউ বুঝতে শেখে। শিখলেও উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে লাইনে আসে। আমার তো মনে হয়, টাকার জন্য মেয়েরা এ লাইনে আসে। কিন্তু যে বয়সে সে টাকার ধার ধারে না, তখনই তাকে লাইনে নিয়ে আসা হয়। বিয়ে হয়ে গেছে, একটু বয়স-টয়স হয়েছে, এমন মেয়ে এ লাইনে কম! ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে না পরতেই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।[৯৫]

নুড়ির মা সংসারের দৈন্য এবং প্রলোভনে পড়ে পতিতা হয়। তবে প্রচলিত অর্থে সে বারবনিতা নয়, অনেকটা ঘরবণিতা। কেননা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এই গৃহবধূটি পুরোপুরি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে এ পথে আসতে পারেনি। নুড়ির কথা থেকে জানা যায় :

> সন্ধেবেলা মায়ের কাছে কেউ আসত না। একটু বেশি রাত হলে আসত। যারা আসত, তারা সবাই তো চেনাশোনা লোক। শহরে যাদের নাম ধাম আছে, তারাই সব মায়ের কাছে আসত।[৯৬]

শহরের নামকরা ডাক্তার থেকে কম্পাউণ্ডার অর্থাৎ নাগরিক ভদ্রলোকেরা নুড়ির মায়ের কাছে আসত, ভদ্রলোক সম্পর্কে নুড়ির মন্তব্য 'আমি শিক্ষিতা, আমার কথাবার্তা চালচলনে সকলে সন্তুষ্ট, আমার একটু নেকনজর পাবার জন্য কত ভদ্রলোক হা করে আছে। বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, এমনকি কবি-সাহিত্যিকও।'[৯৭]

নৈতিক ভালো-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবুদ্ধি নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বৈরিণী চরিত্রের আগমন কম ঘটেনি।[৯৮] কিন্তু নৈতিক ও প্রথাগত আদর্শিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে পতিতাকে জৈব-জীব হিসেবে বিবেচনায় জগদীশ গুপ্তের সাথে সমরেশ বসু তুলনীয়। জগদীশ গুপ্ত যেমন স্বৈরিণী চরিত্রে আবেগ ও সহানুভূতির চেয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সমরেশ বসুও তেমনি বিজলী চরিত্রের মনোদৈহিক প্রত্নইতিহাস খননে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন বিজলী শৈশব থেকে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে। তার মায়ের কাছে কারা আসত, কেন তার মা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত। তার নন্দ মাসি তাকে কীভাবে এই পথে অভ্যস্ত করেছে। কৈশোরে তার ঘর-বরের ভূলুণ্ঠিত স্বপ্ন এবং যৌবনে প্রতি সন্ধ্যায় কামুক উত্তেজিত পুরুষের পূজা। বিজলীর পারিবারিক পরিমণ্ডল কখনোই তাকে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দেয়নি। বিজলী প্রথমে পীতম্বরের রক্ষিতা হয়। পীতম্বর অত্যন্ত সুকৌশলে বিজলীর মনস্তত্ত্ব তৈরি করে। এরপরই বিজলী অনুধাবন করে তার পরিবর্তন :

> আমার ভাল নাম হরিমতি। আমি আর সেই হরিমতিও নেই। আমার এখন একটাই পরিচয়, আমি বেশ্যা। এই আমি সেই বেশ্যা। এখন আমার নাম নুড়ি না। হরিমতি তো বড় সেকেলে, এহন আমার নাম বিজলী।[৯৯]

বিজলী চরিত্রকে ঔপন্যাসিক নানা মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। তাকে শুধু শরীরসর্বস্ব স্বৈরিণী হিসেবে উপস্থাপন করেন নি। তার মধ্যে মানবতাবোধ এবং মাতৃত্ব জাগিয়েছেন। বিজলীর কাছে যারা আসত অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। যেমন রাজেশ্বর ব্যবসায়ী। বিকৃত আনন্দে সে জীবনের অর্থ খুঁজেছে। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি লাঘবে সে বিজলীর কাছে আসত। সংকটময় পারিবারিক আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে রাজেশ্বর আত্মহত্যা করে। রাজেশ্বর বিজলীর বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই পেশায় কোনো বন্ধুত্ব থাকে না। লেখক বিজলী সম্পর্কে বলেছে :

> বিজলী দেহোপজীবিনীর মনটি কেবল কোমল ছিল না, সংসারের পথে চলতে গিয়ে আমরা যে মঙ্গল চিন্তা বা বুদ্ধির কথা বলি, আমাদের তথাকথিত সংসারের বাইরে থেকেও, তার সে বোধ ছিল অনেক বেশি।[১০০]

বিজলী বেশ্যা হলেও তার সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথসহ অনেক লেখকের বই সে পড়ত। ত্রিদিবেশ ছিল তার প্রিয় লেখক। পতিতাপল্লিতে আকস্মিকভাবে ত্রিদিবেশের সাথে তার পরিচয় হয়।

ত্রিদিবেশ মধ্যবিত্তের ভাবালুতা থেকে বিজলীকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। বিজলীকে বলেছে ‘কী নিয়ে তোমার দিন কাটাবে ? ... বলো তো আমিই তোমার বিয়ের একটা সম্বন্ধ দেখি। ত্রিদিবেশ বিজলীর মনস্তত্ত্ব বুঝতে চেয়েছে। বিজলীর অবস্থার পরিবর্তনে দৃঢ়চিত্ত, কিন্তু বিজলীর ভালোবাসার কাছে আত্মদান করতে সে রাজি নয়। বিজলীর ত্রিদিবেশের মিষ্টি কথায় গণিকা জীবন থেকে সংসার জীবনের স্বপ্ন দেখে। তবে সে স্বপ্নের মধ্যে স্বপত্নী হওয়ার বাসনা ছিল না ‘শুধু তিনি আছেন, এটুকু জানলেই আমার হবে। তিনি আমার সব। আমার সঙ্গে তাঁকে থাকতে হবে না। কিন্তু আমার সব দায় দায়িত্ব তাঁর। তখন আমি মদ খাব না। তিনি মাঝে মধ্যে এসে আমাকে দেখে শুনে যাবেন। আমার ভাল-মন্দ বিবেচনা করবেন। এ জীবন থেকে আমি মুক্তি পাব।’[১০১] ত্রিদিবেশ বিজলীকে বুঝত। বিজলীর দুঃখকে অনুধাবন করত। কিন্তু বাস্তববাদী ত্রিদিবেশ বিজলীকে ভালোবাসেনি। একবার পরিহাস করে বিজলী ত্রিদিবেশকে জিজ্ঞাসা করেছিল ‘এখানে আসার কথা কি বাড়িতে বলবেন?’ [১০২] ত্রিদিবেশ হেসে উত্তর দিয়ে বলেছে ‘না। সবাই সব সহজভাবে নিতে পারে না।[১০৩] অথচ এই ত্রিদিবেশ বিজলীকে বলেছে ‘ইচ্ছা করলেই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়েই আমি এখানে এসেছি।’[১০৪] ত্রিদিবেশের কথায় মধ্যবিত্ত মননের ফাঁকি সহজেই অনুমেয়।

স্ত্রীর প্রতি আস্থাশীল, সংসারে শ্রদ্ধাভাজন দায়িত্বশীল লেখক ত্রিদিবেশ মুখে বললেও কখনোই নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বিজলীর সময়টুকু সে অর্থ দিয়ে কিনতে চেয়েছে। বিজলী ত্রিদিবেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে তার কাছ থেকে টাকা নিতে চায় নি। তাই সে বলেছে ‘বেশ এ টাকা দিয়ে রুণকিকে কিছু কিনে দেবেন। [১০৫] তখনই ত্রিদিবেশের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে :

> কী বললে ? তোমাকে যে টাকা দিতে চেয়েছি, সে টাকা দিয়ে আমি আমার মেয়েকে কিছু কিনে দেব? তোমার সাহস তো কম না ? বলেই নোটগুলো খাটের ওপর ছুড়ে দিয়ে, খাট থেকে নেমে, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে, রাগে আর ঘৃণায় আরো এক বার আমার দিকে ফিরে বললেন তুমি কী, তা ভুলে যেয়ো না।[১০৬]

অথচ ত্রিদিবেশ বেশ্যাপল্লিতে তার ভক্ত-পাঠক আছে শুনে দেখা করতে এসেছে। তাকে প্রগতি আর বিপ্লবের কথা শুনিয়েছে। তত্ত্ব আর জীবন এক নয়। বিজলী লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা থেকে টাকা ফেরত দিতে চেয়েছে। কিন্তু এটা ত্রিদিবেশের মধ্যবিত্ত মননের অহমিকাবোধে লাগে। কারণ সংসারে সে সচেতন পিতা, দায়িত্বশীল স্বামী। যে ত্রিদিবেশ বিজলীর গণিকা পরিচয় পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করে সেই ত্রিদিবেশই চলে যাওয়ার সময় বিজলীর আত্মপরিচয়টা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ত্রিদিবেশ আবারো বিজলীর কাছে আসে। পূর্বের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চায়। বিজলীর সাথে কিছুদিনের সখ্য হয়। কিন্তু দুজন বিচ্ছিন্ন মানুষ যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। ত্রিদিবেশও

অসম্পর্কিত ভালোবাসায় আস্থা খুঁজে পায় না। তাই নিজের অবস্থান, সামাজিক পদমর্যাদা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দূরে চলে যায়। ভাঙাহাটের আস্তাকুঁড়ের জীবন নিয়ে বিজলী পড়ে থাকে পতিতা পল্লিতে। ত্রিদিবেশের মত মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষকে ভালোবেসে বিজলী শুধু কষ্ট পায়।

মধ্যবিত্ত নাম না জানা আরেক ভদ্রলোক বিজলীকে সংসারের স্বাদ দিতে চেয়েছিল। সে গণিকাপল্লি থেকে তুলে নিয়ে গার্হস্থ্য জীবন দেয়। কিন্তু তা ছিল ক্ষণিকের মোহ। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিজলী অবনী নামের এক চিত্রশিল্পীর সন্তান জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু সন্তানের অকালমৃত্যু তার জীবনের সমস্ত আনন্দ কেড়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত ত্রিদিবেশকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিল। সেখানেও সে ব্যর্থ হয়।

ত্রিদিবেশ চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্তের চারিত্রিক অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধিতা প্রকাশিত। লেখক ত্রিদিবেশ রায় সাহিত্যিক মহলে পাঠকের কাছে এককভাবে পরিচিত। কিন্তু ত্রিদিবেশ নিজেও জানে না একজন রূপোজীবিনীর কলমে সে অন্যভাবে প্রতিভাত। ত্রিদিবেশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশী মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচিত। ত্রিদিবেশের ভাষার মধ্যে মধ্যবিত্তের আত্মসুখপরায়ণা মনোবৃত্তি প্রকাশিত :

> নিজেকে আমরা সব সময় ছাড়িয়ে যেতে পারি না। তুমি কী বলেছিলে বা চেয়েছিলে, তাতে আমার মেয়ের কিছুই যায় আসে না। ও সব আমার বাড়াবাড়ি। আসলে আমি আমার স্ত্রী-পুত্র ছেলেমেয়েদের কাছেই বা কতটুকু পরিচিত।[১০৭]

পতিতার জীবনে নারীত্বের বিষয়টি সফলভাবে সাহিত্যে এনেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবি কাজী নজরুল তাঁর কবিতায় বারাঙ্গনাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। সমরেশ বসু দেখিয়েছেন বিজলীর মতো মেয়েরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারে না দারিদ্র্যের কারণে। ভদ্রবেশী লোকদের অশুচি ভাবনার কাছে এরা প্রতিনিয়ত পরাভূত হয়। সমরেশ বসু বিজলির জীবনের আপাতবিরোধী বিচিত্র অধ্যায়কে জীবন-তৃষ্ণার এক গভীরতর ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন।

বারোবিলাসিনী

অনুসন্ধিৎসু মধ্যবিত্ত যুবকের চারিত্রিক স্খলনের চিত্র *বারোবিলাসিনী* উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল উদীয়মান সাংবাদিক। ব্যক্তিগত জীবনে সামন্ত পরিবারের প্রথাবদ্ধতা ভাঙার প্রয়াসী, সেই সাথে বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন। স্বাধীনতাপিয়াসী, তাই কলকাতা শহরে একটি ফ্ল্যাটে একাকী থাকে। সাম্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী তাই তার ফ্ল্যাট বন্ধুদের আড্ডাস্থল। চাকরি, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আড্ডা ইত্যাদির অন্তরালে সে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে অবচেতনে এক স্বৈরিণীর প্রেমে পড়ে। যে ভালোবাসা এক অর্থে অর্থহীন। কেননা স্বৈরিণীর কাছে প্রেম প্রেম খেলার চেয়ে অর্থই মূল বিষয়। স্বাস্থ্য,

সম্মান, অর্থ বিসর্জন দিয়ে অমল অনুধাবন করে সে ভুল পথে চলেছে। ঔপন্যাসিক স্বৈরিনী জীবনকে বোঝাতে যথাযথ পরিবেশ, মাত্রা এবং রঙ ব্যবহার করেছেন। তমসাঘন জীবনের অর্ন্তসত্যকে লেখক নির্মম বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন।

অমলের পরিবার ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তের শ্রেণি প্রতিনিধি। সামন্তবাদী মানসিকতায় ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। অমলকে কলকাতায় রেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে। অমলের সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা তারা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। অমল স্বেচ্ছাচারী এবং একরোখা। স্বেচ্ছায় সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। প্রথম দিকে আপত্তি থাকলেও পরে তার পরিবার তার পেশাটি মেনে নেয়।

অমলের ওপর দায়িত্ব আসে পতিতাপল্লি নিয়ে রিপোর্ট করার। সামাজিক মানমর্যাদার কথা চিন্তা করে অমল দ্বিধান্বিত হয়। অ্যাডভেঞ্চারে বিশ্বাসী অমল অবশেষে কাজটি করতে রাজি হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ থাকার স্বার্থেই যৌনজীবনে কতগুলো বিধিনিষেধ রেখেছে। অথচ 'মানবজীবনে যৌনতার অনুভূতি ও পরিতৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা একটি অতি স্বাভাবিক ও সহজাত বিষয়।'[১০৮] সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানুষের এই আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে। তাই এক শ্রেণির মানুষকে এই পরিতৃপ্তির জন্য অস্বাভাবিকতার পথ বেছে নিতে হয়। তাদের জন্য তৈরি হয় আলোছায়ার নিষিদ্ধপল্লি। Colin Wilson – এর উক্তি এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> In the sexual impulse, the gap between man's purpose and nature's seems unusually wide. This is the reason why threw are more pervasions of the sexual urge then of any other human preservative impulse.[109]

যৌনজীবনের স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতা নিয়ে বহু লেখক ও তাত্ত্বিক অনেক মন্তব্য করেছেন। যেমন তলস্তয় তাঁর *The Kreutzer Sonata* উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন সুনির্দিষ্টভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী-পুরুষের যে যৌনসম্পর্ক, একমাত্র সেই সম্পর্কটা স্বাভাবিক। এছাড়া 'All indulgenece for pleasure even between man and wife is abnormal, i.e somehow unnature[110]

উপন্যাসে অমলকে যখন বলা হয় রেডলাইট এরিয়াভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি করতে, সে তার সংস্কার, শ্রেণিগত অবস্থান থেকে এই প্রতিবেদন তৈরিতে বিব্রত বোধ করে। তারপরও অমল রাজি হয়। বারবনিতা ভিত্তিক প্রতিবেদন লিখতে হলে অনেক ক্ষেত্রেই হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ রেডলাইট এরিয়ার কথনভঙ্গি, লেনদেন পদ্ধতি, দেহভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে

হয়। রিপোর্ট সংগ্রহের পূর্বে অমলের এ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ করে সে আশ্চর্যান্বিত হয়। সে উপলব্ধি করে গণিকাবৃত্তির মূলে আছে দারিদ্র্য। এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করে পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। স্বৈরিণী চরিত্রের অনেক অজানা তথ্য জেনে সে এর প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে আবিষ্কার করে শ্রেণিগত অবস্থানভেদে মানুষ একেক এলাকার পতিতালয়ে যায়। যেমন মধ্যবিত্তরা যায় সোনাগাছির পতিতালয়ে, উচ্চবিত্তরা যায় অভিজাত এলাকার বিভিন্ন ফ্ল্যাটে। তবে এই অসামাজিক কাজে উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত সবারই লক্ষ্য থাকে নিরাপদ অভিসার। অমলের প্রতিদিনের প্রতিবেদন পড়ে এক ধরনের পাঠক তৈরি হয়। অমল নির্বিঘ্নে লিখে চলে। কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটে বিপদগ্রস্ত এক গণিকাকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে।

এক বিপদসঙ্কুল পরিবেশে মল্লিকা পুলিশের ভয়ে অমলের শরণাপন্ন হয়। অমল তাকে বাঁচাতে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে। মল্লিকার চাতুর্য এবং কৌশলী আচরণের কাছে অমল পরাজিত হয়। পতিতার সাথে রাত কাটিয়ে দিব্যি সে মিথ্যা বলে পুলিশের কর্তা, অফিসের বস, এমনকি গার্লফ্রেন্ডের কাছে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় মল্লিকাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিল কিনা প্রত্যুত্তরে সে বলে 'না না, কোথায় যাব ? ওকে আমি চৌরঙ্গির ওপরেই ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'[১১১] অফিসের বস যখন বলে তোমাকে যেন কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।[১১২] অপ্রস্তুত হয়ে অমল বলে 'না না সেরকম কিছু না।'[১১৩] মল্লিকাতে আসক্ত হওয়ার পর থেকে সে তার গার্লফ্রেন্ড অনুসূয়াকে এড়িয়ে চলে। আসক্তি-অনাসক্তির দোলাচলে সে দ্বিধান্বিত হয়। স্বধর্মচ্যুত হয়ে প্রতিমুহূর্তে এক ধরনের অপরাধবোধে দগ্ধ হয় :

> মল্লিকার মতো একটা মেয়ে, আকস্মিকভাবে আমার জীবনে এমন করে আসে কী করে, আমি তার কোনও ব্যাখ্যা পাই না। কোনও রকম বিকারগ্রস্ত কাম-রুচির দ্বারা আমি আক্রান্ত, অথবা আমার অবচেতনে তার কোনও আভাস ছিল, আমি এখনও তা বুঝতে পারছি না।[১১৪]

গণিকাবৃত্তির রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে শহর কলকাতা তার কাছে বীভৎসরূপে ধরা পড়েছে। মানুষের অমানবিক রূপ আর মনোবিকার তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। অধোগমন তার মধ্যে শূন্যতাবোধের সৃষ্টি করে। অবচেতনে আত্মময়তার ভুবন থেকে মল্লিকার প্রতি একধরণের আসক্তি জন্মে। সে উপলব্ধি করে 'ওর জন্য একটা ব্যাকুল উন্মাদনা আমার মধ্যে আলোড়িত হচ্ছে, এ সত্যি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি, আর আমার শূন্যতাবোধেও সেই জন্যই।'[১১৫]

অমল রমণী, কলগার্ল, গৃহস্থ বধূর বারবনিতা হওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নানান ধরনের প্রতিবেদন নির্মোহ দৃষ্টিতে লিখেছে। সভ্যতার নগ্নতা তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু মল্লিকার প্রতি সহনুভূতি থেকে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। একাকী জীবনের অমোচনীয় নিঃসঙ্গতা মল্লিকা গ্রাস করে। সে প্রতিদিনই মল্লিকার

সান্নিধ্য চায়। অমলের এই অস্বাভাবিকতার পেছনে সমকালের সমাজপ্রবণতাও মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারে বড় হওয়া অমল শৈশব থেকে দেখেছে মিথ্যা আভিজাত্য আর অহমিকা। চাকরিসূত্রে কলকাতায় বাসা নিয়েছে কসমপলিটন এরিয়ায়। আভিজাত্য, মদ, নারী যেখানে স্বাভাবিক, তার বন্ধুরা হবু পত্নী নিয়ে অনেকেই তার ফ্ল্যাটে ডেটিং এ আসে। বন্ধুদের মদ খাওয়ার নিরাপদ আশ্রয়স্থল তার ফ্ল্যাট। বান্ধবী অনুসূয়ার সাথে তার যে সম্পর্ক তা ঠিক প্রেমের পর্যায়ে পড়ে না। পত্রিকা অফিসের বহুমাত্রিক কাজ, বাড়িতে ফিরে নিঃসঙ্গতা তার মধ্যে একাকীত্বের জন্ম নিয়েছে। অবচেতনে সে এখান থেকে মুক্তি চেয়েছে। বর্তমান অসুস্থ সভ্যতা মানবতার রক্ত শোষণ করে হয়ে উঠেছে পঙ্কিল, বিবর্ণ-বিকৃত। সভ্যতা মানুষকে কেবল গলদঘর্ম করে খাটিয়ে মারে, তাকে পরিণত করে 'পশু মানুষে'।[১১৬] অসুস্থ জীবনের কড়চা লিখতে লিখতে নিজের অজান্তেই অমল এর অংশ হয়ে যায়। মল্লিকা যখন অমলকে বলে 'খবরের কাগজেই লেখ, আর যাই কর, তোমরা আমাদের কথা কিছু বুঝবে না। তাও আবার তোমার মতন একটা লোক, কলকাতায় যাদের বাড়ি আছে, টাকা আছে। এরকম একটা ঘরে তোফা আরামে থাকে।'[১১৭] সত্যি অমল তার অপরাধ বোঝে না। অর্থের বিনিময়ে মল্লিকার প্রতিটা ঘণ্টা কিনতে চায়। স্বৈরিণী চরিত্রের স্বরূপ অন্বেষনে সে মল্লিকার সান্নিধ্যে আসলেও সে প্রকৃতই মল্লিকার প্রেমিক হতে চায়, কিন্তু মল্লিকার অসুস্থ মনে তার কোনো জায়গা নেই। মল্লিকাকে নিয়ে সে তার ফ্ল্যাটে সুখে থাকতে চায়। এর পরিবর্তে মল্লিকা তার ফ্ল্যাটে শুধু স্নান আর চুল শুকানোর উদ্দেশ্যে আসতে চায়। প্রেমের ক্ষেত্রে এই অসম মানসিকতা যার যথার্থ অর্থে কোনো পরিণতি পায় না। চরিত্র-অর্থ-সম্মান হারিয়েও নায়ক মল্লিকাকে ভালোবাসতে চেয়েছে। কিন্তু যখন জেনেছে মল্লিকা বেশ্যাবৃত্তি করে। অনেক লোকের অঙ্কশায়িনী হয়, এর মূলে আছে জিতেন মিত্তির, মনে মনে জিতেন মিত্তিরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে, কিন্তু মল্লিকাকে ত্যাগ করেনি। যতদিন না মল্লিকা তাকে ত্যাগ করেছে।

'আধুনিক সভ্যতায় বিচ্ছিন্নতাবোধের সংক্রাম এতই তীব্র যে, মানুষ যতই নিজেকে অখণ্ড রাখতে চেয়েছে, ভিতরে ভিতরে সে দগ্ধ হয়েছে বিখণ্ডতায় বিচূর্ণতায়।'[১১৮] মল্লিকার ছলনা প্রতারণা প্রথম দিন থেকেই অমল ধরতে পেরেছিল কিন্তু নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির লোভ, তার অব্যক্ত ভালোবাসা তাকে ভেতরে ভেতরে চূর্ণ করেছে। জীবনের একটা ক্ষেত্রে দুজনেই এক বিন্দুতে দাঁড়িয়েছে। মল্লিকা ওরফে টুককির ভালোবাসার মূল্য তার প্রেমিক দেয়নি। আর অমলের ভালোবাসার কোন মুল্য মল্লিকার কাছে নেই। অমলের চেয়ে একটা সস্তা তাঁতের শাড়ি তার কাছে মূল্যবান। দুজনেই ভালোবাসাহীনতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েনে ভোগে। স্বশ্রেণি যেমন অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি পারে না আর্থিক দৈন্যপীড়িত জীবনযাপন করতে। সবশেষে সে নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবন প্রত্যাশা করে। মল্লিকার প্রেমিক জিতেন মিত্তির নিজের দীনতাকে ঢাকতে এবং শ্রেণি অতিক্রমের বাসনায় মল্লিকাকে ব্যবহার করে। মল্লিকাকে অমলের কাছে নিয়ে এসে বলে সে বলে 'আপনার দয়াতে ওর বেশ ভালই চলছিল।'[১১৯] অমল এই বক্রোক্তির ছলনা ধরতে পারে সে নির্দ্বিধায় মল্লিকাকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ অমল আর ঠকতে চায়নি।

বাংলা উপন্যাসের দেড়শ বছরের ইতিহাসে স্বৈরিণী চরিত্রের আগমন বেশ পুরনো।[১২০] প্রথম দিককার উপন্যাসে স্বৈরিণী হওয়ার পেছনে বৈধব্য অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। সামাজিক নৈতিকতার মানদণ্ডে তাদের চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ, মনন্তর, দেশভাগ প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি নড়বড়ে হয়ে যায়। ভদ্রোচিত বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী এই পথে নামতে বাধ্য হয়। আবার প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক নারী প্রতারিত হয়ে এই পথে পা বাড়ায়। জীবনযাত্রার মানের সাথে মানুষের ভালো থাকার ঝোঁক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ধর্ম কিংবা নৈতিক আদর্শকে তুল্যমূল্য হিসেবে গ্রহণ না করে অবলীলায় বহু নারী অন্ধকারের বাসিন্দা হয়েছে। সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে যখন স্বৈরিণী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তখন তার যৌক্তিক এবং বাস্তবিক কারণ দাঁড় করিয়েছেন। বাস্তবতা এবং মানবিকতার যৌগিক পরিচর্যায় নিরাসক্ত নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে শৈল্পিকভাবে এই ধরনের চরিত্র উপস্থাপন করেছেন। *বারোবিলাসিনী* উপন্যাসের নামকরণ দেখে এর কাহিনি অনুধাবন করা যায়। এর কেন্দ্রে যে নারী সেই মল্লিকা ওরফে টুককি বারবনিতা। কৈশোরের অপরিণামদর্শী প্রেমের কারণেই সে সামাজিক ব্যভিচারের শিকার। দরিদ্রতা তাকে নিয়ে গেছে অনৈতিকতার অতলান্ত অন্ধকারে। তার ভালোবাসার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার প্রেমিক জিতেন মিত্তির তাকে এ পথে আসতে বাধ্য করেছে। মল্লিকাও অন্য মেয়েদের মতই মুক্তি চায়। সে বলে 'ও আমার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ও আমাকে...।'[১২১] মল্লিকা তার পেশাটাকে যেমন ঘৃণা করে তেমনই তার সমাজকে ঘৃণা করে।

মল্লিকা দেহদানের অর্থ নিয়ে তার তথাকথিত দিদি এবং জিতেন মিত্তিরকে দেয়, অথচ তাদের মল্লিকার প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। জিতেন মিত্তির আলিপুর কোর্টের উকিল ছিল। অসুস্থতার কারণে ওকালতি ছেড়ে বারবণিতাদের দালাল হয়েছে। সে ব্যক্তিগত জীবনে অসৎ, হিংস্র, এবং দুর্ধর্ষ। মল্লিকাকে নিজের আয়ত্তের রমণী করে রাখে অথচ ভালোবাসে নিজের স্ত্রীকে। মল্লিকার উপার্জিত অর্থ যখন হাতে পায় সেই

মুহূর্তটি মল্লিকার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। অন্য সময় সে জিতেনের লালসার শিকার হয়। ব্যক্তিত্বহীন কাপুরুষ জিতেন স্বার্থের জন্য মল্লিকাকে অমলের হাতে তুলে দেওয়ার ভানও করে 'ও কিন্তু স্যার আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।'[১২২] অর্থের প্রয়োজনে নিজের দয়িতাকে অন্যের ভোগের সামগ্রী করার মতো বিকৃত মানসিকতার অধিকারী জিতেন মিত্তির। প্রকৃত অর্থেই জিতেন মিত্তির কামনা-বাসনাসর্বস্ব আত্মমর্যাদাহীন চরিত্র। এই উপন্যাসে আরো এক স্বৈরিণীর প্রসঙ্গ এসেছে, যার স্বামী অযোগ্য। তাদের দায়িত্ব নিতে অপারগ। সেই নারীর সন্তান পাহাড়ে কোনও এক ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে পড়ে। আর্থিক দীনতা এবং সন্তানের পড়ালেখার খরচ জোগাতে সে এ পথে অগ্রসর হয়েছে।

সমরেশ বসুর সার্থকতা এইখানে যে তিনি বারোবিলাসিনীদের জৈব-জীব হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে দেখার প্রয়াসী হয়েছেন। তাদের প্রেম-দ্রোহ এবং সংগ্রামকে সম্মান জানিয়েছেন। তারা যে সামাজিক অধগমনের শিকার এ কথা পাঠককে জানাতে ভোলেননি।

গন্তব্য

বাস্তববোধ, অপরিমেয় কল্পনাশক্তি আর স্বপ্নময়তার সংমিশ্রণে সৃজিত হয়েছে সমরেশে বসুর উপন্যাস। ফলে সময়ের সাথে সাথে সমকালীন বাস্তবের সংকট উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। লেখক সমাজ চৈতন্যের অংশ। সমাজের অনুভবেদ্যতা তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন। 'লসিয়ঁ গোল্ডমান যাকে বলেন conscience possible অর্থাৎ একটি শ্রেণি কী ভাবে, অনুভব করে, ইচ্ছা করে কেবল তাই নয়, কী ভাববে, অনুভব করবে ও ইচ্ছা করবে, সেটিও শিল্পে-সাহিত্যে, উপন্যাসের মত মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই সূত্রেই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিশেষ শ্রেণির সম্ভাব্য চৈতন্যও ধরা পড়ে।'[১২৩] সমরেশ বসু তাঁর উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনীতির একটি বিশেষ সংকটকালীন সময়কে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত সামূহিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলার অবনতি প্রভৃতি কারণে মধ্যবিত্তের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল—প্রতিবাদ ও গণআন্দোলন। সংঘবদ্ধভাবে জানিয়ে দেওয়া এ আজাদি ঝুটা হায়। এ সময় সচেতন পশ্চিমবঙ্গে বাম চেতনা তার রাজনৈতিক জমি পেয়ে গেল। জাতীয়তা বনাম কমিউনিজমের বিতর্ক-দ্বন্দ্বে নিয়ত অস্থির পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতিকে স্বাধীনতা-উত্তর প্রগতিদর্শনের বীজতলা বলা যায়।[১২৪] শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুব সম্প্রদায় এই সময় সর্বাধিক অস্থিরতায় ভুগেছে। একদিকে গণআন্দোলনের পথে নতুন সমাজ বিস্তারের স্বপ্ন লালিত হতে থাকলো, অন্যদিকে দিশেহারা তারুণ্যকে আত্মস্বার্থপূরণের লক্ষ্যে লুম্পেনবৃত্তির পথে ঠেলে দিলো ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতারা।[১২৫] ষাটের দশকে ঘটলো দুটো

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এক. '৬৭ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একাধিপত্যের ভাঙন যখন তীব্রতর তখন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মনীতি নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই ও সিপিআই (এম) দুই প্রধান শাখায় বিভাজিত হলো। দুই. অঙ্গরাজ্যে যুক্তফ্রন্ট শাসনের অভ্যুদয়। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচির দুই রূপরেখা জনগণের সামনে প্রতিভাত হলো। দুই কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে বামপন্থী অন্যান্য দল ও প্রধান জাতীয় দলের (কংগ্রেস) দ্বন্দ্ব ও আন্তঃসম্পর্কে আলোড়িত হয়ে উঠলো পশ্চিমবঙ্গ।[১২৬]

১৯৬৭ সালে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। '৬৭-এর মার্চে তরাই-এর নকশালবাড়ী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। রাজনৈতিক দোদুল্যমানতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সাময়িক দিশেহারা হলো। যুব সম্প্রদায় সমকালীন সামাজিক হতাশা থেকে মুক্তি পেতে এই আন্দোলনে একাত্ম হলো। কিন্তু নকশালবাদীদের ধৈর্যে সঙ্কট ছিল তারা বোঝেনি মূল তত্ত্ব থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কৃষকের যৌথ চেতনাকে তারা জাগাতে পারেনি। ফলে শহরাঞ্চলে নকশালবাদী আন্দোলন বহু সংঘাতে দীর্ণ হয়েছে, পাশাপাশি পুলিশি নির্যাতন ও অন্য রাজনৈতিক দলের যুগপৎ নৃশংসতাতো ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসু লিখলেন *গন্তব্য*। উপন্যাসে দেখালেন তরুণ সম্প্রদায় গন্তব্য না জেনেই অস্ত্রধারী হয়ে পড়েছে। তিনি উপন্যাসের নায়ক কমলের মাধ্যমে মার্কসবাদের সাথে বিরোধের সূত্রটা খুঁজতে চেয়েছেন।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ফুল্লরা, বুবাই, অনু, কুমারের আনন্দদায়ক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। প্রথম দিকে লেখক পাঠককে বুঝতে দেননি কমল-ফুল্লরার মাধ্যমে তিনি একটি তত্ত্বের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন। ঔপন্যাসিক একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদকে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে মানববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন। বিশেষত তার রাজনৈতিক বক্তব্যের ভেতর থেকে বার বার যা উঠে আসে তা হলো দেশীয় জলবায়ুতে মার্কসবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ধারাবাহিকতা।[১২৭] উপন্যাসটিতে এমন একটি সময়কে বেছে নেওয়া হয়েছে যখন মধ্যবিত্ত সৃষ্ট নকশালবাদী আন্দোলন একটি সঙ্কটাকীর্ণ সময় পার করছে। একদিকে দলীয় অন্তঃকোন্দল, অন্যদিকে পুলিশি আক্রমণ। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে নকশালবাদী আন্দোলন নিয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে সমকালীন নকশালবাদী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসের তের নম্বর সিটের যাত্রী কমল। বাস দেরি করে ছাড়ার পরেই তের নম্বর সিটের যাত্রী উপস্থিত। এই যাত্রী আর কেউ নয় ফুল্লরার এক সময়ের প্রেমিক। যে বর্তমানে

নকশালবাদী। নকশালপন্থাকে জীবনের মুক্তি এবং বেঁচে থাকার আনন্দ হিসেবে গ্রহণ করে সে একসময় ফুল্লরার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। কমলের বাবা ব্যারিস্টার। সমকালীন বহু যুবকের মতো কমল বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে ছাত্র জীবনে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। কমল নীতিবাদী নিজ পরিবারের অর্থের প্রাচুর্যের সে অনায়সে সমালোচনা করে বলত, 'আমার ঠার্কুদা ছিলেন ইংরেজদের খয়ের খাঁ। আর আমার বাবা এখনকার সরকারের খয়ের খাঁ।'[১২৮] কমল তার পরিবারের আভিজাত্যে ভেসে যায়নি বরং নিজ ব্যক্তিত্বের গুণে সে কলেজের সবার প্রিয় ছিল। কমলের চরিত্রের নিজস্বতা ছিল। কমলের সাথে ঘনিষ্ঠতার পূর্বে ফুল্লরা কমলকে অহংকারী ভাবত। কিন্তু ক্রমেই কমলের উদারতার পরিচয় পেয়েছিল।

রাজনীতির ঘোর কাটতেই কমল বুঝেছিল একটা ছকে বন্দি। যেখান থেকে তার মুক্তি নেই। সে জানিয়েছিল :

> যে নিজেকে মুক্ত ভাবতে পারে না, সে অন্যদের মুক্ত করবে কী করে? কোনও কিছুতেই ছকের থেকে খারাপ কিছু নেই, তা যদি বিপ্লবও হয়। আর বিপ্লবই বা কী? তার কোনও শেষ নেই, অতএব কোনও ছকও নেই। আমাদের সঙ্গে যদি তুমি মিশতে, দেখতে আমরা রেভ্যলুশনারি থেকে রিবেলিয়ানই বেশি। বিদ্রোহ যুগে যুগে— মানে বিপ্লব। কোনও ইজমেই বোধহয় এর কোনও পরিসমাপ্তি নেই। একমাত্র জেরন্টোক্রাসিই নিজেদের ক্ষমতায় তৃপ্ত থাকতে চায়। বিপ্লবীদের মধ্যেও বৃদ্ধতান্ত্রিকের তো অভাব নেই। আমাদের দেশে তো নেই-ই। ফলে, আমাদের দলের অধিকাংশ শহরের ছেলেরাই অনেকটা ড্রিফটারের মতো। তাদের গতি আছে অথচ সঠিক গন্তব্য নেই, কারোর প্রভুত্ব মানতে পারেনা, বর্তমান সমাজের নীতি মানের কোনও মূল্য তো আদৌ নেই তাদের কাছে।[১২৯]

লেখক জানান পৃথিবীজুড়ে যখন মার্কসীয় তত্ত্বের সংকটকাল চলছে তখন নকশালবাদী যুবকেরা উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে ছুটছে। তাদের কাছে দাবি করা হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ত্যাগ, উৎসর্গ আর খতম।[১৩০] কমল মনে করে তাদের একটা বিরাট অংশের মার্কসিজম থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে আর সেখান থেকেই সংকটটা শুরু হয়েছে। কমল স্ববিরোধিতায় ভুগেছে। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়েছে। জীবনকে তার অর্থহীন মনে হয়েছে। একটা সময় স্ববিরোধিতা থেকে মুক্তি পেতে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝুঁকেছিল। অনেকটা আকস্মিকভাবে ফুল্লরার সাথে সম্পর্কের ইতি টেনেছিল। ফ্যামিলি, সোসাইটি স্টেট সবকিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল, 'এসবের সাথে হাত মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। অর্থহীন প্রয়োজনে বেঁচে থাকার থেকে মরা ভাল।'[১৩১] কমলের কাছে এটা ছিল সর্বহারার বিপ্লব। যেটা ছিল সশস্ত্র বিপ্লব এবং ক্ষমতা দখল। এটা করতে সে গ্রামে চলে গিয়েছিল। তাই সমকালীন সরকারকে তার বিপ্লবী সরকার মনে হয়নি। তার কাছে এটা একটা সোনার পাথর বাটির মতো। উদ্দেশ্যহীন গন্তব্য একসময় কমলের মতো যুবকদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামলের সাথে

মতপার্থক্য দেখা দেয়। এই মত ও পথ কেবল সশস্ত্র বিপ্লবীবিরোধী তাই নয়, মার্কসবাদ বিরোধীও।[১৩২] এই শ্যামলই তার শ্রেণি শত্রুতে পরিণত হয়। কমরেড শিবতোষ জেলে যায়। কমল আত্মদ্বন্দ্বে ভুগেছে। ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্দিহান কমল কাফকার মেটামরফসিস সাথে নিয়ে ঘুরেছে। সে জানায় তার প্রিয় লেখক এখন কাফফা।[১৩৩]

কমল ক্রমেই উদারপন্থী হয়ে ওঠে। তার বর্তমান চিন্তা সম্পর্কে জানায় :

> বিপ্লবী সরকারে আমার বিশ্বাস নেই, তারা কোনো লোকায়ত্ত রাষ্ট্রও গঠন করতে পারবে না। আর সেই জন্যই মার্কসবাদকে আমি আর ঠিক আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে যথার্থ না জেনেই, আমি একজন রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কসবাদের সঙ্গে আমাদের মূলত কোথায় বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। এই কথাটা বলেই আমি দলের একটা অংশের শত্রু হয়ে গেছি। ফলে দলের আর পুলিশের বন্দুক দুইই আমার পেছনে ঘুরছে।[১৩৪]

দল শ্যামলকে খুঁজে পেলে মেরেও দিতে পারে। পুলিশের হাতে তুলেও দিতে পারে। অথবা কমলের গতিবিধি জেনে তাকে ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলতে পারে। যার কারণে শহরের সাদা পোশাকের গোয়েন্দা এবং গ্রামের জোতদারের পোষা গুণ্ডা কারো হাত থেকে কমলের মুক্তি নেই। স্বাধীনতার পরবর্তী তিনটি দশকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি আসেনি।

কমল আন্দোলনের ফাঁকটা বুঝতে চেয়েছে। শ্রমিক এবং কৃষকের শ্রমের পার্থক্য স্পষ্ট করেছে। শহরের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে এই বিদ্রোহের কোনো সংযোগ নেই। শ্রমিক যন্ত্রযুগের উপযন্ত্র মাত্র। উৎপাদিত পণ্যের সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। সে উৎপাদিত পণ্য হাতে করে ঘাঁটে না। তাই মধ্যবিত্ত মনোভাবাপন্ন বিপ্লবীদের বেড়াজাল থেকে এরা কখনোই বের হতে পারেনা। অথচ কৃষকের সাথে তার উৎপাদিত পণ্যের নাড়ির টান আছে। একজন ভূমিহীন কৃষকও মাটির সোঁদা গন্ধ নিতে ভালোবাসে। সে পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করে কিন্তু নিরন্ন থাকে। এ কারণেই পার্টি গ্রামকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু গ্রামে নকশালবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়, কারণ কৃষকের যৌথ চেতনাকে জাগাতে তারা ব্যর্থ হয়। ফলে অতি বিপ্লববাদের কল্পনা তাদের পেয়ে বসে। রোমান্টিকতার নামে হয়ে ওঠে হৃদয়হীন। তারা এটাও বোঝেনি 'দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব করে জনতা।'[১৩৫] একটা সময় নিজেদের বন্ধুর প্রতি তারা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। সে আরো জানায়, 'আমাদের ডগমা এত বড় হয়ে উঠলো, আমরা জোর করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাইলাম। তার ফলেই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের ছাড়ানো হয়েছে। অথচ শহরে এসে আমরা একটা মন্ত্রীকে মারতে পারিনি, পুলিশের আইজি বা কোনো কমিশনারকেও না। এমনকি কোনো ছদ্মবেশী নিখুঁত শত্রু শয়তানকেও না। মাঝখান থেকে শাসকদলের কতগুলো গুণ্ডা মাস্তান এখন আমাদেরই দল ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিশের অনুচর ছাড়া তারা কিছুই নয়।'[১৩৬]

কমল নিজের দ্বিধা কাটাতে দুই মাস পড়াশোনা করেছে। নিজের মতামতকে শক্ত করেছে। কমল সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করার কথা বলেছে যা বুর্জোয়াদের দিয়ে বিবেকহীন সেনাবাহিনী হবে না। সে লোকায়ত রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। যার রূপরেখা ঠিক করে গেছেন নিরাজবাদীরা। এবং প্রকৃতিবাদী লাওৎসের মতবাদই হলো, তার বিবেচনায়, শেষ লক্ষ্য।[১৩৭] এখানে মধ্যবিত্তের ভাবালুতা স্পষ্ট। মাত্র দু মাস পড়াশোনা করে একটি আন্দোলনের সারসত্য বুঝে ফেলা।

কমলের দেশকাল এবং সমাজ নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবনা ছিল। সে কখনোই মেকী নকশালপন্থী হতে চায়নি। নকশাল আন্দোলনের সারসত্য এবং গতিপ্রকৃতি সে জানতে চেয়েছে। কমলের বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন দিতে চাইলে সে জানিয়ে দেয়, 'ঘরে ফেরার জন্য তো আমি বেরোই নি।'[১৩৮] কমলের প্রেমিক মন ছিল। তার বান্ধবী রূপা রায়ের জন্মদিনে ফুল্লরার তথাকথিত প্রেমিক মদ খেয়ে যখন ফুল্লরার শ্লীলতাহানী করতে চেয়েছিল তখন কমল তাকে বাঁচায়। বিমানকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে কমল ফুল্লরার জীবনে জড়িয়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনে বেলুর নির্জন বাড়িতে ফুল্লরার সান্নিধ্য কমলের জীবনে স্বেদসিক্ত নারীর সান্নিধ্য এনে দেয়। তারপরও কমল রাজনীতির কারণে ফুল্লরাকে ত্যাগ করে।

যে সাম্যবাদে কমল মুক্তি খুঁজেছিল সেই সাম্যবাদ নিয়ে কমলের মনে প্রশ্ন জেগেছে 'নিরাজ সমাজবাদের উৎস থেকেই কি বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের জন্ম নয়? যার সাথে গান্ধীবাদের মিল খুঁজে পেয়েছে। মার্কর্সবাদকে সঠিক না জেনে কমলের মতো অনেকেই রাইফেলধারী হয়েছে। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে মার্কর্সবাদের নবমূল্যানের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। মার্কসবাদের গোড়াটা জানার কথা বলেছেন। কমলের আর জানা হয়না। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই ভুবনেশ্বরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কমলের মুখে অস্তমিত সূর্যের লাল আভা পড়েছিল, যা ভবিষ্যৎ রঙিন জীবনের দ্যোতক। কিন্তু কমলকে হত্যার মধ্য দিয়ে ফুল্লরা-কমলের নিরাজ সমাজের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। কমল যে রাজনীতিকে মুক্তির পথ ভেবেছিল, সেই রাজনীতি তার জীবন নাশ করে।

ফুল্লরা চরিত্রটিকে লেখক নিরপেক্ষ রেখেছেন। ফুল্লরার বাবা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। পারিবারিক আবহ গান্ধীবাদী, কিন্তু উপন্যাসে কোথাও তার রাজনৈতিক আদর্শ জানা যায়নি। কমল বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে ফুল্লরার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিল। ফুল্লরা বলেছিল 'আমি তোমার আদর্শের মূলটাই জানি না।'[১৩৯] কমলের আকস্মিক পরিবর্তন, তার রাজনৈতিক দীক্ষা তাকে চেতনাশূন্য করেছিল। আবার কমলের হাতে *মেটামরফসিস* দেখে বিস্ময়ে ফুল্লরা বলেছে, 'মার্কসিস্টের হাতে কাফফা, কোথায় যেন একটা সিনিসিমের গন্ধ লাগছে।'[১৪০] দশটা সাধারণ মধ্যবিত্তের মতোই তার ভাবনা। কমল তাকে বলে

সিনিকরাই প্রথম সাম্যবাদী দার্শনিক। এ গোত্রের জনক ছিলেন এনটিস্থিনিস নামে এক ব্যক্তি, প্লেটোর সমসাময়িক। নিরাজ সময়ের যারা কল্পনা করেছেন, তাঁদেরই নৈরাজ্যবাদী বলা হয়েছে। অথচ এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী একটি গালাগাল।[১৪১] ফুল্লরা এই নিরাজবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছে। কমলের মৃত্যুর পর তেরো নম্বর আসনে গিয়ে বসে। বাইরে তাকিয়ে শহর দেখে না। দেখতে পায় কমলকে। যে হাজার হাজার বছর আগের নিরাজবাদী সমাজের কবিতা বলছে, আর হাসছে।[১৪২] রাজনীতি শুধু কমলের জীবনকে কেড়ে নেয়নি, বেলু-শিবতোষের সুখের সংসারও ভেঙে দিয়েছে। শিবতোষ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলেও মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবী। তবে বেলুর ভগবদভক্তির সঙ্গে শিবতোষের বামপন্থী ভাবনার পার্থক্য থাকলেও তা প্রকট হয়নি। কিন্তু নকশাল আন্দোলন শুধু কমলের জীবনকে কেড়ে নেয়নি, বেলু-শিবতোষের সুখের সংসারও ভেঙে দিয়েছে। সুখী দাম্পত্যে রাহুর গ্রাস লাগে। শিবতোষ পুরোপুরি নকশালবাদী হয়ে উঠলে বেলু শিক্ষকতার চাকরিতে বদলি ব্যবস্থা করে শান্তিনিকেতনে স্থিত হয়। সমরেশ বসুর মনোভাবনার একটা প্রচ্ছায়া বেলুর মধ্যে দেখা যায় 'তোমরা যে-যাই ইজম টিজম নিয়ে থাকো, আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু বিষয়েই অ্যাভারেজ না হওয়ার চেষ্টা করো। তা সে রাজনীতি কর, গান কর, কবিতা লেখ বা মাঠে ময়দানে খেলতে যাও। জীবনটা অনায়াসে বয়ে যাবে, এরকম ভাবাটাই ভুল।... যার বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই। ঈশ্বরে হোক, অথবা নিরীশ্বর বস্তবাদী হও, হিংসা-অহিংসা, যাই বলো, বিশ্বাস একটা থাকা চাই।[১৪৩]

অপদার্থ

বাঙালি মধ্যবিত্ত জন্মলগ্ন থেকেই পরিবর্তমান সময় পার করেছে। উনিশ শতক ছিল বাঙালি মধাবিত্তের সুখের স্বর্গ। বিশ শতকের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল সংকটময়। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুখের স্বর্গকে চুরমার করে দেয়। সমালোচক এই সময়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> সাতচল্লিশ-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশ্রেণি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল মার্কসবাদী আন্দোলনের রোমান্সকে, কিছু পরেই তারা নেহেরুর সামন্ততন্ত্রে খুঁজে নিতে চেয়েছিল বাঁচা ও পুনরুত্থানের পথ। শ্রেণি-অসামর্থ্যে প্রথমটিতে মুক্তি মেলেনি। দ্বিতীয়টি তো ঐতিহাসিক নিয়মে ব্যর্থ। ফলে অবনমন চাকরির বাজার সংকুচিত, বাণিজ্যে অনাস্থা, কৃষি-অর্থনীতির দুঃসহ ভাঙন, অহঙ্কারী সংস্কৃতিতে ফাটলসহ নানামুখী সমস্যা দেখা দিল।[১৪৪]

সমরেশ বসু এ সমস্ত সমস্যার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই *অপদার্থ* উপন্যাসে মধ্যবিত্তের এই অসহায়তাকে দেখালেন ব্যক্তিক সংকটের মধ্য দিয়ে।

'১৯৭৫ সালে দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।'[১৪৫] শাসকগোষ্ঠীর অপরিমেয় স্বেচ্ছাচারে সাধারণের জীবন হয়ে পড়েছিল বিপন্ন। খুন, কালোবাজারিসহ নানা

ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসে রমেন ডাক্তার, এস. আই মাখন ঘোষ, এমএল এর চরিত্রে বিষয়টি স্পষ্ট। সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব। নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির বলি সবাই। উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে নৈহাটির শিল্পাঞ্চল। সেখানকার পরিবর্তমান সময়টাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিপরীতে ব্যক্তির অসহায়তাকে লেখক তুলে ধরলেন জয়দেবের মতো শিক্ষিত ভীরু মধ্যবিত্ত যুবকের চরিত্রে। জীবনের কাছে যার বেশি চাওয়া-পাওয়া নেই। জীবন চলার মতো একটা চাকরি আর সচ্ছলতা পেলেই সে সুখী, যেখানে সে তার মাকে নিয়ে ভালোই থাকবে। প্রেমিকা হিসেবে প্রণতির মতো মেয়েকে সে কখনোই আশা করে না। বরং নিতাইয়ের প্রেমিকা মালতীকে দেখতেই তার ভালো লাগতো। অথচ এই জয়দেবই প্রণতির গর্ভে প্রাণসঞ্চার করে।

মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> মধ্যবিত্ত সমাজে মানুষের দুটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে— একটিতে আছে ভীরুতা, নিরাপত্তার প্রত্যাশা, আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি, যেটি তার সনাতন রূপ; অপরটিতে দেখি এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ হবার মতো একটা চেতনা। বলা বাহুল্য প্রায় সবক্ষেত্রেই অবধারিতভাবে প্রথমটিরই জয় হয়।[১৪৬]

জয়দেব মধ্যবিত্ত সমাজের তাই তার স্বভাববৈশিষ্ট্যে ভীরুতা আছে তবে সমাজের অন্য দশজন মানুষের মতো গা বাঁচানো মানসিকতার প্রতিনিধি সে হয়ে উঠতে পারেনি। সমস্যার অভ্যন্তরে গিয়েছে তবে সেখান থেকে তার উত্তরণ ঘটেনি। তার চারপাশের সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে মাস্তান, পুলিশ, খুনী, সমাজসেবী, নার্সিংহোমের অসাধু ডাক্তার এরা সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আর তাদেরই কাছে জয়দেব সমাজবিরোধী। অসামঞ্জস্য দেখলে তার মাথাব্যথা করে। কিন্তু সে জানে না মাথাব্যথার ঔষধ কোনটি। তাই লেখক অনেকটা পরিহাসচ্ছলে বলেছেন ‘আহা ! মাথা টিপটিপ করেই চলেছে। না পাছায় তলপেটে ঘাড়ে কোনও ব্যাথা নেই। কেবল মাথা টিপটিপ করছে।’[১৪৭]

শৈশব থেকে জয় কিছুটা বোহেমিয়ান। বাইরে থেকে দেখে তাকে ক্লীব কিংবা অপদার্থ মনে হয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বহিরাবরণের কূটাভাষ তার ছিল না। ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদী মন থাকলে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারত না। চালাকি জানত না বিধায় অন্যায়ের প্রতিবাদে পরিবেশ পরিস্থিতি না বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ফলে প্রায়ই তাকে অপদস্থ হতে হতো। কখনো অন্যায় তোলা তুলবার বিরুদ্ধে, কখনো গগনবিহারী বা ললিত হালদার রোডের মেয়েদের আওয়াজ দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী মন জেগেছে। যেমন বাবলার পোষা গুণ্ডারা সবজিওয়ালাদের কাছ থেকে চাঁদা চাইতে গেলে না পেয়ে তাদের মারধোর করে। জয় হঠাৎই এসবের মাঝখানে পড়ে যায়। জয় তাদের বাধা দিতে গিয়েও দূরে সরে যায়। ‘দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল, মনে মনে রাগে ফুঁসছিল।’[১৪৮] জয়ের অপ্রত্যাশিত কাণ্ড দেখে রিটায়ার্ড স্কুল

মাস্টার জয়কে বলেন— 'তোমার কোনও পার্টি আছে ? নেই আমি জানি। তুমি কোনও পার্টিতে বিলং কর না, শহরে অন্য যে সব দল আছে, তারা কেউ ওদের বাঁধা দিতে এসেছে? আসেনি, আসবে না। এটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক বিষয়, এখন দেশ সমাজ আইন-কানুন সব ওদের হাতে তাই না? ওরা হলো সর্বশক্তিমান। বুঝতে পারছ কী বলছি?'[১৪৯] জয় অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এরপরই জয়কে বাঁচানোর জন্য তিনি প্রসাবের অজুহাত দাঁড় করান— 'পেচ্ছাব পেলে মানুষ যা করতে যায়, খিদে পেলে মানুষ খেতে চায়, তুমি ঠিক সেই রকম একটা নর্মাল মনে স্বাভাবিক কাজই করতে গেছলে।[১৫০] এই কথা শুনে জয়ের বিষম লাগে। নিজেকে রক্ষার কৌশল তার জানা নেই।

জয় চৌধুরী বাড়ির ছেলে। জয়কে সবাই ভালো ছেলে বলে জানে। অতএব অন্যায় অবিচারের সে শুধু নীরব দর্শক মাত্র। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন 'এই মোড় ধরে গগনবিহারী রোড দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'[১৫১] আত্মদ্বন্দ্বে দগ্ধ জয়ের কোনো ক্ষোভের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই তাই সে মনে মনে বলে— 'রাগ! রাগ হয়, অথচ এর কোনও বিহিত নেই।'[১৫২] জয়ের সমকালে শুধু জয় না আরো অনেকে আড়ষ্ট থাকে। তাদের সম্পর্কে জয়ের মন্তব্য 'ওদের ধ্যানধারণা ভাবনা কি আলাদা, ওটা রুচি না মূল্যবোধ? অথচ সবাইতো এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে।[১৫৩]

জয় শিক্ষিত বেকার যুবক। চাকরির বাজার মন্দা বলে চাকরি হয়নি, বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। এপয়নমেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডে জয়ের নামটি আগে ছিল। কিন্তু জয়ের বন্ধু নিতাই এমএলএ নগেন সেনের সুপারিশে চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল। জয়কে দেখে এসআই মাখন ঘোষ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়, 'এই শালা বেকারগুলোকে দেখলে, আমার ইচ্ছা করে, রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের মতো পিটিয়ে মেরে ফেলি। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে না।'[১৫৪] জয়ের কানে কথাগুলো বাজতে থাকে। তার মনে হয় দেশের বড় কেউ মাইকে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কিংবা রেডিওতে অথবা ডাকসাইটে কোনো নেতার উক্তি বা খবরের কাগজে শিরোনাম হয়েছে। যুগধর্মের বিচারে জয়ের এসব আচরণ অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বশেই ওর যাবতীয় প্রতিবাদ বেরিয়ে আসে বা প্রতিবাদ না করতে পারার ব্যর্থতায় সারাক্ষণ মাথা টিপটিপ করে। তার এই অসুখ আধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রতীক।

প্রেমের ক্ষেত্রে জয় ভীরু। গগনবিহারী মেকেঞ্জি আর ললিত হালদার রোডে বেকার যুবকরা মেয়েদের দেখে টিজ করে, আড্ডা দেয়। জয় ততটা দুঃসাহসী নয়। রাস্তায় চলন্ত মেয়েদের তার নিস্তরঙ্গ চলন্ত দীঘির জলের মতো মনে হয়। মেয়েদের ছন্দবদ্ধভাবে হেঁটে চলাতে সে ছন্দপতন ঘটাতে চায় না। জয়ের এই অসঙ্গত আচরণের কারণে তার বন্ধুরা তাকে গাড়ল বলে।

জয় প্রণতি মজুমদারকে ভালোবাসে না অথচ তারই চালে আটকা পড়ে। প্রণতির সম্ভোগের কাছে নিজের সমর্পণ করে। এই প্রণতি যখন গর্ভবতী হয় এ সংবাদে তার মুখ হয়ে যায় 'পুতুলের মতো প্রাণহীন'।[১৫৫] আতঙ্কিত ভূতগ্রস্থের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার শিরদাঁড়া কাঁপে আর মস্তিষ্কে ধ্বনিত হয় 'বাঁজা খাবি তো খোজা হবি। খোজা হবি তো খাসি খাবি। খাসি খাবি তো চিবিয়ে খাব। ঝালমশলা দিয়ে রেঁধে চিবিয়ে খাব।'[১৫৬] জয়ের চরিত্রের অসঙ্গতি ডাক্তার প্রেমেন্দ্রকুমার মজুমদারের জানা, কারণ জয় তারই নার্সিংহোমের কর্মী। তাই জয়কে এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বিষ খেয়ে মরার জন্য প্ররোচিত করেন। কিন্তু জয় জীবনবাদী। বিষ খেয়ে মরার কথা সে কল্পনাও করে না। প্রণতি যখন তাকে বিয়ে করতে চায় তখন জয় ভিতরে ভিতরে চিৎকার শুনতে পায় 'পারে না, পারে না, না না না। আপনাকে তো আমি কখনও সেই চোখে দেখিনি।'[১৫৭]

জয় মেয়েদের নিয়ে কখনোই হারজিতের লড়াই করেনি। যারা এই লড়াই করে তাদেরকে সে ঘৃণা করে। মেয়েদের সে মেয়ে ভাবে। তাই দূর থেকে তাদের সৌন্দর্য দেখে। জয়ের অর্থ নেই, বিত্ত নেই, তাই সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তার কোনো দাবি নেই। যারা এই দাবি করে তাদেরকে ওর গুলি করে মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে পারে না, কারণ জয় অপদার্থ, অক্ষম, দুর্বল। তাই ভাইঝি তাকে ঘাসু কাকু ডাকে। বউদির কাছে সে মাকালু ঠাকুরপো। রাস্তার সুন্দরী মেয়ের দৃষ্টির চেয়ে ধোপানী দুনিয়া কিংবা মালতির দৃষ্টি কামনা করেছে। অবশ্য তাদেরকে জয় করতে হবে এই ভাবনা তার মাথায় আসেনি।

জয় অপদার্থ হলেও যৌবনের ধর্মে গতিমান। তাই সুন্দরী প্রণতির ছলনার কাছে হার মানে। সে উপলব্ধি করে সে 'একজন জোয়ান পুরুষ'।[১৫৮] আর সে কারণে প্রণতির সেবায় লেগে যায়। ডাক্তার রমেন জয়কে ক্লীব ভেবে প্রণতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেয়। জয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। জয়ের জীবনের ওপর তার কোনো হাত নেই। প্রণতিকে সে অনেক কথা বলতে চায়। সে বলতে চায়

> 'আমি আপনার ইচ্ছামতো, আপনার সেবায় লেগে গেলাম। আপনার সেবা! সেই থেকে শুরু। এখন বলছেন, আপনি যদি আমার বাচ্চার মা হতে পারেন, বিয়ে হতে পারে না? ... না না, পারে না। আমি গাধা বুদ্ধু উল্লুক গাড়ল, এমনকি আপনার পেটের বাচ্চার জন্মদাতাও হতে পারি, কিন্তু আপনার সঙ্গে বিয়ে, আপনাকে নিয়ে চলে যাওয়া হতে পারে না, পারে না।'[১৫৯]

এসবই তার অনুচ্চারিত উক্তি, অব্যক্ত কথা। জয় ভীত। এই ভয়ের জন্ম সমাজের অসঙ্গতি থেকে। অপ্রত্যাশিতভাবে সে রাখাল তালুকদারের খুনি চেহারা দেখে ফেলে। তখন থেকেই রাখাল তালুকদার তাকে ভয় দেখায়। জীবনের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সে বারবার হেরে গেছে। একটা পাগলা ভিখারিকে বাঁচানোর চেষ্টায় সে ব্যর্থ হয়। সেই জয়ই পোষমানা মধ্যবিত্ত থেকে এক সময় সাহসী হয়ে

ওঠে। অন্নদাতা ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। জয়কে বেজন্মা বলে তার মাকে অপমান করলে জয় প্রতিবাদ করে। 'আমাকে বেজন্মা বাস্টার্ড বলবেন না, ... আমার মা বড় খাটি মানুষ মাইরি '[১৬০] কিন্তু এই ম্রিয়মান প্রতিবাদ তার মালিকের কান পর্যন্ত পৌছায় না। একটা সময় যা অসহায়ের মত আর্তি শোণা যায় :

> আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাকে কেন ওটা করবেন, ওই ভ্যাসেকটমি। আমাকে কেন শহরে আটকে রাখবেন? আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও আপনার বাড়িতে আসব না। ... আপন গড বলছি, আমি আর জীবনে কোন দিনও এ মুখো হবে না।[১৬১]

ডাক্তার তাকে নপুংসক করতে চাইলে তার মনে হয় 'শুয়োরের বাচ্চার ঠ্যাং ধরে ছিঁড়ে ফেলতে।'[১৬২] কল্পনায় সে ডাক্তারের অনেক কিছুই করে কিন্তু বাস্তবে দৃঢ়তার অভাবে সে মুখে কিছু বলে না। নীরবে ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সমরেশ বসুর অন্যান্য নায়কের মতো জয় বিচ্ছিন্ন মানুষ। এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত শৈশব থেকে। তার সন্ধ্যার আকাশের দেবশিশু কিংবা বিরাট লম্বা মানুষের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। বাস্তব বর্হিভূত আচরণের কারণে সে সবার পরিহাসের পাত্র হয়েছে। সে বুঝেছিল ক্রমশ 'সকলের কাছ থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।'[১৬৩] কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন করতে গিয়ে মার খেয়েছে। রাখাল তালুকদারের জ্যাঠামশাইয়ের খুনের সাক্ষী হওয়ায় প্রতি মুহূর্তে সে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে। অথচ সবসময় ভাবে 'কী ভাবে বেঁচে থাকা যায়।'[১৬৪] তার খুব ইচ্ছা করে মালতির সাথে বসে খাবার খেতে। কিন্তু সবসময়ই লোকলজ্জার ভয়ে গুটিয়ে থাকে। এই জয়ই মায়ের কথায় জেগে ওঠে। প্রণতির প্রতি তার সুপ্ত ভালোবাসা বিকশিত হতে চায়। সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিতে চায়। কিন্তু সমাজের অপশক্তির কাছে পরাজিত হয়। ছিনতাই, মাদক পাচারসহ নানা অজুহাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে প্রণতির জন্য, অনাগত সন্তানের জন্য ভালোবাসা তাকে বীরের মর্যাদায় উন্নীত করে।

বিপর্যস্ত

বিপর্যস্ত উপন্যাস সমরেশ বসুর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বহন করে আছে। ষাট এবং সত্তর দশকের পরিবর্তমান রাজনীতি মধ্যবিত্ত বেকার যুবকের কাছে ছিল একদিকে আশার বাণী, অন্যদিকে আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বর্ণকমল চ্যাটার্জি ওরফে দুদে। দুদের জবানিতে উত্তম পুরুষের জবানিতে ফ্লাশব্যাক রীতিতে উপন্যাসের কাহিনি উপস্থাপিত। দুদেকে কেন্দ্র করে কাহিনি সম্প্রসারিত।

বিশ শতকের এই সময়পর্বে ভারতবর্ষকে দুর্নীতি, কালোবাজারি, বেকারত্ব আচ্ছন্ন করেছিল। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছিল। দেশের প্রায় ষাট ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছিল। শহরে মাথাপিছু আয় চল্লিশ টাকা আর গ্রামে বাইশ টাকা।[১৬৫] পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এর থেকে বাদ পড়েনি। উপন্যাসে কয়েকটি সালকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন '৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেস গঠন, নকশাল আন্দোলনের সময় হত্যাসহ অরাজক পরিস্থিতি, ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হওয়া ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক সংকট সরাসরি এসেছে উপন্যাসে।

১৯৬৬ সালে শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। দুদের বন্ধুরা '৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনের সময় খাদ্য সংগ্রহের নামে লুটপাটের বেসাতি চালিয়েছে। ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেস দলের অজয় মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনীতির এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করে। উপন্যাসের নায়ক দুদে এই যুক্তফ্রন্টের সমর্থক। তবে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী নয়। তারই স্মৃতিচারণসূত্রে ধরা পড়েছে সেই সময়কার বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনীতির বেষ্টনে আবদ্ধ জীবন। এ প্রসঙ্গে লেখকের সরল স্বীকারোক্তি 'প্রথম কথা হচ্ছে রাজনীতি এতো অনিবার্য ব্যাপার যে তা আমার সাহিত্যে আসবে বলে আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। আসবেই।'[১৬৬]

উপন্যাসটির কালগত পরিসর মাত্র একদিন। এই একদিনে জানা যায় দুদের শৈশব কৈশোর যৌবন, প্রেম বিয়ে দাম্পত্য সংকট এবং বিবাহ বিচ্ছেদ। দুদের বয়স বিয়াল্লিস বছর তিন মাস। এই বয়সে এসে স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে পুকুরপাড়ে বসে বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করে যার সাথে অনিবার্যভাবে পরিবর্তমান বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং রাজনীতি এসে পড়ে। দুদের জীবনের দুটো সময়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি সাত থেকে চৌদ্দ বছর যে সময়টা সে তার দাদু দিদিমার সাথে কাটিয়েছে, এই সময়টা তার কাছে শ্রেষ্ঠ সময় অন্যটি ত্রিশ থেকে আটত্রিশ যে সময়ে সে যৌবনের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। দুদে নিজেকে খুব চালাক আর ধূর্ত মনে করে প্রকৃতপক্ষে সে একজন বোকা শ্রেণির মানুষ যে তার চারপাশকে নিস্পৃহ এবং নির্মোহভাবে পর্যবেক্ষণ করে। দুদের সাথে তার বাবা ত্রিলোচনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব। ত্রিলোচন নীতিহীন নারীলোলুপ ভদ্রবেশী কাপুরুষ। ত্রিলোচনের ধারণা দুদে দিন দিন বখে যাচ্ছে এবং চেহারাটা লম্পটের মতো হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ত্রিলোচন এক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী। বাড়িতে প্লাস্টিকের ব্যাগ বানানোর কারখানা খুলে পতিত মেয়েদের নিয়ে স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত। দুদের কথাতেই জানা

যায় লোকটার বয়স তো আমার থেকে কম না? হাজার হোক আমার বাবা, আমার জন্মদাতা, অথচ চরিত্রের রহস্য আমি বুঝি না। ওই বুড়ো লোকটির ওপর ওদের এত দরদ কীসের? এত সাজগোজ করে এসে কাজের মধ্যেই এত হাসি কথাবার্তা কিসের? কারো কারোকে নিয়ে তো এক সময়ে দরজা বন্ধ হয়ে যেত।'[১৬৭]

দুদে বেকার, তাই তাকে পরিবারের সদস্যদের কাছে উঞ্ছবৃত্তি করে চলতে হয়। তার বাবা তাকে বিতাড়িত করেনি কারণ সে তার দাদুর সম্পত্তির স্বত্বের অংশীদার। দুদে রাজনীতিতে সক্রিয় না, তবে বুঝেছিল রাজনীতির ছাপ না থাকলে চাকরি পাওয়া সম্ভব না। চাকরির জন্য কংগ্রেসের নেতা গৌর সেনের পেছনে দেড় বছর ঘুরেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থক না হওয়ায় সে চাকরিটা পায়নি। উপরন্তু দুদে চাকরি অনুসন্ধানের সূত্রে দেখেছিল পার্টির অর্ন্তকলহ। গৌর সেনের মতো নেতা দুদেকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। গৌর সেন তার রাজনৈতিক সহকর্মী বলরাম মিত্তিরকে মারার জন্য দুদেকে বলে। 'তোমরা বলরাম মিত্তিরকে কিছুকালের জন্য শুইয়ে রেখে দাও'।[১৬৮] দুদে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পাড়ায় ভদ্র ছেলে বলে সমাদৃত। সে বুঝতে পারে না একই দলের রাজনৈতিক সহকর্মীকে কেন মারতে হবে। অথচ স্বভাবসুলভ নিস্পৃহতায় দুদে এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে না। কিন্তু গৌর সেনের ওপর রাগের কারণে ভোটের সময় সে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ নিয়েছিল। তার বাবা কংগ্রেসের সমর্থক বাবার বিরুদ্ধে যাবার মনোবৃত্তি থেকে সে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক হয়েছিল। লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি না করলে সেই সময় চাকরি পাওয়া অভাবনীয় ব্যাপার। তার বন্ধু নির্মল তাকে কথা দিয়েছিল দল ক্ষমতায় এলে সে চাকরি পাবে। ভোটের সময় সে যুক্তফ্রন্টের হয়ে প্রচুর কাজ করে। কংগ্রেসের প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে সে ভোটের সময় বিচার করেনি কে আদর্শবাদী নেতা আর কে সুবিধাবাদী নেতা। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে জয়ের আনন্দে দুদে বাড়িতে পিকনিক করে। এই পিকনিককে উদ্দেশ্য করে সে তার বাবার সাথে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তার বন্ধু নির্মল-পঞ্চানন–বুলেকে বাড়ি থেকে বের করার উদ্দেশ্যে তার বাবা পুলিশ ডেকে আনে। পুলিশ দুদেদের বাড়িতে এসে দেখে নির্মল-পঞ্চানন–বুলে সবাই ক্ষমতাসীন দলের কর্মী। তাই পুলিশ দুদে-নির্মলের পক্ষ নিয়ে তাদের ভদ্র ছেলে বলে আখ্যা দেয়। অথচ এই সাব-ইন্সপেক্টর কিছুদিন আগে গৌর সেনের সাথে একই জিপে ঘুরত। রাজনীতির পালাবদলের সাথে সাথে পুলিশের চেহারা পাল্টে যায়। দুদে ব্যঙ্গ করে বলে 'পুলিশের রোলটা তা হলে এ রকম নাকি, যখন যাহার কাছে থাকি তখন তাহার মন রাখি। অর্থাৎ সেই রূপকথার মতো গাছ তুমি কার? জবাব যে আমার তলায় বসে তার। তার মানে যারা পাওয়ারে পুলিশ তখন তার সেবক।[১৬৯] দুদে একে রাজনীতির ভেলকি বলতে চায়, যদিও জলধরের মতো নেতাদের মতে এই জয় তাদের দীর্ঘদিনের কষ্টভোগের ফল। কিন্তু

দুদে মানতে নারাজ। তবে তার আপ্তবাক্যের নীরব শ্রোতা সে নিজেই। এই পিকনিকের সাতদিন পরে তার চাকরি হয়।

চাকরি তার ভেতরকার শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। চাকরি এবং রাজনীতিকে ব্যবহার করে সে সরাসরি তার বাবার বিরুদ্ধে লড়ে। কারখানার মেয়েদের বাড়ির ভেতরে অবাধে প্রবেশ বন্ধ করে। তার বাবার নগ্ন হীন আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে । তার বাবা কারখানার মেয়েদের দিয়ে তার বিরুদ্ধে যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে তাও প্রতিহত করে। বাবার অমিতচার সে তার বন্ধুদের সাহায্যে প্রতিহত করেছিল। দুদে চাকরি পেয়ে খুকুকে বিয়ে করে সাধারণ দাম্পত্যজীবন চেয়েছিল। যে জীবনে সে কাজ করে বাড়ি ফিরবে আর বাড়িতে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি।

দুদে রাজনীতির গভীর পর্যবেক্ষক ছিল কিন্তু কখনোই পার্টির সক্রিয় সদস্যপদ নেয়নি। বলরাম মিত্তির খুন হওয়ার পর ভয়ে গৌর সেনের প্রস্তাবের কথা কাউকে বলেনি। আবার যুক্তফ্রন্টের সময় তার বন্ধুরা দল বেঁধে ইস্টিশনে গিয়ে গম খোঁজার নাম করে লুটপাট করত। সে এসবের বিরোধী ছিল। সেই সময় একদিকে খোলাবাজারে চালের দাম বেড়েছিল অন্যদিকে রেশনে চালের মজুত কমে যাচ্ছিল। জলধরের মতো নেতাদের বলতে শোনা গেছে 'আশেপাশে সবখানে মজুতদাররা যত খাবার মজুত করছে সব খুঁজে বের করতে হবে, দরকার হলে লুট করতে হবে।[১৭০] পঞ্চাননরা লুট করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়নি নিজেদের পকেট ভারী করেছে।

রাজনীতিতে দুদে নির্মলের মতো নেতার সাহচর্য যেমন পেয়েছে তেমনি সুহাসের মত সুবিধাবাদী নেতাও দেখেছে। সুহাস দুদেদের কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। বহিরাবরণে ভদ্রলোক– সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে তার সুখের সংসার। সৌম্য চেহারা এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্য সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। যুক্তফ্রন্ট দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে কলকাতা ছেড়ে দুদেদের এলাকায় বাসা নেয়। গৌরসেনের কূটকৌশলে কারখানায় মারামারির সময় সে বিদ্যুৎ-এর লাইন বন্ধ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী শঙ্করকে খুন করে। যার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী দুদে :

> শঙ্করকে পড়ে যেতেই সুহাস দাস তার ভারী জুতো দিয়ে প্রথমেই ফুটবল মারার মতো ওর মাথায় মেরেছিল, আর ফট করে শব্দ হয়েছিল। আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল, মাথার খুলিটা ফেটে গিয়েছে, সুহাস দাস চিবিয়ে বলেছিল 'শুয়োরের বাচ্চা, আমাকে না ফাঁদ দেখাতে চেয়েছিলি? বলেই লাফ দিয়ে শঙ্করের পেটের ওপর উঠে, এমন নেচেছিল, আমার মনে হয়েছিল, শঙ্করের পেটের নাড়িভুঁড়ি নিশ্চয়ই ফেটে বেরিয়ে পড়বে। [১৭১]

দুদে এসব দেখেও দেখেনি, যদি তারও শঙ্করের মতো অবস্থা হয়। বাহাত্তর সালে সুহাস চাকরি ছেড়ে দিয়ে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছিল। ব্যবসা করে অনেক প্রতিপত্তির মালিক হয়েছিল। শঙ্করের পরে তিয়াত্তর সালে নির্মল খুন হয়। পুলিশ নির্মলের খুনিদেরও ধরতে পারেনি।

দুদে রাজনীতির নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে। ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতার সময় সে লক্ষ করেছে বাজারে একটি কথা প্রচলিত 'সালটা খেলো, চুলু পিও ইন্দিরা গান্ধী যুগযুগ জিও।'[১৭২] প্রথম দিকে এর অর্থ না বুঝলেও পরবর্তী সময়ে বুঝেছিল।

দুদে কখনোই ধর্মকে চলার পথের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেনি। যে কারণে বাবার গলায় পৈতা দেখে তার পৈতার প্রতি ঘৃণা ধরে গিয়েছিল। প্রেম ভালোবাসা নিয়ে দুদের নিজস্ব দর্শন ছিল। নীলা বৌদি আর অনাথ দাদা এবং তার দাদু-দিদিমার দাম্পত্যজীবন দেখে তার মনে হয়েছিল এই যুগল একে অপরের জন্য সৃষ্ট। যদিও ব্যক্তিগতজীবনে বাবা-মায়ের দাম্পত্য সংকট তাকে কষ্ট দিয়েছে। তার বাবার আধিপত্যশীলতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মনযন্ত্রণার কারণ হয়েছে। তার বাবা সমাজ-সংসারে যা পেয়েছে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে যশ-অপযশ সবকিছু। দুদের মনে হয়েছে তার মায়ের জীবনে তার বাবা একটা অভিশাপ। এসব কিছু অতিক্রম করে খুকুর সাথে সুখী দাম্পত্যজীবন প্রত্যাশা করেছে। স্বামী হিসেবে দাম্পত্যসম্পর্কে একটু সুখ-শান্তি, প্রণয় ও সান্নিধ্যকামনা করে। বাড়ির অদূরে যে পতিতাপল্লি আছে সেখানেও দুদে কখনো যায়নি। কিন্তু বিয়ের এক মাসের মাথায় পুরীতে বেড়াতে গিয়ে বুঝেছে খুকু যেখানে পুরুষের ভিড় সেখানে। খুকুর আচরণের অসঙ্গতি বিশেষত বেড়াতে গিয়ে তাকে কখনো দাদা কিংবা ভাই সম্বোধন তার দুর্বোধ্য লেগেছে। সর্বদা হারায় হারায় শঙ্কা নিয়ে খুকুকে আগলে রেখেছে। খুকু দুদের বিপরীতমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের দাম্পত্যসংকটকে আরো প্রকট করে। রূপ-যৌবন এবং পূর্ব প্রেমিক কানুকে হাতিয়ার করে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী খুকু খুব সহজেই কলকাতার সংস্কৃতি অঙ্গনে স্থান করে নেয়। দুদে বিয়ের আগে জানত খুকু গান জানে। এখন দেখে গান নাচ অভিনয় সবই জানে। খুকু এসব ব্যবহার করে একাত্তর সালে কলকাতার একটি বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়। খুকুর চাকরি অন্য পুরুষের সাহচর্যে দুদে ঈর্ষান্বিত হয়েছে কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। তার স্বগতোক্তি থেকে জানা যায় :

> আমার অবস্থা হয়েছিল এঁড়ে লাগা ছেলের মত। হিংসায় জ্বলতাম, অথচ এঁড়ে লাগা ছেলে যেমন মায়ের কোল, বুকের দুধ কিছুতেই ছাড়তে পারে না, আমার সেই রকম আবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এঁড়ে লাগা ছেলে যেমন সুযোগ পেলেই আঁচড়ে কামড় দিত, আমি সেই রকম করতে পারতাম।[১৭৩]

নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সচ্ছলতার জন্য বিপথগামিতা এবং প্রেমহীনতার বিপরীতে পুরুষের নিস্পৃহতা, আত্মগত ক্ষোভ দাম্পত্যজীবনকে অনিবার্যভাবে স্থবির করে তোলে। অফিস থেকে ফিরে দুদের স্ত্রী সান্নিধ্যের স্বপ্ন-কল্পনা, সামান্য শুশ্রূষার আকাঙ্ক্ষা ও প্রণয়-মাধুর্য-আমোদের চাহিদা ব্যাহত হয় খুকুর উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। খুকুকে আগলে রাখার প্রচেষ্টায় দুদে তার মায়ের সাথে আলাদা হয়েছিল। অর্থগৃধ্নুতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় খুকু ক্রমেই দুদের অপরিচিত হয়ে ওঠে। অফিসের নাম করে নানান জায়গায় যায়— দুদে একথা জিজ্ঞেস করায় তাদের দাম্পত্যের অর্ন্তক্ষতটি বাইরে বেরিয়ে আসে। দুদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় হয়তো খুকুকে ফেরাতে পারত কিন্তু দুদের অপৌরষসুলভ নিস্পৃহতা তাদের দাম্পত্যজীবনে দুর্বিষহ বাস্তবতা নিয়ে আসে। খুকু তার বাবার বাড়ি চলে গিয়ে দুদের নামে নারী নির্যাতন এবং ডিভোর্সের মামলা করে দেয়। দুদে তার একমাত্র সন্তান বিধাতাকে ফেরত পেতে মামলা করে। দুদের কাছে মামলা বিচার একসময় অর্থহীন মনে হয়। তার জিঘাংসু মন খুকুর মুখে এসিড ঢেলে সবকিছুর নিষ্পত্তি করতে চায়। ‘নির্ভেজাল অনেস্ট লাইফ, রাজনীতি, গণতন্ত্র সবকিছু বুকের ওপরে, তোমার মুখের চামড়া অ্যাসিডে পুড়ে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়বে। আর আমি একবার বিধাতাকে শেষবারের জন্য বুকে নিয়ে আদর করব।[১৭৪] কিন্তু তার স্নেহপ্রবণ মন বিধুর মায়ের মুখে এসিড দিতে পারে না। সে আশা করে খুকু হয়তো পরিবর্তিত হবে। সেই সাথে তার বন্ধুরাও পরিবর্তিত হবে। সারাজীবন এভাবে চলতে পারে না। সে মনস্থির করে আবার চাকরির সন্ধান করবে।

বিপর্যস্ত উপন্যাসে একদিকে দেখানো হয়েছে পূর্বপ্রজন্ম সমাজটাকে বাসের অযোগ্য শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল করে রেখেছে। অন্যদিকে বর্তমান যুবসমাজ অর্থনৈতিক বিপন্নতায় দিশেহারা।[১৭৫] ত্রিলোচন এই পূর্ব প্রজন্মের প্রতিনিধি। যে জানে শুধু ভোগ করতে। সুবিধাবাদী মুখোশধারী ভদ্রলোক। পিডব্লিউডি-এর ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করত। দুর্নীতির দায়ে চাকরি চলে যায়। বড় ভাইয়ের এবং শ্বশুরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নষ্ট করে। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি উদাসীন। সংসারে সামান্য অর্থ দিয়ে পরিবারের প্রতি কতর্ব্য পালন করে। সমস্ত অর্থই সে অসৎ পথে ব্যয় করে। কারখানায় মেয়েদের কাজ করানোর নাম করে অচরিতার্থ অভীপ্সা পূরণ করে।

মানুষ শক্তির উৎস

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এবং নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত *মানুষ শক্তির উৎস* উপন্যাস। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের চেহারা বড়ই করুণ। ২৫ মে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রাক-মুহূর্তে ১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বারো

হাজার লোক কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছিল। দুইশ উনসত্তরটি কলকারখানা লকআউট ঘোষিত হয়েছিল।[১৭৬] ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দারিদ্র্য, আর বিদেশী তোষণে অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। এ সময় মূল্যবোধের দারুণ অবনতি হয়েছিল। এ সময়কার মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন— 'বাঙালি মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুর্গতির চেয়েও এখন বড়ো হয়ে উঠেছে নৈতিক চরিত্রহানির দুর্গতি।'[১৭৭] সার্বিক মূল্যবোধহীনতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত মুক্তির উপায় খুঁজেছিল। সেই সময় নকশালবাড়ি আন্দোলন ভারতীয় সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৬৭-এর মার্চে তরাই-এর নকশালবাড়ি এলাকা থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন একদিকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এবং সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল, অন্যদিকে শহরের ছাত্র-যুবক,-বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশকে যুক্ত করতে পেরেছিল কৃষক আন্দোলনের অংশভাক হিসাবে।[১৭৮] এ ঘটনায় মধ্যবিত্ত তার দোলায়মান শ্রেণি অবস্থান থেকে কিছুদিনের জন্য হলেও শ্রেণিচ্যুত হয়। প্রথমদিকে এই আন্দোলন কৃষকদের অধিকারকেন্দ্রিক হলেও পরে কলকাতার মধ্যবিত্ত এবং ছাত্র ও যুবকদের একটি বিরাট অংশ এতে জড়িয়ে পড়ে। 'কলকাতায় নকশালবাড়ি আন্দোলনে ছাত্র-যুবকদের রক্ত ঝরেছেও অনেক। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে কলকাতা থেকে বহু যুব-ছাত্র গ্রামে চলে যায়।'[১৭৯] কলকাতার দেয়ালে তখন লেখা থাকত 'রাইফেল শক্তির উৎস'। কিন্তু অস্ত্র কখনো মানুষের নিয়ন্তা হতে পারে না। অস্ত্র মানুষ পরিচালিত করে। অতএব স্লোগানটির মধ্যে যে ফাঁকি ছিল তা উপলব্ধি করে সমরেশ বসু লিখলেন *মানুষ শক্তির উৎস* উপন্যাসটি। সত্তর দশকের উত্তাল রাজনীতি, বামপন্থার বহুমাত্রিক নীতি ও কৌশলের ক্রমবিবর্তনে যে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে একটা সর্বাত্মক বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গের শহর কলকাতার বুকেও সৃষ্টি করেছে আন্দোলনের পটভূমি। সেই পটভূমিরই একেবারে মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে লেখা হয়ে হয়েছে এই উপন্যাস।[১৮০]

সমসাময়িক কালে উপন্যাসটি সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। উপন্যাসের ঘটনাভূমি ষাট-সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন। এই সময় নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত মুক্তির স্বপ্নে ছিল বিভোর। 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন নকশাল আন্দোলনের নেতারা। এর কিছু আগে ঘটে গেছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট শিবিরের বিভাজন।[১৮১] রাজনীতি সাধারণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বেচ্ছায় হোক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোক রাজনীতির বাতাবরণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। উপন্যাসে দেখা যায় মফস্বল থেকে উঠে আসা একটি সাধারণ মেয়ে যমুনার ভেতর

রাজনীতি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। তারই দৃষ্টিতে উপন্যাসটি রচিত তবে উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে তার প্রেমিক সজল।

যুমনার কথনে উপন্যাসটি রচিত। যমুনার শৈশব কৈশোর কেটেছে কৃষ্ণনগরে। মামা-মামির কন্যাসন্তান না থাকায় মামার পালিতা কন্যার মতোই বড় হয় সে। যমুনার বেড়ে ওঠা, শিক্ষা ও রুচিতে তার শ্রেণি পরিচয়টা স্পষ্ট। যদিও উপন্যাসে যমুনা তার বাবার অসৎভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উত্তরণের কথা স্মরণ করে। উপন্যাসের শুরুতে রাজনীতির আলোচনায় যমুনা নির্বিকার। সে তার বান্ধবী রাখী কিংবা ঋতার মত প্রগতিবাদী হতে পারেনি। উচ্চমধ্যবিত্তের সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে সে অনেকটাই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতার কারণে সে অংশুমালরি কাছে আত্মসমর্পণ করে। অংশুমালির সাথে কাটানো সময়গুলো তার কাছে সুখস্মৃতির মতো থাকে। যমুনা তার মামাকে শ্রেণিশত্রু ভাবতে পারে না, যদিও সে জানে রাজনৈতিক আদর্শে তার মামা তার শ্রেণিশত্রু। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য তার মামা কারখানা লকআউট ঘোষণা করে।

স্বার্থকৌশলী মধ্যবিত্তের চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে যমুনার বাবার চরিত্রে। তিনি অসদুপায়ে নিজের শ্রেণিগত অবস্থান পরিবর্তন করেন। যমুনার মা স্বামীর অসৎ পথ সমর্থন না করায় তাদের মধ্যে দাম্পত্য বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। যদিও একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে দুজন অবস্থান করেন। কিন্তু দুজনের ঘরের মাঝের দরজাটি সবসময় লাগানো থাকে। যমুনার বাবা-মার দাম্পত্য সম্পর্ক দেখে মনে হয় দুজন নিঃসম্পর্কিত মানুষ একই ছাদের নিচে অবস্থান করে। যমুনার মা অতীত জীবনের স্মৃতিচারণায় সুখানুভব করে। যুমনার বোন কলেজের এক নবীন শিক্ষককে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। যমুনার বাবা ছেলেক বিয়ে দিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূর স্বপ্ন দেখেন। তিনি কীভাবে তার ব্যবসার অংশীদারিত্ব থেকে অনঙ্গবাবুকে ফাঁকি দেন, এবং সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন তা অবলীলায় স্ত্রীকে গল্প করেন। যমুনার সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের ছন্দপতন ঘটে তার কলকাতার জীবনে। মামা-মামীর কন্যাসন্তানের বাসনা পূরণ করতে তাকে মফস্বলের সংস্কৃতি ত্যাগ করে নগর-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে হয়। দিপু, রমু মামাতো দুই ভাইয়ের সাথে যমুনা স্বাচ্ছন্দে বেড়ে ওঠে। যমুনার স্মৃতিপথে লেখক দেখিয়েছেন সজলের কৈশোর এবং যৌবন। রমু সজলকে যমুনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। পিতৃহারা সজল দাদার আশ্রয়ে বড় হয়েছে। বিএসসি-র পর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। এরই ভিতর দিনবদলের সাথে সাথে বদলে গেছে সজল। রাজনীতিতে নেমেছে, মিছিল করেছে, শ্লোগান দিয়েছে।[১৮২] রমুর বন্ধুরা বামপন্থী কিন্তু একদলের নয়। দীপু পড়ালেখার পাশাপাশি রাজনীতি করে। রমু কেমিস্ট্রিতে পাস করে

ব্যবসা করে। রাখী ইংরেজিতে এমএ পড়ছে, মিহির ডাক্তারি পড়ে। শ্যামল আর বিপ্লব ফেল করে রাজনীতিতে ঢোকে। ঋতা পড়ালেখা ছেড়ে দেয়। যমুনার স্কুলের বন্ধু রমা রাজনীতি করে। রমা যমুনাকে মার্কসের বই পড়তে দেয়। যমুনা বাংলায় এমএ পড়া শুরু করে। যমুনার শৈশব কৈশোর আর যৌবনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি নিয়ে নতুন প্রজন্মের ভাবনা প্রতীয়মান। দেশ নিয়ে তার প্রজন্ম কী ভাবছে এবং কোনটি সঠিক পথ সেটি নিয়ে প্রত্যেকে বিভ্রান্ত।

সজল মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাণচঞ্চল ছেলে। অন্যান্য মধ্যবিত্ত যুবকের মতো রাজনীতি নিয়ে তার আগ্রহের কমতি নেই। তবে সে রাজনীতিকে কখনোই ওপরে ওঠার হাতিয়ার হিসেবে নেয়নি। আবার তার আদর্শ আর দশটা মধ্যবিত্ত যুবকের মতো তত্ত্বসর্বস্ব নয়। সে তত্ত্বের সাথে জীবনের সংযোগ ঘটাতে চায়। সজলের রাজনীতি ভাবনাতে তার বন্ধুদের বিশ্বাস জন্মেছিল সজল ভুল পথে চলেছে। সবাই যখন দলের আদর্শে চলেছে সেখানে ব্যক্তির আদর্শ তুচ্ছ। সজল তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে অনেকবেশি সাহসী আর দ্বিধাহীন। ব্যক্তিগতজীবনে সজল চেয়েছিল একটা চাকরি স্বচ্ছলতা আর যমুনাকে বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু সজলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, চলমান সমাজসৃষ্ট বেকারত্ব এবং রাজনীতির টানাপোড়েন তার সকল সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। প্রেমের ক্ষেত্রে অনেকটাই উদার। অংশুমালির সাথে যমুনার দেহজ সম্পর্কের খবরে সে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। সুবীর এবং সে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। তবে সজল সুবীরদের পদ্ধতিটার সাথে একমত হতে পারেনি। সজলের চিন্তাধারা পার্টির সদস্যদের সঙ্গে মেলে না। সজল মনে মনে বলে 'যা সমাজের পক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে অশুভ তাই অশুভ। তাকেই আমি অশুভ বলছি। যারা আমাদের সংগ্রামের সুযোগ নিয়ে, নিজেদের স্বার্থে রক্তপাত করছে, অত্যন্ত নিচু স্তরের খুনি, গুণ্ডা, বদমাইশ, ওয়াগান ব্রেকার্স, ছিনতাই পার্টি, এক কথায় সো-কল্ড মস্তান, আর যে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় আসার জন্য সব রকমের সন্ত্রাসের রাস্তা ধরেছে, তারা আমাদের ছায়ায় নিজেদের আড়াল করছে। তাতে দিনের পর দিন আমাদের ইমেজের ক্ষতি হচ্ছে।'[১৮৩] সজল কখনোই এ সব গুণ্ডা-মস্তানকে লুম্পেন প্রলেতারিয়েট বলতে চায় না। এদেরকে সে ক্ষমতাসীন দলের এজেন্ট বলতে চায়। জনসাধারণের মনে ভীতি সঞ্চার করতে পার্লামেন্টরি মতবাদে বিশ্বাসী, বুর্জোয়া, আধাবুর্জোয়া দলগুলো তাদের ব্যবহার করে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে লেনিনবাদ কতটুকু উপযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। যে সব দেশে বিপ্লব হয়েছে সে সব দেশের বিশেষ কোনো ফর্মুলা যে তার দেশে কাজে লাগবে সজল তা মনে করে না। সে মনে করে 'কোনো ফরমুলাই চিরদিন কার্যকরী হয় না। দেশ আর কালচারের মধ্যে তার অনেক অদলবদল হয়।'[১৮৪] সজলের এ জাতীয় বক্তব্য পার্টিতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। সুবীরের মতো যুবক যারা পার্টি-অন্ধ তারা পার্টি অভ্যন্তরে

পার্টির সমালোচনা মেনে নিতে পারে না। সজল দেখিয়ে দিয়েছে কলকাতার রিয়্যাল ক্লাস এনিমিদের তার দল ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারেনি। মাঝখান থেকে তারা দক্ষিণপন্থীদের পথ পরিস্কার করেছে। আর বামপন্থীপার্টিগুলোকে তাদের দলের সমালোচনার পথ খুলে দিয়েছে। সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে 'ওদের দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিপরীত আমরাও বামপন্থী সংশোধনবাদের পথে চলেছি। কিছু ইনডিভিজ্যুয়াল ছাড়া, জনতার কোনও অংশই আমাদের সঙ্গে নেই।'[১৮৫] রাজনীতির ফাঁকি সে ধরেছে। রাজনীতির একদিকে যেমন থাকে আশ্বাসের কারণ অন্যদিকে থাকে নিরন্তর বিশ্বাসভঙ্গের কারণ। আর এসবের পশ্চাতে থাকে ক্ষমতা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। সজল মানুষের গতিশীলতায় বিশ্বাসী। তার কাছে :

> মানুষই সব কিছুর স্রষ্টা, সব কিছুর থেকে বড়। ইতিহাসের বহু স্তম্ভ আর সিংহাসন সে ভেঙেছে, আরও অনেক গড়বে এবং ভাঙবে। কিন্তু তথাপি, তার সেই স্বর্গলাভ কখনও হবে না, যে স্বর্গের লোভ তাকে দেখানো হয়। সেই হিসাবে, মানুষ চিরকালই বড় অসহায়।[১৮৬]

সজল চরিত্রের কিছু অসঙ্গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন সজল এসকেপিস্ট মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতো তত্ত্বসর্বস্বতা নিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে সরে পদ্ধতি বা কৌশলগত নীতির সমালোচনা করে।[১৮৭] কিন্তু কোনো পথ বাতলে দেয় না। সে যেহেতু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি তাই অন্য মধ্যবিত্তের মতোই সুখী সংসার তার প্রত্যাশা 'বিন্দু, দেখ আমি খুব আবেগের সঙ্গেই বলছি, তুমি আমার প্রতিমা, নারীর সেই চিরন্তন প্রতিমা, সাধারণ পুরুষ যার সঙ্গে সুখেদুঃখে ঘরকন্না করে, সন্তান উৎপাদন করে, লালনপালন করে, সেইরকম প্রতিমা।[১৮৮] সজলের উচ্ছ্বাস এবং উচ্ছলতা শুরু থেকেই পাঠককে আকৃষ্ট করে, সজলের ভয় ছিল সে গ্রেফতার হতে পারে অথবা গুপ্ত হত্যার শিকার হতে পারে। ঔপন্যাসিক সদ্য যুবক হিরণকে দিয়ে আকস্মিকভাবে সজলকে হত্যা করাতে পাঠকের সহানুভূতি সজলের দিকে যায়। আসলে লেখক দেখিয়েছেন নকশাল আন্দোলনে সজলের মতো অসংখ্য ছাত্র-যুবকের রক্ত ঝরেছে।

সুবীর সজলের বন্ধু। সজলের সূত্র ধরে যমুনার সাথে সুবীরের পরিচয়। যমুনার সুবীরকে দেখে মনে হয়েছিল 'অজ্ঞাতবাসী অর্জুন। কিন্তু দু চোখে তার আগুনের ঝিলিক। দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটে কঠিন প্রতিজ্ঞা। প্রশস্ত কপালে যেন বিদ্যুতের চিকুর হানা।[১৮৯] সুবীর যমুনাকে বোঝায় তার মামা তার শ্রেণিশত্রু। ১৯৭০ সালে নকশালবাদীদের ওপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন নেমে আসে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন 'নকশালপন্থীদের শারীরিকভাবে শেষ না করা পর্যন্ত লড়াই চলবে। এই সময় অনেক নকশালপন্থী আন্ডারগ্রউন্ডে চলে যায়। [১৯০] সুবীরও এ সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়।

হিরণ কলেজের পড়ালেখা ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে নাম লেখায়। সব সময় তার হাতে অস্ত্র থাকে। তারই হাতে সজল খুন হয়। সজলকে খুনের অপরাধে হিরণকে পার্টির নির্দেশে খুন করা হয়। হিরণের

মৃত্যুতে তার বাবা হরিশ শোক করেননি। তিনি হাজার হাজার হিরণের কথা ভেবেছেন। পুত্রের মৃত্যুতে তার উপলব্ধি হয় 'আমি এ হত্যার অংশীদার। কিন্তু যমুনা, এ হত্যার দায় নিতে বড় ভার লাগছে। কারণ এ হত্যা একটা উপলব্ধি এনে দিয়েছে, যা কঠিন। অথচ অনেক হত্যাই, সামনের পথ খুলে দেয়নি, পথ রুদ্ধ করেছে।[১৯১]

হরিশ বর্ষীয়ান বামপন্থী নেতা। সজল কলেজ স্ট্রিটে হরিশের সাথে যমুনার পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার ক্ষমতায়। হরিশ বলেন 'এ সরকার কখনও টিকে থাকতে পারে না ভাঙল বলে। সরষের মধ্যেই ভূতগুলো সব বসে।[১৯২] বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পর কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যমুনার মামা কারখানা বন্ধ করে দেয়। হরিশ এক সময় মন্তব্য করে— 'একে শ্রেণি সংগ্রাম বলে না, বিপ্লবের পথও বলে না। এ সব হচ্ছে মন্ত্রিত্বের পার্টি পলিটিকস, একটি পাক্কা সুবিধাবাদী রাস্তা। 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে' বসে বিপ্লব করা যায় না। তাই এখন দেখছি, আমরাই সেই সব কৃষকদের আর নেতাদের দমন করতে শুরু করেছি। যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।[১৯৩] তিনি মনে করেন বর্তমান রাজনীতি মন্ত্রিত্ব কোনো সমস্যাই সমাধান করতে পারবে না। বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে না, কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিতে পারবে না। তিনি কখনোই বিশ্বাস করেন না বিপ্লবী পার্টি সংসদীয় সরকার গঠন করে গোটা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলবে। হরিশের কথা সত্যি হয়। সম্মিলিত মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। নির্বাচন আসন্ন। সুবীর, হরিশদা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। আর সজল গ্রেফতারের ভয় মাথায় নিয়ে এদের সাথে গোপনে যোগযোগ রাখে। লেখক বলেন : খুন এখন রাজনীতির এক মুখ্য অঙ্গ। বহু ছেলে জেলে পচছে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, তার সঙ্গে পুলিশও খুন হচ্ছে। amenesty international– এর পরিসংখ্যান মতে পশ্চিমবঙ্গে left extremist কার্যকলাপের অভিযোগে ১৫০০০-২০০০০ মানুষকে জেলে বন্দি করা হয়েছিল। তাছাড়া ৩০০০০ থেকে ৪০০০০ হাজার জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিবৃতি থেকে জানা যায়, তখন পর্যন্ত ১৭৭৮৭ জন নকশালপন্থী জেলে আটক ছিল।[১৯৪] যমুনার মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। সে নিরস্ত্র অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে যায় 'অস্ত্র আমার দরকার নেই। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আমি ওর কাঠামো টুকরো করব। ওর শক্তির উৎস আমি বুঝে নিয়েছি। ওর শক্তির উৎস হত্যা হত্যা হত্যা।'[১৯৫] হিরণের মৃত্যুতে এবং হরিশের উপলব্ধতিতে সে এখান থেকে সরে আসে। অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'অবশ্য এতে শঙ্কিত হবার কিছু নেই, সবই তো অহিংস গান্ধীবাদী পথে।'[১৯৬] সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :

> আমি মনে করি না গান্ধীবাদে তিনি তাঁর মুশকিল আসানের কোনও নিশান পেতে পারতেন। গান্ধীবাদের কঠিন অনুশাসনে তিনি কি স্বাধীন ব্যক্তির যে যন্ত্রণার সপক্ষে বাব বার দাঁড়িয়েছিলেন, তার সমর্থন পেতে পারতেন? আসলে কোনও 'বাদ' তাকে ধরে রাখতে পারেনি। পারার কথাও নয়। সমরেশ বসু মার্কসবাদীও নন, তেমনি গান্ধীবাদীও নন। আসলে জীবনবাদী এবং সে 'বাদ' তাঁরই অর্জিত।[১৯৭]

মানুষ শক্তির উৎস উপন্যাসে সজল, যমুনা, ঋতা সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতি ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করেছে। নাগরিক জীবনের জটিলতা এবং হার্দ্য টানাপোড়েনে তারা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত।[১৯৮] এরা সবাই বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। রমা যমুনাকে মার্কস লেনিনের বই পড়তে দেয়। যমুনা কিছুটা বোঝে কিছু বোঝে না। রমা বলে 'সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চাই, সেই অবস্থা তৈরি করতে সময় লাগবে। তার মধ্যে নির্বাচনের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।[১৯৯]

চারদিকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। রমুর কথাতে বোঝা যায়— 'আজকাল এমন দিনকাল হয়েছে, দিনেই হোক আর রাত্রেই হোক একলা চলতে গিয়ে পাশে অচেনা কেউ এসে দাঁড়ালে কেমন ভয় ভয় করে। [২০০] রমুর কথাতে জানা যায় এখন আর কেউ একা নয়, সবাই দলের সাথে চলে, দলের আদর্শই ব্যক্তির। ব্যক্তির একার আদর্শের কোনো মূল্য নেই। কলেজে দীপু রমু শ্যামল সবাই রাজনীতি করে। তবে বিপ্লব আর শ্যামল যে পার্টি করে দীপু সেই পার্টি করে না। দীপু দেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে। সে বলে কিছু লোক সুখ ভোগ করবে, আরামে থাকবে, আর কোটি কোটি মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে, এটা কখনও মেনে নেওয়া যায়না।[২০১] যমুনা এবং দীপু ভিন্ন ভিন্ন পার্টিকে সমর্থন করে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজনীতির দিক থেকে এই আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল গতি সঞ্চার করে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন কলকাতাতে এসে হয়েছে নকশাল আন্দোলন। সমরেশ বসু তাঁর *মানুষ শক্তির উৎস* উপন্যাসে দেখালেন শহুরে মধ্যবিত্ত যুব সমাজের এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা। সেই সময় হাজার হাজার ছাত্র-যুবক শহুরে আত্মমুখিনতার চোরাবালি ছেড়ে গ্রামে চলো ধ্বনি তুলেছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণি কোনদিকে যাবে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। কমিউনিস্ট শিবিরের বিভাজনের পর মানুষ খুঁজেছে সমাজকে বদলে দেবার পথ। এসময় নকশালবাড়ি আন্দোলনের চালিকা শক্তি সি.পি.আই (এম-এল) কে চলতে হয়েছে গোপন রক্তাক্ত পথ ধরে। লেখক তাঁর *মানুষ শক্তির উৎস* উপন্যাসে সাধারণের জন্য একটি বার্তা প্রেরণ করলেন— অস্ত্র কখনো মানুষের নিয়ন্তা হতে পারে না, সমাজের মূল শক্তির উৎস হচ্ছে মানুষ তাই বিশ্বাস রাখতে হবে মানুষে।

যুগ যুগ জিয়ে

যুগ যুগ জিয়ে তিন খণ্ডে রচিত আত্মজীবনীধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের ঘটনাভূমি ১৯৩৯-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময় দেশীয় রাজনীতির পট-পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্তের অবস্থান উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। আর একটু বিস্তৃতভাবে বললে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জাপা বোমার ত্রাস, দেশীয় পটভূমিতে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট অবস্থান, মুসলিম লীগ, নৌ-বিদ্রোহ, মন্বন্তর, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তিরর পর কমিউনিস্টদের ওপর কংগ্রেসী দমন-পীড়ন, পার্টি বে-আইনীকরণ ও তার আণ্ডারগ্রাউণ্ড অবস্থান, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিরও নীতি বদল এবং পরিস্থিতিজনিত যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তাকেই লেখক নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন।[২০২] লেখক উপন্যাসটি দীর্ঘ সময় ধরে লিখেছেন। *দেশ* পত্রিকায় ১৪ জুলাই ১৯৭৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করেন ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে শেষ হয়। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে ১৯৮১ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ত্রিদিবেশ। এই ত্রিদিবেশ মূলত লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ। লেখকের প্রেম-দাম্পত্যজীবন-রাজনীতি ত্রিদিবেশ চরিত্রে যুগপৎভাবে এসেছে। সমরেশ বসু তাঁর *শ্রীমতি কাফে* যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে *যুগ যুগ জিয়ে* শুরু করেছেন। অর্থাৎ ভজুলাটের যেখানে সমাপ্তি ত্রিদিবেশের সেখানে সূচনা। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে সেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শগত ঐক্য-অনৈক্য দেখেছেন। তবে উপন্যাসে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা।

উপন্যাসে ত্রিদিবেশের জীবনযাত্রা দুটো ধারায় বিভক্ত একদিকে তার ব্যক্তি জীবন অন্যদিকে তার রাজনৈতিক জীবন। ব্যক্তি বৃত্তে শিউলি মধুমতি রায়, জয়াসহ অনেকের অবস্থান রাজনীতির বৃত্তে সবিতাপণ্ডিত-মোহন-ইন্দ্রনাথ-অজয় সহ অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা। রাজনীতির বিবরণে একটি অংশ কমিউনিস্ট বলয়াবৃত্ত অন্যটি কংগ্রেস বলয়াবৃত্ত। এছাড়া সুভাষ বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকসহ অন্যান্য বিষয় সহ সমকালীন রাজনীতির অনেক ঘটনায় এসেছে। উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের স্পষ্ট ব্যাখা দিয়েছেন। আবার এমন কিছু চরিত্রের অবতারনা করেছেন যারা দলমতের উর্ধ্বে। যেমন মধুদি, হিমাংশু ডাক্তার এবং সালমার মতো মানুষেরা। এসকল মধ্যবিত্ত চরিত্রের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত কিংবা নির্বিত্ত মানুষের কথা এসেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ত্রিদিবেশ আঠারো বছরের উচ্ছল বোহেমিয়ান যুবক। প্রথাবদ্ধ পড়াশোনায় অমনোযোগী, সিগারেট খায়, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পরিবারের সাথে থেকেও পরিবার বিচ্ছিন্ন। অকালপক্ক এই যুবককে প্রতিবেশী অনেকেই পছন্দ করে না। যেমন তার প্রেমিকা শিউলির মা মামা,

দাদা কেউই পছন্দ করে না। মাথায় ঝাঁকড়া চুল দেখে অনেকেই বখাটে ভাবে। ত্রিদিবেশের অকালপক্কতার মূলে রয়েছে তার চেয়ে বয়সে বেশি বয়সী বন্ধুদের সাথে মেলামেশা। বাকপটু ত্রিদিবেশকে অনেকেই পরিহাস করে অবনীন্দ্রনাথ ডাকে। শিল্পানুরাগী ত্রিদিবেশ ভালো ছবি আঁকে, এস্রাজ বাজায়, হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করে। ত্রিদিবেশ বোহেমিয়ান হলেও নীতিবিবর্জিত নয় রাস্তায় শিউলিকে বখাটে যুবকেরা বিব্রত করলে সে প্রতিবাদ করে এবং জেলে যায়। শিউলির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুদি এই সাহসের প্রশংসা করে এবং আহত ত্রিদিবেশকে উদ্ধার করে। এই প্রতিবাদী মনোভাব তার রাজনীতি জীবনেও দেখা যায়।

শিউলির সাথে প্রেম থেকে প্রণয় এবং শিউলি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে ত্রিদিবেশ চাকরির সন্ধানে নামে। সবিতাপণ্ডিত তাকে চাকরি খুঁজে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। ত্রিদিবেশের কাছে তখন একটা কাজ পাওয়াটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিদিবেশ লক্ষ করে সে সময় অনেকেই অনেক ধরনের কাজ পাচ্ছে যেমন এ.আর.পি, সিভিক গার্ড, ফায়ার ফাইটিং সারভিস ইত্যাদি। সে খবরের কাগজে দেখে এসব কাজ কারা পাবে তাই নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটিও হয়েছে। অ্যাসেম্বলিতে তখন ফজলুল হক, প্রমথ ব্যানার্জি, হবিবুল্লা, নলিনাক্ষ স্যানাল, কিরণশঙ্কর রায় সক্রিয় সদস্য। এরা এই ভোটাভুটির বাইরে আর কি কাজ করে সে সম্পর্কে ত্রিদিবেশের কোনো ধারণা নেই। এছাড়া সমকালে ঘটে যাওয়া মেদিনীপুরের ঝড়, ভারত ছাড়ো আন্দোলন কিংবা বিদ্যুৎ বাহিনী গঠন তার মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তবে কাজের সন্ধানে সে বন্ধু রশীদের শরণাপন্ন হয়। রশীদের সূত্র ধরেই সে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। রুজভেল্ট টাউন, আমেরিকার যুদ্ধ ঘাঁটি এবং আমেরিকার সৈন্যদের নৃশংসতা। নারীমাংস লোভী এসব সৈন্যদের কাছে বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামের বউ, ঝি-রা অবলীলায় দেহ বিক্রি করে। রশীদের বন্ধু সন্তোষ এই দেহ বিক্রির দালাল। ট্রেনে ফেরার পথে সে চীনা-বাঙালি সংঘর্ষ দেখে। এক আহত রক্তাক্ত চীনাকে ট্রেনের বাথরুমে আশ্রয় নিতে দেখে। এই সংঘর্ষ দেখে অবচেতনায় তার মনে হয় 'বহুকাল সে মানুষের দিকে ঠিকমতো তাকিয়ে দেখেনি।'[২০৩] এরপরই সে লক্ষ্য করে ব্যারাকপুর থেকে ওঠা এক যুবতিকে যার বিসদৃশ্য আটসাট পোশাক যুবা-বৃদ্ধ যাত্রীদের প্রলুব্ধ করে। ত্রিদিবেশের শিউলির কথা মনে পড়ে। তার মনে হয় :

> নীতি শাসন প্রহার, ভদ্দরলোক আর তাদের ছেলেদের, ওদের হাতে কী পুঞ্জীভূত প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা, দলাদলা মাংসের গা খাবলিয়ে লাল জামার টুকরোর পতাকা মুঠোয় তোলে, অথচ ত্রিদিবেশের মনে হয় চলমান ট্রেনের কামরায় এক বেশ্যাকেই জনতা ধর্ষণ করে এবং ওদের ক্রুদ্ধ চোখ যেন রাত্রের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ, তৃপ্তির লালা এবং এখনও শোণা যায়,'একে দিলি, তাকে দিলি'...এবং কখন? যখন রাজনৈতিক মতবিরোধে দুজনের আলোচনা সোচ্চার এবং যে কারণে মতবিরোধের উত্থাপন, সেই নিমিত্তের ভাগী রক্তাক্ত আহত অবস্থায় এখনও বন্ধ বাথরুমে![২০৪]

ট্রেনে ইতিমধ্যে ভারত সাম্রাজ্যবাদ এবং চীয়াং কাই-শেকের প্রসঙ্গ ওঠে রিপন কলেজের অধ্যাপক ধরণি মজুমদার এবং অজ্ঞাতনামা যুবকের কথোপকথনে। এই কথোপকথনে চীনের জেনারেল চিয়্যাং কাই-শেকের ভারত আগমন নিয়ে সে কোনো আকর্ষন অনুভব করেনি। বরং ধরণী মজুমদারের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। চিয়াং কাই-শেক কলকাতায় জনসভায় বলেছেন ভারতবর্ষ আর চীনের মুক্তি না হলে পৃথিবীর মুক্তি সম্ভব নয়। কংগ্রেসের মতবাদের সাথে যা ধাক্কা খায়। তাদের মতে চীয়াং কাই-শেককে ভারতে আনা হয়েছিল যাতে ভারতের নেতাদের বুঝিয়ে অ্যান্টি অ্যাক্সিস লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করানো যায়। স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতত বন্ধ থাকবে। তারা মনে করে 'ওয়ার' না হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কাইশেককে ভারতে আনতেন না। কিন্তু কমিউনিস্টরা এই মনোভাবের বিরোধী । কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী নামহীন যুবকের সূত্র ধরে লেখক জানান এটি অ্যান্টি অ্যাক্সিস যুদ্ধ নয় অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট। সে আরো জানায় কাই-শেক স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করতে বলেনি বরং বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় বিবেচনা করতে বলেছেন। ধরণি মজুমদার জানায় চীয়াং কাই-শেক ব্যর্থ তিনি ভারত নেতাদের মত করাতে পারেননি। আবার স্টুডেন্ট ফেডারেশনের ডাককে রিগ্রেট করেছিল। অজ্ঞাত যুবক এর প্রত্যুতরে জানায় 'জানি বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতাই আপনার কাছে সব থেকে বড় ব্যাপার। জনসাধারণের কাছে তা না। ফেব্রুয়ারির কথা মনে করে দেখুন, চিয়াং কাই-শেক যখন কলকাতায় এসেছিলেন, মানুষের মধ্যে কীরকম উদ্দীপনা এসেছিল।'[২০৫] কিন্তু ধরণি মজুমদারের বক্তব্য জনগণের মধ্যে সেরকম কেনো উদ্দীপনা দেখা যায়নি। তবে এক শ্রেণির লোকের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধরণি মজুমদার এই ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে তাদের সাথে হাত মেলানো সাথী কমরেডদের বুঝিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি জানান তিনি কংগ্রেস থেকে অব্যাহতি নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন। অজ্ঞাত যুবকের কাছে এটি দেশদ্রোহিতার সামিল। কেননা সুভাষ বসু ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনতে গিয়েছেন। ধরণি মজুমদার মনে করে এ বিষয়ে সময় কথা বলবে। ধরণি মজুমদারের দলত্যাগ ত্রিদিবেশকে অবাক করেনি তবে তার যুবকের কথা বেশি ভালো লাগে কারণ এরই মধ্যে সে সবিতা পণ্ডিতের কাছে দীক্ষা নিয়েছে।

ত্রিদিবেশ সমরেশ বসুর অন্যান্য নায়কের মতোই নিঃসঙ্গ। মা, মামা, দাদা সবার সাথে তার সম্পর্ক অনাত্মীয়ের মতো। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য 'যদিচ, একথা ঠিক, ঘর সংসার এবং সেখানকার মানুষদের সঙ্গে, ওর মনের চিন্তা ভাবনার কোনও মিল কখনও খুঁজে পায়নি।[২০৬] অন্যদিকে শিউলি তার বাঁচার

প্রেরণা। শিউলির সাথে নিশ্চিন্ত দাম্পত্যের আশায় সে চাকরি খোঁজে। শিউলির ভালোবাসার মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা ত্রিদিবেশের চোখের সামনে তুলে ধরে মধ্যবিত্ত মেয়েদের ভালোবাসার দুর্বলতা।[২০৭]

ত্রিদিবেশ রাজনীতি বিষয়ে সচেতন। ত্রিদিবেশ রাজনীতিতে সবিতা পণ্ডিতের মত ও পথকে বিশ্বাস করে। তবে রাজনীতি নিয়ে বকুলতলা ক্লাবের ঝড় এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের প্রতি সে আস্থা পায়নি। তাদেরকে দূর দেশের মানুষ মনে হয়েছে।

ত্রিদিবেশের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপুর্ণ। ধুকড়ি বাগানের স্বৈরিণীদের টমিরা বীভৎসভাবে ধর্ষণ করে যা তার মনে দাগ কাটে পরবর্তী সময়ে এই বীভৎস দৃশ্য নিয়ে ছবি আঁকে। যে ছবি কমিউনিস্ট নেতা নিত্যানন্দ এবং শিউলির কাছে অশ্লীল বলে পরিগণিত হয়। কাজের সন্ধানে কলকাতায় গিয়ে রুজভেল্ট টাউনের নগ্নতা প্রত্যক্ষ করে তবে এই নগ্নতার চেয়ে বিভীষিকাময় তার ধুকড়িবাগানের অভিজ্ঞতা। যেখানে পশুর মত দল বেঁধে নগ্ন মেয়েরা আড্ডা দেয়, প্রাত্যহিকতা সম্পন্ন করে, আবার পেশাও টিকিয়ে রাখে। এই অভিজ্ঞতার কথা সে শিউলিকে কখনো বলতে পারেনি। যেমন বলতে পারেনি মধুমতির সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা।

শিউলিকে নিয়ে ত্রিদিবেশ সংসার করলেও শিউলিকে ভালোবাসে কি না এই প্রশ্নে তার মধ্যবিত্ত মন দোলায়মান। তার স্বগতোক্তিতে জানা যায় ‘আমি চাই বা না চাই, জানতাম ভিক্ষে করে খেলেও ফুলিকে আমার নিয়ে আসতে হবে। এমনকি ফুলিকে আমি ভালবাসি কি না তাও বুঝতে পারতাম না। এখনও যে পারি তাও না।[২০৮] শিউলির চিন্তায় আচ্ছন্ন থেকেও সে ধুকড়ি বাগানের নগ্নতা থেকে বের হতে পারেনি, মধুমতি রায়ের সান্নিধ্যে মুগ্ধ হয়, মধুমতি রায়ের সাথে ঘনিষ্ট হওয়ার সংবাদ শিউলি জানতে পেরে শিউলির কাছ থেকে প্রত্যাখাত হয়ে ধাঙড় পল্লির গুহাঘরে আশ্রয় নেয়। এই গুহা ঘরে ধাঙড় নারীর শরীরী আবেদনে সাড়া দেয়। সংবেশনে ত্রিদিবেশ এক নারীতে কখনোই তৃপ্ত হতে পারে নি যখন যে নারী তার কাছে এসেছে তাকেই সে গ্রহণ করেছে। শিল্পের তাড়নায় ত্রিদিবেশ ইন্দ্রনাথের বিদূষী বোন জয়ার সাথে ঘনিষ্ট হয়। ত্রিদিবেশের কাছে জয়াকে মনে হয় মধুদির পরিপূরক। জয়ার প্রবাহিনী শক্তিতে সে ভেসে যায় কিন্তু এই সম্পর্কের যৌক্তিক পরিণতি খুঁজে পায় না। শিউলি তার অভিভাবকের মতো তাকে শক্ত করে বেধেঁছে, মধুদি তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে আর জয়া তাকে শিল্পের বিচরণ ভূমিতে মুক্ত করে দিয়েছে।

ত্রিদিবেশের চোখে লেখক দেখিয়েছেন বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা। সে মধ্যরাতের কলকাতায় দেখেছে মেয়েদের ভিড় যারা যুদ্ধের অভিঘাতে দু মুঠো অন্নের জন্য মেয়েরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। বউয়ের বেশ্যাবৃত্তি স্বামীরা স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে।

ত্রিদিবেশ ব্যক্তি সমরেশের প্রক্ষেপ। তবে ত্রিদিবেশ অন্য মার্কসবাদীদের মতো ধর্ম এবং ঈশ্বর নিয়ে অনস্তিত্ববাদী নয়। মৃত্যু এবং পুনর্জীবন নিয়ে একেবারে অবিশ্বাসী নয়। সবিতাপণ্ডিত এবং মোহনের কাছে যে বিশ্বাস বোকা লোকের কাজ ত্রিদিবেশের কাছে সেটিই বিশ্বাস।

ত্রিদিবেশ স্রষ্টা সমরেশের প্রত্যক্ষ ছায়া পাওয়া যায় ত্রিদিবেশ চরিত্রে। ৪৬'-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিদিবেশ। ত্রিদিবেশের কাছে সমস্ত ঘটনায় সাজানো মনে হয়। সিমলায় নেতাদের ব্যর্থ সম্মেলনের তিন সপ্তাহ পরে হিরোশিমায় এবং নয় আগস্ট নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণে ত্রিদিবেশ হতবাক হয়ে গিয়েছিল, মানবতার লাঞ্ছনায় সে ব্যথিত হয়েছিল কিন্তু ফ্যাসিস্ট সহযোগী জাপানের পতনে আনন্দিত হয়েছিল। ত্রিদিবেশ প্রত্যক্ষ করেছিল নৌবিদ্রোহীরা কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই-এর মধ্যস্ততায় আত্মসমর্পণ করেছে।[২০৯] এর পরের মাসে মার্চের চব্বিশ তারিখে ক্যাবিনেট মিশন এবং তার চার মাস পরে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। এই দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সে প্রগতিশীল বামপন্থী কমিউনিস্ট প্রকাশনার ডিরেক্টরদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে। দাঙ্গার মধ্যে তাকে একা ফেলে সবাই পালিয়ে যায়। ত্রিদিবেশ দাঙ্গায় মানবতার অপমান মেনে নিতে পারেনি। এই দাঙ্গায় সে একদিকে মানবতার অপমান দেখে অন্যদিকে ডাক্তার হিমাংশু, সালমার মত মানুষের সেবাদান প্রত্যক্ষ করে। মধুদির বাসায় দাঙ্গায় আহত মানুষের সেবা দেওয়া হয়। সে দেখে দাঙ্গায় মুসলমান কমরেডরা হিন্দুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেয় আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দাঙ্গায় ত্রিদিবেশ শান্তিবাহিনীর সাথে শহর থেকে শহরতলীতে ঘুরে বেড়ায় আর লক্ষ করে এ বিপর্যয় প্রকৃতি সৃষ্ট নয় মনুষ্য সৃষ্ট। কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষমতা, জেদ আর ক্রোধ সংক্রমিত হয়ে শত শত সাধারণ মানুষের মধ্যে। দাঙ্গায় তার কাছে পার্টির ভূমিকা দুর্বল মনে হয়। শত্রুদের দূর্গে আক্রমণ করার ক্ষমতা পার্টির নেই।

দাঙ্গার সময় সে আরো একবার মধুমতি রায়ের মুখোমুখি হয়। মধুদির কাছে সে ডরোথি এবং মঙলির সাথে ঘনিষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করে। জাপা বোমার ত্রাসের রাতে মধুদির সাথে ঘটে যওয়া ঘটনা নিয়ে তার মধ্যে কোনো পাপবোধ নেই। মধুমতি ত্রিদিবেশের ভেতরের শক্তিকে অনুধাবন করে বলে 'জীবনটা অনেক বড়–শিল্পের থেকেও। জীবনই যেন তোমার শিল্পের কাজে লাগে।[২১০]

ব্যক্তি সমরেশ বসু এবং উপন্যাসের ত্রিদিবেশ দুজনেই গান্ধীকে দেখেছেন অহিংসার প্রতিভূ হিসেবে। উপন্যাসে ত্রিদিবেশ গান্ধীর শক্তিকে স্বীকার করেছে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর পি. সি. যোশীর অনেকেই সমালোচনা করে। বিশেষত গান্ধীর সাথে যোশীর পত্রালাপ এবং গান্ধীকে ফাদার অব দ্য নেশন আখ্যা দেওয়ায়। বি টি রণদিভে সরাসরি যোশীর নেতৃত্বের দোষ দেয়। যোশীর গান্ধীকে ফাদার

অব দ্য নেশন আখ্যা দেওয়ায় ত্রিদিবেশ গান্ধীর আটফুট লম্বা একটা ছবি আঁকে। ছবির নীচে লেখে দরিদ্রনারায়ণোঁ শ্রীচরণ।[২১১] শিল্পী ত্রিদিবেশ তার শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বারবারই দারিদ্রের শিকার হয়েছে। এ কারণেই গান্ধীর ছবির নিচে সে নির্দ্বিধায় লিখতে পেরেছে 'দরিদ্রনারায়ণোঁ শ্রীচরণ'। পার্টি নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরী এর ব্যাখ্যা চায় এবং একে ভাববাদী ভাবনা বলে আখ্যা দেয়। তারপরও ত্রিদিবেশের শিল্পী সত্তা থেমে থাকেনি।

এরপরই কমিটার্নের বদলে পার্টি কমিনফর্ম এসেছিল। যোশীর সেটাই বুঝতে সময় লেগেছিল।[২১২] ত্রিদিবেশের যোশীর প্রতি বরাবরই দুর্বলতা ছিল। পার্টি বে আইনী ঘোষিত হওয়ার পর নির্দেশ এসেছিল মধ্যবিত্তদের সরিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করে পার্টির নেতৃত্ব দিতে হবে। ত্রিদিবেশ চটকল ফ্রন্টে যোগ্য শ্রমিক কমরেড খুঁজে পায়নি। পরবর্তীতে লছমনের মত সুদখোর কিন্তু লড়াকু লিডারকে পার্টির নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। পার্টির নির্দেশে হরতাল করার যৌক্তিকতা শ্রমিকরা খুঁজে পায়নি। ত্রিদিবেশের বারবারই মনে হয়েছে পার্টি ক্রমেই টেররিস্ট আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে। ত্রিদিবেশ চটকলের নকশাঘরে ড্রাফটম্যানের কাজ পায়। কমিউনিস্ট পার্টি আণ্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলে পার্টির নির্দেশে ত্রিদিবেশ হাতে বোমা তুলে নেয় কিন্তু যুক্তিবাদী ত্রিদিবেশ বোমা মারার লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পায়নি।

বাড়ি ফিরে ত্রিদিবেশ পার্টির নির্দেশে পুলিশের সাথে দাঙ্গাবিরোধী অভিযানে নামে। স্বাধীনচেতা ত্রিদিবেশ বারংবার পুলিশের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার বিরোধীতা করে। ত্রিদিবেশ লক্ষ করে শ্রমিকরা তাদের হাতে লাঠি তুলে দেয় পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নয় পুলিশের ভয়ে।

স্বাধীনতা-দেশভাগ-গান্ধীহত্যা ইত্যাদি ঘটনায় পার্টি অভ্যন্তরে অনেক পরিবর্তন আসে। ত্রিদিবেশ ক্রমেই পার্টির অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। পার্টির কাজের সমালোচনা শাস্তি সম্পর্কে জেনেও ত্রিদিবেশের প্রতিবাদী কণ্ঠ থেমে থাকেনি। ১৯৪৯ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। ব্যাপক ধড়পাকড় চলে।[২১৩] পার্টি সদস্যদের কূটকৌশলে ত্রিদিবেশ জেলে যায়। জেলেও তার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। ত্রিদিবেশ মুক্তবুদ্ধির ধারক। মার্কসবাদী তত্ত্বে এবং প্রয়োগে নির্মোহ এবং সুবিধাবাদ বর্জিত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রত্যাশা করেছে। যা সেই সময়ের একজন সৃজনশীল মেধাবী মানুষের ধর্ম।

উপন্যাসে অনীল একটি প্রতিবাদী চরিত্র। পার্টি নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিতন্ত্রের দ্বন্দ্বের শিকার হয়। অনীল ত্রিদিবেশের মতোই অ্যাকশন কমিটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অহীনের পূর্ণ নেতৃত্ব মেনে নেয়

না। তার কাছে মনে হয় পার্টির ডিসিপ্লিন মানলে অ্যাকশন কমিটির প্রয়োজন হয় না। অ্যাকশন কমিটি একটি সহায়ক দল হিসেবে কাজ করতে পারে। পার্টি তার সমালোচনা এবং যুক্তি মেনে নেয় না। পার্টি তাকে শাস্তি দেয়। ত্রিদিবেশ তাকে বাঁচাতে লুকিয়ে রাখে।

ইন্দ্রনাথও প্রতিবাদী চরিত্র। পার্টি নীতি এবং অভ্যন্তরিন দ্বন্দ্বে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে সে দেশ-সমাজ-পার্টির কাছে বিশ্বাসী থাকতে চায়। ত্রিদিবেশের মনে হয় ইন্দ্রনাথের আত্মহত্যা এই বিশ্বস্ততার নমুনা।

অহীন মুখার্জি মধ্যবিত্ত পরিবারের বখে যাওয়া সন্তান। জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের প্রত্যাশায় স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। শরীরচর্চায় পারদর্শী কমিউনিস্ট পার্টি একনিষ্ঠ সমর্থক। ব্রহ্মচারী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট প্রকাশ মল্লিক তার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা অন্বেষণ করে। অহীন পার্টি অভ্যন্তরে ইন্দ্রনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে কিন্তু কখনোই ইন্দ্রনাথের মতো হতে পারে না। শিউলিকে ত্রিদিবেশের বিরুদ্ধে যেতে প্ররোচিত করে এবং কৌশলে ত্রিদিবেশকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়।

উপন্যাসে সবচেয়ে ব্যতিক্রম চরিত্র সবিতাপণ্ডিত যার সাথে সমরেশের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু সত্যমাস্টারের প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্সিতে কলেজে পড়ত কিন্তু ট্রেনে নিয়মিত যাতায়াতে অস্বস্তি এবং পড়ালেখায় আত্মিক টান অনুভব না করায় ইস্তফা দেয়। বি এ পাশ করে কলকাতায় বিলেতি কোম্পানিতে চাকরি করে। ত্রিদিবেশের বন্ধু চন্দ্রনাথের পরিবারের গৃহশিক্ষক। চন্দ্রনাথই সবিতাব্রত স্থলে পণ্ডিত সংযোজন করে। চন্দ্রনাথের কারণে সবাই সবিতাপণ্ডিতের আসল নাম ভুলে যায়। সবিতাপণ্ডিতের কাছে সন্টু, মোহন মার্কসবাদের দীক্ষা নেয়। তারা সেভিয়েট, রাশিয়া, স্ট্যালিন বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। মাসতুতো দাদা নিশিকান্তের কাছে কমিউনিস্টে দীক্ষিত হয়। নিশিকান্ত বকুলতলায় এসে বলেছিল কমিউনিস্ট প্র্যাকটিক্যাল পার্টি আর কংগ্রেস আদ্যন্ত বুর্জোয়া পার্টি 'জনযুদ্ধই স্বীকৃত নীতি।'[২১৪]১৯৩৯ সালে যখন কংগ্রেসের ছোটবড় সব নেতা জেলে তখন কমিউনিস্টরা ফাঁকা ময়দানে তলোয়ার চালায়। মোহনের সাথে সবিতা পণ্ডিতের এই সময় মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। সবিতাপণ্ডিতের রেস খেলা এবং অ্যান্টি কমিউনিস্ট ননী ঘোষের সাথে বন্ধুত্ব মোহন মেতে নিতে পারে না। নিশিকান্ত মনে করে সবিতাপণ্ডিতের জনযুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলার মূলে রয়েছে কমিউনিস্ট বিশ্বাসে গলদ। সবিতাপণ্ডিতের নিজের অবস্থান নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়। নিশিকান্তর বাড়িতে জাপা বোমার আতঙ্কে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে অন্ধকারে তার সামনে দয়াল মিশিরের রক্তাভ মুখ ভেসে ওঠে। গভীর অন্ধকারে তার মনে প্রশ্ন জাগে 'পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধ ঠিক। কিন্তু মাতৃভূমি? ভ্যাসিলিয়েটিং-আমি ...আমার শ্রেণি চরিত্র,

পদাঘাত আমার মুখ।[২১৫] সাধারণ মানুষ মনে করে জাপান ভারতবর্ষ দখল করবে। সুভাষবসু তাদের সঙ্গে স্বাধীনতার সনদ নিয়ে আসবে।

সবিতাপণ্ডিত মানবতাবাদী। ত্রিদিবেশকে কারখানায় ছবি আঁকার কাজ দেয়। বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিককে উজ্জিবিত করার চেষ্টা করে। সে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করে সরকার ইচ্ছা করলেই শ্রমিকদের পেটে লাথি মেরে কোম্পানিওয়ালাদের নিয়ে কারখানা চালাতে পারবে না। আবার বোঝানোর চেষ্টা করে ভারত কেন ব্রিটিশ সরকারের হয়ে লড়ছে। পিতৃভূমি রাশিয়াকে জাপান জার্মান কেন ধ্বংস করতে চাইছে। রেলওয়ে মজুরদের, বন্দুকের কারখানার মজুরদের রেশন দেওয়া হচ্ছে অতএব চটকলের শ্রমিকরা সম্পূর্ণ রেশন দিতে হবে। অথচ সাধারণ মজুররা এসবের বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। তারা সভায় বক্তৃতা শুনতে আসে সহযাত্রী শ্রমিকের অনুরোধে অথবা যেসব শ্রমিকদের শ্রদ্ধা করে তাদের নির্দেশে। সভার চেয়ে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে বায়স্কোপের বাজনাওয়ালার দিকে। সমরেশ বসু রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের ফাঁকি দেখিয়েছে। *ত্রিধারা* উপন্যাসে রাজেন যেমন শ্রমিকদের সাথে থেকেও তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেনি, সবিতাপণ্ডিতও তেমনি তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। সবিতাপণ্ডিত শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করে চটকলে হরতালের ডাক দিতে চায়।

উপন্যাসে আরো দেখানো হয়েছে মুসলিম লীগের সাথে কমিউনিস্টের দৃশ্যত কোন বিরোধ নেই কিন্তু লাল ঝাণ্ডার পতাকাতলে গণজমায়েত শরাফত মণ্ডলের মত মুসলিম লীগ নেতা মেনে নিতে পারেনি। মুসলিম লীগের প্রসারের জন্য তাকে প্রতিহত করতে চায়।

শিউলি নিরপেক্ষ চরিত্র। ত্রিদিবেশের সাথে প্রেম-প্রণয় এবং অন্তঃসত্তা অবস্থা প্রকাশের আশঙ্কায় নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। শিউলি তার মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা থেকে মধুদিকে ঈর্ষা করে। রাজনীতি কিংবা পৃথিবীর কোন প্রান্তে যুদ্ধের দামামা বাজছে এ বিষয়ে তার কোন মাথাব্যাথা নেই। ত্রিদিবেশের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল প্রগাঢ় সে কারণেই সর্বদা হারায় হারায় শঙ্কা তাকে পেয়ে বসত। বোহেমিয়ান ত্রিদিবেশের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ত। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মধুমতি রায় কিংবা জয়া কাউকে মেনে নিতে পারেনি। এই শিউলিই ইন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় কমিউনিস্টে যোগ দেয়। অহীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ত্রিদিবেশকে ভুল বোঝে। ত্রিদিবেশ জেলে গেলে দুই সন্তান নিয়ে সংগ্রাম করেছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে ত্রিদিবেশের কাছে ফিরে এসেছে।

নিশিকান্ত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ গুপ্তের একমাত্র পুত্র। নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কংগ্রেস সমর্থক কিন্তু পুত্রের কমিউনিস্ট সমর্থন নিয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা

তৈরি করে না। নিশিকান্ত অন্যান্য কমিউনিস্টদের মত মনে করে পুলিশ কমিউনিস্টদের প্রতি নেতিবাচব মনোভাব পোষণ করে। তাদেরকে জনযুদ্ধওয়ালা বলে পরিহাস করে। আগস্ট আন্দোলনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তার বক্তব্য 'যে পুলিশ আগস্টের দাঙ্গাবাজদের পেটাচ্ছে, তার বাড়িতেই লক্ষীল পটের পেছনে গান্ধীর ছবি লুকানো আছে।[২১৬] কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা জানে শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স-এর কোনও খোঁজ রাখে না। তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের বিপ্লবীদের শত্রু ভাবেন 'ওরা সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে লড়ছে। রিয়্যাল সোশ্যালিস্ট হলে ওরা আমাদের পিপলস্ ওয়ারের লাইন মেনে নিত।[২১৭] নিশিকান্তের কাছে মনে হয় কমিউনিস্টরা একমাত্র অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্যাসিস্টরা সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ছেড়ে কথা বলে না। বললে তারা ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স আক্রমণ করত না।...দুশো বছর আমরা পরাধীন আছি, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না? প্রত্যেকটা দেশ যেখানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে সেভিয়েট রাশিয়া, সেখানে এখন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমরা আর্ন্তজাতিকতাবাদী।[২১৮] সুভাষ বসু আর্ন্তজাতিকতাবাদী কিন্তু নিশিকান্ত মনে করে সুভাস বসু ফ্যাসিস্টদের দালাল। 'দেশ স্বাধীন করবার জন্য সে হাত মিলিয়েছে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে, আর আমরা লড়ছি আন্ডার দ্যা লিডারশিপ অব কমরেড স্ট্যালিন [২১৯] কমিউনিস্টদের লড়তে হবে কংগ্রেসর বিরুদ্ধে, সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে এমন কি ভ্যাসিলিয়েটিং পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে।

মোহন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। রাজনীতি তার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে রাশিয়া তার পিতৃভূমি। ফ্যাসিস্ট জার্মান রাশিয়া আক্রমণ করেছে তাই আগে ফ্যাসিস্টদের নিধন করতে হবে পরে সাম্রাজ্যবাদের নিধন। তার দাদা রমণ এই মতের বিরোধিতা করে। তার কাছে ভারতবর্ষ আগে তাই সে বিদেশের দেবতার চেয়ে স্বদেশের কুকুরকে পুজা দিতে আগ্রহী। সে স্ট্যালিনের ঊনচল্লিশ সালে হিটলারের সাথে অনাক্রমণ চুক্তির সমালোচনা করে, দেশের কমিউনিস্টদের রাশিয়ার জান বাঁচাতে ইংরেজের সাথে হাত মেলানোরও সমালোচনা করে। কংগ্রেস আগে ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছে তারপর মর্যাদার সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে[২২০] অংশগ্রহণ করতে চেয়েছে। তাই সে কংগ্রেসের প্রশংসা করে। মোহনের কাছে এসব সংর্কীণ জাতীয়তাবাদ। মোহনের কাছে কংগ্রেস বুর্জোয়া পার্টি। রাজনীতির আলাপ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তিক্ততা আছে কিন্তু তা কখনোই ব্যাক্তিগত সম্পর্কের তিক্ততায় রূপ নেয় না। লেখক দেখিয়েছেন একই পরিবারের একাধিক সদস্য একাধিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও তারা সহবস্থানে থাকতে পারে।

দয়াল মিশিরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় সবিতাপণ্ডিত দয়াল মিশিরের চোখে মুখে সরকারের প্রতি ঘৃণা দেখেছিল। সেই দয়াল জেল থেকে বের হয়ে বিপিন, শীতল, রমণের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে সবিতা পণ্ডিতের ওপর আক্রমণ করে। রমণ সবিতাপণ্ডিতদের বিদেশের অনুচর আখ্যা দেয়।

উপন্যাসে আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র রশীদের বন্ধু সন্তোষ। মধ্যবিত্তের আদর্শগত অসঙ্গতি ধরা পড়ে তার চরিত্রে। রুজভেল্ট টাউনের আমেরিকান সৈন্যদের মদ, মেয়ের যোগানদাতাহয়ে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয় এবং নিজের শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তন করে। পরবর্তীতে বিলাসী জীবনযাপন করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে সে কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেআর কংগ্রেসের কট্টর সমর্থক সে।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত রশীদ চরিত্রটি। সে পাকিস্তানের কট্টর সমর্থক। চীয়াং কাই-শেকের সমালোচনা করে কারণ চীয়াং কাই-শেক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে দেখা করেনি। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গার মধ্যেও তার একটাই প্রত্যাশা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। দেশভাগের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সে পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের কর্মকর্তা হয়।

বাঙালি মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল ভদ্র পরিবার বকুলতলার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। তাদের আছে সম্মান ও ঐতিহ্য।[২২১] এই পরিবারে বধূ হয়ে আসে মালতি। বয়ঃসন্ধিকালে জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে অন্য পাড়ায় দুর্গা প্রতিমা দেখে ফেরার পথে অপহৃত এবং ধর্ষিত হয়েছিল। ধর্ষণকারীরা তার নামে সমাজে কুৎসা রটায়। বাধ্য হয়ে তার বাবা নিশ্চিত খাওয়া পরা এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দীপেন্দ্রনাথের পাগল ভাই মৃগেন্দ্রনাথের সাথে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর মালতি জানতে পারে মৃগেন্দ্রনাথ পাগল। মালতি সাহসী চরিত্র। নারীত্বের টানে স্বাভাবিকভাবে ভাশুরপুত্র চন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। চন্দ্রনাথের ভালোবাসায় স্নাত হয়ে নবজন্ম লাভ করে। চন্দ্রনাথের ভালোবাসা তাকে সাহসী করে তোলে :

> তুমি তো আমার সব জানো। একদিন তোমাদের বাড়ি আসার আগে আমি মরতে চেয়েছিলাম, পারিনি। আজ যখন তোমাদো বকুলতলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার ভেতরে যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আমার মনে পড়ে গেল, একদিন আমি কৃষ্ণনগরের বাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, আর সেখানে কোনওদিন ফিরে যায়নি, ফিরে যাবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। যেখান থেকে একবার বেরিয়ে এসেছি, সেখান থেকে চিরদিনের জন্যই এসেছি, আর আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই না, যাব না।[২২২]

মালতীর এই সাহসী উচ্চারণে চন্দ্রনাথ ভীত হয়। কেননা সে অনেকটাই আত্মসুখপরায়ণ মধ্যবিত্ত চরিত্র। অসম সম্পর্কের এই প্রেম তার মধ্যে পাপবোধের জন্ম দেয়। মনুষত্ব এবং বিবেকের লড়াইয়ে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ হয়। কিন্তু মালতী দ্বিধামুক্ত। চন্দ্রনাথের নির্দেশে সে পাগল স্বামীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে। তবে নারীত্বের অপমান মেনে নিতে পারেনি। ভাশুরপুত্র চন্দ্রনাথ চিরকালই তার কাছে পুরুষের প্রতিমূর্তি ধর্ম বা

সম্পর্কের সংস্কার সেখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে বিকারগ্রস্ত স্বামীর অঙ্কশায়িনী হয়েই বিদ্রোহ করেছে। চন্দ্রনাথকে বলেছে 'জানি তুমি আমার বিয়ের আগের জীবনের কথা জেনেও দয়া করে ভালোবেসেছিলে, আবার পাগলের কাছে শুতে পাঠিয়েছিলে।...আমি যদি তোমার বিয়ে করা বউ হতাম তা হলে তুমি অন্যের ঘরে আমাকে শুতে পাঠাতে।[২২৩] চন্দ্রনাথের দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। ভীরু চন্দ্রনাথ কখনোই তার মনের খবর পায়নি। কৈশোরের ধর্ষণকারী এবং চন্দ্রনাথের মধ্যে সে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায়না। চন্দ্রনাথকে নির্দ্বিধায় বলে 'তুমি শিক্ষিত শঠ, প্রবঞ্চক, তুমি আমাকে ভালবাসা দিয়েছিলে কেন? পাগলা খুড়ো আর ভাইপো, দুজনে মিলে আমাকে ভোগ করবে বলে।[২২৪] এরপর মালতী নিজেই নিজের মুক্তি খুঁজে নেয়। মালতী মৃগেন্দ্রনাথকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে।

চন্দ্রনাথও মালতির আহবানে সাড়া দিয়ে অবচেতনে পাপবোধে আক্রান্ত হয়। মৃগেন্দ্রনাথ ক্রোধনমত্ত হয়ে মালতীকে হত্যা করতে চাইলে তার বোধের বিস্মরণ ঘটে। কতগুলো ছিন্নভাবনা মস্তিস্কের সীমায় স্পর্শ করে আবার মিলিয়ে যায় 'পিতার কনিষ্টতম সহোদর-ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।...আমার বউ, আমার বউ। কুত্তার বাচ্চা।...তুই আমার বউকে নিয়েছিস।![২২৫] মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথের জীবন এক জিজ্ঞাসাহীন অতলান্ত খাদে পড়ে। যেখান থেকে সে মুক্তি পায় না। মালতীর নারীত্বের কাছে সে বারবারই হেরে যায়, মালতীর প্রতি আবিষ্টতা থেকে সে কখনোই মুক্ত হতে পারেনি। তারপরও চরিত্রটি নিঃসঙ্গ। গ্রামে গ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতা এবং পাপকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

রাজনীতি নিয়ে মধ্যবিত্ত মননের দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্রনাথ চরিত্রে। নিরপেক্ষভাবে সে রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের আদর্শগত অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করে। সুভাষ বসু অ্যাক্সিসদের সাথে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা আনতে পারবে কি না সে বিষয়ে চন্দ্রনাথ সন্দিহান। তবে সুভাষ বসু যদি ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারে চন্দ্রনাথ তাতে খুশি। এমনকি কমিউনিস্টদের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা এলেও সে খুশি। মানুষের জীবনকে রাজনীতি কি কখনো পরিচালিত করতে পারে?[২২৬] এই একটি প্রশ্ন তাকে প্রতি মুহূর্তে বিদ্ধ করে। দেশের রাজনীতির নানামুখী গতির নীরব দর্শক। জাপান বোমার আক্রমণে তার পুরো পরিবার রামচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করে। এই রামচন্দ্রের কাছে চন্দ্রনাথ প্রথম মন্বন্তরে মৃত্যুর কথা শোণে। দুলালের বউ না খেতে পেয়ে বিষলতাপাতা খেয়ে রামচন্দ্রের চালের গুদামের পাশে মরে পড়েছিল। শেয়াল কুকুরে তার লাশ ছিঁড়ে খায়। চন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করে তার নাকে লাশের গন্ধ নয় মজুতকৃত চালের গন্ধ আসে। যা তাকে পরিহাস করে। চন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে জানায় সে গান্ধীবাদী নয় তবে গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে। যা ব্যক্তি সমরেশ বসু করতেন। চন্দ্রনাথের পরিবার সুবিধাবাদী, আত্মকেন্দ্রিক। ক্লাইভ স্ট্রিট নাটকের

নেপথ্য অংশীদার। তার পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের অভিমত 'মানুষ মরছে, মরবে, কিন্তু কী করা যাবে? এখন এটা দু-একজনের ভাগ্যেও ব্যাপার না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যাপার। একে বলে মন্বন্তর, কিছু করার নেই, নিজেদের রক্ষা করতে হবে।[২২৭]

রাজনীতির দোলাচলতার মতো তার ব্যক্তিগত জীবনও দোলায়মান। ছোটকাকী মালতীর সাথে তার প্রণয় এবং ঔরসজাত সন্তান চাদকে নিয়ে সব সময় বিবেকের তাড়নায় দগ্ধ হয়।

সমাজ অনুমোদিত প্রেমের কারণে চন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। সমাজ সম্মুখে কখনোই মালতিকে নিজের করে পায়নি কিংবা পাবেও না। তাই মধ্যবিত্ত মানুষের ঘর বাধাঁর স্বপ্ন তাকে তাড়িত করে না। ভেতরে কখনো কর্মবোধের স্পৃহা অনুভব করে না। তাই যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের সময় তার দাদারা যখন ব্যবসা করে স্ফিতকায় সম্পদের অংশীদার হয় তখন সে অনেকটাই নীরব দর্শক। মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তাকে লালায়িত করে না। এর মূলে আছে পাপবোধ। এই বোধ থেকে মালতীর প্রতি নির্দয় হয়। মালতীকে বাধ্য করে পাগল স্বামীর সান্নিধ্যে যেতে। মৃগেন্দ্রনাথ অধিক বিকারগ্রস্ত হলে মালতীসহ তাকে অন্য স্থানে রাখার প্রস্তাব করে। তবে আপাত ভাবে মালতীর প্রতি যতই নির্দয় হোক সময়ের ব্যবধানে মালতীকে আরো গভীরভাবে পেতে চেয়েছে। 'তার অনুভূতির তীব্রতার মধ্যে এক গভীর নিঃশব্দ আর্তনাদ বাজে, 'হারাতে চাই না, হারাতে চাই না...[২২৮] আদতেই চন্দ্রনাথ ভীরু কাপুরুষ। মধ্যবিত্ত মননের সংকোচবোধ থেকে কখনোই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি।

আরো একটি মধ্যবিত্ত চরিত্র দীপেন্দ্রনাথ। রাজনীতি নিয়ে নিজস্ব কোনো মতবাদ বা বিশ্বাস নেই। পরিবারের ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিবারের স্বার্থটাই তার কাছে মুখ্য বিষয়। যুদ্ধ নিয়ে তার পরিবারের মন্তব্য 'যাদের যুদ্ধ তারা করুক, আমরা আমাদের কাজ করে যাব্ [২২৯]মেদিনীপুরের ঝড়ে ফসল হনিতে এই গৃহস্থ মানুষটি চিন্তিত হয়। তার আবস্থসম্পন্ন পরিবার লিগ মিনিস্ট্রির কাছে কিছু আশা করে না। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের অনাহারি কর্মহীন মানুষের দীপেন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত। বোমার আতঙ্কে পরিবারকে ধলতিতাতে পাঠিয়ে দেয়।

কোদন চন্দ্রনাথের ছোট ভাই। যুদ্ধের সময় তার জ্যাঠামশাই-এর প্রচেষ্টায় সামরিক বিভাগের কন্ট্রাক্টরের কাজ পায়। চন্দ্রনাথের পরিবারটি ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। যুদ্ধের সময় পরিবারটি ব্যাবসায়ী পরিবার হয়ে যায়। এই পরিবারটিকে কোনোভাবেই দেশপ্রেমিক আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে ইংরেজ বিদ্বেষ, স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা, কংগ্রেসের এবং নানাবিধ বিপ্লবী আন্দোলন পরিবারটির মধ্যে

আবেগ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের অভিঘাতে সৃষ্ট বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়ে পরিবারটি অভূতপূর্ব অর্থোপার্জন করে।

মধুমতি রায় পেশাজীবী মধ্যবিত্ত চরিত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী নারী। শিল্পী ত্রিদিবেশের অনুরক্ত যা শিউলি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। শিউলির শিক্ষিকা মধুমতি যাকে ত্রিদিবেশ সহ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররা মধুদি সম্বোধন করে। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এই নারীর সাথে অনেকেরই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। যেমন সবিতাপণ্ডিতের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিপিন স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। আবার ত্রিদিবেশ-মধুদির মিথস্ক্রিয়া মোহনের অনতিগম্য। জাপান বোমার ত্রাসের রাত্রে ত্রিদিবেশ মধুদির বাড়িতে যায়। বাইরে বোমার আতঙ্ক ঘরে ত্রিদিবেশ-মধুমতি। বোমার তাণ্ডব শুরু হলে আত্মরক্ষা এবং অবচেতনে একে অপরের ঘনিষ্ট হয় :

> ‘মধুমতি আবার কিছু শব্দ করেন, গোঙানির মতো। মনে হয় তার জ্ঞান নেই, সমস্ত শরীর কুঁকড়ে ওঠে, ত্রিদিবেশকে ধরে থাকেন। তার লালা ত্রিদিবেশের মুখে গালে লাগে, এবং মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা কতখানি ব্যাপ্ত ও বর্তমান অবস্থায় অনুমান করতে পারে না। কিন্তু এক অসহায় অভিসম্পাতের মতো মনে হয় নিজের অবস্থাকে। কারণ নিশ্চিত মৃত্যুভয়ের মধ্যেও বিস্ময়কর রকমে ওর আত্মধিক্কারের মুখে পদাঘাত করে রক্তে বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে।[২৩০]

মধুমতির স্বামী জয়দেব কুমার কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপন্যাসে তাদের দাম্পত্যজীবন নিয়ে বকুলতলার মানুষেরা কৌতূহলী। উপন্যাসে তাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদের জট উন্মোচন করা হয়নি।

অজয় উত্তর কলকাতার একসময়ের প্রতিষ্ঠিত পরিবারের অধঃপতিত বংশধর। ম্যাট্রিক পাশ করে বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বেকারত্ব আর নৈঃরাশ্যের শিকার। এরপরই এ আর পি ওয়ার্ডেনে চাকরি পায়। ইন্সট্রক্টর পদে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন করে। যদিও বাস্তবে তা কখনোই সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে নির্বেদ নৈরাশ্যের শিকার কেননা মদ্যপ, নামমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সহকর্মীর অবদমিত বাসনার সাথে কখনোই একাত্ম হতে পারেনি। কলকাতার বাই এই নিঃসঙ্গ জীবনে প্রথম মুক্তি ঘটেছিল বকুলতলা ক্লাবে। মুক্তির পথপ্রদর্শক মোহন। মোহনের কাছে জনযুদ্ধের পাঠ নেয়। সবিতাপণ্ডিত তাকে মার্কসবাদে দীক্ষা দেয়। মোহনের বোন কাননের প্রেমে পড়ে। অর্থনৈতিক সংকটতাড়িত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি অজয়ের প্রেম কখনোই আলোর মুখ দেখে না। প্রেম নিয়ে আত্মগত সংকট তার মধ্যে প্রকট।

মহীতোষের পরিবার সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। নিজে গান্ধীবাদী এবং সরকারের নজরবন্দী। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকান্ত সেই ধারার অনুসারী। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে অনুপস্থিত। কলকাতার বিখ্যাত বিলেতি কোম্পানির বিভাগীয় প্রধান। পেশা নিয়ে পিতা-পুত্রের কোন দ্বন্দ্ব নেই। মহীতোষের স্ত্রী ব্যক্তি জীবনে

রাজনীতির কারণে স্বামীকে অনেকবার পুলিশের লাঞ্ছনার শিকার হতে দেখেছেন। তাই প্রথম পুত্রকে রাজনীতি বিমুখ করে তৈরি করেছেন। 'মধ্যবিত্ত আর দশটা সাধারণ পরিবারের ছেলের মতো রাধাকান্ত লেখাপড়া শিখেছে। তিরিশের দশকের শুরুতে ভারো চাকরি পেয়েছে। সংসার জীবনে সফল। শিল্পানুরাগী রাধাকান্ত নাটকের মহড়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। বছরের বিশেষ কয়েকটি দিন পরিমিত মদ্যপান করে। রাজনীতি বিমুখ তবে কমিউনিস্টের রাজনীতির প্রতি অতিমাত্রায় উদাস, যে উদাসীনতাকে কখনও কখনও বিদ্রূপাত্মক মনে হয়।[২৩১] মেজ ছেলে রাধারমণ মেদিনীপুর থেকে আন্ডরগ্রাউণ্ডে নেতৃত্ব দেয়। ৪২'-এর আগস্ট আন্দোলন গোপনে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। রমণ বিপ্লবী। ছোট ছেলে মোহন কমিউনিস্ট এর সমর্থক।

চারুমোহন চক্রবর্তী শিউলির বাবা। ত্রিদিবেশ এবং তার পুত্র রাখালকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে তিনি জামিনদাতা হয়ে ছাড়িয়ে আনেন। প্রথম দিকে বোহেমিয়ান ত্রিদিবেশকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি।

রামচন্দ্র মজুতদার, রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী। তার চরিত্রে মধ্যবিত্তের নানাবিধ অসঙ্গতি প্রকাশিত। নিজেকে নির্মোহভাবে রাজনীতির সমালোচক হিসেবে উপস্থাপন করে। সে দাবী করে চার্চিলের চেয়ে কৌটিল্য শাস্ত্র ভালো বোঝে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ইলিয়া এরেনবুর্গের বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেয়। সে জানায় সে গান্ধীকে শ্রদ্ধা করে। মন্বন্তরের সময় সে সফল ব্যবসায়ী বনে যায়। এ সময় সরকারের জাপানকে রুখবার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর যে বঞ্চনা নীতির প্রয়োগ করে সে তার উপযুক্ত ব্যবহার করে।

যুগ যুগ জীয়ে উপন্যাসকে বলা হয় সমরেশ বসুর সর্বাপেক্ষা উচ্চভিলাষী উপন্যাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালকে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক ত্রিদিবেশের মাধ্যমে লেখক দেশকালের জটিল রূপটি ধরতে চেয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাও উপন্যাসে এসেছে। অনেক সমালোচকই ত্রিদিবেশের সঙ্গে পার্টির মতান্তর এবং পার্টি দ্বারা নিন্দিত ও লাঞ্ছিত ত্রিদিবেশের পরিণামকে লেখকেরই পরিণাম বলে মনে করেন।[২৩২] তবে ত্রিদিবেশের মাধ্যমে একটি বিশেষ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনীতি তার শ্রেণি অবস্থান লেখক স্পষ্ট করেছেন। সেই সাথে ব্যক্তি ত্রিদিবেশকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি থেকে বৃহত্তর মানবতাবোধে উত্তীর্ণ করেছেন।

পুনর্যাত্রা

পুর্নযাত্রা উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৮২** সালে। অর্থাৎ আশির দশকের গোড়া থেকেই সমরেশ বসু সত্তর দশককে মূল্যায়ন করেছেন। সত্তর দশকের আর্থ-সামাজিক ক্রমিক অবনতি এবং রাজনৈতিক

অস্থিতিশীলতায় মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। আবার রাজনীতির আবর্ত থেকে জনগণ মুক্তিও পায়নি। স্বাধীনতার তিনটি দশক পার করলেও জনমনে শান্তি এবং স্বস্তি আসেনি, বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বেড়েই চলে। লেখক নিজের মতো করে সেই সংকট উপস্থাপন করলেন এক মধ্যবিত্ত যুবকের জবানিতে।

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজ সত্তর দশককে মুক্তির দশক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ লক্ষ্যে তারা অনেকেই রাজনৈতিক দলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। আর এই সময় পার্টির আন্দোলন অনেকটাই খতম অভিযানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা খতমের লড়াইকে সমস্ত সমস্যার সমাধান বলে ভেবেছে।[২৩৩] তবে '৭০ সালের শেষের দিকে শ্রেণি শত্রু খতমের লাইনে বদলার রাজনীতি অনুপ্রবেশ করে এবং আন্দোলন ক্রমাগত তার ইতিবাচক দিকগুলি হারিয়ে ফেলায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমে রাষ্টশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর নেমে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।[২৩৪] *পুনর্যাত্রা* উপন্যাসে সমরেশ বসু এই সময়কে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে দুশো বছরের আগে ও পরের দুটো প্রজন্মকে দাঁড় করিয়ে একদিকে যেমন নিয়তি নির্বপিত জীবনের কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে দেখানো হয়েছে সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে বৈদুর্যকান্তি এবং তাপসের মতো মানুষের অসহায়ত্ব। উভয়ে আত্মীয় পরিজন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নায়ক। যদিও উভয়ে সমাজের ভিন্ন কারণে নির্বাসিত তবু নির্বাসনের বেদনায় তারা যেন এক।[২৩৫]

তাপস ১৯৭২ সালে এসে ১৭৭২ সালে লেখা তার পর্ব পুরুষ বৈদুর্যকান্তির আত্মজীবনীর এক পাণ্ডুলিপি খুঁজে পায়। এই পাণ্ডুলিপির নায়ক বৈদুর্যকান্তি ওরফে রমাকান্ত সাথে তাপস তার জীবনের সাযুজ্য সে খুঁজে পায়। দুশো বছরের ব্যবধানে দুজনের জীবনের সমস্যা এক। অনন্বয়ের নিরিখে তাদের আত্মিকযোগও একই। তাপসের পরিবার সক্রিয় রাজনীতি করে না পুরনো শাসকদলের সমর্থনের বাইরে তাদের কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতামত নেই। তাপস এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। সে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। পার্টির মূলনীতির প্রতি সে আস্থাবান তবে পার্টির বর্তমান কর্মকাণ্ডের সে কঠোর সমালোচক। যে কারণে সে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। তার গোছানো জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তার প্রেমিকা মনীষা যাকে সে পার্টির অনুমতির অপেক্ষায় বিয়ে করতে পারেনি সেও পার্টি সহকর্মী অলকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাপসের বাড়ি পুলিশ সার্চ করে যা তার মধ্যবিত্ত পরিবার মেনে নিতে পারেনি। তার সেজদা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চায়, ন'দা পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চায় পারিবারিক শান্তি এবং সম্মান রক্ষার্থে। তার মা ও তাকে বের করে দিতে চায় মায়ের কাছে সে একটি মূর্তিমান

সর্বনাশ। পরিবারের অন্য সদস্যরা তাকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়। তাপসের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী পার্টির সমালোচনা। পার্টিও বর্তমানে ছিন্নভিন্ন। সেন্ট্রাল কমিটির সঙ্গে লোকাল ইউনিট বিচ্ছিন্ন। অনেক নেতা আর অসংখ্য কমরেড খুন হয়েছে। বন্ধুর ছদ্মবেশে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে তাপসের মতো মধ্যবিত্ত যুবকদের চেনার উপায় নেই। পার্টির নির্দেশে গ্রুপের সিদ্ধান্তকে সবাই মেনে নিচ্ছে যা তাপস মেনে নিতে পারে না। অথচ তাপস গ্রামে আসার আগে শহর থেকে বিশ মাইল দূরে পুলিশ আউট পোস্ট আক্রমণ করে দুটি বন্দুক সংগ্রহ করেছিল। তাপস গ্রামে আসার পরেই গ্রামের নিজস্ব সংগ্রহ ছুরি, বল্লম, দা, কাটারির স্থলে কোল্ট পয়েন্ট থ্রি এসেছিল। এরপরই গ্রামের একজন কুখ্যাত সুদখোর মহাজনকে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় শহরের দেয়ালে 'সাদা কাগজে লাল টকটকে অক্ষরে লেখা থাকত সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুণ।...জনশত্রুদের খতমে এগিয়ে আসুন।...চীনের চ্যায়ারম্যান আমাদের চ্যায়ারম্যান।'[২৩৬] একাত্তরের শেষ পর্যন্ত তিনজন জোতদার, একজন মহজন, একজন সেপাই খুন হয়েছিল। তাপসদের দলেরও অনেকে পুলিশের হাতে খুন হয়। জনজমায়েত সার্থক হয়নি। তাপসের মতো মধ্যবিত্ত যুবকদের ধারণা ছিল 'খতমের সূত্র ধরে গ্রামের গরীব ভূমিহীন কৃষকরাই নেতৃত্ব নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়বে'[২৩৭] বাস্তবে তা হয়নি ভূমিহীন কৃষকরা নির্বিচারে পুলিশের দ্বারা ধৃত হয়েছিল এবং পার্টির প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা তাপসদের তাড়া করে গ্রাম ছাড়া করল তাপসরা শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের কমরেডদের নেতৃত্বে গ্রামের কৃষকরা লড়বে এবং তাদের সাহস গ্রামের কৃষকদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে এই ধারণাটিই ছিল ভুল। উপন্যাসে এই ভ্রান্তিগুলো স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। যেমন পুলিশের অত্যাচারে বহু কমরেড খুন হওয়ার বদলা স্বরূপ খতম অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমে তারা সিদ্ধান্ত নেয় শহরের অদূরের এক বিডিওকে খুন করবে কিন্তু ভুলক্রমে তার কর্মচারিকে খুন করা হয়। তাপসকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এক বাস মালিককে খুন করার যদিও তার একটি মাত্র বাস ছিল। তাপস অনিচ্ছা সত্তেও এই খুন করে। তাপস এক এস ডি ও-কে খতম করার প্রস্তাব করে অলক এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বলে 'এসডিওকে মারলে এ শহর থেকে চিরদিনের জন্য সরে যেতে হবে।'[২৩৮] এরপর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে খুন করা হয়। পরে জানা গিয়েছিল লোকটি গুপ্তচর নয় কলকাতা জিপিওর একজন সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। অর্থাৎ একর পর এক ভুল খতম অভিযান অব্যাহত ছিল। তাপস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই খতম অভিযানের সমালোচনা করেছিল। এরপরই তাপসকে এক ছাপোষা মধ্যবিত্তকে খতম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শহরের প্রান্তেবাবসী ঐ ছাপোষা হাবিলদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সে বেতনের পাশাপাশি উৎকোচ গ্রহণ করে। তাপস আর

ভুল ব্যক্তিকে খতম করে হাত রাঙাতে চায়নি। সে প্রতিবাদ করেছিল। পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী কেউ খতমের নীতি থেকে সরে আসতে পারবে না। তাপস পার্টির কাছে বিশ্বাসঘাতকরূপে পরিগণিত হয়। আঘাত হানার জন্য আঘাত হানা নয়, খতম করার জন্যই আঘাত হানা।[২৩৯] মাও সেতুঙ-এর এই বক্তব্যর সে কট্টর সমালোচক হয়ে ওঠে যা পার্টির্র কর্তাব্যক্তিরা মেনে নিতে পারেনি। তাকে পার্টি থেকে বহিস্কৃত করা হয়। তাপস পার্টি থেকে বহিস্কৃত এবং বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে সাত পুরুষের পূর্বে রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হয় গঙ্গাযাত্রী অকুরের দ্বারে। এখানেই সে এই পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করে। এই অনুবাদ শেষ হওয়ার কিছু আগেই সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়। এই আওয়াজ পুলিশ এবং পার্টির যে কারো হতে পারে। তার নিয়তি নির্বপিত জীবনে এটাই হয়তো চরম নিয়তি কিন্তু সে বাঁচতে চায়। লেখক সমরেশ বসু তার একক সংগ্রামকে সম্মান জানিয়েছেন।

দশ দিন পরে

দশ দিন পরে উপন্যাসে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক রাজনীতির সূত্রে কীভাবে মস্তান হয়ে যাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। সমরেশের অন্যান্য উপন্যাসেও দেখা যায় মধ্যবিত্ত সমাজে যুবশ্রেণির একটি বৃহত্তর অংশ অধঃপতিত হয়ে মস্তান হয়ে যাচ্ছে। তাদের কোনো উত্তরণ নেই। বিশেষত ষাটের দশকে রচিত *প্রজাপতি* উপন্যাসের সুখেন চরিত্র। কিন্তু আশির দশকে এসে দিবাকর ওরফে দিবা মস্তান চরিত্রে দেখিয়েছেন দিবার উত্তরণ। পঙ্কিলতার মধ্য থেকে সে নবউপলব্ধি লাভ করে। সেখান থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় শুভ আর মঙ্গলের পথে যাবে। সত্তার গভীরে যে নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে সেই পথে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দুটি রাজনৈতিক দল সি.পি.এম এবং কংগ্রেস নিজেদের কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্য মস্তান লালন করেছে। তারা ভোটের জন্য সেই মস্তানদের সর্বতোভাবে কাজে লাগায়। এবং রাজনীতির প্রশ্রয়ে এই লুমপেন প্রলেতারিয়েত বা গুণ্ডা বাহিনী নিজেদের কাজ হাসিল করে।[২৪০] দিবা সেইরকম একটি দলের মস্তান। কলকাতায় একটা সময় দেখা যেত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকমাত্রই বামপন্থীর সমর্থক। দিবাও ব্যতিক্রম নয়। সে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী। যদিও সে দলের সদস্যপদ পাওয়া সক্রিয় কর্মী না। ভোটের সময় দলের হয়ে প্রচুর কাজ করে। তার স্বগতোক্তি থেকে জানা যায়— 'কেবল নেতার নামেই তো আর ভোট এনে দেয় না। ভোটের লড়াইয়ে অনেক খেলা আছে। মস্তানি বোমাবাজি এখন সব দলের হাতিয়ার। গোলাগুলিও চলে। তার সঙ্গে অনেক রকম কারচুপি আর কারসাজি।'[২৪১] প্রয়োজনে অ্যান্টি পার্টির ভোট ছিনিয়ে নেওয়া, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদের ব্যালট বাক্সে ভোট পড়তে না দেওয়া, খুনের ভয় দেখিয়ে বাক্সে ভোটের কাগজ ছাপ মেরে বোঝাই করা, কখনো কখনো বাক্স

ছিনতাই করা এসব তার মামুলি ব্যাপার। ভোটের সময় জেতাটা আসল ব্যাপার। তার এ জাতীয় ভূমিকার কারণে ভোটের সময় সবাই তাকে টেরর বলে। অবশ্য এ কারণে দলও তাকে অনেক সুবিধা দেয়। পার্টির নেতা প্রসন্নবাবুর নির্দেশে কলেজে শারীরিক শিক্ষার ইন্সট্রাক্টরের চাকরি পেয়েছিল। দিবা খেলাধুলা ভালোবাসত তার সৌম্য দর্শন এবং দেহ সৌষ্ঠবের কারণে চাকরিতে তাকে মানিয়ে গিয়েছিল।

দিবা চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। দিবা আদর্শিক কারণে সমাজে অসঙ্গতি দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। মেয়েদের পেছনে টিটকারি দেওয়া কিংবা হয়রানিমূলক আচরণ সে পছন্দ করত না। এসব কাজ যারা করত তাদের মেরে শায়েস্তা করত। তার গ্রুপের শঙ্কর এ কারণে তার কাছে প্রহৃত হয়েছিল। সবাই তাকে মারকুটে নামে চিনত। সে দেখেছে অভাবের তাড়নায় বহু মেয়ে বিপথে গিয়েছে। স্কুলমাস্টারের বউকে কয়েকজন যুবক ধর্ষণ করলে সে প্রতিবাদ করে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক ছেলের পুরুষাঙ্গ কেটে তাকে হত্যা করে। বুদ্ধিমত্তার কারণে পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। এরপর থেকে ক্রমশই মস্তানদের সাথে তার সখ্য বাড়ে, বিশেষত রাজীব ভৌমিক এবং কুশার মতো মস্তানদের সাথে। নিজের বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক সক্ষমতার কারণে খুব দ্রুতই তাকে সবাই গুরু মানে। এই সময় সে লক্ষ করে পুলিশ টাকার বিনিময়ে তাদের সাথে সদ্ভাব রাখে। কৌশিক অর্থাৎ কুশা মস্তানের সঙ্গী হয়ে দিবা চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। তার প্রতিপক্ষ খয়রার দল দেবকী ঘোষের ছত্রছায়ায় লালিত। দিবা প্রসন্নবাবুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে লালিত। দিবা সমকালীন বহু বিভ্রান্ত যুবমানসের প্রতীক, যারা সঠিক পথের সন্ধান পায়নি। প্রতিনিয়ত রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দিবা অনুভব করে কলেজে যারা তার সাথে মিশতো মস্তান হওয়ার পর তারা সঙ্গ ত্যাগ করে। অথাৎ শ্রেণিগত অধঃপতন দিবা খুব সহজেই অনুধাবন করে। দিবাও দলের দুর্নাম হবে ভেবে প্রকাশ্যে দলের কর্মীদের সাথে কথা বলত না।

দিবার জীবনে প্রেম ছিল। দিবা রিংকিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। তপনের হিংস্রতার হাত থেকে বাঁচাতে রিংকিকে দিবা গোপনে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। তপন রিংকির প্রতি আকর্ষণ থেকে দিবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কৌশলে দিবাকে খয়রাদের এলাকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তবে রিংকি তার জীবনে যতখানি প্রভাব ফেলেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছিল খয়রার রক্ষিতা পুতলি বাঈ ওরফে মিনু। দিবা তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে মিনুর ঘরে আশ্রয় নেয়। দশ দিন মিনুর ঘরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় থাকে। মিনুর সংস্পর্শ তার জীবনের গতিপথ পাল্টে দেয়। মিনু দিবার দর্শনে প্রভাবিত হয়। মিনু নিজের তরকারি কাটা বটি দিয়ে আশুকে খুন করেছিল। আশু তাকে বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকত আর প্রত্যহ নির্যাতন করত। মিনু আশুকে খুন করেছিল মুক্তির আশায় কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সে পায়নি।

পুনরায় খয়রার মত মস্তানের রক্ষিতা হয়। মিনু এমন এক পুরুষের প্রত্যাশা করেছে যে নারীর সম্মান বোঝে। আর তাই তো দিবাকে বলেছে— ‘তোমার নিয়তির পায়ে আমি মাথা কুটি, তোমাকে সে এ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাক। [২৪২] এই দশ দিনে মিনুও পরিবর্তিত হয়। দিবা চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে দিবার কোলে মাথা দিয়ে তার মনে হয়েছে মানুষের কোল পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। ‘তোমার সেই কোল, দিবাবাবু। তোমার কোলে শান্তি আছে। পুণ্যি আছে।’[২৪৩] দিবারও মনে হয়েছে এরকম দশটা দিন আর কখনো আসবে না। যাবার মুহূর্তে সমস্ত ব্যবধান ভুলে গিয়ে দুই স্বাধীন আত্মা একত্রিত হয় একটি চুম্বনে। ‘দিবা মিনুকে দু হাতে বুকের কাছে টেনে নিল। দুজনের মুখ যেন দুজনকে ঠোঁটের আগ্রাসী চুম্বনে আকর্ষণ করল। প্রায় দু মিনিট পৃথিবী যেন স্তব্ধ রইল।[২৪৪] এই চুম্বনই তাদের নবজীবনের পাথেয়। সমালোচকের ভাষায় ‘মাত্র একটি চুম্বন। কিন্তু এমন ভূমিকাগর্ভ চুম্বন খুবই কম মেলে। যে স্বাধীনতায় এমন চুম্বন মুদ্রিত হয় তা দেহাশ্রিত নয়, দেহাতীত নয়। তা দুই মুক্তিলব্ধ ব্যক্তির পরস্পরের কাছে স্বাক্ষরিত হওয়া।’[২৪৫]

উপন্যাসে দুই শ্রেণির নেতার প্রসঙ্গ এসেছে। একজন দেবকী ঘোষ যে খয়রার মতো মস্তানদের লালন করে যাদের কোনো নীতি নৈতিকতা নেই। অন্যজন প্রসন্নবাবু যার কাছে দিবা আনসোশ্যাল এলিমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। দিবাকে মুক্ত করে আনার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রসন্নর কাছে নীতির প্রশ্ন আসে। তবে তিনি এও স্বীকার করেন ‘হ্যাঁ, দিবাদের ছাড়া আজকাল কোনও পার্টিও আর চলে না। অবশ্য পার্টির সাধারণ ছেলেরাই বা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাও তো দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, নিজেদের নোংরা আর নিজেদের ঘেঁটে আর কী হবে?’ [২৪৬] দিবা মস্তান হয়ে যাওয়াতে প্রসন্নবাবু দিবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। দেবকী ঘোষও প্রকাশ্যে খয়রাদের সাথে কথা বলত না। ভোটের প্রয়োজনে এরা উভয়ই মস্তানদের তোষণ করত।

উপন্যাসে পুলিশের সুবিধাবাদী চরিত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যখন যে দল ক্ষমতায়, পুলিশ তখন সেই দলের তাঁবেদার বাহিনী হিসেবে কাজ করে। যেমন রেলের সিকিউরিটি ফোর্সের ইন্সপেক্টর অবতার সিং খয়রার টোপ হিসেবে কাজ করে। সেকেন্ড অফিসার গাঙ্গুলি সরকারি দলের সমর্থক আর সার্কেল ইন্সপেক্টর ভৌমিক বিরোধী দলের সমর্থক। যে কারণে সার্কেল ইন্সপেক্ট ভৌমিক দিবার বিরোধী। পুলিশের ভূমিকা দেখে দিবার মনে হয় ‘নিরপেক্ষ’ শব্দটা অভিধান থেকে মুছে ফেলা প্রয়োজন।

দিপু তরুণ নেতা দিবার বন্ধু। দলে দিবার মতো ছেলের প্রয়োজন তার অজানা নয়। রাজনীতিতে দীপুর কাছে এথিকস আর পলিটিকস সোনার পাথর বাটির মতো। তাই দিবাকে মুক্ত করার ব্যাপারে সে নীল নকশা তৈরি করে সেই মোতাবেক খয়রাদের এলাকা থেকে দিবাকে বের করে মিছিলের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিছিল করে দলের একজন মাস্তানকে এভাবেই বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই উপন্যাসে সমরেশ বসু মধ্যবিত্তের রাজনীতির কূটকৌশলের জট খুলেছেন।

রূপায়ণ

উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের কড়চা *রূপায়ণ* উপন্যাস। নাগরিক জীবনের অবক্ষয়কে উপন্যাসে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিশোরী মীরা নিজের ভুলে বড়বোন নীরার প্রেমিক দীপকের ভোগের সামগ্রী হয়। নীরার অজান্তেই তাদের অভিসার চলতে থাকে। কিন্তু মীরা গর্ভধারণ করলে দীপক সেই সন্তানের স্বীকৃতি দিতে অপারগতা জানায়। অসহায় মীরা তার ভুলের কথা বাড়িতে কাউকে জানাতে পারে না। বিষপানে আত্মহত্যার পূর্বে সে দীপককে ভীরু, লোভী এবং দুর্বল চরিত্রের বলে চিঠি লিখে আত্মহত্যা করে। প্রাণোচ্ছল মীরার আত্মহত্যা তাদের পরিবারের সকল সদস্যকে নিষ্প্রাণ করে দেয়। নীরা এবং তার বাবা মধুসূদন নিজ নিজ কাজে ডুবে যায়। কাজের ব্যস্ততায় তারা মুক্তি খোঁজে কিন্তু মদুসূদনের আকস্মিক মৃত্যু নীরার জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। পিতার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ নীরা তার পিতার অর্থসাহায্যে বড় হওয়া বিজিতের সঙ্গলাভ করে। বিজিতকে লেখা পিতার চিঠির মর্মোদ্ধারে সে বিজিতের কাছাকাছি আসে। বিজিতের ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু পিতা এবং একমাত্র ছোটবোনের অকাল মৃত্যুর শোকে সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিজিত তার অসুস্থতার কথা জেনেও নীরাকে নিয়ে সংসারী হতে চায়। নীরারও সংসারী হওয়ার ইচ্ছায় তারা বিয়ে করে কিন্তু নীরার আক্ষেপ থেকে যায়। সে সাধারণ মেয়ের মতোই স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার করতে চেয়েছে । অসুস্থতার কারণে তার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। নীরা অধরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে স্কুল আর পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা করে। আসন্ন মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ করে সে দিনরাত কাজ করে যায়। কাজ দিয়েই সে মৃত্যুকেই তিলে তিলে জয় করতে চেয়েছে।

হৃদয়ের মুখ

স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত চাকরিকে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন করেছে। ধ্রুবজ্যোতি লেখাপড়া শেষ করে চাকরির পেছনে ছুটেছে। চাকরি না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে কলকাতা থেকে ট্রেনে ফেরার সময় সামতানির সাথে পরিচয়। এই পরিচয়পর্বকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতা এবং মেধার জোরে সে ইন্দ্রানী সামতানির বিজনেস লায়নসের শেয়ার হোল্ডার হয়। লেখকের বক্তব্য তার

প্রমাণ— ‘কথাবার্তা ভাষার স্টাইলে ও নিজেকে রাখত ভীষণ স্মার্ট, ঈগলের মতো ওর দৃষ্টি শহরের চারিদিকে, প্রতিটি কোণে তীক্ষ্ণভাবে ঘুরে বেড়াত, আর অন্ধের শ্রবণানুভূতির মতো প্রতিটি মানুষের কথা ওর কানে বাজত।’[২৪৭] ধ্রুবজ্যোতি খুব সহজেই মধ্যবিত্ত থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উচ্চবিত্ত পর্যায়ে উঠে আসে। অর্থই তাকে নারীর দিকে ঠেলে দেয়। ব্যবসায়িক সাফল্য, অগাধ নারীসঙ্গ তাকে আরো নিঃসঙ্গ করে দেয়। ‘এই ভিড়, এই নাচ আর ভাল লাগে না, ক্লান্তবোধ করে।’[২৪৮] ধ্রুবজ্যোতি ইন্দ্রানী সামতানি এবং তার মেয়ে মোহনার সাথে সম্পর্কে জড়ানোকে উচ্চবিত্ত সংস্কৃতির অংশ ভাবে। এই সম্পর্ক নিয়ে তার মধ্যে কোনো টানাপোড়েন নেই। সে জানে এই দুইজনের সময়ের দাবীকে সে পূরণ করছে, যার সাথে হৃদয়ের সংযোগ নেই। চৌকষ মেধাবী ধ্রুবজ্যোতি মা-মেয়েকে বিরূপ করে ব্যবসায়িক ক্ষতি চায়নি। সে এই সম্পর্কের পরিণতি আশা করে না। নাগরিক নগ্নতার চোরাস্রোতে সে ভেসে যেতে চায়। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। তারই গাড়িতে এক অসহায় মধ্যবিত্ত গৃহবধু আশা আহত হয়। নাগরিক নৈরাশ্য ধ্রুবজ্যোতির জীবনকে বিভ্রান্ত করেছিল। আশাকে চিকিৎসার্থে সে আশার কাছাকাছি আসে। এর আগে হৃদয় সম্পর্কে তার বক্তব্য— ‘হৃদয় বলতে আমি শরীরের ভিতর আর দশটা অংশের মতোই মনে করি, যেমন স্টমাক, লিভার, অতএব তাতে ছায়াপাতের কিছু নেই।’[২৪৯] আশার অ্যাকসিডেন্ট তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। উৎকণ্ঠা, আশার জীবন সংকট এবং পুলিশি জেরায় ধ্রুবজ্যোতির চোখে অন্য একটা জগৎ খুলে যায়।’[২৫০] সে তার মধ্যবিত্ত মন দিয়ে দেখতে পায় পুলিশ কতটা ভদ্রোচিতভাবে ঘুষ খায়, পুলিশ ইন্সপেক্টর নস্কর কী উপায়ে বড়লোকদের তোষামোদ করে, লিলির মতো উচ্চবিত্ত মেয়েদের অবৈধভাবে জীবন উপভোগ প্রভৃতি বিষয় সে অনুধাবন করে এবং ভাবে সব কিছু নষ্টদের দখলে। সে নিজে ব্যবসায়ী হিসেবে কতটুকুই বা সৎ। তার আসল রূপ কী ? সর্বত্রই একটা ‘সেটলমেন্ট। একমাত্র বোধহয় বেশ্যালয় সহজ সরল জায়গা যেখানে অন্তত ছলনার চাতুরি নেই।[২৫১]

আশা ধ্রুবজ্যোতি আপন বৈশিষ্ট্যে আশার বেদনার ভাষা বোঝে। দিবাকরের মতো শ্রমিক নেতার স্ত্রী হয়ে যার একদিন গর্ব ছিল, যে দিবাকরকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিল, সেই দিবাকরের অধপতন তাকে মানসিকভাবে পীড়া দেয়। মদ্যপ দিবাকরের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মহত্যা আধুনিক যুগযন্ত্রণাপ্রসূত। সেই সিদ্ধান্তে সে ধ্রুবজ্যোতির চলন্ত গাড়ির নিচে পড়ে। অচেতন অবস্থায় দিবাকর তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দেয়। সুস্থ হয়ে ধ্রুবজ্যোতি আশার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে আশাকে ভালোবেসে ফেলে। ধ্রুবজ্যোতির জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। কিন্তু বিবাহিত আশার প্রতি ধ্রুবজ্যোতির প্রেম অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হয়, যা বাস্তবে রূপ পায় না।

আশা একমাত্র মধ্যবিত্ত নারী প্রতিনিধি। শ্রমিক নেতা দিবাকরের আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু সংসার জীবনে দীবাকরের স্খলন বিশেষত অভাবের তাড়নায় পার্টি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া আশা মেনে নিতে পারেনি। বাড়িতে মদের আসর বসানো, আশাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা এসবই ছিল দিবাকরের বিকৃত রুচির বহিঃপ্রকাশ। আশা যে দিবাকরকে চিনত সেই দিবাকর ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে পড়ালেখা করত, পার্টি আদর্শে স্থিত ছিল। দিবাকরের এই বিচ্যুতি আশাকে হতাশ করে। আত্মগ্লানিতে সে আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

দিবাকর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা। শ্রমিকদের জন্য সদর্থক চিন্তা এবং কল্যাণে বিশ্বাসী। অভাব এবং শ্রমিকদের স্বার্থান্বেষী চরিত্র তাকে শ্রমিকদের প্রতি বিরূপ করে তোলে শ্রমিকদের ছারপোকার মতো মনে হয়— 'যত পাইয়ে দিতে পারো, তত তুমি ভালো। না হয়ত পাছায় লাতথি, তুমি জাহান্নামে যাও...'ট্রেড ইউনিয়ন বলতে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন বলে কিছু নেই, তার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দল, তাদের নির্বাচনের নানা কৌশল। আসলে দলেরই প্রতিষ্ঠা।'[২৫২] পার্টির মূলনীতির সাথে কারখানার শ্রমিকদের আদর্শভ্রষ্টতা মেলাতে পারে না। সামূহিক বিপর্যয় তাকে স্খলিত করে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাদের দাম্পত্যসম্পর্কে শীতলতা আনে।

শ্যামপদ বেকার মধ্যবিত্ত যুবক। সমকালীন অর্থনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তাকে নেতিবাদী করে। তুচ্ছ স্বার্থে অবলীলায় মিথ্যা বলে। পুলিশের সামনে ধ্রুবজ্যোতিকে ফাঁসাতে বলেছে :

> হান্ড্রেট মাইল স্পিডে এসে চাপা দিল? ... চাপা দিয়ে হয়তো কেটে পড়ত, নেহাত আমরা কয়েকজন এসে পড়েছিলাম। তারপরে বুঝলাম, ভদ্রলোক মদ খেয়ে টং হয়ে আছে।[২৫৩]

আবার এই পুলিশই তার বিরুদ্ধে গোডাউন লুটের অভিযোগ আনে।

উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে উচ্চবিত্ত চরিত্রকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ঔপন্যাসিক যতই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন ততই মধ্যবিত্ত চরিত্র, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক কাহিনি মোড় নিয়েছে।

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা নভেলটিক উপন্যাস। উপন্যাসটির আখ্যানবিন্যাস এবং পরিণতি সরল এবং স্বাভাবিক। বিয়ের দিন উপন্যাসের নায়িকা শম্পা গাঙ্গুলির পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কাহিনিতে জটিলতা তৈরি হয়েছে। শম্পা কেশবকে ভালোবাসে। তার বাবা এই ভালোবাসা মেনে নেননি। তাই বিয়ের দিন কেশবের সাথে শম্পা পালিয়ে যায়। শম্পার বাবা নিত্যহরি বিষয়টি গোপন করে পুলিশের

দ্বারস্থ হন। শ্যামাপদ দারোগা এবং তার সহকর্মী অশোক এই রহস্যের জাল উন্মোচন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শম্পার জন্য মনোনীত পাত্রের সাথে শম্পার দূরসম্পর্কীয় বোন ঝরনার বিয়ে হয়। এর পরই শম্পা বাড়ি ফিরে আসে। মফস্বলের অতি সাধারণ এই মধ্যবিত্ত পরিবারটি বিয়ের দিন কন্যা পালিয়ে যাওয়াতে আত্মসম্মান ও মানমর্যাদার ভয়ে সবার নিকট কন্যা হারিয়ে যাওয়ার গল্প ফাঁদে। শম্পাকে নিয়ে উৎকণ্ঠা এবং রেল লাইনের পাশে পাওয়া অজ্ঞাত লাশের খবর শুনে তার পিতামাতার উৎকণ্ঠিত হওয়ার মধ্যে এক ধরনের অভিনয় ছিল। এই অভিনয়ের অন্তরালে তাদের মনোগত যন্ত্রণা ও বেদনা লুকিয়ে ছিল। সংসারে সুখাকাঙ্ক্ষী, সম্মান প্রত্যাশী নিত্যহরি কেশবের মতো ছেলেকে জামাই হিসেবে মানতে চাননি। কেশবের অপরাধ সে কায়স্থের সন্তান। কন্যা হারিয়ে বর্ণবাদী নিত্যহরি অনুধাবন করেন কন্যার প্রতি ভালোবাসা। তাই শেষ পর্যন্ত কেশব-শম্পার প্রেম এবং বিয়ে মেনে 'নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে 'হতে পারে কেশব কায়স্থের ছেলে, কিন্তু সে শিক্ষা-দীক্ষায় ভদ্রতায় কায়স্থকূল চূড়ামণি।'[২৫৪]

উপন্যাসে শম্পা দ্বিধামুক্ত, সাহসী এবং প্রতিবাদী চরিত্র। যদিও উপন্যাসে তার উপস্থিতি সামান্য। তারপরও তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস আবর্তিত ।

উপন্যাসে আরো একটি চরিত্র কাঞ্চন বউদি। যে অর্থ এবং সম্পদের জোরে একজন বিকলাঙ্গ পুরুষের স্ত্রী।[২৫৫] দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তিকে হাসিমুখে মেনে নিয়ে সে ভালো থাকার ভান করে। অশোকের সাথে তার রহস্যাবৃত সম্পর্ক। 'ওরা নিজেরাও জানে না ওদের সম্পর্কটা কী। এক অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পর্ককে ধরে রেখেছে নিজেদের। সংসার সমুদ্রে নিজের যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতেই কাঞ্চন বউদি এই সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেয়। উপন্যাসে উদ্ধৃত কাঞ্চনের একটি মাত্র উক্তি তার মনোযন্ত্রণা প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। অশোককে সে বলে 'গোলেমালে গোলেমালে পিরীত করো না।'[২৫৬] কাঞ্চনের সুখের এবং স্বপ্নের শরিক অশোক।

সমরেশ বসু মানবমনের নির্জ্ঞান অংশে আলো ফেলে মধ্যবিত্ত মননের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তবে এই মধ্যবিত্ত জীবন সমগ্রতার পরিচয়বাহী নয়, জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র।

আনন্দধারা

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা প্রতিষ্ঠিত একজন গায়কের আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে। বিশ্বরূপ চক্রবর্তী জনপ্রিয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী। প্রেম-ভালোবাসা-বিয়ে সংসার সম্পর্কে

স্বতন্ত্র ভাবনার অধিকারী। সঙ্গীতকে সে জীবনচর্চার উপায় হিসেবে নিয়েছে, তবে জীবন-যাপনের বিষয় করেনি। সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু কখনোই সঙ্গীতকে জীবনের থেকে বড় করে দেখেনি। পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় পরিবারের সবাই ভেবেছিল সেও পুরোহিত হবে। কিন্তু তার পিতার উৎসাহে সে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তালিম নেয়। তার সঙ্গীতচর্চার প্রথম গুরু তার বাবা। মাত্র বারো বছর বয়সে কলকাতায় আসে এবং ওস্তাদ নাসিরউদ্দিনের শিষ্য হয়। তার গুরু তাকে শুধু সঙ্গীতের তালিম দেয়নি, তার জীবনবোধকেও জাগ্রত করেছে। গুরুর সুঅভ্যাসের সাথে সাথে বদভ্যাসও সে রপ্ত করেছে। যেমন মদ্যপান এবং নারীর প্রতি আসক্তি। তারপরও জীবনে কোথায় যেন অপূর্ণতা। নিজেকে সে বিবেকবুদ্ধিহীন, হৃদয়হীন, অহংসর্বস্ব গায়ক মনে করে। তার প্রতিষ্ঠা তাকে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সমরেশের অন্যান্য নায়কের মতো সেও বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। আত্মঅহমিকা থেকে সে শিষ্য এবং পরিষদবৃন্দ নিয়ে গান গায় না। সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু একসময় প্রতিষ্ঠার মোহই তার মধ্যে অবসাদের জন্ম দেয়। 'আমার জীবন যাপনের প্রবাহ যেভাবে বয়ে চলেছে তাতে পেশাদারি করা আমার শেষ হয়ে আসছে। পেশা যদি আমাকে ভারবাহী পশু করে তোলে, তা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার খ্যাতি, অর্থবিত্ত, প্রতিপত্তি, ক্রমাগত আমাকে সেই দিকেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।[২৫৭]

নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে মনোরমাসহ বহু নারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে। কিন্তু সেখানে সে প্রত্যাশিত মুক্তি পায়নি। এক ধরনের অসম্পূর্ণতা তাকে প্রতিমূহূর্তে দগ্ধ করেছে। জীবনের আনন্দধারাকে সে খুঁজেছে। বারবার বলেছে 'কেমন করে সেই আনন্দকে আমি আয়ত্ত করব?'[২৫৮] শেষ পর্যন্ত শান্তার মধ্যে সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছে। শান্তার গান এবং ব্যক্তিত্ব তাকে মুগ্ধ করে। এই শান্তা তারই গুরু নাসিরউদ্দিনের ঔরসজাত। শান্তা পার্থিব সুখের প্রত্যাশী না। তাই শান্তার কাছে বারবারই বিশ্বরূপ চক্রবর্তী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু গান দিয়ে সে শান্তাকে জয় করার অভিলাষী।

বিশ্বরূপ চক্রবর্তী সমকালীন সংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছে। মনোরমা সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়ে অপসংস্কৃতিকে রপ্ত করে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী হয়েছে তার স্পষ্ট বিবরণ বিশ্বরূপ দিয়েছে। মনোরমার কথক নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় বিশ্বরূপ বিস্ময় প্রকাশ করেছে। মনোরমা বহুগামী, জীবনকে উপভোগে বিশ্বাসী। মনোরমা নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে শিল্পী হতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেও তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছায়। তবে সফল নৃত্যশিল্পী হয়েও সে ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান।

উপন্যাসে প্রত্যেকটি চরিত্রই ব্যক্তিগতজীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দ্বৈরথ নিয়ে ভাবিত। সমকালীন সময় এবং সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রত্যেকেই জীবনবাদী শিল্পী হতে চেয়েছে। উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হৃদয়ের অপূর্ণতাজনিত আক্ষেপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মরীচিকা

মরীচিকা উপন্যাসের পটভূমি চলচ্চিত্রের অন্তরালের পাত্র-পাত্রীর জীবন। উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয়েছে ততদিনে বাংলা চলচ্চিত্র শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ভারতের চলচ্চিত্র ততদিনে সমস্ত পৃথিবীতে বাজার তৈরি করে নিয়েছে। চলচ্চিত্র মানুষের বোধকে তাড়িত করে সত্তাকে জাগরিত করে। চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনের মাধ্যমে নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের রূপকার। যন্ত্রনির্ভর মাধ্যমে হলেও সাহিত্য সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং নৃত্যকলার মতোই চলচ্চিত্র জীবনবোধ ও শিল্পরসকে তুলে ধরতে সক্ষম।[২৫৯] দর্শক শুধু চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত চরিত্রসমূহ নিয়েই ভাবে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের পোশাক, কথাবার্তার ধরন অনুসরণ করার চেষ্টা করে। বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারের বিনোদনের অন্যতম আকর্ষণ চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের মূল দর্শক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণির একাংশের মধ্যে চলচ্চিত্রকে পেশা হিসেব গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দ্রুত তারকাখ্যাতি এবং অর্থের মোহের আশায় চলচ্চিত্রকে পেশা হিসেবে নিতে আগ্রহী হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রুমি সেন চিত্রতারকা। শিল্পভাবনা সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যিক ছবির সফল নায়িকা। দর্শক শুধু তার রঙিন চাকচিক্যময় জীবনটাই চেনে। রুমি সেনের গুণমুগ্ধ ভক্তের কাছে তার একটাই পরিচয় ‘যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী / হে অপুটশোভনা উর্বশী।’[২৬০] চলচ্চিত্রে রুমি সেন নিজেই যুগান্তকারী । শিল্পী হিসেবে অনন্ত যৌবনা। এই রুমি সেনের চাকচিক্যময় জীবনের অন্তরালে রয়েছে তার টিকে থাকার সংগ্রাম আর ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতা। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তার জন্ম। তার বাবা ছিলেন কালেক্টর অফিসের কর্মচারী। মাতৃহারা রুমির বাবাকে নিয়ে ভালই দিন কাটত। কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যু তার জীবনে ছন্দপগন ঘটায়। তার বাবা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সমস্ত সম্পত্তি তার কাকাকে দিয়ে যায়। কাকা-কাকির আশ্রয়ে রুমির কষ্টের জীবন শুরু হয়। কাকিমার আশ্রয়ে তার পরিচয় গৃহপরিচারিকা। বাজার করা, রান্না করা ইত্যকার নানাবিধ কাজে নিজেকে সে এক রকম মানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে তার শিল্পী মনটি মরে যায়নি। কাকা তার শৈল্পিক মনের পরিচয় পেয়ে তাকে পাড়ার ক্লাবে আবৃত্তির সুযোগ করে দেয়। তার কাকা ছিল অর্থগৃধ্নু পিশাচ। অর্থের বিনিময়ে তিনি

রুমিকে আবৃত্তি, অভিনয় করাতেন। যার বিন্দুবিসর্গ রুমি জানত না। এভাবে রুমি চলচ্চিত্রে সুযোগ পায় এবং সফল হয়। রুমি চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরই কাকার পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিশাল প্রাসাদপ্রতীম বাড়িতে সে হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। তার এই নিঃসঙ্গতার সুযোগ নেয় তারই কৈশোরের বন্ধু অবিনাশ চ্যাটার্জি। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে প্রেমের ফাঁদ পেতে তার সমস্ত সম্পত্তি নিজ অধিকারে আনে। এক সময় রুমিকে উচ্ছিষ্টের মতো ছুড়ে ফেলে দেয়। নিঃসহায়, নিঃসম্বল রুমি সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায়। অন্যদিকে অবনীশ চ্যাটার্জির প্রযোজক হিসেবে আত্ম প্রকাশ ঘটে। উপন্যাসটির কাহিনি সিনেমাটিক, যা পরে চলচ্চিত্রের কাহিনি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং জনপ্রিয়তা পায়।

রুমি সেনের জীবনের উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল দুটি অধ্যায়কে উপন্যাসে উদ্ভাসিত করা হয়েছে। রুমি সেনের অন্তস্থ প্রেমের ব্যর্থতা তার জীবনে পরাজয় ডেকে আনে। সে নিজেই একসময় গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে। শৈশব থেকে একটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা গৃহকোণ, সন্তান, স্বামীর ভালোবাসা তাকে ভিন্ন এক মানুষে রূপান্তরিত করেছে— এসবই ছিল তার কল্পনায়। আর সেই কল্পনাকে রূপ দিতে সে বাড়ির একটি ঘরকে সাজিয়ে রেখেছিল। সারাদিন পর কর্মক্লান্ত হয়ে সেই ঘরে সে প্রবেশ করত। অবিনাশকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বলে— 'এসবই আমার স্বপ্ন। আমার প্রাণের সাধকে এমনি করে সাজিয়ে রেখেছি ! বলতে পারো এ স্বপ্ন ইচ্ছে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার মনের মাঝারে। বাস্তবে সবই শূন্য। এ ঘর আমার আকাঙ্ক্ষার ছবি।[২৬১] রুমির এই শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে অবিনাশের সাহচর্যে আসে। কিন্তু অবিনাশ প্রেমের পরিবর্তে স্থূল দেহসম্ভোগের ইচ্ছা এবং হৃদয়হীনতা রুমিকে হতাশ করে। অবিনাশ কখনোই রুমিকে ভালোবাসেনি। চিত্রনটী বলে ব্যঙ্গ করে। অপমানে, বোবা আক্রোশে রুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে। তার পাতানো মা সুধাময়ীর পরিচর্যায় বিস্বাদ জীবন নিয়ে কোনরকম ধুকে ধুকে বেঁচে থাকে। পত্রিকায় নতুন ছবির বিজ্ঞাপনে অবনীশ চ্যাটার্জি প্রযোজিত ও পরিবেশিত লেখা দেখে অবনীশের মুখোশ খুলে দিতে পূনরায় প্রত্যাবর্তন করে। অবনীশের বৈরী অভ্যর্থনা এবং অপমানে সে ব্যর্থ হয়। 'রুমির বগলে ক্রাচ ছিল না। ওকে সবাই ধাক্কাধাক্কি করছিল, আর লোকের পায়ের ঠেলা খেতে খেতে ও সিঁড়ি গড়িয়ে পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল, শয়তান ও শয়তান।'[২৬২] রুমির এই আচরন এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, যা সমাজ-সংসারের বৈরিতায় চিরতরে নিভে যায়। জীবন পিপাসু রুমির স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের মূল্যবোধহীনতা, অর্থগৃধ্নুগ্ন, আত্মসর্বস্বতার বাস্তব দৃষ্টান্ত অবনীশ। অবনীশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক মানবস্বরূপের নঞর্থকতাকে দেখিয়েছেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও

সে কর্মক্ষেত্রে অসফল। রুমির অর্থবিত্তকে সে প্রাধান্য দেয় এবং রুমির জন্মদিনে সে তার কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। চিত্রজগতে রুমি-অবনীশের প্রেম নিয়ে চটকদার খবর বের হয়। অবনীশ এই সুযোগটি কাজে লাগায়। রুমির সব কাজ গুছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। নিঃসঙ্গ রুমি এটাকে মুক্তি ভেবেছে। কিন্তু সে কোন 'অজগরের কঠিন পাকের কুণ্ডলীতে বাঁধা পড়েছিল, তা বুঝতে পারল না। ওর বিশ্বাসের অবিচলতা, দৃষ্টিকে কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা টের পেল না। পারলে, দেখতে পেত, চির অভুক্ত অজগরটা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, এবার মুখব্যাদান করে, ওকেই সমূলে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।'[২৬৩] রুমির বিত্ত আর বৈভব করায়ত্ত হতেই তার লোভের মাত্রা বেড়ে যায়। কামার্ত হয়ে রুমিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। রুমির প্রত্যাখ্যানে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। 'তোমার মুখে বড় বড় কথা, আর চিত্রনটীর সতীত্বের কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। আমি এক কথার মানুষ, যা চাইব, তোমাকে তাই দিতে হবে। তোমার সবকিছুর ওপর আমার অধিকার আছে।'[২৬৪]

উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুধাময়ী চরিত্রটি ব্যতিক্রম। সদালাস্যময়ী পরোপকারী চরিত্র। চলচ্চিত্রের এক সময়ের ডাকসাইটে নায়িকা বর্তমানে পার্শ্বচরিত্রের অভিনেত্রী। চিরন্তন বাঙালি নারীর শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি ধরা পড়েছে তার চরিত্রে। জীবনকে সে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। একদিকে অভিনয় যেটি তার পেশা, অন্যদিকে সংসার। স্বামী-সন্তান নিয়ে তার সুখের সংসার। আহত রুমিকে সেই আশ্রয় দেয়। রুমি সেনের বিপদে মাতৃস্নেহ নিয়ে তার পাশে থেকেছে। রুমি সেন যখন ক্রাচে ভর দিয়ে অবনীশের মুখোশ খুলতে গিয়েছিল, তিনি বাড়িতে রুমিকে দেখতে না পেয়ে উন্মাদের মতো অবনীশের স্টুডিওতে গিয়েছে। রক্তাক্ত রুমিকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, 'ওরে মেয়ে মিথ্যার মুখোশ চিরদিন থাকে না, তা একদিন খুলে পড়বেই।'[২৬৫] স্নেহমমতা দিয়ে তিনি রুমিকে আগলে রাখতে চেয়েছেন। শত ঝঞ্ঝায় রুমিকে ভেঙে পড়তে দেয়না। ধৈর্যশীলা এই রমণী সর্বদা রুমির জন্য উৎকণ্ঠিত থেকেছেন। সুধাময়ী চলচ্চিত্রে যেমন শক্তিশালী চরিত্র, ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি।

রুমির কাকিমা উপন্যাসের অন্যতম নারীচরিত্র। 'পাশাপাশি তিনটি ঘর। একটি ঘরের দরজা খুললেই রাস্তা। ঘরের আসবাব সামান্য। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যে রকম হয়।'[২৬৬] স্বামীর বেকারত্ব, সন্তানের ওপর নির্ভরশীল সংসারে তিনি কিছুটা বেসামাল। মনুষ্যত্ব আর মানবিকতাবোধ হারিয়ে নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখেছেন। নিজের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠালেও ননদের আশ্রিতা কন্যা রুমিকে স্কুলে পাঠায় না। রুমি স্কুলে যেতে চাইলে তিনি বলেন 'এর জন্য আবার কান্নাকটি কীসের ? আমরা যে লেখাপড়া শিখিনি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখেই বা কী হবে ?

বিদ্যাসাগর তো হবি না।’[২৬৭] সর্বদা নিজের সংসার নিয়ে ভেবেছে, তাই স্বামীকে বলেছেন ‘ভাইঝিকে নিয়ে তো খুব নাচানাচি করছ, নিজের মেয়ে দুটোর কী হবে? তোমার ভাইঝিটির না হয় রূপ আছে, কিন্তু আমার মেয়ে দুটোর ? খুবতো রমাকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছ, এদিকে নিজের মেয়ে দুটোর কথা ভেবেছ একবার?[২৬৮] এই রুমি যখন নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় তখন তিনি তাকে মাথায় করে রাখেন। রুমি তার কাকা-কাকির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি প্রতিমাসে একবার এসে রুমির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতেন।

রুমির কাকা এই উপন্যাসে স্বল্প আঁচড়ে অঙ্কিত নঞর্থক চরিত্র। বৈষয়িক লোভে তিনি আপন ভাইঝির সৌন্দর্যকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন। পাড়ার বখাটে ছেলেদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রুমির সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। রুমি প্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকা হলে তিনি তার অর্থ আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন। রুমির অর্থে তিনি হয়ে ওঠেন দুর্বিনীতি ও মদগর্বী; আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শিকড়শূন্য মানুষ। মানবিক মূল্যবোধের চেয়ে অর্থই তার কাছে প্রধান।

আকাঙ্ক্ষা

আকাঙ্ক্ষা সমকালীন উচ্চমধ্যবিত্ত যুবকের প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিসর্জনের কাহিনি। প্রেমের কারণে উপন্যাসের নায়ক অরিন্দম আত্মহননের মধ্য দিয়ে ‘বেঁচে আছি’ এই অনুভাবনার অপমৃত্যু ঘটায়। জীবনের অসারতা, প্রেমের নিষ্ফলতা, বিকলাঙ্গ জীবনের নিরক্ত জৈবাবস্থা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করে। যাকে ভালোবেসে সে আত্মঘাতী হয় সে নারী তাকে যথার্থ ভালোবাসে কিনা এর সদুত্তর তার অজানাই থেকে যায়।

অরিন্দমের জন্ম এমনই এক পরিবারে যেখানে শিক্ষার চেয়ে অর্থকে প্রধান হিসেবে দেখে। তার সমকাল এবং সমশ্রেণির মানুষগুলো বিকৃত ভাবনায় নিমজ্জিত। ঘৃণ্য কামুক সঙ্গ তার সুস্থির জীবনকে অস্থির করে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণিমার মতো নির্জীব নিষ্প্রাণ স্ত্রী তাকে অনায়াসে অর্থলোভী সাহানার প্রতি আকৃষ্ট করে। ছেলেবেলায় দেখা নগ্ন নারীর চিত্র তার অবচেতনে থেকে যায়। প্রাপ্ত বয়সে লুকিয়ে ভারতের নিষিদ্ধ পত্রিকা ‘মেন ওনলিতে’ আসক্তি হয়। অবচেতনে রঙিন পর্নোগ্রাফিতে প্রেমিকা সাহানাকে খোঁজে। অরিন্দম হঠাৎ করেই নিজের প্রতি অতিসচেতন হয়। একদিনে দুইবার দাড়ি কামায়, পিতলের সরু তারের নকশা করা নাগরা পরে, বেশভূষায় পরিবর্তন আনে। অরিন্দম কৈশোরে নগ্ন নারীদেহের ছবি দেখতে গিয়ে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং মাকে কথা দেয় আর কখনো নগ্ন

নারীদেহের ছবি দেখবে না। কিন্তু উত্তর যৌবনে এই প্রতিজ্ঞা সে বিস্মৃত হয় এবং যৌবনধর্মের অপচয়িত অংশের দিকে ধাবিত হয়। বিষবৃক্ষের মতো নগ্ন নেশা তাকে পেয়ে বসে।

দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম মানসিকতায় এসে একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে যখন মানসিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম নেয় তখন তারা নিঃসম্পর্কীয় মানুষে পরিণত হয়। উপন্যাসে অরিন্দম এবং তার স্ত্রী মানসিকতার বিস্তর ব্যবধান। দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। স্ত্রীর অপারগতা, দীনতা তাকে উচ্চবিত্ত নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষিত করে। আর ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত নারী যে দুর্লভ না তা ওর ঐকান্তিক মফস্বলীয় রক্ষণশীল মানসিকতায় ধরা পড়ে নি।'[২৬৯] তবে একটা সময় অরিন্দম বিশ্বাস করতে শুরু করে — প্রেমের প্রধান কেন্দ্র পরকীয়তা।[২৭০]

অরিন্দমের অতৃপ্ত হৃদয় সাহানাকে পেয়ে তৃপ্ত হতে চায়। সাহানার আহবানে সমস্ত বাস্তবতাকে তুচ্ছ করে দেয়। মোহগ্রস্তের মতো ছুটে চলে। সাহানার মতো স্বেচ্ছাচারিনীকে নিজের বাড়িতে এনে লিভ টুগেদার করেছে। কখনো ভাবেনি সাহানা কেন তাকে বিয়ের জনা পীড়াপীড়ি করে না। এমনকি অরিন্দমের মনে হয়নি 'যাদের কাছে ও মানুষ হয়েছে, তাঁদের সামনে ওর এই আচরণ কতখানি লজ্জাকর।[২৭১] সাহানার স্বেচ্ছাচারিতা, আর স্বাধীনতায় অরিন্দমের পরিবার লজ্জিত হয়েছে। অরিন্দমের ভোগাকাঙ্ক্ষা তার শিক্ষা, রুচি সবকিছুই অনর্থক করে দেয়। অতিরিক্ত মোহ আর স্খলিত চরিত্রের কারণে অরিন্দম পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। কর্পদকশূন্য অরিন্দমকে সাহানা মুহূর্তেই ত্যাগ করে। অরিন্দমের গালে থাপ্পড় মেরে জানিয়ে দেয় 'আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই।'[২৭২] সাহানার প্রত্যাখ্যান, পরিবারের অসহযোগিতায় হতাশ অরিন্দম যখন নিয়তিকে চেনে তখন সব শেষ। সাহানা বরুণ মহেশানির কাঙ্ক্ষিতা। সে বুঝেছে, 'সাহানার মন ও আর পাবে না। কোনও কালে পেয়েছে কিনা, সেটাও সন্দেহের বিষয়।'[২৭৩]

বাবার কিনে দেওয়া রিভলবার তার শেষ আশ্রয়স্থল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কিনে দেওয়া রিভলবার দিয়ে সাহানাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মনন ভাবে এক, করে আরেক। সাহানাকে বিনাশের পরিকল্পনায় সাহানাদের বাড়িতে এসে তার গুলির নিশানা ব্যর্থ হয়। 'মস্তিষ্কের মধ্যে কালো পরদা নেমে আসা স্তব্ধতায় অরিন্দম উপলব্ধি করে 'জীবনের সর্বস্ব হারিয়েও, অপরের অস্তিত্ব ও বিনাশ করতে পারে না। পারলে একমাত্র নিজের অস্তিত্বকেই পারা যায়।'[২৭৪] যে কারণে আত্মহননের পথই একমাত্র পথ। প্রেমের কাছে প্রতিবাদহীন পাপই সমর্পিত হয়। তারপরও মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে এক ব্যর্থ

পিতার আকুতি শোনা যায় তার কণ্ঠে 'অবহেলিত সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলে 'পারলাম না'।[২৭৫] এক ব্যর্থ পিতা তার সন্তানদের জন্য অসীম শূন্যতা রেখে চলে যায়।

অভিজ্ঞান

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি অংশ শিক্ষায় অসামান্য উন্নতি করে। কর্মক্ষেত্রে বড় সফলতার পরিচয় দেয়। *অভিজ্ঞান* উপন্যাসের নায়ক সন্দীপ সফল ব্যাংক কর্মকর্তা। কর্মসূত্রে উচ্চবিত্ত সমাজের সান্নিধ্যে আসে। সন্দীপ কলকাতার অভিজাত পরিবারের বিধবা গৃহকর্ত্রী রাণী দত্তের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। রাণী দত্ত সন্দীপের প্রেমকে উপভোগ করে। রাণী দত্ত বহুপুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছে। স্বামীর কর্মব্যস্ততা ও নিস্পৃহতায় এবং নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করতে রাণী দত্ত অবচেতনে এই নেশায় জড়িয়ে পড়ে :

> প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি মানসিক বা হৃদয়গত দিকগুলোর বিষয়ে, তাঁর স্বপ্ন বা বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামী শ্রীকান্ত দত্ত। কিন্তু কষ্ট কি পাননি ? তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ও বিশ্বাস আস্তে আস্তে যখন নষ্ট হয়েছিল, তার প্রথম পর্বে কষ্ট বোধ করেছেন বইকী। যে কারণে ধীরে ধীরে তাঁর নবজন্ম হয়েছে। মানবিক সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে আবর্জনার মতো ঝেড়ে ফেলেছিলেন। জীবনকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে তার ভাবমূর্তিকে বজায় রাখা, সম্পত্তি ব্যবসা আর্থিক বিষয়ে সর্বত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং গৃহের কাজকর্মের নিয়মানুবর্তিতা এক দিকে, আর এক দিকে দেহ-সম্ভোগ।[২৭৬]

এর ঊর্ধ্বে প্রেম বলে কিছু আছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর রাণী দত্তের অজানা। রাণী দত্ত সফল ব্যবসায়ী এবং সুন্দরী। নিতান্ত ভোগের মোহে সে সন্দীপের মতো সাধারণ ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়ায়। কিন্তু এই সন্দীপই তাকে নতুন জীবন দেয়। সে উচ্চবিত্তের ব্যসন ও ফ্যাশনকে অনায়াসে ত্যাগ করে সাধারণ গৃহবধু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। সন্দীপ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বাবা ব্যাংক কর্মকর্তা ছিলেন, সেই সুবাদে তার ব্যাংকার হওয়া। বিধবা মা এবং দুই ভাই- বোন নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। উচ্চশিক্ষিত তাই পারিবারিক সংস্কার ছেড়ে মননে এবং পোষাকে আধুনিক হয়েছে। প্রেম-বিয়ে সংসার সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে সে রাণীদত্তের রূপ মুগ্ধ। ষাটোর্ধ রাণীদত্তের প্রেমে পড়ে। রাণী দত্তের মধ্যে সে অবচেতনে তার মৃত বউদির সন্ধান করে। যে বউদির সাথে তার একসময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে বলে 'এক সময়ে আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। এটাকে কোন কমপ্লেক্স বলা হবে জানিনে। আদিপাউস?[২৭৭] সেই বউদির প্রতিচ্ছায়া সে রাণী দত্তর মধ্যে খুঁজে পায়। তাদের প্রেমে বয়স কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। রাণী দত্ত তার আভিজাত্যের মোহে সন্দীপকে চাকরি ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু সন্দীপ চাকরি ছেড়ে প্রেমিকার দাস হয়ে থাকতে চায়নি। সে অকপটে বলেছে, 'আমার জীবনে আর কী আছে, কাজ আর তুমি।' [২৭৮]

রাণী দত্তর জীবনে সন্দীপ পঞ্চম পুরুষ। রাণী দত্ত সন্দীপকে শুধু নিঃসঙ্গতার সঙ্গী ভাবলেও সন্দীপ তার আপন ব্যক্তিত্বে রাণীর প্রেমিক হয়ে ওঠে। গর্ভধারণের আনন্দে রাণীর ব্যক্তিবোধের বেদনাবিধুর তমসালোকে নতুন রঙ লাগে। জীবন সম্পর্কে মাতৃত্ব সম্পর্কে সে নতুনভাবে ভাবিত হয়। তার সমস্ত চিন্তাস্রোত মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণে উদ্বেলিত হয়। সন্দীপের কাছে অনাগত সন্তানের স্বীকৃতি চায়। সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সন্দীপের স্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সামাজিক মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সন্দীপের সাথে চলে যেতে চায়।

সন্দীপ তার মধ্যবিত্ত জীবনে রাণী দত্তকে কীভাবে মানিয়ে নেবে এবং তার প্রেমিক আদৌ নিজেকে মানাতে পারবে কিনা এই দ্বিধা তাকে তাড়িত করে। সে বলে 'আমিই বা তোমায় কোথায় নিয়ে যাব? কোন জীবনে? সারাটা জীবন যেভাবে কাটিয়েছ, তারপরে একজন সামান্য ব্যাংকের ম্যানেজারের বউ হয়ে তুমি থাকবে কেমন করে ?'[২৭৯] ভালোবাসা মানুষকে সাহসী হতে শেখায়। তাইতো রাণী দ্বিধাহীনভাবে বলেছে 'আমি তোমার সঙ্গে যে কোনও অবস্থায় থাকতে পারব। যে কোনও অবস্থায় দরকার হলে বস্তিতে।[২৮০]

অনাগত সন্তানের স্বীকৃতিতে তারা একমত হয়। তারপরও অবচেতনে দুজনের সংকোচ, দ্বিধা, জীবন সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। তবে দুজন নরনারীর অসম প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

সমরেশ বসুর সদর্থক জীবনভাবনায় বিশ্বাসী। তার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই প্রেম অনেক ক্ষেত্রেই দেহভিত্তিক, রূপজ কামনায় উদ্বেল এবং হৃর্দিক সম্পর্কে গভীর। সমরেশের প্রেম-চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসরল তীর্যক এবং ব্যতিক্রমী সম্পর্কের প্রকাশ।[২৮১] প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি জটিলতার বিরোধী। নারী পুরুষের পরস্পরকে চেনা এবং মিলনে বিশ্বাসী। সামাজিক শ্রেণিভাবনা সেখানে কোন প্রভাব ফেলে না। যে কারণে *অভিজ্ঞান* উপন্যাসে মধ্যবিত্তের প্রেমভাবনা জয়ী হয়েছে। নাগরিক নগ্নতা এবং অন্তঃসারশূণ্যতাকে সে ভালোবাসা দিয়ে জয় করে। তাই সন্দীপের স্বগোতোক্তি 'তুমি আমাকে ডাকোনি, আমি তোমার কাছে এসেছিলাম।'[২৮২] সন্দীপ তার সামাজিক পদমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে এই বর্ষীয়ান নারীর মাতৃত্বকে সম্মান দিয়েছে এবং নিজেও সম্মানিতবোধ করেছে।

জবাব

'জায়া ও পতির নিপাতনে সিদ্ধ শব্দবদ্ধ' 'দাম্পত্য' ভৃত্য-প্রভুর সমাজমনস্তত্ত্ব ধারণ করে অসম সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। সমাজ বিকাশের ধারায় প্রাথমিক পর্যায়ে নারী অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে

বিবেচিত হতো। সেই সমাজে বহু বিবাহ একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু মানুষ এত সভ্য হয়েছে বিয়ে একটি আইনসিদ্ধ ব্যাপার বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[২৮৩] মূলগতভাবে নর-নারীর দাম্পত্যজীবন আর্থসামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পরিবার অর্ন্তগত বিশেষ যৌননীতি।[২৮৪] ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারায় দাম্পত্যসম্পর্ক বাস্তবধর্মী নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং মীমাংসা খুঁজেছে। বিবাহ ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়েছে। দাম্পত্যসম্পর্কে প্রেম কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। 'প্রেম কর্তব্যে পরিণত হলে তা আর প্রেম থাকে না।[২৮৫] মধ্যবিত্ত দাম্পত্যসম্পর্কে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়ক হতে চেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে দাম্পত্যসম্পর্ক নতুনভাবে ব্যাখ্যা পেয়েছে। প্রথাবদ্ধ যৌননীতি চিরন্তন অতৃপ্ত নরনারীকে আর মুক্তি দিতে পারেনি। উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত নিজেদের মতো পথ খুঁজেছে আর মধ্যবিত্ত তার আপন পরিবৃত্তির মধ্যে সমাধান খুঁজেছে। শৈবাল-শিখার সুস্থ-স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের আড়ালে যে ভণ্ডামি তা লেখক সাবলিরভাবে রূপ দিলেন। তবে মধ্যবিত্ত পরিকাঠামোর মানস বিধায় শিখার আত্মহুতির মাধ্যমে লেখক সমাধান এনেছেন। কেননা মধ্যবিত্ত সমাজ যৌনতার ক্ষেত্রে নারীর দ্বিরাগমন কখনোই স্বাভাবিকভাবে নেয় না। প্রায়শ্চিত্ত তার প্রাপ্য।

শৈবাল রক্ষণশীল উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সাহিত্যানুরাগী, পেশায় সরকারি কর্মকর্তা। শিখাকে বিয়ের অপরাধে স্বগৃহচ্যূত। কেননা শিখা পূর্ববাংলার বদ্যিবাড়ির মেয়ে। শিক্ষায় সংস্কারে কোনোভাবেই শৈবালের সমকক্ষ নয়। শৈবালের বাবা আভিজাত্যের অহমিকায় তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি।

আট বছরের দাম্পত্যজীবনে তারা নিঃসন্তান। শৈবাল পিতৃত্বকে ভয় পায়, কারণ সে বীর্যহীন। নিয়তি নির্ধারিত বন্ধ্যাত্ব জীবনকে সে অস্বীকার করে। মধ্যবিত্তসুলভ পৌরুষের অহংকার থেকে ডাক্তারি নকল রিপোর্ট তৈরি করে শিখাকে জানায় সে বাবা হতে পারবে। উচ্চশিক্ষিত শৈবালের কিছু নিজস্বতা আছে। সে মনে করে 'মানুষ নিজেকে সব থেকে কম চেনে, আর সেই অপরিচয়ের মধ্য দিয়েই তার জীবন চালিত হয় যেন এক অপ্রাকৃত বিস্ময়ের পথে। মানুষের জীবনে সেটাই সব থেকে বড় অসহায়তা।[২৮৬] নিজের পিতৃত্বের খবর শুনে সে সবচেয়ে বেশি অসহায়বোধ করে :

> কথাটা যখন শুনলাম, মনে হল আমার সর্বাঙ্গ অসাড়। সাপের ছোবল খাওয়া কাকে বলে, কী সেই ভীষণ যন্ত্রণা এবং নির্ঘাৎ মৃত্যু, সে অনুভূতির কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু কথাটা যখন প্রথম শুনলাম যে মুহূর্তে শুনলাম, সেই মুহূর্তেই মনে হল, ভয়ংকর বিষাক্ত সাপের আচমকা দংশনে, আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। শরীরের সমস্ত রক্তধারা দলা পাকাতে আরম্ভ করেছে। জিভ গলা মৃত্যু আমাকে দ্রুত গ্রাস করছে। আমার চোখের সামনে নেমে আসছে গাঢ় অন্ধকার। অথচ আমার চোখের সামনে তখন শুধু শিখার অনিন্দ্যসুন্দর নিষ্পাপ মুখটিই ভাসছিল।[২৮৭]

তার বারবার মনে হয়েছে 'শিখা কি আমার আসল অক্ষমতার কথা জানতে পেরেছে।[২৮৮] শৈবাল তার মিথ্যার জালে নিজেই ধরা পড়েছে। শৈবাল দাম্পত্যজীবনে শিখার বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করেছে। অথচ

দাম্পত্যসম্পর্কে যে কেউ অন্য জনের প্রেমে গভীরভাবে নিমজ্জিত থাকতে পারে। শৈবাল এই দিক থেকে সততার পরিচয় দিয়েছে। দাম্পত্যজীবনে সে সুখী। দাম্পত্য সুখের পূর্বশর্তসমূহের প্রায় সবগুলিই সে পূরণ করেছে। স্ত্রীকে সমান অধিকার দিয়েছে, তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়নি, শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্ক স্থাপনে আন্তরিক এবং উভয়ে উভয়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একটি মাত্র মিথ্যা তার সম্পর্কের আভিজাত্য চূর্ণ করে দেয়। শিখার মাতৃত্বের খবরে মুহূর্তে সে শৈবালের কাছে অবিশ্বাসিনী হয়েছে— 'আমার শয্যা সঙ্গিনী স্ত্রী পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী, অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী, যে পিতৃত্বের মিথ্যা দায় আমি এখনও বহন করছি।[২৮৯] মুহূর্তের ভাবনা থেকে সে শিখাকে শেষ করে দিতে চেয়েছে কিন্তু 'কে সেই পুরুষ' জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে শিখাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যখন শিখার মুখ থেকে অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় পেয়েছে তখন মানসিক ঔদার্যতায় সেই জারজ সন্তানের পিতৃত্বের দায় নিজেই নিতে চেয়েছে। শিখার প্রবল আপত্তি শৈবালকে নিরস্ত করেছে। মধ্যবিত্তের দোদুল্যমান চরিত্রাভিব্যক্তি নিয়ে শৈবাল শিখাকে বলেছে 'বেশ রাত পোহালে চলো কলকাতায় যাই। এখনও যদি গর্ভপাতের উপায় থাকে। তবে তাই হবে ... তবু তোমাকে আমি হারাতে চাইনা।'[২৯০]

মধ্যবিত্ত সর্বদাই দাম্পত্যসম্পর্কে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়ক। দাম্পত্যসম্পর্কে প্রথাবদ্ধ যৌননীতি কখনোই নারীকে মুক্তি দিতে পারেনি। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নারী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র কিংবা ভোগ্যপণ্য থাকতে চায়নি। এক্ষেত্রে সে স্বাধীনতা চেয়েছে। ফলে দাম্পত্যসম্পর্কে অনিবার্যভাবে এসেছে জটিলতা। শিখা শৈবালকে ভালোবেসে মাত্র ষোলো বছর বয়সে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু বিবাহিত জীবনের শুধু শৈবালে স্থিত থাকতে পারেনি। রজতের প্রতি নিষ্কাম প্রেমে সুখ অনুভব করেছে। শৈবালের তীব্র শরীরী আকর্ষণের বিপরীতে শিখার প্রেম-অপ্রেমের দ্বান্দ্বিক হৃদয় মুক্তি চেয়েছে। শৈবালের ভালোবাসা দেহসর্বস্ব ভেবে রজতকে কামনা করেছে। রজতের কাছে জানতে চেয়েছে সুখী হওয়ার মন্ত্র। রজত দ্বিধাহীনভাবে বলেছে সহৃদয়, সক্ষম, কর্তব্যপরায়ণ স্বামীই স্ত্রীকে সুখী করে। শৈবালের সেই গুণ আছে। কিন্তু শিখার অনুভুবনে মাতৃকাঙ্ক্ষাজনিত শূন্যতা থেকে সে সুখী নয়। আর তাইতো খুব সহজে উমেশের কাছে প্রেমবঞ্চিত নিবিড় সান্নিধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। 'উমেশ আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড পরীক্ষার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই পরীক্ষার অনিবার্যতার মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করেছিলাম, আমি সত্যি গর্ভবতী হয়েছি।[২৯১] উমেশ শিখাকে কখনোই ভালোবাসেনি। তার কাছে শিখা 'ভোগবাসনা চরিতার্থ করার একটা সুখের যন্ত্র মাত্র।'[২৯২] শিখা জীবনের চরম মূল্য দিয়ে বোঝে 'সব কৌতূহলের নিরসন করতে নেই। সব জানার চেষ্টাও করতে নেই।'[২৯৩] বহুকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব

শিখাকে তৃপ্ত করেনি। গোপনীয়তা আর পাপবোধ ছাড়া ভাবী সন্তানের জন্য সে কিছুই ভাবতে পারে না। দ্বান্দ্বিক মানসতা থেকে শিখা এই বোধে উপনীত হয় :

> পতনের গহ্বরে অমি যখন নামছিলাম তখন মনে হয়েছিল, দেহসর্বস্ব আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে না। উমেশের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ বেড়েছিল। এখন দেখছি সবই বিপরীত।[২৯৪]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী তার আপন দেহের আধিকার হারায়। যৌনতা কিংবা সন্তান গর্ভে ধারণের প্রক্রিয়ায় পুরুষই কর্তা, নারী সামাজিক উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ।[২৯৫] শিখা এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় প্রেমহীন ভোগসর্বস্বতায় শিখা সমর্পিত হয়েছে, যা ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ। আর সে কারণেই লেখক শিখাকে আত্মগ্লানিতে পরাভূত করেছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শৈবালকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় তার অনুবেদনা :

> যে অপরিণামদর্শী কৌতূহল আর অবিশ্বাসে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তার থেকে আমি একটাই মাত্র পথ খুঁজে পেয়েছি। সেই পথেই আজ আমি চলিলাম।[২৯৬]

মধ্যবিত্ত সমাজের নেতিবাদী চরিত্র উমেশ। মদ-নারী-মাৎসর্য যার একমাত্র সম্বল। সমান লেখাপড়া শিখে লেবার অফিসের সুপারভাইজার। উমেশের শব্দচয়ন, ভাষাভঙ্গিমায় তার চরিত্রের নেতিবাচক দিক প্রকাশিত :

> তোমার যখন ভাল লাগবে তখন তু তু করে ডাকবে আর যখন ভাললাগবে না মানে দরকার ফুরিয়ে যাবে, তখন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। উমেশ দাশশর্মা সে পাত্র নয়।[২৯৭]

উমেশের ক্রমাগত উস্কানিতে শিখার মাতৃকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছিল। উমেশ সুযোগ বুঝে শিখাকে ব্লাকমেইল করে। উমেশের হাত থেকে বাঁচতেই শিখা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে।

আধুনিক সমাজে নারীর শিক্ষা তাকে স্বতন্ত্র করেছে। নারীর শিক্ষা-রুচির ভাবনার নানাবিধ পরিবর্তন দাম্পত্যসম্পর্ককে বাস্তবধর্মী কিছু সমস্যার সম্মুখীন করেছে। যেকারণে শৈবাল-শিখার দাম্পত্যসঙ্কট সৃষ্টি হয়। আবার প্রথাবদ্ধ যৌননীতি তাদের দাম্পত্যসম্পর্কের মুক্তি আনেনি। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় খুব সহজেই শিখা পথ হারায়। স্বামী হিসেবে শৈবালের উদারতা এবং জারজ সন্তানের মৌখিক স্বীকৃতি দানের প্রতিশ্রুতি শিখার আত্মহননকে রুখতে পারেনি। কেননা সমাজের চোখে শিখা পাপী তাই শাস্তি তার প্রাপ্য। আধুনিক সমাজের মানুষ হিসেবে লেখক শিখার আত্মাহুতির মাধ্যমে সমাধান আনলেন।'[২৯৮]

এছাড়া আরও কিছু উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের কথা পাওয়া যায়, যেমন *ওদের বলতে দাও* উপন্যাসে গোরা-বাঁশি, নিখিল, কেতকী, নীলু, পুতুল,অসীম, রুবি, অনিশ, কৃষ্ণার আশা-অকাঙ্ক্ষা নিপূণভাবে

চিত্রিত।[২৯৯] এই মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণী সবাই মানবতাবাদী। শৌভিকের মৃত্যতে বাঁশির কেবল একটি কথা মনে হয় 'যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়, গান্ধীর বুকে বুলেট বেঁধে।[৩০০] শৌভিকের লাশ কাঁধে নিয়ে তারা আবার এক হয়। তবে শৌভিকের নিহত হওয়া নিয়ে অনেক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন প্রাজ্ঞ সমালোচক নির্মল ঘোষের মতে— 'শৌভিক নামক এক আধাবাউল, আধা রাবীন্দ্রিক চরিত্রের নিহত হবার যে কাহিনি উপন্যাসে গুরুত্ব পায়, তা বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে নকশালবাদীদের প্রতি বিরূপ করে তোলার পক্ষে খুবই উপযোগী।'[৩০১]

যাত্রিক উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মধ্যবিত্ত বেকার যুবক পুরন্দরের প্রতিষ্ঠার লড়াইকে। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনায় সে তার প্রেমকে জলাঞ্জলি দেয়। পুরন্দরের চাকরি সূত্রে নগর কলকাতার ক্লেদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পুরন্দরের প্রেমিকা জীবনের চরম মূল্য দিয়ে পুরন্দরকে চাকরি পাইয়ে দেয়। চাকরি পেয়ে ওপরে ওঠার বাসনায় সুবিধাবাদী পুরন্দর অন্য নারীতে আসক্ত হয় এবং রীণাকে ভুলে যায়। বিকৃতি আর অবক্ষয়ের সমাজ থেকে রীণা মিশনারী কলেজে চাকরি নিয়ে শিলং- এ চলে যায়। পুরন্দর যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে তখন রীণা আর তার আহবানে সাড়া দেয় না।

মহাকালের রথের ঘোড়া উপন্যাসে রুহিতন মধ্যবিত্তের শ্রেণিচরিত্র বুঝতে পারেনি। যেমন সে বোঝেনি খেলু চৌধুরী, পেশাজীবী মধ্যবিত্তের শ্রেণি প্রতিনিধি পুলিশ অফিসারকে বা সশস্ত্র রক্ষী কিংবা ওয়ার্ডারের চরিত্রকে। সশস্ত্র রক্ষী কিংবা ওয়ার্ডাররা অকারণেই বন্দিদের সাথে দুর্ব্যবহার করত। একারণেই ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় সে গাড়ির মধ্যে রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ অফিসারের আচরণ রুহিতনের বোধগম্য হয়নি। রুহিতন এই পুলিশ অফিসারকে দশ বছর আগে খড়িবাড়ি থানায় প্রথম দেখেছিল। দ্বিতীয়বার দেখে সে যখন পরাজিত, রক্তাক্ত এবং পর্যদুস্ত। তৃতীয়বার দেখা হয় যখন পুলিশ ক্যাম্পে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছিল তখন এই পুলিশ অফিসার তাকে সিগারেট খেতে দিয়েছিল। পুলিশের এই বৈচিত্রময় আচরণে সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কেননা এই পুলিশ অফিসার জানত রুহিতনই পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করেছে। আবার দিবা বাগচি জোতদার-পুত্র হয়েও নকশাল আন্দোলনে যোগদান এবং নেতৃত্ব দেয়ার কারণ সে বেঝেনি। কিন্তু দিবা বাগচির 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার' লড়াইয়ে সে একাত্ম হয়েছিল। জেলে আসার কিছুদিন পরে সে জানতে পারে দিবা বাগচি ধরা পড়ার পর হার্টফেল করে মারা যায়। খেলু চৌধুরীর চরিত্র তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে কেননা খেলু চৌধুরীরা মনে করে দিবা বাগচি নিজে যেহেতু শ্রেণিশত্রু ছিল তাই সে দলকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। যেকারণে সে রুহিতনকে সন্দেহ করে এবং তাকে বড়কা ছেত্রীর টাকায় লবু খাঁকড়ি অর্থাৎ

মেয়ে কাঁকড়ার সাথে সঙ্গ করা এবং তার ফলে কুষ্ঠ রোগ হওয়ার অপবাদ দেয়। অথচ রুহিতন জানে শনিলালের জোতে কাজ করা পেরওয়ার সাথে মুক্ত এলাকা গড়ে তোলার সময় তার মধ্যে কুষ্ঠের জীবাণু প্রবেশ করে কেননা পেরওয়া ছিল কুষ্ঠ রোগী। রুহিতনের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রহসন হচ্ছে সে যখন বাস থেকে নেমে গ্রামে প্রবেশ করে তখন যারা তাকে নিতে আসে। এদের মধ্যে একজন কাছিমুদ্দিন, যে রুহিতনের দলের হাতে নিহত রুকনুদ্দিন আহম্মদ এর ভাই। আরেকজন নরসিং ছেত্রী মোহন ছেত্রীর ভাইপো। কোনো সাধারণ গরীব মানুষ তাকে নিতে আসেনি। সে লক্ষ করে জেলের থেকে বাইরের বাস্তবতার অসংগতি অনেক বেশি। তার স্ত্রী তাকে এড়িয়ে চলে পুত্ররা কাছে আসে না। তার ছেলেরা শাসকদলের ঝাণ্ডা নিয়ে ঘোরে। সরকার তার স্ত্রী-পুত্রদের চাষের জমি এবং বাড়ি করার খরচ দিয়েছে। সংসারে সে এখন অযাচিত।

পরিশেষে বলা যায় সত্তর দশক পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-রাজনীতিতে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, নির্মাণ-বিনির্মাণের সন্নিবন্ধন। সত্তর দশকের গোড়ায় নকশালবাদী আন্দোলনের উন্মাদনা ও তা দমনে শাসকগোষ্ঠীর পৈশাচিক তাণ্ডব এবং ’৭৭-এর পূর্ব পর্যন্ত বিরোধী পক্ষকে দমন পীড়নে ফ্যাসীবাদী কায়দায় শাসন নিপীড়ন সমরেশ বসুকে পীড়িত করেছিল। ’৭৭ পূর্ব ঘটনা সমৃদ্ধ উপন্যাসে তিনি দেখালেন রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মানুষ কিভাবে চাপা পড়ে মার খাচ্ছে, মানুষের মুক্তির মূল প্রতিবন্ধকতা রাজনীতি। ক্রমশ তাঁর চরিত্ররা রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়েছে। ’৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণে রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা কমে আসে। মূলত এই সময়ের সমাজ-রাজনীতির দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল-পরিবেশ-পরিস্থিতি মধ্যবিত্ত জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাই লেখক দেখালেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শৃঙ্খলা, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র চেয়েছিল। সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলতে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রতিবাদ-প্রতিরোধকেই তিনি প্রাধান্য দিলেন। মধ্যবিত্তের জীবন বর্ণনায় তিনি উচ্চ এবং মধ্য মধবিত্তের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা, তাদের অবনমন এবং নিম্নমধ্যবিত্তের ছিন্নমূল জীবনসঙ্কট উভয়দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি লক্ষ করেছেন উচ্চ ও মধ্যশ্রেণিভুক্ত মধ্যবিত্তদের ক্রমিক বিত্তবৃদ্ধি, কামনা-বাসনা ও ভোগাবিলাস বৃদ্ধি তাদের জীবন আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার অন্যদিকে ধনতান্ত্রিকতার বিকাশে নিম্ন মধ্যবিত্ত চরমভাবে আর্থিক দারিদ্র্যের শিকার হয়েছে। ফলে তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন-ধারণের সংকটই মূখ্য বিষয় হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সমরেশ বসুর মৃত্যু হয় ১৯৮৮ সালে। মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিশীলতা অক্ষুণ্ন ছিল। ফলে তাঁর বেশ কিছু রচনা তার অন্তর্ধানের পর প্রকাশিত হয়। আবার কিছু লেখা অসমাপ্তও থেকে যায়। যেমন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে* তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। আমাদের অন্বিষ্ট বিষয় 'সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবন'। *দেখি নাই ফিরে* অসমাপ্ত রচনা বিধায় আমরা এ উপন্যাস তাঁর অন্ত্য পর্বের আলোচনায় আনিনি। সে-হিসেবে তাঁর অন্ত্য পর্বের সময়সীমা (১৯৭১-১৯৮৮) সাল পর্যন্ত বিবেচনা করেছি।

২. যদিও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি দশকের হিসেবে চলে না, তবু আলোচনার সুবিধার্থে মোটা দাগ অনেক সময় কাজে লাগে। অরুণকুমার বসু, *কথাশিল্পের নানাদিক* (কলকাকা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,২০০৬), পৃ. ২২৯

৩. সরোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস : সেকাল একাল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯১), পৃ. ১৯৭-১৯৮

৪. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০১), পৃ. ৬৯৭

৫. ঝুমা রায়চৌধুরী, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন, প্রথম খ* (কলকাতা : পূর্বাশা, ২০০৭), পৃ. ৩৬৬

৬. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী -৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯২

৭. Erich Fromm, *The Art of Loving*, Thorsons, London, Thorsons Edition 1995, P. 41

৮. সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার*, (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০৬), পৃ. ২৮২

৯. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯০

১০. *তদেব*, পৃ. ৭১৪

১১. *তদেব*, পৃ. ৬৯১

১২. আমিনুর রহমান সুলতান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা (১৯৪৭-১৯৯৭)*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৬১

১৩. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯৩

১৪. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১) পৃ. ১১০

১৫. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯৯

১৬. *তদেব*, পৃ. ৭০১

১৭. *তদেব*, পৃ. ৭০৬

১৮. প্রমোদ সেনগুপ্ত 'মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ', *নির্বাচিত কালপুরুষ (১৯৬৭-১৯৬৯) সংশোধনবাদবিরোধী সংগ্রাম ও নকশালবাড়ি*, সম্পাদক, দীপঙ্কর চক্রবর্তী (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি ২০১১) পৃ. ১৩৫

১৯. মার্কসবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্ববীক্ষা। ভাববাদী দর্শন আর বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান বারংবার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছে। সম্পাদক : ধনঞ্জয় দাশ, মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতক প্রসঙ্গে', *মার্কসবাদী সাহিত্য-বির্তক* (অখ), (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০৩) পৃ. ১

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশ করার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মার্কসবাদ কী এক কথায় এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মার্কবাদ সম্পর্কে লেনিন বলেছেন Marxism is the system of the views and teachings of Marx কার্ল মার্কসই মার্কসবাদের প্রধান রূপকার। মার্কসবাদ হলো একটি সঠিক সমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব। মার্কসবাদ হলো দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে শ্রেণিসগ্রামের মাধ্যমে বিশ্বব্যপী শোষিত-বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই হলো মার্কসবাদের মূল কথা।

কার্ল মার্কস প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রেরণা পেয়েছিলেন হেগেলীয় 'দ্বন্দ্ববাদ' বা 'দ্বান্দ্বিক ভাববাদ' থেকে। কিন্তু হেগেলীয় চিন্তাধারা থেকে তিনি ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হেগেলের বস্তুবাদের মূলে ভাব ক্রিয়াশীল, আর মাকসীয় বস্তুবাদে জড়বস্তু ক্রিয়াশীল। কার্ল মার্কসের মতে, বস্তুগত প্রয়োজন থেকে এবং সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হয়। এই বস্তুগত প্রয়োজন হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজন। পরসম্পর বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থ ও শক্তির দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ বিবর্তন ধারা অব্যাহত থাকে। কার্ল মার্কসের এই বিবর্তন ধারাকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব। মার্কসের মতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক সভ্যতার বিবর্তন প্রক্রিয়া, মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরস্পর সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রাচীন যুগের ক্রীতদাস ও স্বাধীন শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগের সামন্ত শ্রেণি ও সাঢর্ফ বা ভূমিদাসদের দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক যুগের মালিক ও মজুর শ্রেণির দ্বন্দ্ব একই অর্থনৈতিক প্রয়োজনভিত্তিক মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল কথা।

ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটেই কার্ল মার্কস তার শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য প্রদান করতে গিয়ে মার্কস শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছেন। কার্ল মার্কসের মতে, শ্রেণিসংগ্রাম ব্যতীত সামাজিক বিকাশ সম্ভব নয়। সমাজের গতিশীলতা বিকাশে শোষক ও শোষিতের মধ্যে বৈরিতা থেকে সৃষ্টি হয় শ্রেণিসংগ্রাম। সমাজের যেখানেই শ্রেণিভেদ চোখে পড়ে সেখানেই হয় প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন শ্রেণিসংগ্রাম ক্রিয়াশীল থাকবেই। মার্কস বলেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে শ্রেণিসংগামের ইতিহাস। মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব ইতিহাসের জড়বাদী ও অর্থনৈতিক মতবাদের অনুসিদ্ধান্ত। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে যদি সামাজিক পরিবর্তনের পথ বলা হয় তবে শ্রেণিসংগ্রামকে নিঃসন্দেহে সমাজ পরিবর্তনের কৌশল। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন সাম্যবাদী অবস্থা থেকে শ্রেণিব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং প্রত্যেক সমাজে একটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং শোষণ করে। ফলে সমাজের শাসন ক্ষমতাও তাদের হাতে চলে যায়। শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে শাসক শ্রেণি সমাজের শোষিত শ্রেণিকে অধিকার সচেতন, বিদ্রোহী ও শক্তিশালী করে। তখন শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে চায়। সবশেষে তারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে নতুন শাসক শ্রেণীর অবসান ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

২০. সংশোধনবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Revisionism, ল্যাটিন শব্দ Rividere থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ কোনো কিছু পুনরায় নিরীক্ষণ করা। Wikipedia, the free encyclopedia তে Revisionism ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে— ঐতিহাসিক সংশোধনবাদ, যা স্নায়ু যুদ্ধকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট গবেষণার ধারণাকে অস্বীকার করা। oxford advanced learner's dictionary তে Revisionism কে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— Revisionism- n[u] (Often derg) changes to, or doubts about, Standard political ideas or practices, esp Marxism. A S hornby, oxford advanced learner's dictionary of current English, fifth edition, oxford university press, Walton Street, 1997

সংশোধনবাদের সাথে লাসালে, বার্নস্টাইন, কাউটস্কির নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এঁদের ছাড়া সংশোধনবাদের কথা ভাবাই যায়না। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর ১৮৬০ সাল থেকে জার্মানীতে লাসালের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন আবার নতুন উদ্যমে শুরু হলো।... লাসালের কর্মসূচি ছিল বিপ্লববিরোধী, সংস্কারপন্থি, সুবিধাবাদী ও জাতীয়তাবাদী। তাঁর প্রধান তিনটি দাবী ছিল সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, রাষ্ট্রের সাহায্যে উৎপাদন সমবায়, এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র। লাসালে মনে করতেন জনসাধারণ একবার ভোটাধিকার পেয়ে গেলে পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন জনসাধারণের প্রতিনিধি হবে এবং তাঁদের উপরই রাষ্ট্র পরিচালনার ভার এসে পড়বে।... বুর্জোয়া অর্থনীতির ভিত্তিতে লাসালে জার্মানীতে শ্রেণিসংগ্রাম বর্জিত সংস্কারপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁর মূল কথা ছিল এই যে, সামন্ত-বুর্জোয়া-শোষকশ্রেণির রাষ্ট্রকে মেনে নিয়ে তারই সাহায্যে শোষণহীন, পুঁজিপতিহীন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করা যায়। এটাই হচ্ছে লাসালীয় সংশোধনবাদ। ইতিমধ্যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণি কিছু কিছু দাবী আদায়ে সক্ষম হয়। যেমন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার, ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী যুগের প্রথম থেকেই বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ইনসিওরেন্স, জাহাজ কোম্পানি ইত্যাদি গড়ে ওঠে তার ফলে একদল দক্ষ ও ভদ্র শ্রমিকের (white collar workers) আবির্ভাব হয়। শিক্ষিত হওয়ার ফলে এরা ক্রমশঃ ট্রেড ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। পূর্বেকার চ্যাটিস্ট শ্রমিকদের জঙ্গী দৃষ্টি ভঙ্গি এদের মধ্যে ছিল না। তখন থেকেই শুরু হলো ব্রিটিশ শ্রমিকদের এঙ্গেলসের কথায়. 'চল্লিশ বৎসরের শীতকালীন নিদ্রা'। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এই অবস্থা আসতে বেশি সময় লাগেনি। এই সব পাতি-বুর্জোয়ারা যখন শ্রমিক আন্দোলনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখনই সংশোধনবাদের উদ্ভব হয়।

মার্কস-এঙ্গেলস লাসালীয় সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। মাকর্স-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সংশোধনবাদ শ্রমিক আন্দোলন বার্নস্টাইন ও কাউটস্কির নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়েছিল। ভারতের মার্কসবাদ লেলিনবাদ শুরু থেকেই সংশোধনবাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ডাঙ্গে আই নেতৃত্বে সি. পি. আই-এর ক্রুশ্চেভীয় সংশোধনবাদ এবং মাকর্সবাদী নেতৃত্বের নয়া সংশোধনবাদ মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। প্রমোদ সেনগুপ্ত, মাকর্সবাদ ও সংশোধনবাদ, নির্বাচিত কালপুরুষ (১৯৬৭-১৯৬৯) সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও নকশালবাড়ি, সম্পাদক, দীপংকর চক্রবর্তী (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল, ২০১১), পৃ. ১৪৪-১৪৬

২১. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৫*, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ৭০৪

২২. *তদেব*, পৃ. ৭০৭-৭০৮

২৩. *তদেব*, পৃ. ৭০৭

২৪. পূর্বের দশকের ন্যায় ষাটের দশকে খাদ্য সংকট থাকলেও '৬৬ সালের আগে বড় কোনো আন্দোলন হয়নি। এই আন্দোলনের সময় কলকাতার রাস্তায় ছাত্র-জনতা নেমে এসেছিল। ছাত্র পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সময়ে একাধিক বাংলা বনধ্ এবং অভূতপূর্ব বিশাল মৌন মিছিল দেখা যেত। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী কলকাতায় এলে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট রেশন ও লেভি প্রথার কিছু পরিবর্তন চাইল। কংগ্রেসী রাজ্য সরকারও আন্দোলনের চাপে খাদ্যনীতি কিছুটা শিথিল করে। ফলে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি ২০০৭), পৃ. ৭৫
২৫. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৭১৮
২৬. *তদেব*, পৃ. ৭৮২
২৭. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৮
২৮. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৭১৮
২৯. *তদেব*
৩০. *তদেব*, পৃ. ৭২৪
৩১. অশ্রুকুমার শিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ২৯২
৩২. সমরেশ বসু, *বিশ্বাস, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫, পুর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭৮
৩৩. *তদেব*, পৃ. ৭৭৯
৩৪. *তদেব*, পৃ. ৭৮১
৩৫. *তদেব*, পৃ. ৬৯১
৩৬. সমরেশ বসু, *ছায়া ঢাকা মন, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০২), পৃ ৭০
৩৭. *তদেব*, পৃ. ৭৫
৩৮. *তদেব*, পৃ. ৭৬
৩৯. *তদেব*, পৃ ১৪০
৪০. *তদেব*
৪১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), 'মনঃ মৃত্তিকাঃ মানুষ' *সমরেশ রচনাবলী*-৬ ভূমিকাংশ
৪২. সমরেশ বসু, *ছায়া ঢাকা মন, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, *পুর্বোক্ত*, পৃ ১৪০
৪৩. সমরেশ বসু, *অন্ধকার গভীরতর, সমরেশ বসু রচনাবলী*- ১২, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৫২৩
৪৪. *তদেব*, পৃ. ৫২৪
৪৫. *তদেব*, পৃ. ৫৪৩
৪৬. *তদেব*, পৃ. ৫৪৫
৪৭. *তদেব*, পৃ. ৫৪৭
৪৮. সমরেশ বসু, *অশ্লীল, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ২৩
৪৯. *তদেব*, পৃ. ২৫
৫০. *তদেব*, পৃ ১৫
৫১. *তদেব*
৫২. *তদেব*, পৃ. ৫৯
৫৩. *তদেব*, পৃ. ৮৫
৫৪. *তদেব*, পৃ. ৮৭
৫৫. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *সাহিত্যের সামাজিকতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫) পৃ. ৯০
৫৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, 'সংক্রান্তি অভিমুখে', ভূমিকাংশ, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৮*, আনন্দ পাবলিশার্স (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., এপ্রিল ২০১১)
৫৭. সমরেশ বসু, 'বৃত্তভঙ্গের পূর্ব অধ্যায়', ভূমিকাংশ, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *সমরেশ বসু রচনাবলী-১২*, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., জানুয়ারি ২০০৮)
৫৮. সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাতকার, অনুলেখক : নিতাই বসু, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৯. পৃ. ৩০
৫৯. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা, সমরেশ বসু রচনাবলী-৫*, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৬১

৬০. *তদেব*, পৃ. ২৭৬
৬১. *তদেব*, পৃ. ২৭৭
৬২. *তদেব*, পৃ. ৪২৮
৬৩. *তদেব*, পৃ. ৪২৯
৬৪. *তদেব*, পৃ. ৪৪৩
৬৫. *তদেব*, পৃ. ২৭১
৬৬. *তদেব*, পৃ. ২৭৬
৬৭. *তদেব*, পৃ. ২৬৩
৬৮. *তদেব*, পৃ. ২৯৯
৬৯. *তদেব*, পৃ. ২৬৭
৭০. *তদেব*, পৃ. ৩৫৩
৭১. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উপন্যাস', বিজয় দিবস সংখ্যা, *দৈনিক বাংলা বাজার* ১৯৯২ ঢাকা , উদ্ধৃত : আমিনুর রহমান সুলতান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯
৭২. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৬
৭৩. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৫
৭৪. *তদেব*, পৃ. ৫১৫
৭৫. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪১
৭৬. *তদেব*, পৃ. ৪৪১
৭৭. *তদেব*, পৃ. ৩৩১
৭৮. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১৬
৭৯. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৩
৮০. *তদেব* পৃ. ৪১২
৮১. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,পৃ.* ৫১৯
৮২. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪৯
৮৩. *তদেব*, পৃ. ২৫৭
৮৪. *তদেব*, পৃ. ২৬৮
৮৫. *তদেব*
৮৬. *তদেব*, পৃ. ২৬৭
৮৭. সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার, অনুলেখক : নিতাই বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১
৮৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২১৫
৮৯. সমরেশ বসু, *ত্রিধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৫, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৮
৯০. *তদেব*, পৃ. ৪০১
৯১. *তদেব*, পৃ. ৩৬০
৯২. *তদেব*, পৃ. ৩৬২
৯৩. সমরেশ বসু, *আয়নায় আমার মুখ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০২),পৃ. ৬৪১
৯৪. হরিশংকর জলদাস, *বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ* (ঢাকা : রোদেলা, ২০১২) পৃ. ২২
৯৫. সমরেশ বসু, *আয়নায় আমার মুখ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪৩
৯৬. *তদেব*, পৃ. ৬৪৬
৯৭. *তদেব*, পৃ. ৬৮৫
৯৮. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৩১
৯৯. সমরেশ বসু, *আয়নায় আমার মুখ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, *পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬৫
১০০. *তদেব*, পৃ. ৬৭৩
১০১. *তদেব*, পৃ. ৬৮৩
১০২. *তদেব*, পৃ. ৬৮৪

১০৩. *তদেব*
১০৪. *তদেব*, পৃ. ৬৮৫
১০৫. *তদেব*
১০৬. *তদেব*
১০৭. *তদেব*, পৃ. ৬৮৬
১০৮. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* পৃ. ৬৭
১০৯. Colin Wilson, *Origins of the Sexual Impulse,* (London : Granade Publishing Ltd., reprint 1978), p. 18
১১০. Ibid. p. 19
১১১. সমরেশ বসু, *বারোবিলাসিনী, সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩, পুর্বোক্ত,* পৃ. ১৪০
১১২. *তদেব*, পৃ. ১৪১
১১৩. *তদেব*
১১৪. *তদেব*, পৃ. ১৩৮
১১৫. *তদেব*
১১৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ১৭৫
১১৭. সমরেশ বসু, *বারোবিলাসিনী, সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩, পুর্বোক্ত,* পৃ. ১৪৫
১১৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পুর্বোক্ত,* পৃ. ১৭৫
১১৯. সমরেশ বসু, *বারোবিলাসিনী, সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩, পুর্বোক্ত,* পৃ. ১৫৪
১২০. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,* পৃ. ১২৮
১২১. সমরেশ বসু, *বারোবিলাসিনী, সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩, পুর্বোক্ত,* পৃ. ১৩৫
১২২. *তদেব*, পৃ. ১৫৪
১২৩. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন ১৯৮৯), পৃ.৪
১২৪. পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায়, *গৌরকিশোর : কালের উত্তরাধিকার,* (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২), পৃ. ২৬
১২৫. *তদেব*, পৃ. ২৭
১২৬. *তদেব*
১২৭. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৪৮
১২৮. সমরেশ বসু, *গন্তব্য, সমরেশ বসু রচনাবলী*-১৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৯), পৃ. ৩০০
১২৯. *তদেব*, পৃ. ৩৩২
১৩০. *তদেব*, পৃ. ৩৩৩
১৩১. *তদেব*, পৃ. ৩৩৪
১৩২. নির্মল ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী ১৪০১), পৃ. ২১৬
১৩৩. কাফফার *মেটামরফসিস* এর নায়ক গ্রেগর সামসা যে সারারাত নানান ধরনের স্বপ্ন দেখার পর সকালে উঠে নিজেকে পতঙ্গরূপে আবিষ্কার করে। পতঙ্গরূপী সামসাকে নিয়ে তার পরিবার বিপদে পড়ে। যেহেতু তার পরিবার উৎপাদনশীল। অনুৎপাদনশীল পতঙ্গটির প্রতি ক্রমেই তাদের সহানুভূতি শূন্যের কোঠায় চলে যায়। পরিবারের অবহেলায় সামসা মৃত্যু বরণ করে। পরিবারের এই অযাচিত আর্বজনা ঝেড়ে ফেলে পরিবারটি সোনালি স্বপ্নে বিভোর হয়। কমলও সংসার-সমাজ-পার্টির কাছে অনেকটাই অযাচিত হয়ে যায়, যাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে সবাই দায় মুক্ত হয়। সামসার মতো কমলও মৃত্যু বরণ করে। তবে তাকে হত্যা করা হয়।
১৩৪. সমরেশ বসু, *গন্তব্য, সমরেশ বসু রচনাবলী*-১৩, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩৫
১৩৫. *তদেব*, পৃ. ৩৩৬
১৩৬. *তদেব*
১৩৭. নির্মল ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী ১৪০১), পৃ. ২১৬
১৩৮. সমরেশ বসু, *গন্তব্য, সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩৭
১৩৯. *তদেব*, পৃ. ৩৩৪
১৪০. *তদেব*

১৪১. *তদেব*, পৃ. ৩৩৫
১৪২. *তদেব*, পৃ. ৩৩৯
১৪৩. *তদেব*, পৃ. ৩২০
১৪৪. ইরাবান বসু রায়, 'সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাস', সম্পাদক, অনিল আচার্য, *সত্তর দশক*, (কলকাতা : অনুষ্টপ ১৯৮০), পৃ. ২০৮
১৪৫. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫১
১৪৬. সরোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস : সেকাল একাল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯১) পৃ ১৯৭-৯৮
১৪৭. সমরেশ বসু, *অপদার্থ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী* -১৩, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৯), পৃ. ৪৭৯
১৪৮. *তদেব*, পৃ. ৪৭৮
১৪৯. *তদেব*
১৫০. *তদেব*
১৫১. *তদেব*
১৫২. *তদেব*
১৫৩. *তদেব*, পৃ. ৪৭৯
১৫৪. *তদেব*, পৃ. ৪৮৭
১৫৫. *তদেব*, পৃ. ৫০০
১৫৬. *তদেব*, পৃ. ৫০১
১৫৭. *তদেব*, পৃ. ৫০৪
১৫৮. *তদেব*, পৃ. ৫০৬
১৫৯. *তদেব*
১৬০. *তদেব*, পৃ. ৫০৯
১৬১. *তদেব*, পৃ. ৫১০
১৬২. *তদেব*
১৬৩. *তদেব*, পৃ. ৫২০
১৬৪. *তদেব*, পৃ. ৫১৪
১৬৫. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯
১৬৬. 'আলাপন- সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে- সমরেশ বসু : স্মরণ সমীক্ষণ (সম্পাদক : সত্যজিৎ ও অন্যান্য) চয়নিকা ১৯৯৪, পৃ ৯-১০
১৬৭. সমরেশ বসু, *বিপর্যস্ত*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, , (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ২৩৭
১৬৮. *তদেব*, পৃ. ২৪৪
১৬৯. *তদেব*, পৃ. ২৫৪
১৭০. *তদেব*, পৃ. ২৯৪
১৭১. *তদেব*, পৃ. ২৯৭
১৭২. *তদেব*, পৃ.২৯৮
১৭৩. *তদেব*, পৃ. ৩১৫
১৭৪. *তদেব*, পৃ. ৩১৯
১৭৫. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬৩
১৭৬. Hindusthan Standard 7th June 1967 City Edition.
১৭৭. সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, 'রণক্ষেত্র রাজপথ' *পঞ্চাশ-ষাট দশকের কলকাতায় যুব বিক্ষোভ* , (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০০২), পৃ. ১৩ উদ্ধৃত- সঞ্চিতা পাল, 'নকশাল আন্দোলন ও বাঙালি মধ্যবিত্ত-রাজনৈতিক সংস্কৃতি', প্রদীপ বসু (সম্পাদক), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী : বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান* (কলকাতা : সেতু প্রকাশনী ২০১২), পৃ. ১৫৮
১৭৮. নির্মল ঘোষ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, ভূমিকাংশ
১৭৯. অমর ভট্টাচার্য, *লাল তমসুক নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন* (কলকাতা : গাঙচিল ২০১৪), পৃ. ১১৭

১৮০. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত, পৃ.* ৪৪৬

১৮১. *তদেব*

১৮২. *তদেব*, পৃ. ৪৪৭

১৮৩. সমরেশ বসু, *মানুষ শক্তির উৎস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ১৫৯

১৮৪. *তদেব* পৃ. ১৫৯

১৮৫. *তদেব* পৃ. ১৬১

১৮৬. *তদেব* পৃ. ১৬৪

১৮৭. নির্মল ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩

১৮৮. সমরেশ বসু, *মানুষ শক্তির উৎস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

১৮৯. *তদেব* পৃ. ১৫৮

১৯০. অমর ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১১৭

১৯১. সমরেশ বসু, *মানুষ শক্তির উৎস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৫

১৯২. *তদেব* পৃ. ১৫৬

১৯৩. *তদেব* পৃ. ১৫৭

১৯৪. *আনন্দবাজার* ১৭ মার্চ ১৯৭৩

১৯৫. সমরেশ বসু, *মানুষ শক্তির উৎস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৯৬. নির্মল ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪

১৯৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৯৮৮) পৃ ৩৯৮

১৯৮. ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রচারের মধ্যে দিয়ে যে একটি বৈপ্লবিক পরিমন্ডল তৈরি হচ্ছিল, তা ভারি বেসামাল, এলোমেলো হয়ে গেল। তপ্ত উত্তেজিত পরিবেশে কে কার বন্ধু, কে শত্রু বিচার করার সময় থাকল না। শ্রেণি শত্রুর হাতে হাত রাঙাতে হাতের কাছে একজন শ্রেণি শত্রু আবিষ্কার করার জন্য সরলীকৃত নানা তত্ত্ব হাজির হলো। ব্যক্তি বা গোষ্ঠিগত পুরনো ঝগড়ার জের টেনেও শ্রেণি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ঘরোয়া যুদ্ধের চেহারা নিল। শৈবাল মিত্র, ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ অনুষ্টুপ শীত সংখ্যা ১৯৮৭, পৃ. ৫৫-৫৬

১৯৯. সমরেশ বসু, *মানুষ শক্তির উৎস, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৯

২০০. *তদেব*, পৃ. ১০২

২০১. *তদেব*, পৃ ১৪৮

২০২. ঝুমা রায়চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০১

২০৩. সমরেশ বসু, *যুগ যুগ জিয়ে*, সমরেশ বসু রচনাবলী-৬, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০২), পৃ. ৩৫২

২০৪. *তদেব*, পৃ ৩৫৭

২০৫. *তদেব*, পৃ. ৩৬০

২০৬. *তদেব*, পৃ. ৩৫১

২০৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য : এপার বাংলা-ওপার বাংলা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ. ১৩৮-৩৯

২০৮. সমরেশ বসু, *যুগ যুগ জিয়ে, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭

২০৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ। বৈষম্য দূর করা এবং অর্থনৈতিক দাবির মধ্যেই নৌ- সেনাদের দাবী সীমাবদ্ধ ছিল।... নৌ সৈনিকদের এই সংগ্রামকে শ্রমিক শ্রেণি এবং তা পার্টি কমিউনিস্ট পূর্ণ সমর্থন জানায়।...কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা নৌ-সৈনিকদের আত্মসমর্পণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তারা ওয়াদা দেয়, এই হরতালের জন্যে নৌ- সেনাদের কোনো প্রকারের দন্ড দেওয়া হবে না। অযোধ্যা সিংহ, *ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* অনুবাদ. কমলেশ সেন ও আশা সেন (কলকাতা : উন্মেষ প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ.৭০

২১০. সমরেশ বসু, *যুগ যুগ জিয়ে, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯০

২১১. *তদেব*, পৃ. ৮১৫

২১২. ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশের ইতিহাসে যোশীর নেতৃত্বের পর্বটি নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা দোটানা ছিলই। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই আর শ্রেণি-সংগ্রাম এর সমীকরণ কী হবে এ ছিল একটা বড়ো প্রশ্ন। এই তাত্ত্বিক প্রশ্নটি শুধু ভারতে নয়, যাবতীয় পরাধীন দেশেই কমিউনিস্টদের ভাবতে হত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিয়ন্তা কমিনটার্ণ (তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, প্রতিষ্ঠা ১৯১৯ খ্রী) মূল নীতি নির্ণয় করে দিত। পরাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি কমিনটার্ণের নির্দেশে বারবার বদলেছে। সব দেশেরই কিছু নিজস্ব সমস্যা থাকে। বাইরের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের মুশকিল হয়েছে বারবার। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পার্টির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। গণভিত্তি পায়নি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিপুল গণ-আন্দোলনের পাশে কমিউনিস্টদের অবস্থান তাই দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। এই দিশাহীনতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল গত শতাব্দীর তিনের দশকের মাঝামাঝি থেকে। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান প্রতিরোধে ফ্যাসীবিরোধী প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যের প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠল। এই বাস্তবতায় কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেস (১৯৩৫) পপুলার ফ্রন্টের নীতি গুরুত্ব পেল। পরাধীন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে কমিউনিস্টদের সহযোগ অবধি হল।

এই সময়ে যাঁরা পার্টিতে আসেন তাঁরা দুটি ধারায় ব্যাপক জনসংযোগ ঘটাতে পেরেছিলেন। মহাযুদ্ধের দুর্যোগে দুর্ভিক্ষে যোশীর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আন্দোলনে বহু প্রতিভার আবির্ভাব গণনাট্য সঙ্ঘে সংহতি পায়। পিছন ফিরে দেখলে সেই সময়টাকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল পর্বই মনে হবে। ফ্যাসীবাদের আক্রমণে বিপন্ন বিশ্বের অনিশ্চয়তা বিশ্বজুড়েই প্রগতিশক্তির প্রবল টানে অনেক দূরের ভিন্ন মতের মানুষকেও সংহতিতে মেলাতে পেরেছিল, জোয়ার এসেছিল সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতায়। বিশ্বজুড়ে মানবতার পক্ষে শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা প্রবল প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছিলেন। সে ছিল এক চরম বিপর্যয়ের সময়। আবার মনুষ্যত্বের পক্ষে এক প্রবল প্রতিরোধেরও সময়। বিশ্বের যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ, সেদিন মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষায় প্রতিরোধে সামিল হয়েছিলেন। অনেক লেখক শিল্পী এমনকি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেক অগ্রগণ্য মানুষ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ব্যাপক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে মতাদর্শগত গোঁড়ামি শিথিল হয়, প্রসার পায়। তখন এমনকী মার্কসবাদীদের মধ্যেও উদারনীতি দেখা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। পরিস্থিতির চাপে পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতার স্বাদ পেল। সে স্বাধীনতার চেহারা চরিত্র যেমনই হোক। যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল দেশভাগের সর্বনাশের পথে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্ষমতা থেকে সরে গিয়েও নানা কৌশলে শাসিত দেশে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে পরোক্ষ প্রভাব জিইয়ে রাখল। স্থায়ী ক্ষত রেখে গেল। খণ্ডিত ভারত যেমন রয়ে গেল কমনওয়েলথ-এ, রয়ে গেল কাশ্মীর নিয়ে স্থায়ী সমস্যা। সেই পরিস্থিতিতে ভারতে দেখা দিয়েছিল চরমপন্থী কমিউনিস্ট রাজনীতি। আওয়াজ উঠেছিল, এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। এসব তত্ত্ব পরে ভুল বলে স্বীকার করা হলেও সে সময়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। জাতীয়তাবাদ ঘেঁষা কমিউনিস্টপন্থা পরিহার করা হল। ক্ষমতাচ্যুত হলেন পি. সি যোশী, পার্টির ক্ষমতায় এলেন রণদিভ। রণদিভ আমলের চরমপন্থা, পার্টির ভিতরে কঠিন শাসন, হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় উপদলীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বপার্টির শক্তি বাড়ায়নি। তার উপরে নেমে আসে কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়ন এবং অবশেষে পার্টি বে-আইনি হয়ে যাওয়া। সত্যজিৎ চৌধুরী, *সমরেশ বসু : আমাদের বাস্তব*, (কলকাতা : একুশ শতক, ২০১৩), পৃ. ৯০-৯১

২১৩. সত্যজিৎ চৌধুরী, *সমরেশ বসু : আমাদের বাস্তব*, (একুশ শতক, ২০১৩), পৃ. ৯০

২১৪. সমরেশ বসু, *যুগ যুগ জিয়ে*, *সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫

২১৫. *তদেব*, পৃ. ৩৭৩

২১৬. *তদেব*, পৃ ৩৭০

২১৭. *তদেব*

২১৮. *তদেব*

২১৯. *তদেব*, পৃ. ৩৭০-৭১

২২০. মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভয়ংকর এক অভিশাপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া-চেকোস্লোভিয়া-পোল্যান্ড দখলের প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হিটলারের নের্তৃত্বে জার্মানি ফ্যাসিবাদী উন্মত্ততায় পৃথিবী দখলের পায়তারা করতে থাকে। অচিরেই জার্মানির পক্ষে যোগ দেয় ইতালি এবং জাপান-গড়ে তোলে তারা অক্ষশক্তি। অক্ষশক্তির আক্রমণে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ-একের পর এক পরাভূত হতে থাকে। অক্ষশক্তির এই ফ্যাসিবাদী

উন্মত্ততার প্রেক্ষাপটে বিশ্বসভ্যতাকে রক্ষা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য গড়ে তোলে মিত্রবাহিনী। ক্রমে পৃথিবীর অনেক দেশ যোগ দেয় মিত্র বাহিনীতে যোগ দেয় ভারতবর্ষও। বিশ্বজিৎ ঘোষ, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বুদ্ধবাদী জাপান এবং রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য গবেষণাপত্র*, মোঃ আব্দুল আলীম (সম্পাদক), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ২০১৪, পৃ. ২৭

২২১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য : এপার বাংলা-ওপার বাংলা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

২২২. সমরেশ বসু, *যুগ যুগ জিয়ে, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩১

২২৩. *তদেব*, পৃ. ৭০৪

২২৪. *তদেব*, পৃ. ৭০৫

২২৫. *তদেব*, পৃ. ৫৬৬

২২৬. *তদেব*, পৃ. ৩৩১

২২৭. *তদেব*, পৃ. ৫৬১

২২৮. *তদেব*, পৃ ৭০৩

২২৯. *তদেব*, পৃ. ৫৪২

২৩০. *তদেব*, পৃ. ৪৭৬

২৩১. *তদেব*, পৃ ৫৭৫

২৩২. অলোক রায়, *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, (কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ২৯২

২৩৩. ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে দেশব্রতী পত্রিকায় 'গেরিলা অ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা' শীর্ষক রচনায় চারু মজুমদার বলেন 'যে শ্রেণি শত্রুর রক্তে হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিস্ট নামের উপযুক্ত নয়।' ২২ জানুয়ারি ১৯৭০-এ দেশব্রতীতে '৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন' শীর্ষক রচনায় স্পষ্টভাবে খতমের লাইনকে ব্যক্ত করা হয়।'শিপ্রা সিংহ রায়, নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত ও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সংস্কৃতি', সম্পাদক, প্রদীপ বসু, *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান* (কলকাতা : সেতু প্রকাশনী ২০১২) পৃ. ২৩৯

২৩৪. শিপ্রা সিংহ রায়, 'নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত ও পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সংস্কৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩

২৩৫. ঝুমা রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬

২৩৬. সমরেশ বসু, *পুনর্যাত্রা, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, সম্পদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ২০০১), পৃ ৩২৭
১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে চীনের উস্কানি এবং কমিউনিস্টদের চীনের চর বলে আখ্যায়িত করে এবং নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করতে থাকে। নকশাল পন্থী কমিউনিস্টরাও সত্তরের গোড়ায় মাওসেতুঙ কে চীনের নেতা আমাদের নেতা বলে ঘোষণা করে উদ্ধৃতি লিখে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে রাখত।

২৩৭. সমরেশ বসু, *পুনর্যাত্রা, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

২৩৮. *তদেব*

২৩৯. আজিজুল হক, *নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৯) পৃ. ৪৫

২৪০. সমরেশ বসু, *দশ দিন পরে*, সমরেশ রচনাবলী ৮ম খণ্ড সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১), ৬৬৮

২৪১. *তদেব*, পৃ ৬৯৮

২৪২. *তদেব*, পৃ. ৭১৬

২৪৩. *তদেব*

২৪৪. *তদেব*, পৃ. ৭৩৯

২৪৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮), পৃ. ৩৯৮

২৪৬. সমরেশ বসু, *দশ দিন পরে, সমরেশ বসু রচনাবলী*-৮, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৩২

২৪৭. সমরেশ বসু, *হৃদয়ের মুখ, সমরেশ বসু রচনাবলী-১১*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৪৩৬

২৪৮. *তদেব*, পৃ. ৪৮৬

২৪৯. *তদেব*

২৫০. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩*

২৫১. সমরেশ বসু, *হৃদয়ের মুখ, সমরেশ বসু রচনাবলী*-১১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৬

২৫২. *তদেব*, পৃ. ৪৮৫
২৫৩. *তদেব*, পৃ. ৪৭৫
২৫৪. সমরেশ বসু, *হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৯*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০৯), পৃ. ২৮৩
২৫৫. *তদেব*, পৃ. ২৮২
২৫৬. *তদেব*
২৫৭. সমরেশ বসু, *আনন্দধারা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
২৫৮. *তদেব*, পৃ. ১৬৫
২৫৯. অনুপম হায়াৎ, 'চলচ্চিত্র সংসদ, ফিলম, ইনস্টিটিউট ও ফিলম আর্কাইভ', *বাংলাদেশের চলচিত্রের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৯৮৭), পৃ. ১৬১
২৬০. সমরেশ বসু, *মরীচিকা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩*, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৪৩
২৬১. *তদেব*, পৃ. ৩৯১
২৬২. *তদেব*, পৃ. ৪১১
২৬৩. *তদেব*, পৃ. ৩৯৭
২৬৪. *তদেব*, পৃ. ৪৫৪
২৬৫. *তদেব*, পৃ. ৪১১
২৬৬. *তদেব*, পৃ. ৩৭৫
২৬৭. *তদেব*, পৃ. ৩৭৭
২৬৮. *তদেব*, পৃ. ৩৮২
২৬৯. সমরেশ বসু, *আকাঙ্ক্ষা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৯*, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫৯৪
২৭০. স্বকীয়া বৈবাহিক প্রেমে যদি-বা অক্লান্ত প্রগলভতায় যৌনতার উন্মোচন ঘটেও থাকে, তবু এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য— প্রেমের প্রধান কেন্দ্র পরকীয়তা। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, 'শৃঙ্গার' অনিল ও অর্ণব সাহা (সম্পাদক), *যৌনতা ও বাঙালী*, কলকাতা : অনুষ্টুপ ২০০৯), পৃ. ৪১
২৭১. সমরেশ বসু, *আকাঙ্ক্ষা*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-৯*. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৩
২৭২. *তদেব*, পৃ. ৬০৯
২৭৩. *তদেব*
২৭৪. *তদেব* পৃ. ৬১৩
২৭৫. *তদেব*
২৭৬. সমরেশ বসু, *অভিজ্ঞান*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৪*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ১২৬
২৭৭. *তদেব*, পৃ. ১৩০
২৭৮. *তদেব*, পৃ. ১৩১
২৭৯. *তদেব*, পৃ. ১৪০
২৮০. *তদেব*
২৮১. ঝুমা রায় চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭৫
২৮২. সমরেশ বসু, *অভিজ্ঞান*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
২৮৩. বারট্রান্ড রাসেল, বিবাহ ও নৈতিকতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩
২৮৪. সিরাজ সালেকীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮
২৮৫. বারট্রান্ড রাসেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭
২৮৬. সমরেশ বসু, *জবাব*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৪*, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬৪
২৮৭. *তদেব*, পৃ. ১৪৫
২৮৮. *তদেব*, পৃ. ১৭৪
২৮৯. *তদেব*, পৃ. ১৮১

২৯০. *তদেব*, পৃ. ১৯৮
২৯১. *তদেব*, পৃ. ১৯১
২৯২. *তদেব*
২৯৩. *তদেব*, পৃ. ১৯২
২৯৪. *তদেব*, পৃ. ১৯৩
২৯৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, বিবাহ প্রসঙ্গে, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১১, উদ্ধৃত, সিরাজ সালেকীন, পৃ. ২১১
২৯৬. সমরেশ বসু, *জবাব*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
২৯৭. *তদেব*, পৃ. ১৮৭
২৯৮. সমরেশ বসু, *রূপায়ণ*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১২*, , সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৪৫২
২৯৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *হৃদয়ের একূল-ওকূল* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১৩৭
৩০০. সমরেশ বসু, *ওদের বলতে দাও*, *সমরেশ বসু রচনাবলী-১১*, সম্পাদক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৬), পৃ ২৮৮
৩০১. নির্মল ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮

উপসংহার

উপসংহার

মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান সমাজের মধ্য স্তরে। এরা বিত্তবান নয় আবার বিত্তহীনও নয়। সমাজে যে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিন্যাস লক্ষ করা যায়, সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের মধ্যভাগে অবস্থান করে। এই শ্রেণি স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে সমাজে অবস্থান করতে পছন্দ করে। সাধারণভাবে এই শ্রেণি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে ভদ্রোচিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মধ্যবিত্তকে তার জীবিকা শুরু হয় বিচিত্র পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে। স্বপ্ন এবং বাস্তবের ব্যবধান ঘোচাতে তাকে প্রতিনিয়ত হোচট খেতে হয়। সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান দূর করতে প্রতিনিয়ত মানসিক টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। শাসকশ্রেণি রাষ্ট্রযন্ত্রকে হাতের মুঠোয় রাখতে এই শ্রেণিটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে । তবে বিত্ত ভেঙে বাইরে এসে পরিচ্ছন্ন জীবনের দিকে ঝোঁক এই শ্রেণিটির সবসময়। সমরেশ বসু নিজে যেহেতু এই বিত্তের মানুষ ছিলেন তাই তিনি মধ্যবিত্তের চিত্তবৈকল্য এবং দ্বিধান্বিত জীবন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন।

মধ্যবিত্ত জীবনের কথা বলতে গিয়ে অবধারিতভাবে তিনি মধ্যবিত্তের প্রেম-রাজনীতি-সংস্কৃতি-সমাজভাবনার কথা বলেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের যে সমাজ প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর অধিকাংশই ক্রুরতা, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। মননের দ্বান্দ্বিকতা এই সমাজের স্বাভাবিক বিষয়। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই লেখক ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতা উভয়েরই শিল্পরূপ নির্মাণ করলেন। সমরেশ বসুর প্রথম পর্বের উপন্যাসে পঞ্চাশের দশকের রাজনীতির উত্তাল সময় এবং সময়-রাজনীতির দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তি চরিত্রের মানসলোক খনন করেছেন। যেমন *শ্রীমতি কাফে*তে প্রথম বেকার মধ্যবিত্ত যুবকের জীবন যন্ত্রণার কথা বললেন। অনুচ্চারিত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় সে কখনোই পরিবারের একজন হয়ে উঠতে পারেনি। সমরেশ বসু সেই ভজুলাটকে বৃহত্তরের সাথে মেশাতে চাইলেন। ভজুলাটকে সে সময়ের বৃহত্তর বাস্তব-জীবনের টানাপোড়েনের আশাভঙ্গ ও আশার প্রায় প্রতীক হিসেবে দাঁড় করালেন। ভজুলাটের ব্যক্তিগত পরিবারগত অস্তিত্ব ক্রমশ প্রসারিত হয় বৃহত্তর বাস্তবের দিকে। এই প্রসারতা সেই সময়ের ইতিহাসে মধ্যবিত্তের মধ্যে ছিল।[১] ভজুলাটের যে সংকট তা এক অর্থে সমসময়েরই সংকট। সময়ের বহুবঙ্কিম জটিল ও যন্ত্রণার শিল্পভাষ্য *বাঘিনী* উপন্যাস। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ভাঙনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি *বাঘিনী* উপন্যাস। চিরঞ্জীবকে শেষ পর্যন্ত মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন বৃহত্তরের মধ্যে। দুর্গাকে হারিয়েও সে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। ত্রিধরের মতো নেতা তাকে পথ দেখিয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাতজনিত জীবন সত্যের আলোতে চিরঞ্জীব স্নাত হয়ে নবজন্ম লাভ করেছে। *দুরন্ত চড়াই*-এ কন্যাকে পাত্রস্থ করা নিয়ে মধ্যবিত্তের ফাঁকি দেখালেন। অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের চরিত্র স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই উপন্যাসে। *ফেরাই*-

এ মধ্যবিত্ত নারীর মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। এই পর্বের প্রথম দিককার উপন্যাসে ব্যক্তি এক বৃহত্তরের সাথে মেলাতে চেয়েছেন। ক্রমশ এই মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব সংকট এতই প্রবল হয় যে ব্যক্তি সমষ্টি থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

সময়ের অনিবার্য কাল-কৃত্যে মধ্য- পর্বে নায়কেরা নিপতিত হয়েছে ব্যক্তির অনন্বয়বোধে। ষাটের দশকের উন্মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, দ্বন্দ্বময় সময়ের ছবি পাওয়া যায় সমরেশ বসুর এ-পর্বের উপন্যাসে। সমাজ-রাষ্ট্রের নানাবিধ চাপে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মনোলোক বিচ্যুতি-বিসঙ্গতি-বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। তারা সুস্থ সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবনের প্রত্যাশায় জীবনের মিথ্যাচার-লাম্পট্য-মেকি ভদ্রতা-ভণ্ডামি এ সমস্ত অন্তঃসারশূন্যতা থেকে বের হতে চেয়েছে। কিন্তু সমকালীন উৎকেন্দ্রিক পরিবেশ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দেয়নি। বিচ্ছিন্নতা আর শূন্যতার গর্ভে তারা হারিয়ে যেতে থাকে। এ সময় সংকটাদীর্ণ নৈরাজ্যময় পরিবেশে মধ্যবিত্ত সত্তাবিচ্ছিন্ন হয়ে চরম সংকটে নিপতিত হয়। বিশেষত মূল্যবোধ হারিয়ে স্ব-সংস্কৃতি, সততা এবং অস্তিত্ব হারিয়ে অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়। সমরেশ বসু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে মূল্যহীনতার জগৎ থেকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। যে কারণে প্রচলিত কথ্যভঙ্গি-নস্যাৎ করে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজকে বারবার আঘাত করেছেন। জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে। আত্মিক সঙ্কটাদীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই পর্বে। আত্মকথন এবং স্ল্যাঙভাষ্যে নায়কের মনোবিকারের শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। যেমন *বিবর, পাতক, স্বীকারোক্তি*-র অনামা নায়ক এবং *প্রজাপতি*-র সুখেন সবাই আত্মসমালোচক এবং সমাজসমালোচক। তারা কেউই জীবনের কোথাও ছন্দ বা সঙ্গতি খুঁজে পায়নি। প্রত্যেকেই সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তশ্রেণির সঙ্গে এদের ভয়াবহ রকমের বিরোধ। তাইতো এরা প্রত্যেক্যেই কটূক্তি এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে। সমাজকে শোধন করার অভিপ্রায়ে শ্রেণি স্বার্থের বেষ্টনীকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। সমালোচনা করেছে সমকালীন রাজনীতির। লেখক ষাটের দশকের প্রত্যয়-প্রমূল্যহীন অপচয়িত সমাজের অন্তর্বাস্তবতা বোঝাতে সত্তাবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বহুভূজ যন্ত্রণার প্রসঙ্গ এনেছেন। এই পর্বে ব্যক্তি তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে এতই সচেতন যে ক্রমশ নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছে। *বিবর*-এর অনামা নায়কের আত্মকথনে তার বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ এসেছে। তবে সে অপচয়িত সমাজের অংশ হয়েও মধ্যবিত্তের অসঙ্গতিপূর্ণ ক্লেদাক্ত জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। এই অনামা নায়ক প্রত্যাখান করেছে তার সামগ্রিক মূল্যবোধহীনতাকে। এই পর্বে শুধু ব্যক্তির সংকটই নয় মধ্যবিত্তের নানামাত্রিক সংকটের চিত্র তুলে ধরলেন। মধ্যবিত্ত একটা সময় নিজেদের স্বার্থে নিজের শ্রেণিকে অবমূল্যায়নের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এই পর্বের নায়কেরা নিজেদের সেখান থেকে বের করে আনতে চেয়েছে। *তিন ভুবনের পারে* মধ্যবিত্তের

দাম্পত্য সংকট এবং উত্তরণ দেখালেন। *প্রজাপতি*তে সুখেনের বোধের উত্তরণ যেন তার সমাজের উত্তরণ। *পাতকে*র অনামা নায়ক প্রতিবাদ করেছে তার স্ব-সমাজের প্রেম-রাজনীতি-যৌনতা সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে। অবাধ যৌনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার আড়ালে সে ভণ্ড মধ্যবিত্তের মুখোশ উন্মোচন করেছে। *বিবর প্রজাপতি পাতক* এবং *স্বীকারোক্তি*র নায়করা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্তের যৌনতা বিষয়ক ইলিউশনকে কুঠারাঘাত করেছে। ষাটের দশকের অবক্ষয়িত সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ *বিবর*-এর অনামা নায়ক করেছিল সেই প্রতিবাদই প্রচণ্ডভাবে দেখা যায় সমরেশ বসু অন্ত্য পর্বের উপন্যাসে। ১৯৬৭ সালের নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের শ্রেণি চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করলেন।

অন্ত্য পর্বেও বর্ণিত হয়েছে মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতা। এই পর্বে এসে তাঁর নায়কেরা নিজ শ্রেণি বলয় থেকে বেরিয়ে শ্রমিক শ্রেণি তথা সর্বহারা শ্রেণির সাথে একাত্ম হতে চেয়েছে। লেখক এই প্রবণতাকে সদর্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বিনাসী যুগ আর বৈরী পরিবেশে তারা একাত্ম হতে পারেনি। স্বশ্রেণিজাত শূন্যতা তাদের একাত্ম হতে দেয়নি। শ্রমিকরা তাদের সাথে নিজের মতো করে মিশতে পারেনি। তারাও শ্রমিকদের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। একধরনের ফাঁকি সহজেই প্রতীয়মান হয়। লেখক এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনার টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করেছেন। *যুগ যুগ জিয়ে*র অনিল নিজস্ব দর্শন আর বিরূপ পরিবেশে একাত্ম হতে না পারার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে। *পুনর্যাত্রার* তাপস সমাজ থেকে দূরে পালিয়ে গঙ্গাযাত্রীর ভগ্নগৃহে বসে পুরনো পাণ্ডুলিপির মধ্যে নিজেকে খুঁজেছে। ত্রিদিবেশের মতো বাস্তববাদী শিল্পীকে তার সমাজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। এই পর্বে চরিত্ররা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অনেকটাই দিশেহারা হয়েছে। ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিশেষত খাদ্য আন্দোলন-নকশাল আন্দোলন-রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নে পরিবেশ পরিস্থিতি আরো বেশি উত্তপ্ত হয়েছে। ষাটের দশক বাঙালি মধ্যবিত্ত কাঙ্ক্ষিত মুক্তি পায়নি। সত্তর দশককে নকশালবাদীরা মুক্তির দশকে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের খতম অভিযান, গেরিলা বাহিনি গঠনের তৎপরতা, চারু মজুমদারের গ্রেফতার হওয়া এবং মৃত্যুবরণ নকশাল আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্যকে অনেকাংশে ম্লান করে। এই পর্বের নায়কেরা তাদের চারপাশে কেবল বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার শব্দ শোনে। সত্তর দশকে যে আন্দোলন ছিল মুক্তির দশকে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি, তা পরবর্তী সময়ের মূল্যায়নে দেখা যায় এই আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক উল্লম্ফনের সূচনা মাত্র, সমকালে অনেক নকশালবাদী অনুধাবন করেছেন। তারা যে বাম-হঠকারী লাইনে চলেছেন তার পূর্বাভাস ১৯৬৯ সালের আটটি দলিলে আছে। সমরেশ বসু এই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন নকশাল আন্দোলনে অনেক খামতি, ভুল ছিল তবে নকশালবাদীরা ছিল সাহসী, বিপ্লবী, তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। *মানুষ শক্তির উৎস, গন্তব্য, মহাকালের রথের* ঘোড়া উপন্যাসে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। অন্ত্যপর্বের উপন্যাসে সত্তর দশকের রাজনৈতিক

অস্থিতশীলতা এবং আশির দশকের রাজনৈতিক আবহ সরাসরি উপন্যাসে এসেছে। এই পর্বে লেখক বাক-বিন্যাসে অনেক বেশি সচেতন। ষাটের দশকের ন্যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতার আর্তি এই পর্বেও লক্ষণীয়। সময়-রাজনীতির দ্বন্দ্বে সৃষ্ট ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন এই পর্বে। ভজুলাটের সংকটকে আরো বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরলেন *যুগযুগ জিয়ে* উপন্যাসের ত্রিদিবেশ চরিত্রে। তারই দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরলেন যুদ্ধ-মন্বন্তর দাঙ্গা-দেশভাগ-স্বাধীনতা ত্রিদিবেশ মূলত লেখকের প্রতিচ্ছায়া। ত্রিদিবেশের মধ্যে ব্যক্তি সমরেশ বসুর মানসভূবন খুঁজে পাওয়া যায়।

সমরেশের নায়কেরা পার্টির ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। *বিবর, প্রজাপতি, পাতকের* নায়ক রাজনীতিতে আস্থাবান নয়। *বিবরের* নায়ক পার্টি চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে চায়নি। *প্রজাপতি*র সুখেনের মনে জন্ম নেয় সর্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক অবিশ্বাস। সে তার শিক্ষায়তনের অধ্যাপক, নেতৃবৃন্দ, বন্ধু কারো প্রতি আস্থাশীল হতে পারেনি। সর্বত্রই লক্ষ করেছে অন্তঃসারশূন্যতা। *বিশ্বাসের* নীরেন তার পরিবার পরিজনের মতো সমকালীন স্বার্থন্বেষী রাজনীতিতে আস্থাবান নয়। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা এর সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর কোনোটার প্রতি তার বিশ্বাস নেই। *যুগযুগ জিয়ের* ত্রিদিবেশ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক এবং সদস্য হয়েও পার্টিম্যান হয়ে উঠতে পারেনি। *মানুষ শক্তির উৎস*-এর সজল, এবং *গন্তব্য*-এর কমলকে প্রাণ দিতে হয়েছে পার্টির সমালোচনার অভিযোগে। তাঁর নায়কেরা কেউই পার্টিম্যান হতে চায়নি। সমাজকে বদলে দেবার অভিপ্রায়ে তারা পার্টির বলয়াবদ্ধ হয়েছে আবার বেরিয়েও এসেছে।

এছাড়া বেশকিছু স্বল্পায়তনের উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বিশেষ বিশেষ মানসপ্রবণতাকে ধরার প্রচেষ্টা এই পর্বে উল্লেখযোগ্য দিক। যেমন দাম্পত্য সংকট, প্রেম বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি। এই পর্বে ভাষা ব্যবহারে লেখক আরো পরিশীলিত। যৌনতা বা বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে এই পর্বে স্থান পেল সমাজবাস্তবতা। স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এই পর্বে দ্রোহের রূপ নেয়। হতাশা, বিবমিষা থেকে বেরিয়ে সত্তর দশকে মধ্যবিত্ত প্রতিবাদী হয়েছে। *বিশ্বাসের* নীরেন, *অশ্লীলের* মদন, *অপদার্থের* জয় এরা সবাই ক্রমশ সাহসী হয়েছে। এই পর্বের উপন্যাস অনেকটা তত্ত্ব নির্ভর। চরিত্রের অর্ন্তগত বিশ্লেষণের চেয়ে বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা সব সময়ই ছিল কিন্তু তা পূরণের সাধ্য তার কখনো পুরোপুরিভাবে হয়নি। লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষার সমগ্রতাকে সুচারুভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। জীবনের প্রতি ঔৎসুক মন আর বৈচিত্র্যের মধ্যে সমগ্রতার আস্বাদ নেওয়ার এক সর্বগ্রসী অভিপ্রায় তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সমরেশ বসু সমগ্র জীবনব্যাপী চেয়েছেন মানুষের সর্বৈব কল্যাণ ও মুক্তি। এই সূত্রে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী কখনো সংগ্রামশীল নিম্নজীবী-শ্রমজীবীর কথা বলেছেন আবার অস্তিত্ববাদী মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতা প্রকাশ করেছে। আবার কখনোবা তিনি কালকূট হয়ে মানুষের মাঝে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। সঙ্কটাদীর্ণ মধ্যবিত্তের কথা বলতে গিয়ে একই সাথে তিনি নন্দিত এবং নিন্দিত হয়েছেন। *বিবর, প্রজাপতি, পাতক* এই সব উপন্যাস নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তারপরও থেমে থাকেনি তাঁর কলম। বৈচিত্রপিয়সী সমরেশ বসু নতুন নতুন সৃষ্টি করে গেছেন।

সমরেশ বসু গান্ধীবাদ কিংবা মার্কসবাদ কোনো তত্ত্বের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। বৈশ্বিক নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে গান্ধীর অহিংস মতবাদে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তিতে তার ঝোঁক ছিল সাম্যবাদে কিন্তু তিনি দেখেছেন দেশীয় রাজনীতির আবহে সাম্যবাদী দলগুলির বিচ্যুতি। আসলে কোনো ‘বাদে’ই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি তিনি ছিলেন মানবতাবাদী।

উপন্যাসে অনেক স্থানে যৌনতার প্রসঙ্গ চলে এসেছে। অনেকেই এর কঠোর সমালোচনা করেছে। ষাটের দশকে আমেরিকান সাহিত্যের একটি ধারা যেগুলিতে যৌনতা ও হিংসার চিত্র সম্বলিত সস্তা মানের বিনোদক কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠগুলোতে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল।[২] অনেকেই মনে করেন সমরেশ বসু- এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের অর্ন্তবাস্তবতার শিল্পরূপ নির্মাণে লেখককে এগুলো প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। সমকালীন যুগসঙ্কটে সৃষ্ট যুবসমাজের এই যৌনবিকৃতি কখনোই আরোপিত নয়, এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়— ‘অশ্লীলতা নয়, অতিরিক্ততা নয়, যা সত্য তাকে, সমস্তরকম সেন্টিমেন্ট, কৃত্রিমতা, তথাকথিত ভদ্রতা, পুরনো সংস্কার ইত্যাদিকে ঠেলে সরিয়ে সরাসরি বড় মাপের ও মর্যাদার শিল্পে আঁকার জন্যই যৌনতা সমরেশ বসুর উপন্যাসগুলিতে একটা আলাদা জগত, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও অনুগ বিষয় হয়ে উঠেছে।’[৩]

সমরেশ বসুর মধ্যবিত্ত শ্রেণি-চরিত্ররা সবাই নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত না। তবে নাগরিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশে তিনি অধিক আগ্রহী। মধ্যবিত্তের বিস্তৃত প্লাটফর্মকে রূপদানে তিনি আপোষহীন। বৌদ্ধিক ও যৌক্তিকভাবে শঙ্কিত, দ্বিধান্বিত, বিবরগ্রস্ত মধ্যবিত্তের অবস্থার মূল্যায়ন করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি জাতির সঙ্কটে হাল ধরেছে। নিজেদের খোলস থেকে বেরিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাসকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন। মোটকথা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন-অবলোকন ও রূপায়নে তিনি যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং স্বাতন্ত্র্য চিহ্নায়ক।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন* (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৮৯), পৃ. ০৫

২. ঝুমা রায় চৌধুরী, *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন, ২য় খণ্ড* (কলকাতা : পূর্বাশা ২০০৭), পৃ. ৩২৯

৩. অরুণ সান্যাল, *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৯১), পৃ. ৭২৭

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আলোচিত উপন্যাস :

নয়নপুরের মাটি : সমরেশ বসু রচনাবলী ১ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৩-১০১

শ্রীমতী কাফে : সমরেশ বসু রচনাবলী ১ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৮৩-৪৪০

বাঘিনী : সমরেশ বসু রচনাবলী ২ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩২৭-৪৯৬

দুরন্ত চড়াই : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ.১১-১১০

শেষ দরবার : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ. ১১১-১৮০

ফেরাই : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ. ২৯৩-৩৪৪

ধূসর আয়না : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ.৩৪৫-৪০৮

স্বর্ণ পিঞ্জর : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ. ৪০৯-৪৬২

বিবর : সমরেশ বসু রচনাবলী ৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১, পৃ ৪৬৩-৫৪৮

তিন ভুবনের পারে : সমরেশ বসু রচনাবলী ৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৮, পৃ.৩০৩-৩৫৬

প্রজাপতি : সমরেশ বসু রচনাবলী ৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৮, পৃ. ৩৫৭-৪৩৮

পাতক : সমরেশ বসু রচনাবলী ৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৮, পৃ. ৪৩৯-৪৮৬

স্বীকারোক্তি : সমরেশ বসু রচনাবলী ৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৮, পৃ. ৪৮৭-৫৪৪

ত্রিধারা : সমরেশ বসু রচনাবলী ৫, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৪৫-৪৫০

তরাই : সমরেশ বসু রচনাবলী ৫, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫৯৭-৬৪৪

অলিন্দ : সমরেশ বসু রচনাবলী ৫, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫৪১-৫৯৬

বিশ্বাস : সমরেশ বসু রচনাবলী ৫, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৮৭-৭৮২

অপরিচিত : সমরেশ বসু রচনাবলী ৫, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৫১-৫৪০

ছায় ঢাকা মন : সমরেশ বসু রচনাবলী ৬, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৭-১৪২

যুগ যুগ জিয়ে : সমরেশ বসু রচনাবলী ৬, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০২, পৃ. ২৮৩-৮৩৯

অশ্লীল : সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১১-৮৮

আমার আয়নার মুখ : সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৬৩৭-৬৯০

পুনর্যাত্রা : সমরেশ বসু রচনাবলী ৭ (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৩২৩-৩৯২

মানুষ শক্তির উৎস : সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৮৯-১৬৬

বিপর্যস্ত : সমরেশ বসু রচনাবলী ৭, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ২২৯-৩২২

দশ দিন পরে : সমরেশ বসু রচনাবলী ৮, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৬৬৩-৭৪০

পদক্ষেপ : সমরেশ বসু রচনাবলী ৮, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৮৭-১৩৮

অচিনপুর : সমরেশ বসু রচনাবলী ৮, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১, ৪৬১-৫৭৪

অলকা সংবাদ : সমরেশ বসু রচনাবলী ৮, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৯৫-২৫৪

দশ দিন পরে : সমরেশ বসু রচনাবলী ৮, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৬৬৩-৭৪০

অবশেষে : সমরেশ বসু রচনাবলী ৯, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৯৩-১৬৮

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা : সমরেশ বসু রচনাবলী ৯, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৪৭-২৮৪

আকাঙ্ক্ষা : সমরেশ বসু রচনাবলী ৯, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ৫৬৯-৬১৮

যাত্রিক : সমরেশ বসু রচনাবলী ১০, (সম্পাদকঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১০, পৃ. ২৮৫-৩৪০

বিষের স্বাদ : সমরেশ বসু রচনাবলী ১১, (সম্পাদকঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়),আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ.৬৩-১১৮

বিকেলে ভোরের ফুল : সমরেশ বসু রচনাবলী ১১, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ.১১৯-১৭৪

হৃদয়ের মুখ : সমরেশ বসু রচনাবলী ১১, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ.৪৩৯-৫০৮

রূপায়ণ : সমরেশ বসু রচনাবলী ১২, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩৮৯-৪৫২

অন্ধকার গভীর গভীরতর : সমরেশ বসু রচনাবলী ১২, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫২১-৫৬৯

গন্তব্য : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৭৭-৩৪০

বারোবিলাসিনী : সমরেশ রচনাবলী ১৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৯১-১৫৪

আনন্দধারা : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৫৫-২০০

মরীচিকা : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৪১-৪১২

অপদার্থ : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৩, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৭১-৫২৮

অভিজ্ঞান : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১০৯-১৪২

জবাব : সমরেশ বসু রচনাবলী ১৪, (সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১৪৩-১৯৮

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৮০), *বিবাহের চেয়ে বড়, অচিন্ত্য রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশেষ সংস্করণ, গ্রন্থলয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০০০), *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

অনুপম হায়াৎ (১৯৮৭), *'চলচ্চিত্র সংসদ, ফিলম, ইনস্টিটিউট ও ফিলম আর্কাইভ', বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯৯১), *বাংলার রেনেসাঁস*, মুক্তধারা, ঢাকা

অমর ভট্টাচার্য (২০১৪), *লাল তমসুক নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন*, গাঙচিল, কলকাতা

অম্বজ বসু (১৯৯৯), *একটি নক্ষত্র আসে*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

অযোধ্যা সিংহ (১৯৮৮), *ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনুবাদ. কমলেশ সেন ও আশা সেন, উন্মেষ প্রকাশন, কলকাতা

অরিন্দম গোস্বামী (২০০১), *সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯১), *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর ১৯২৩-১৯৮২*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা

(২০০৯), *সাহিত্য : এপার বাংলা-ওপার বাংলা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

(১৯৯৯), *হৃদয়ের একূল-ওকূল, দুই বঙ্গের গদ্যসাহিত্য*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

অরুণ সান্যাল [সম্পাদক] (১৯৯১), *প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস*, ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা

অলোক রায় (২০০০), *বাংলা উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

অশ্রুকুমার শিকদার (২০০৮), *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

আকিমুন রহমান (১৯৯৩), *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আজিজুল হক (১৯৯৯), *নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ [সম্পাদক] (২০০০), *ভাষা-আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি, ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ৫ খণ্ড একত্রে, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০০১), *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্যাপিরাস, ঢাকা

আবদুল মওদুদ (২০১১), *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আবদুল হক [সম্পাদক] (১৯৮৮), 'বাংলার মুসলমানের কথা', *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী* (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আব্দুল করিম (১৯৯১), বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭), বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা

আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৮৮), *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

আবুল কাশেম (২০০১), *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৮১) *কথা ও কবিতা*, মুক্তধারা, ঢাকা

আমিনুর রহমান সুলতান (২০০৩), *বাংলাদেশের উপন্যাস নগরজীবন ও নাগরিক চেতনা, (১৯৪৭-১৯৯৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আলবেয়ার কামু (২০১৪), *আউটসাইডার*, অনুবাদ, রতন কুমার দাস, কবিতীর্থ, কলকাতা

আশিসকুমার দে (১৯৮৩) *উপন্যাসের শৈলী তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্যাপিরাস, কলকাতা

উইলিয়াম হান্টার,(১৯৯৬) *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদ, আবদুল মওদুদ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

এম. এ রহিম আহমদ (১৯৮২), *বাংলার মুসলমানের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৭), *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

কার্তিক লাহিড়ী (১৯৭৪), *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

গোপাল হালদার (২০০৮), *সংস্কৃতির রূপান্তর*, মুক্তধারা, ঢাকা

গোপীকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৮৬), *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (২০১৩), *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

চন্দন ভট্টাচার্য [সম্পাদক] (২০১১), *সতীনাথের জাগরী: স্মরণে মননে*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

চিত্রা সরকার (২০১২), *সামাজিক সংকট আত্মিক সংকট প্রেক্ষিত বাংলা কথাসাহিত্য*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৯১), *বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জয়ন্তকুমার ঘোষাল (১৯৯২), *বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জীবননান্দ দাশ (১৯৮৬), *জীবননান্দ সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ঝুমা রায় চৌধুরী (২০০৭), *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু সামগ্রিক মূল্যায়ন*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বাশা, কলকাতা

তপন কুমার চট্টোপাধ্যায় (২০১০), *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯৯), *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

দেবীপদ ভট্টাচার্য (১৯৬১), *বাংলা উপন্যাসের কথা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

(১৯৬১), *বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্ব*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

দীপংকর চক্রবর্তী [সম্পাদক] (২০১১), *মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ, নির্বাচিত কালপুরুষ (১৯৬৭-১৯৬৯) সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও নকশালবাড়ি*, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা

দীপালি নাগ (১৪১২), *এবং মানুষ: সমরেশ বসুর গল্প*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

ধনঞ্জয় দাশ [সম্পাদক], (২০০৩), *মার্কসবাদী সাহিত্য- বিতর্ক (অখণ্ড), মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে'*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০১০), *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, ৩য় মুদ্রণ, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ [সম্পাদক] (১৯৮৪), *বাংলার জাগরণ ও ভদ্রলোক*, নরহরি কবিরাজ, 'উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তর্ক ও বিতক', কে পি বাগচি, কলিকাতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, (১৯৮৩), *চেনামহল* (দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৩২৭), *শুভা*, এম. সি সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৮০), *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৮৫), *সাহিত্যের সামাজিকতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

নিতাই বসু (১৩৯৪), *কালকূট সমরেশ*, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা

(১৯৮৯), সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা

নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬), *প্রাক-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

নির্মল ঘোষ (১৪০১), *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী কলকাতা

নীরুকুমার চাকমা (২০০০), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বার্টান্ড রাসেল (১৯৮৪), *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনুবাদ, নূরুল আনোয়ার খান, ঢাকা প্রকাশন, ঢাকা

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য (১৩৯০), *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ২য় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার [সম্পাদক], (২০১০), *বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: বাস্তববাদের বহুমুখ*, বাক-সাহিত্য (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা

(১৯৯৪), *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

(১৯৮৯), *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন*, কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,

পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২), *গৌরকিশোর : কালের উত্তরাধিকার*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

ফরিদা সুলতান (১৯৯৯), *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবন চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বদরুল হাসান (১৯৯০), *উনিশ শতকের নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস*, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৯৫), *বাংলার নবজাগৃতি*, ৪র্থ মুদ্রণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান লি., কলকাতা

(২০০০), *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা

(১৯৭৫), *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, বাকসাহিত্য, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭), *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৯০), *সাহিত্যে অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৬), *পাতাল থেকে আলাপা : মেঘ বৃষ্টি রোদ*, কামিনী প্রকাশনী, কলকাতা

(১৯৯০), *রাত ভরে বৃষ্টি*, সপ্তম সংস্করণ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নববিবি বিলাস*, (১৩৩৪), (সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), রঞ্জন পাবলিসিং হাউস, কলকাতা

লুইস হেনরি (২০০০), *আদিম সমাজ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, বুলবন ওসমান, অবসর ঢাকা

মধুমিতা আচার্য (২০১৩), *স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা*, কমলিনী প্রকাশ, কলকাতা

মহীবুল আজিজ (২০০২), *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮২), *মানিক গ্রন্থাবলী*, ২য় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

মুহম্মদ ইদ্রিস আলী (১৯৮৫), *বাংলদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ১৯৪৭-৭০*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুজফ্ফর আহমদ (১৯৯৬), সমকালের কথা, চতুর্থ মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

মুহম্মদ রেজাউল হক (১৯৮৯*), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস (১৯৪৫-১৯৬০)* , বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুনতাসীর মামুন (১৯৯৮), *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫) তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোস্তফা তারিকুল আহসান (২০০৮), *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোহাঃ সাইদুর রহমান (২০১১), *আমাদের তিন ঔপন্যাসিক*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩৯২), *বাঙ্গালা ভাষা*, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ কলকাতা

(১৯৮৬), *বঙ্কিম রচনাবলী উপন্যাস সমগ্র*, তুলি-কলম, কলকাতা

রফিকুল ইসলাম (১৯৯২), *ভাষাতত্ত্ব*, বুকভিউ, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান, (১৯৯৭), *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবিউল হোসেন (২০১৩) *সমকাল পত্রিকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা*, ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা

রবীন্দ্র গুপ্ত (১৯৯৫), *উপন্যাস জিজ্ঞাসা*, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা

রমেন্দ্র বর্মণ (১৯৮৯), *রাজনৈতিক চেতনা ও বাংলা উপন্যাস*, বাণী প্রকাশ, কলকাতা

রামেশ্বর শ (২০০৬), *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

রেজোয়ান সিদ্দিকী (১৯৯৬), *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

লোকমান হাকিম (২০০৪), *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ (১৮৫৭-১৯৪৭) : শ্রেণীবিন্যাস ও সংস্কৃতির রূপান্তর*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৪১৮), *শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ সপ্তম সম্ভার*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.কলকাতা

শামসুজ্জোহা মানিক (২০১০), *বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের উত্থান*, ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ঢাকা

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৭৫), *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমা,জ* নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা

শোয়াইব জিবরান (২০০৯), *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৬), *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৮), *সতীনাথ রচনাবলী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সত্যজিৎ চৌধুরী (২০১৩), *সমরেশ বসু আমাদের বাস্তব*, একুশশতক, কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০৯), *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, ২য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুনীতি কুমার ঘোষ (২০১০), *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা

স্বপন বসু (১৯৮৫), *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস* দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সফিকুন্নবী সামাদী (১৯৯৭), *কথাসাহিত্যে বাস্তবতা: শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সরকার আবদুল মান্নান (২০০৩), *উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সরোয়ার জাহান (১৯৯১), *বাংলা উপন্যাস : সেকাল একাল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় (২০০২)'রণক্ষেত্র রাজপথ' *পঞ্চাশ-ষাট দশকের কলকাতায় যুব বিক্ষোভ* , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা

সিরাজ সালেকীন (২০০৬), জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প : জীবনজিজ্ঞাসা ও শৈলীবিচার, ঐতিহ্য, ঢাকা

সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯৯৮), *বিবাহ প্রসঙ্গে*, ক্যাম্প, কলকাতা

সুধীর চক্রবর্তী [সম্পাদক], (২০১০), *বুদ্ধিজীবীর নোট বই*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

সুধীর কুমার নন্দী (১৯৯৬), *নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

সুফিয়া আহমেদ (২০০২), *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২*, অনুবাদ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯২), *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০০৩), *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

সুশোভন সরকার (১৩৯৭), *বাংলার রেনেসাঁস*, দীপায়ন, কলিকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬১), *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, প্রথম প্রকাশ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
(১৯৮৮), *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা
(১৯৯৬), *বাংলা উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক দর্পণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা আকাদেমী, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ

সালউদ্দীন আইয়ুব (১৯৯৯) *ফ্রানৎস ফাঁনো, সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি [সম্পাদক] (২০১১), *বাঙালী মধ্যবিত্ত মানস*, উবুদশ, কোলকাতা

সিরাজুল ইসলাম [সম্পাদক] (১৯৯২), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৮৭৪-১৯৭১*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

সৌভিক রেজা (২০১২), *কথাশিল্পের কথা*, ধ্রুবপদ, ঢাকা

হরিশংকর জলদাস (২০১২), *বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ*, রোদেলা, ঢাকা

হায়ৎ মামুদ [সম্পাদক], (১৯৯৫), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা

হিতেন্দ্র মিত্র (১৯৯৫), *সমরেশ বসু মুক্তিপন্থার সন্ধান*, প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা

গ. সহায়ক বাংলা পত্রিকা

অনীক (*এপ্রিল ১৯৮০*), সম্পাদক, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, কলকাতা

অনুষ্টুপ (১৯৮৭), সম্পাদক, শৈবাল মিত্র শীত সংখ্যা, কলকাতা

আনন্দবাজার, ১৭ মার্চ ১৯৭৩

অ্যাক্ট ২৯, ১৮৩৭, আইনের ক্ষেত্রে ফার্সির বদলে মাতৃভাষার প্রবর্তন Board Collection 73770

এবং জলার্ক (২০০০), সম্পাদক, স্বপন দাস অধিকারী, ২য় ভাগ, (কলকাতা : পুস্তক বিপণী)

কল্লোল , ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৪ মাঘ, ডাকঘর বিভাগ

কালি ও কলম, (ফেব্রুয়ারি ২০১৫), সম্পাদক, আবুল হাসনাত, দ্বাদশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা

দেশ , সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২

: ৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ১ মে ১৯৮৮

: ২২ নভেম্বর ১৯৮৬

দৈনিক বাংলা বাজার, (১৯৯২), বিজয় দিবস সংখ্যা, ঢাকা

ধ্রুবপদ (২০০০), সম্পাদক, সুধীর চক্রবর্তী, বার্ষিক সংকলন, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

পাণ্ডুলিপি (১৩৮১), সম্পাদক, শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার ,একবিংশ খণ্ড, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গদূত (১৩ জুন ১৮২৯), সম্পাদক, নীলরত্ন হালদার

বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৯৩২-১৯৩৩

মননে সৃজনে নকশালবাড়ী : বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান, (২০১২), সম্পাদক, প্রদীপ বসু, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা

শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, (২০১১), সম্পাদক, সাধন বড়ুয়া, *কালকূট বিশেষ সংখ্যা*, বর্ষ ৩য়, সংখ্যা, কলকাতা

শালুক (ফেব্রুয়ারি ২০১১), সম্পাদক, ওবায়েদ আকাশ, বর্ষ ১২, ঢাকা

সাহিত্যিকী (জুন ২০১৩), সম্পাদক, প্রফেসর মোঃ হারুন-অর-রশীদ ত্রিচত্বারিংশ সংখ্যা,

সাহিত্য গবেষণাপত্র (২০১৪), সম্পাদক, মোঃ আব্দুল আলীম প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

ঘ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

A. R. Mallick (1961), *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),* Asiatic Society of Pakistan, Dacca:

A S hornby (1997), oxford advanced learner's dictionary of current English, fifth edition, oxford university press, Walton Street

Bimanbihari Majumdar (1924), *History of Political Thought*. Vol.1, university of calcatta, calcatta

Colin Wilson (1978), *Origins of the sexual Impulse,* reprint Granade Publishing Ltd., London

Erich Fromm (1995), *The Art of Loving,* Thorsons Edition Thorsons, London

Gordon Marshall (2nd ed.), (2005), A *dictionary* of *sociology New York* : Oxford University Press

Henry Pratt Fairchild (ed.) (1976), *Dictionary of Sociology* Reprint, Greenwood Press, New York

J. H. Broomfield (1968), *Elite Conflict in Plural Society: Twentieth Century Bengal.* (Burkely, University of Calcutta,

John Scott and Gordon Marshall (ed.), (2005), (New York), *Oxford Dictionary of Sociology*

Judy Pearsall ed. (2000), *The New Oxford Dictionary of English*, Vol.1 Ist edn., Oxford University Press, New Delhi

Limaye, P. M. (1941) *The Problem of Unemployment in Historical and Economic Studies'* edited by kwcve , D.G. poora

M A Rahim (1967), *Social and Cultural History of Bengal* (1576-1757), vol. 2, Pakistan publishing House, karachi

Max Weaber (1947), *Essays in Sociology.* part 11, sec.V11, London

Leah Mclean (ed.) (1995), *Oxford Concise Dictionary Of Polictics,* New York

Ram Gopal (1963), *How the British Occupied Bengal.* Asia, Publishing House, Bombay

Ralph Fox (1944), *The Novel and the People*, Eagle Publishers, culcatta

Geoff Dow (*Retrieved 2009-10-04)*, *Class*, *politics, and the economy*. *Routledge*. *1986*. *ISBN 978-0-7102-0452-3*.

Soren Kierkegaard (1959), Either/or voll. 11. tram wonder Lower, New york

W. C. Smith (1940), *Modern Islam in India,* London: Victor, Gollanges

ঙ. সহায়ক ইংরেজি পত্রিকা

Annual Adm. Report of the Deptt. of Industries, Bengal, 1934-35

David Kopf and Safiuddin Joarder (edt.,), Reflections on the Bengal Resaissance, *Insitite of Bangladesh Studies*, Rajshahi 1977.

Government of the Bengal, General Report on Public Instraction in the lower Province of The Bengal Presidency for 1874-75 (Calcutta: The Military Orphan press, 1876), Appindix-D

http. www.mltranslations org/Britain/Marxclass htm at §The 'Middle Class' M. Rubel and T. B. Bottomore ed., *Karl Marx* (victoria: Penguin Books Ltd., 1960)

Hindusthan Standard 7th June 1967 City Edition

Indian Anual Register 1928 Vol, 1

Stewart Clegg, Paul Boreham, Geoff Dow; *Class, politics, and the economy*. Routledge. 1986. ISBN 978-0-7102-0452-3. Retrieved 2009-10-04

The World Book Encyclopedia m.vol. 13 (U. S.A : World Book Childcraft, Inc, 1981)|